কৃশানু
বর্ষ – ৯
সংখ্যা – ১৯৪
১৩৮৩ – ১৩৮৪

# কৃশানু

শারদীয় ১৩৮৩

the pioneer

# SHALIMAR TAR

still pioneering

We Execute Various Types of
Civil & Structural Works

We also undertake waterproofing, dampproofing,
mastic flooring, foam concreting,
pipe line coating and other specialised
application works.



## SHALIMAR TAR PRODUCTS ( 1935 ) LTD.

6 Lyons Range, Calcutta-700001,

Gram : Shalimatar Telex :

Phone : 22-2385/6, 22-8960

CALCUTTA • BOMBAY • DELHI • MADRAS

কিছুদিন আগে একটি ঘরোয়া সাহিত্য সভায় যাবার আমন্ত্রণ ছিল। ভাবলাম সাহিত্য সম্বন্ধে যার ভাল ধারণা নেই তাকে নেমন্তন্ন, এযে গোলাপের বাসরে অপরাজিতার প্রবেশ।

প্রবীণ নবীনেরা তাঁদের সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা আলোচনা করলেন সেই সভায়। পরের প্রসঙ্গ কলকাতা, আমার আপনার সবার কলকাতা, ভালবাসার কলকাতা। কলকাতার কত সমস্যা, কত অসুবিধা, নানাজনে নানা বক্তব্য রাখলেন। ঝামেলা সবাই পোহাচ্ছে, বৃষ্টিতে জল জমছে, রাস্তা খানা খন্দে ভরা, ট্রামে বাসে ভিড় হচ্ছে, রাস্তায় ফুটপাত দিয়ে চলা যায় না, আবর্জনায় রাস্তা ভরে আছে, বেশী জল পাওয়া যায় না, লিখতে গেলে অভিযোগ হবে পাহাড় প্রমাণ, এইরকম আরো কত কি। এসব অসুবিধাগুলো সবাইকেই ভোগ করতে হয়, কবি, শিল্পী সাহিত্যিক বা চিন্তাবিদকেও ছেড়ে দেয়না। তাঁদের মনোজগতে সাধারণের ঠাঁই না হলেও, সাংসারিক অসুবিধাগুলো তাদের রেহাই দেয়না, মাথা তাঁদেরও ঘামাতে হয়।

কলকাতাকে আমরা সবাই ভালবাসি, এই শহরটার শ্রীবৃদ্ধি আমরা সবাই চাই।

আজ চারদিকে যেন বিরাট এক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। শহরটার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যে দিকেই তাকাননা কেন কোন না কোন কাজ চোখে পড়বে। শুধু কি শহরে? সুদূর বাঁশবেড়িয়া থেকে কল্যাণী যেখানেই যান কাজের নিশানা দেখতে পাবেন। কোথায়ও রাস্তা বা সেতু, কোথায়ও ড্রেন বা স্কুল বা হাসপাতাল। এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের হোতা মহানগরী উন্নয়ন সংস্থা বা সংক্ষেপে সি, এম, ডি, এ, কর্ণধার শ্রী ভোলানাথ সেনের প্রেরণায় আজ চারহাজার জায়গায় পুরোদমে কাজ চলছে কলকাতা ও শহরাঞ্চলকে ভাল করতে। সি, এম, ডি, এ কলকাতার রাস্তাঘাট চওড়া করেছে, সুড়ঙ্গ-পথ, উড়ালপুল, ব্রীজ তৈরী হচ্ছে, পুরাণো জলাধারের সংস্কার করাতে এখন অনেক বেশী জল পাচ্ছি আমরা, নতুন নতুন জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। ড্রেনেজের উন্নতি হওয়াতে কলকাতায় অনেক জায়গায় বর্ষায় জল জমলেও বেশীক্ষণ দাঁড়ায়-না। বস্তীর লোকেরা উন্নত জীবন-ধারণের সুযোগ পাচ্ছে। নগরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সব কিছুর উপর নজর রেখেছে এই সি, এম, ডি, এ।

এক শ্রেণীর নিন্দুক কিন্তু কলকাতার ভালো হওয়াটা কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিল না। তাদের ভাষায় কলকাতার ভবিষ্যত অন্ধকার, এই পচা গলা শহরের কিছুই হবে না, শুধুই টাকা জলেই যাচ্ছে। তারা সবাই কিন্তু এই শহরবাসী, হালে তাদেরও সুর পালটিয়েছে। তাদের অভিনন্দন চিঠি আমরা প্রায়ই পাচ্ছি, শহরটাকে ভালো করার জন্য তাদের আন্তরিকতা আমরা লক্ষ্য করছি। কলকাতা-বাসী নিন্দুক-কুলের মন জয় করতে পারাতেই সি, এম, ডি, এ একটু বেশী উৎফুল্ল।

**With Best Compliments from :**

Phone : 24-4170

# BRIGHTWAYS

Contractors & General Order Suppliers

27, Park Lane
Calcutta-16

সবুজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।

**শান্তিনিকেতন...** শরতের নির্মল আকাশ আর ধানক্ষেতে দোলা লাগানো মৃদুমন্দ বাতাসের স্পর্শ। এখানে ওখানে হাজারো গাছের আড়ালে নাম-না-জানা অজস্র পাখির ভীড়। সুরকি-ঢালা লাল রাস্তার পাশে পাশে গাছের ছায়ায় প্রাচীন তপোবনের ঐতিহ্য। একাধিক বিস্ময়কর মূর্তি...ভাস্কর্যের বিমূর্ত প্রতীক। উপরন্তু বিচিত্রা আর উদয়ন...কবিগুরুর পুণ্য স্মৃতিধন্য। আম্রকুঞ্জ আর শাল-বীথিতে পথিকের ভীড়। আশ্রমের বাইরে মেঠো পথে রাখালিয়া বাঁশির সুর। এ সব নিয়েই আজকের শান্তিনিকেতন... আপনার আমার 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'।

বুকিংএর জন্য যোগাযোগ করুন : রিজার্ভেশন কাউন্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন,৩/২,বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ(ইস্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০১ অথবা ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

**ট্যুরিস্ট অ্যাডভো**

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট)
কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন : ২৩৮২১৭
গ্রাম : TRAVELTIPS

পর্যটন বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

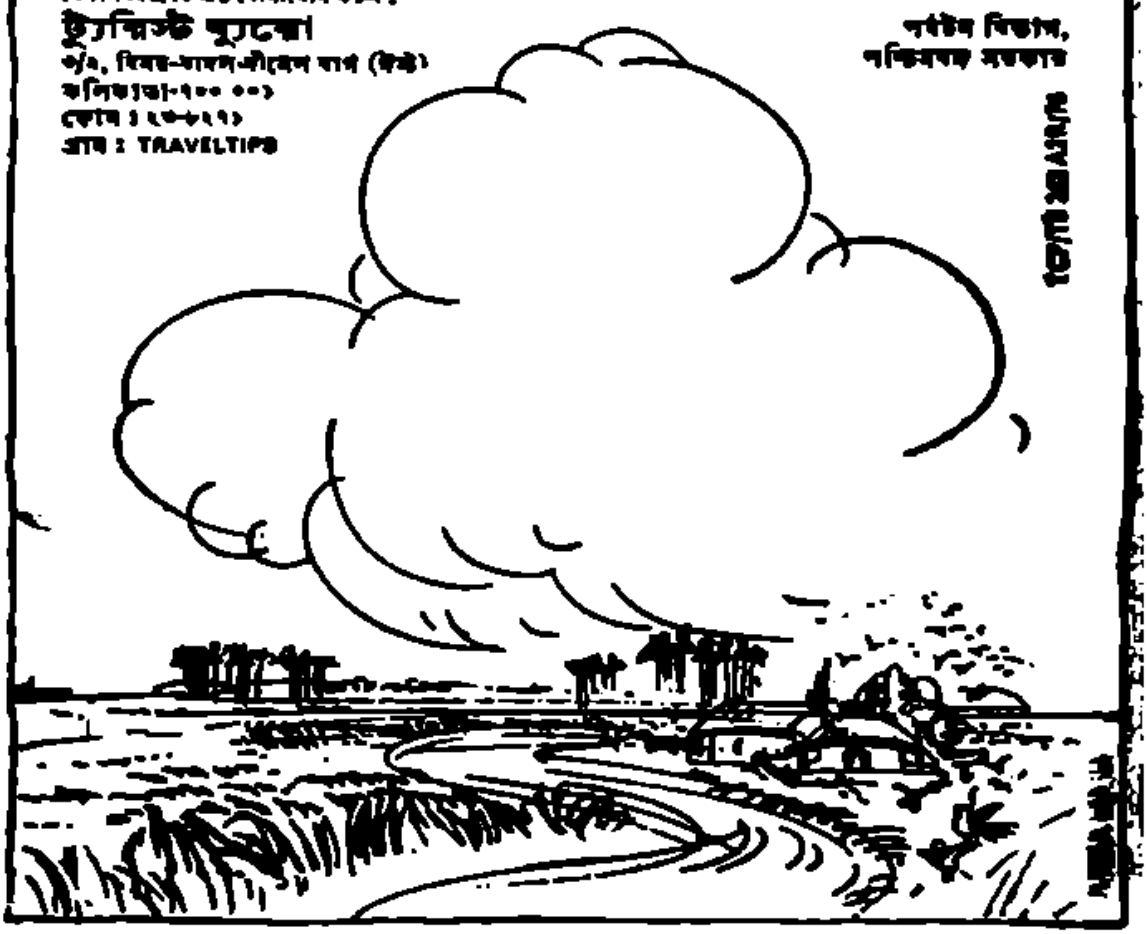

*With best compliments of*

★

Telegram : 'NADIACHEMI' Phone : 34-3176

**NADIA CHEMICAL WORKS PRIVATE LTD.**

Manufacturers and Importers.

*Manufacturers of :*

Laboratory & Technical Apparatus & Plants

Incubators, Sterilisers etc.

Laboratory Fitters & Furnishers.

★

*Regd Office :*

**C 44. 45 & 46, College Street Market**

**Calcutta-12**

# বিদ্যুৎ সরবরাহে গণ্ডগোল

## ॥ কিন্তু সবসময় লোডসেডিং নয় ॥

লোডসেডিং হল বিদ্যুৎ সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ঘাটতি দেখা দিলে এই নিয়ন্ত্রণ জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ হবার পর থেকেই এবং বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নতির ফলে লোডসেডিং এখন আর সচরাচর হয় না। তবুও সরবরাহ ব্যবস্থায় স্থানীয় গোলযোগে বিদ্যুৎ সরবরাহে সময়ে সময়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম চুরি যাওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যাহত হয়।

আপনার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটলেই ধরে নেবেন না 'লোডসেডিং।' পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে।

'কল সেন্টার,' 'গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই' অথবা অপারেশন ও মেন্টানেন্সের স্থানীয় এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

## পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

Gram : Servrocket Phone : 24-4556/5947

# Transport Development Corporation

*Head Office* :—
132, Lenin Sarani, Calcutta-13

*Garage & Warehouse* :—
1. 23-N. Radha Madhab Dutta Garden Lane, Calcutta-10

Phone : 35-8742

2. Circular Garden Reach Road, Opp. Sick Line, Gravel Siding, Kidderpore, Calcutta.

*Branches* :—
Dhanbad, Barauni, Patna, Muzaffarpur, Jamshedpur, Ranchi, Raxaul, Coimbatore, Madras, Hyderabad, Delhi, Bombay, Bangalore,Nagpur & Ahmedabad.

*Experts in* :—
Clearing & Forwarding works, Road Transportation, Warehousing & Freight Forwarding Service. Super-Mail Service between Cal-Bombay, Cal-Delhi, Cal-Madras, Cal-Hyderabad, Cal-Nagpur & Cal-Ahmedabad.

REGISTERED TRANSPORT OPERATOR UNDER INDIAN BANKS' ASSOCIATION

আকাশে শরৎ। মানুষের মন
এখন মেঘের সঙ্গী। ছুটতে চায়
দূর দিগন্তে যেদিকে নদী, সমুদ্র,
পর্বত, যেদিকে সৌন্দর্য এবং
সুষমা। আমরা জানি। এবং
আমরা প্রস্তুতও। মানুষের আসা-
যাওয়ার পথের ধারে আমরা
বাড়িয়ে আছি হাত সাহায্যের,
সৌজন্যের, সহযোগিতার।
বিনিময়ে প্রত্যাশা শুধু একটাই।
তার নাম শৃঙ্খলা। জীবনের
চলা-হাঁটার পথে শৃঙ্খলাও এক
সৌন্দর্য।

পূর্ব রেলওয়ে

# B S C

OFFERS

Consultancy • Design • Manufacture
OF
Industrial Structures & Material Handling
Equipments :

**B S C** CONSULTANTS

**10/1 Sahid Khudiram Bose Sarani**
**Calcutta-700028**

**With best compliments of :**

# T. K. STEEL FABS.

DESIGNERS, FABRICATORS, ERECTORS

10/1, MALL ROAD,
CALCUTTA-700028

*With Best Compliments from—*

Phone : 45-7785
45-8428

Telegram 'SNEMOC'
Calcutta

# C. COMENS & SONS LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

103/3, Diamond Harbour Road,
Calcutta-700038

*Branch Office* :
17, Casa Major Road,
Egmore
Madras-600008
Phone : 86565 ( 2 Lines )

With best compliments of :

Phone : 24-2711

**AUTOMAKE**

Automobile & Mechanical Engineers
Undertake all sorts of vehicle repairs
Body making etc.

Selling & Purchasing of Cars :
Light Fabrication, Machining & Mechanical Jobs.

116, Dr. Lalmohan Bhattacharya Road,
Entally, Calcutta-14.

## কৃশানু

একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এককালীন চাঁদা ছয় টাকা। সডাক আট টাকা।

বিশেষ সংখ্যার বর্ধিত মূল্য গ্রাহকদের দিতে হয় না।

নমুনা সংখ্যার জন্য দুই টাকার ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টরা ২৫% কমিশন পাবেন।

কৃশানু মুখ্যত নবীন লেখকদের মুখপত্র। কৃশানু'তে রচনা প্রকাশের জন্য তদ্বির করতে হয় না। উত্তমানের যে কোন মৌলিক রচনা প্রকাশের জন্য সাদরে গৃহীত হবে। প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ সম্ভব নয়।

With best Compliments from

Phone : 47-5522

**DATTA ENGINEERING CORPORATION**

*FABRICATOR AND CONTRACTOR*

25, ASUTOSH MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-700020

# আনন্দের সঙ্গে সেবা

"যদি আনন্দের সঙ্গে সেবা না করা হয় তবে তার কোন অর্থই হয় না। যখন কেবলমাত্র জনমতের ভয়ে বা লোক দেখানোর জন্য সেবা করা হয় তা কেবল মানুষকে অভিভূতই করতে পারে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।"

—মহাত্মা গান্ধী

জাতির সেবা করা আমাদের মহান লক্ষ্য এবং সেই সুযোগ আমরা পেয়েছি।

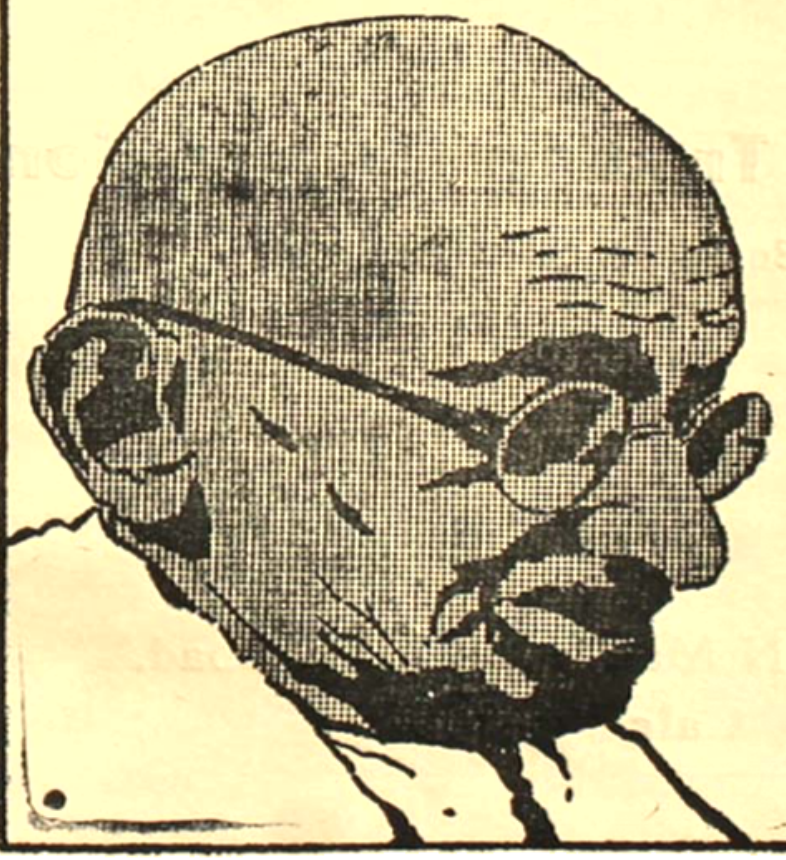

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

*With best Compliments from :*

Phone : 35-8632

**Bengal Trading Corporation**

Engineers & Contractors

**127 N Maniktala Main Road.**
**Calcutta-700054**

কবিগান বাঙ্গালী কৃষ্টির
অন্যতম অঙ্গ। পূর্ববঙ্গের
কবিগানের শেষ সার্থক প্রতি-
নিধি কবিয়াল শ্রীনকুলেশ্বর
সরকারের ( নকুল দত্ত )
৭০ বছর ব্যাপী কবিজীবনের
অনবদ্য আলেখ্য। খ্যাতনামা
কবিয়ালদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার
চমকপ্রদ বিবরণ। পূর্ববঙ্গের সরস মাটি ও রসিক মানুষের সাবলীল পরিচয়

প্রকাশের অপেক্ষায়

# কবিয়াল কবিগান

দীনেশচন্দ্র সিংহ

দাম বিশ টাকা

## জ্যোৎস্নাময় বসুর

নতুন স্বাদের প্রথম উপন্যাস

## সিকিদিরি

দাম সাত টাকা।

হাতিয়া—ধুক্কয়াতে টাকা উড়ছে।
কায়দা জানলে সে টাকা ধরাও যায়…।
প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে
প্রকৃতি যে হেরে যাচ্ছে তার প্রমাণ…
সুবর্ণরেখার জল এবং
বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে

**লিপিকা** ৩০/১এ কলেজ রো কলিকাতা—৯

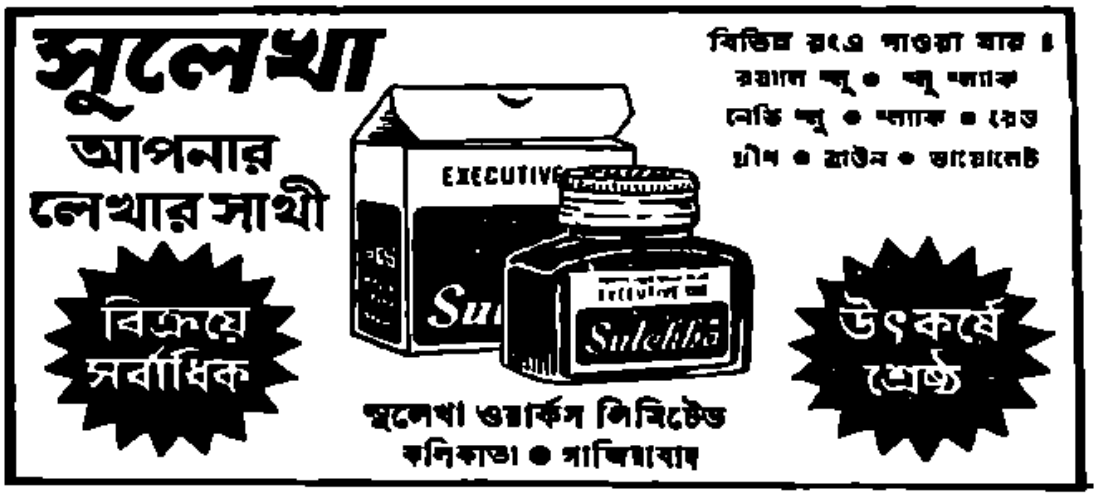

*With Best Compliments of :*

**South Calcutta**
**Construction**
**Company**

Engineers Builders and Government Contractors ::
Colouring Painting and Interior Decorative Finish.
Cable Laying Contractors To Calcutta Telephones.

411, Beloygarh, Calcutta-32
Gram : MEROON, Cal-32 Phone : 46-0828

অজিত হাজরার দু'খানা উপন্যাস

যে যার মতন — দশটাকা
ওরা চারজন — দশটাকা

**করুণা প্রকাশনী**

১৮ টেমার লেন,
কলি-৯

**With Best Compliments from :**

# S. Chakraborty & Co

Government Contrctors

**14-L Middle Road** ( Ground floor )
**Calcutta-14**

# স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী / প্রভাস ভদ্র

আজকাল তরুণ গল্প লেখকরা নিটোল গল্পরচনায় প্রায়শ সমর্থ নন—প্রভাস ভদ্র এই সাধারণ অভিযোগের জলন্ত জবাব। ইতিপূর্বে 'গল্প দশক' 'সময়ের কণ্ঠস্বর' 'গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থে একাধিক গল্প সংকলিত হওয়ার পর তার কয়েকটি অসাধারণ গল্পের সংকলন 'স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী' সম্প্রতি প্রকাশিত।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেন, লেখাটা প্রভাসের কাছে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের মত জরুরী ব্যাপার। তার চেয়েও জরুরী ব্যাপার, কিছু বলা। তিনি কিছু বলতে চান।··· গল্পগুলো না পড়লে বাংলা গল্পের এই হতাশাব্যঞ্জক উচ্ছৃংখল রাজ্যেও যে অনেক সত্যিকার নিষ্ঠা কাজ করছে, টেরই পেতাম না।

সাপ্তাহিক 'দেশ' মতে, প্রভাস ভদ্র লেখক হিসেবে তরুণ হলেও শিল্পের একটি চরম কথা জেনে গিয়েছেন·· বোঝাগেল তিনি গল্পের বক্তব্যও বিশ্বাসী। এই সংকলনের প্রতিটি গল্পেই সে বিশ্বাসের প্রমান রেখেছেন।

সাপ্তাহিক 'অমৃত' মতে, তরুণ জীবনের বেকারী ও অন্যান্য জ্বালা যন্ত্রণা গল্পগুলির মূল বিষয়···তা ভালভাবেই ফোটাতে পেরেছেন লেখক। লেখারও রীতিমত মুন্সিয়ানা আছে। সেই সঙ্গে আছে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য।

'দৈনিক বসুমতী' মতে, লেখক যথেষ্ট পরিচিত না হলেও এই গল্পগুলির মধ্যে তাঁর মুনশীয়ানা ও প্রতিভার পরিচয় তাঁকে নিঃসন্দেহে খ্যাত করবে।

এবং প্রভাস ভদ্র বলেন, বক্তব্য বলতে যা কিছু আমার গল্পতেই। লিখেছি এবং লিখছি নিজের তাগিদেই।

॥ লিপিকা কলকাতা-৯ ॥

**With Compliments of :—**

Phone :—24-3771 Post Box No.—7819

# EASTERN TRADERS

**45A, Bancharam Akrur Lane**
**Calcutta-12**

**With best Compliments from :—**

# THE ECONOMIC BUILDERS PVT. LTD.

Engineers & Government Contractors.
**Batanagar, 24-Parganas**

# কৃশানু

সাহিত্য ত্রৈমাসিক

নবম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। শারদীয় ১৩৮৩

লেখক সূচী

কবিতা

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কৃষ্ণ ধর। গৌরাঙ্গ ভৌমিক। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। ফণিভূষণ আচার্য। স্বপন কুণ্ডু। নিশীথ ভড়। অজয় নাগ। হৃষীকেশ বিশ্বাস। প্রসেনজিৎ গুহ সরকার। প্রণবকুমার পাল। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। শংকর চক্রবর্তী। রঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মীনা ভৌমিক। বাউল চৌধুরী। স্বপন চক্রবর্তী। কানাই ঘোষ। অনুপ কুমার আচার্য। উজ্জ্বল সিংহ। শ্যামল কান্তি দাশ। সুনীল বসু। কবিতা সিংহ। অরণি বসু। পূর্ণেন্দু পত্রী। সাধনা মুখোপাধ্যায়। যজ্ঞেশ্বর হাজরা। শান্ত রায়। গোবিন্দ ভট্টাচার্য। পিনাকী গুহ। সমরেন্দ্র ঘোষাল। রঞ্জিত সিংহ। করোল বিশ্বাস। ফণী বসু। ইন্দ্রনীল মিত্র। কমলা সরকার। বরেণ রায়। রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়। সন্দীপ দে। সুখরঞ্জন রায়।

গল্প

অজিত হাজরা। পুষ্পজিৎ কর্মকার। অশোক কুমার সেনগুপ্ত। নির্মল চট্টোপাধ্যায়। যজ্ঞেশ্বর বর্মণ। মদন দাশ। দীনেশচন্দ্র সিংহ। প্রভাস ভদ্র।

উপন্যাস

জ্যোৎস্নাময় বসু

প্রচ্ছদ

শ্রীপ্রভাস

সম্পাদক

দীনেশচন্দ্র সিংহ

## সম্পাদকীয়

কবি নজরুলের কায়িক মৃত্যু ঘটল সম্প্রতি। মানসিক মৃত্যু ঘটেছে ১৯৪২ এর জুন মাসের কোন একদিন। সেদিন বাঁধনহারা কবি জবান হারা হলেন। নীরব কবির ব্যথাতুর অগ্রীম আবেদন নিয়তির দরবারে পৌঁচেছিল নিশ্চয়ই। তাই বিয়াল্লিশের পরবর্তী বাঙ্গালী চরিত্রের কুৎসিৎ বর্বরতা কাপুরুষতা ধর্মান্ধতা হিংস্রতা নিষ্ঠুরতা কবিকে সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করতে হয়নি। নজরুলের মরদেহ ও কবর নিয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ। পাশবিকতার বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী, পিতৃহন্তা ও পিতৃত্ব স্বীকারে নারাজ জল্লাদদের নখদন্ত লুকানোর জন্য একটা কবরের আড়াল দরকার। কবরের বোরখা পরে তারা সভ্য সমাজে চলাচল করতে চায়। আমাদের শুধু কামনা—মাটির কোলে শায়িত কবি ধূমকেতুরূপে সে আকাশে ভেসে উঠুন। মুরলে পরিণত হোক তাঁর অস্থিপুঞ্জ। সৃষ্টি হোক নলখাগড়া। অভিনীত হোক যদুবংশ। কফিনরূপী ট্রয়ের ঘোড়া থেকে বেরিয়ে আসুক লক্ষ লক্ষ সংশপ্তক—অগ্নিবীণায় ঝঙ্কার তুলে বিশ্বের বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে। ইতিমধ্যে আসুন, আমরা কবির কালীভক্তি ও আল্লা ভক্তির হিস্তা নিয়ে কিস্‌সা গাই ; ঘন্দে প্রবৃত্ত হই।

* * *

এ সংসারে যারা শুধু পেলই, দিলে না কিছুই তারা শরৎ জন্ম শতবার্ষিকীতে শরৎচন্দ্রকে অড়াল করে প্রচুর মালা, তোড়া ও তালি পেয়েছেন এবং সমাধান-ভীতু, মেয়েলী কোঁসকোঁসানির লেখক বলে খারিজ শরৎচন্দ্রের মধ্যে হঠাৎ মার্কসিজমের বীজাণু খুঁজে পেয়েছেন। কি মৌলিক আবিষ্কার।

* * *

এবারের পূজা সংখ্যায় কৃশানু'র নবম বর্ষ শুরু। এই নয় বছরে কৃশানু অনেক কবি গল্পকারকে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশে ছাড়পত্র দিয়েছে। এখন লিটল ম্যাগাজিনের চরম দুর্দিন। বেশীর ভাগ মরে গেছে। বাকী কয়টা ধুঁকছে। নতুনের জন্মরোধ। ছোট পত্রিকার লেখকগণ নিজেদের স্বার্থেই পাঁচ দশ কপি পত্রিকা নিজ নিজ অঞ্চলে বিক্রি তথা প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাতে পত্রিকার জন্য দরদ প্রকাশ পাবে : অনুরাগী পাঠক মহল তৈরী হবে। বড় পত্রিকায় লেখা ছাপানর জন্য .মান খুইয়ে হত্যা দেওয়ার চেয়ে তা অনেক বেশী মানী কাজ।

কৃশানুর নববর্ষ ও শারদীয়—শুভ প্রীতি-শুভেচ্ছা, শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি।

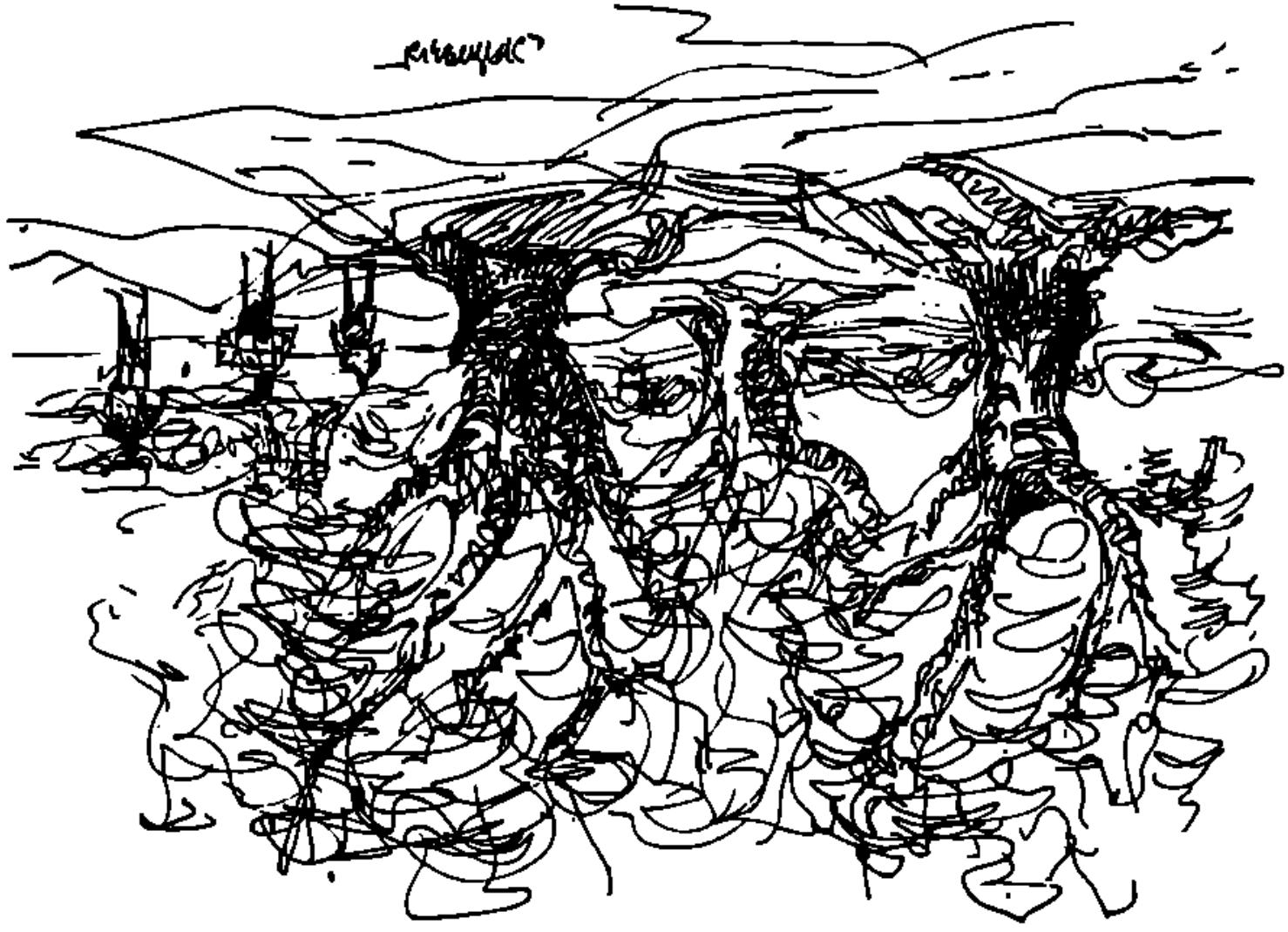

## কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী
## নজরুল : স্মৃতির উপমা

বাঙলাকে কাব্য গড়ে প্রার্থনার মন্ত্র আয়োজনে
আজীবন বক্ষে আমি কান্নার অব্যাহতি পাইনা ;
অগ্নিবীণা সরগম আমার শরীরে সুনির্জনে
সারাক্ষণ কেঁদে যায়.—যে সমুদ্র হঠাৎ নীরব···

যেহেতু জলের শব্দে বেঁচে থাকে হাহাকার স্রোত,
আমার অশ্রুর রঙে তাই যেন চেনা হয় মাটি
স্মৃতি সত্তার উপমা ;—
অনুভূতির মৌন সংসারে
নজরুল : চুরুলিয়া : বাঙলাদেশ-কবিতা-ভাগ্য
আমার বিনীত প্রশ্ন ;—
মাটি সহোদর কবি, তুমি
আমার পূজার মন্ত্র, অথচ তোমাকে ঘিরে আমি
দেয়াল দাঁড়িয়ে থাকি ; তোমার অরুণ মহাকাব্যে
প্লাবন-বহ্নি-ঝড়ে কখনো কি প্রয়োগ হবো না।
চিরকাল থেকে যাবো অনারোগ্য কাপুরুষ রোগী ?

তীর্থের উদ্দেশে আমি, সর্বহারা ধাবিত প্রগতি,
জঞ্জালের স্তূপ চিনি, অথচ, তুমিই সেই তীর্থ।

বস্তুতঃ কান্নার মন্ত্রে তুমি জ্যৈষ্ঠের রুদ্র দর্পণ,
বৈশাখী সূর্যের পথে যুগ আনা ঝড়-অভ্যর্থনা
কান্নার গঙ্গোত্রী ধারা বিশ্ব-বাঙলা স্মৃতি তর্পণ
ধ্বংসের বিপ্লব তূর্যে সৃষ্টির সাবলীল প্রার্থনা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

## খেয়া ঘাটে

ভোরাকাটা সোয়েটারের মতো চামড়া
একটি কুকুর ছুটে গেল
কোনাকুনি পশ্চিমের দিকে
তখন বৃষ্টির ঠিক আগের মুহূর্ত
তীব্র নাদে কাঁপিয়ে তুলুক বর্ণ মেঘ
একটি রুপালি বর্শা
সোজা এসে গেঁথে গেল
নদীর পাঁজরে
পিত্তল বাসন নিয়ে সিক্ত এক নারী
চলে গেল শাড়ী সপসপিয়ে
ঈষৎ পৃথুলা, তবু কোমরে জাদুর ছোঁয়া
বাঁক ঘুরবার আগে তাকে ছুঁয়ে ছেনে গেল
চৈত্যের বাতাস
তিনটি ধবল হাঁস সেধে নিল গলা···

খেয়াঘাটে এসময় আর কেউ নেই, আমি একা—
আমি কি যাবো না ? আমি পিছনে দৌড়োবো ?
যতই চিৎকার করি, বজ্রপাত ছাড়া কোনো
প্রত্যুত্তর নেই
কালো হয়ে আসে বেলা, আমি সুঁচ রাজা হয়ে
ভূমিতে শয়ান।

কৃষ্ণ ধর

## অন্ধকারে মুখচাটে শিকারী বেড়াল

সারাক্ষণ চেয়ে আছে নিবিষ্ট হয়ে
অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে তার চোখ
একচুল নড়ে না চড়ে না।

অন্ধকারে মিহি হয়ে মিশে থাকে শরীর
শুধু আগুনের মতো জ্বলছে তার চোখ।
অন্য কোনো দিকে নজর নেই
সে তন্ময় হয়ে আছে শিকার ধরার জন্য।

বেফুর ইঁদুরগুলো মহানন্দে ভাঁড়ারে লাফায়
অন্ধকারে মুখ চাটে শিকারী বেড়াল।

## গৌরাঙ্গ ভৌমিক
## দু'টি কবিতা

১

দুয়ার ধরে হঠাৎ জোরে কড়ানাড়ে পিয়ন—
আপনি মশাই, গৌরবাবুর কে হন ?
কেমন করে জানি
ডাক-পিয়নও জেনে ফেলল গৌরবাবু নই আমি।

বলল আবার, আপনারই কি নাম ?
তাহলে নিন, এই যে টেলিগ্রাম।
কে দিয়েছে ? দেখি,
সুদেষ্ণারা ভালো আছে, একি
এখন আছে পথের মধ্যে দার্জিলিংয়ের মেলে,
ডিভোর্স হবে কলকাতাতে এলে।

ভালো আছে, ভালো আছে, ভালো আছে, নাকি ?
কথাটাকে সারা প্রহর কেবল ভাবতে থাকি।

২

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল নেমে।
তুমি কেন দাঁড়িয়ে আছ পথের মধ্যিখানে ?
ধুয়ে নিচ্ছ শরীরটাকে ? ধোও,
পবিত্র এই বৃষ্টিধারার জলে।
তোমায় নিতে ময়ূরপঙ্খী নৌকা এল বলে।
যাচ্ছ নাকি ? চলে যাচ্ছ ? যাও।
মনে জাগছে সুদূর কোনো আশা ?
যাবার সময় ফেলে যেও পুরোনো সব চিঠিপত্রের সঙ্গে,
বিয়ের আগের পীরিত-টিরিত এবং ভালোবাসা।

## প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

### অর্থহীন

এত হৈচৈ, এত আলো, রেস্তোরাঁয় এত ঝুলঝুরি—
তবু মানুষের সঙ্গে মানুষজনের যোগাযোগ
ক্রমশই ক্ষীণ হ'য়ে আসে।
যারা পটকা ফাটিয়ে দিয়ে হো হো ক'রে হাসে
তাদের সমস্ত রঙ্গ বুক-ভাঙা আর্তনাদ মনে হয় কেন?
হরিভূষণের দল গাঁজাপার্কের দিকে চলে যায়
কোলাহল ক'রে—
আমিও তো সঙ্গে যাই, আমিও কি দুঃখ ভুলতে গিয়ে একা
হেসে উঠি?
ভেজা শালিকের দল উড়ে আসে ছাতের ওপরে—
মানুষ তাদেরও কিন্তু লক্ষ্য করে, কেউ খাতা খুলে বসে,
কেউ বা পয়সা দেয় ভিখিরিকে, কেউ রেগে ওঠে—
ঘন-কুয়াশার মতো তবু এক ছায়া দোলে
প্রত্যেকের মুখের ওপরে,
কেউ উঁকি মেরে দেখে, দেখতে পায়ে না,
কেউ কিছুই না দেখে
বাসে ওঠে, বাস থেকে নামে, আর
বাড়ি ফিরে এসে
রাতের বাজার করতে বেরোয় বিকেলে॥

কণিভূষণ আচার্য

## মৃত সৈনিকের ঘোড়া

হৃদয়ে কয়েক প্রস্থ ঘাস ছিল অবিরল ঘাসের মতন
শিশির হাওয়ায় ঠিক নত হতো  দুঃখে সুখে
চাই কি না চাই রোজ যত্নে কমাল ওরে ফুল দিত  ফুল
হৃদয়ে কয়েক প্রস্থ ঘাস ছিল অবিরল ঘাসের মতন

অই-খানে একদিক সিংহাসন পাতা ছিল
ফুলকাটা সবুজ জাজিমে
অই-খানে একদিন সিংহাসন পাতা ছিল
উলুখড়ে রাখাল রাজার
সরল বিস্ময় ছিল মন্ত্রমুগ্ধ খরগোশের মতো।
হৃদয়ের কাছাকাছি নীল হ্রদে ভুঁতেরং বৃহৎ আকাশ ছিল
অবিকল আকাশের মতো...
এখন মাঠের কোণে মাকড়সার জালে ভ্রষ্ট শিশিরের স্মৃতি লেগে আছে
অই-খানে কোন নারী নক্ষত্রমানের পর জীবনকে ভালোবেসেছিল

এখন হৃদয়ে তাখো জেগে আছে মৃত এক সৈনিকের ঘোড়া
আকাশের দিকে মুখ তুলে  ঈষৎ বাদামী ফিকে ঘাড়ের কেশর
বিদ্যুৎ-মেঘের মতো পাক খায়  আকাশ সেখানে দূর  খুব দূর
হাঘরে মেঘেরা কচি শালপাতা খেতে যায় অর্জুনপাহাড়ে
পৃথিবীর দার্শনিক শোকগুলি মুছে নেবে দুর্দিনের শেষরোদ
বিধ্বস্ত হৃদয়ে শুধু জেগে থাকবে মৃত এক সৈনিকের ঘোড়া
নির্জন বিষাদে ওর চোখ থেকে দেখে নিও একদিন
ঈষদ্রুক্ষ বৃষ্টিপাত হবে

## স্বপন কুণ্ডু
# একটি আন্দোলনে

একটি আন্দোলনে টুটে যাক্ জলের বধিরতা ঘাটের কান্নায় নদী হোক
বৃক্ষের গৌরবে সমাসীন থেকো না কেউ
একটি আন্দোলনে ছিন্নবসন উড়ে যাক্ বাদামী বনের দিকে
চৈত্রের চিতায় পুড়ে যাক্ ধূর্ত মুখোস

অসুখী নারীর কাছে যেও না অচলমুদ্রায়
সুবর্ণ আধারে রেখে এসো জীবনের সজীবসকলতা
মহার্ঘ প্রেমের লাবণিতে ঢেকে দাও সব লজ্জা গোপনতা তার
একটি আন্দোলনে তাকে ফিরিয়ে দাও
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রখচিত সহাস্য আকাশ

একটি আন্দোলন দাবানল হোক বনে উপবনে
সর্বভুক আগুনে পুড়ে যাক শকুনের বাসা চিলের ডিম
শেকড়ের নীচে ইঁদুরের গর্তে লুকনো পুরাতন সাপ
তারপর ভস্ম ঔষধি
সারা অঙ্গে মেখে মন্ত্রের মতো
অমোঘ প্রাণের বার্তা রটিয়ে দাও বাতাসের সফলচুম্বিতে
একটি আন্দোলনে কেঁপে উঠুক বাসুকির মাথা

## নিশীথ ভড়

### সন্ধান

ওই মুখের থেকে কি টুকরো খাও হরিৎহেম গমদানার মতো
কি আকাঙ্ক্ষা নেচে বেড়ায়, কেন বেড়ায়, শরীর ঘিরে ঘিরে
ঝুঁটির কিছু রম্যতা ও গলার কাছে স্নিগ্ধ বর্ণলিপি
তোমার ভালো লেগেছিলো, তোমার ভালো লাগেনি, লাগবে না
অসুখে আর প্রতারণায় তাই কি ভালোবাসতে চেয়েছিলে
যেমন ভালোবাসার ইচ্ছে জড়িয়ে থাকে নিসর্গেও, কানা
সে, কিন্তু, তুমি তো নও, তোমার ততো কিসের দায় বলো
জড়িয়ে শুয়ে থাকতে চেয়ে তাৎপর্যের লোকশিল্প, কাঁথা
তাড়সে জ্বর আসে, জ্বরে নাড়িবিকার, বিকারে ঘুঘনীল
কি সন্ধানে ভূতের মতো আজো ঘুরছো, ফিরতে পারছো না।

## অজয় নাগ

### করাতের হাতল

একদিন সব হবে—এই মনে করে
প্রতিদিন রাতে শুতে যাই
প্রিয় কবির লেখা হারিয়ে ফেলি—পড়া হয় না
মুখিকারা ফিরে যায় শর্ত ভেঙে দিয়ে
নাম ধরে ডাকে ঘুমের মধ্যে প্রিয় সখা
—চিঠি লেখা হয় না
কবিতার বর্ণমালা ভুলে যাই
নিছক শরীর ও তার নিশ্বাস নিয়ে শুতে যাবার আগে
আয়নার সামনে নিজেকে দেখতে পাই—
ধারালো নিরুপায় করাতের হাতল

## হৃষীকেশ বিশ্বাস
## দু'টি কবিতা

জলে স্তব জলে মন্ত্র
থেকে থেকে জেগে ওঠে
আমাদের গুহ্য ভয়াল তন্ত্র।
জলে স্তব জলে মন্ত্র।

জ্যোৎস্নার ফুল ফাটছে
খুব খুশীর আহ্লাদে
তার সঙ্গে পারিস তো
তুই পাল্লা দে!
জ্যোৎস্নায় ফুল ফাটছে…

## প্রসেনজিৎ গুহ সরকার
## ইদানীং বয়স নিয়ে

একদিনেই মনের তারিখ
অনেকবার বদলে যায়।
আশা নিরাশা নিয়ে দ্রুত ছোটা,
উপন্যাসের গুরুতা আর যাযাবর বিস্ময়।
একদিনেই অনেক বার
খবার চুম্বন বসন্ত চুরি করে নেয়।
নাট্যমঞ্চে বয়সগুলো অসময়েই
ছিনিয়ে নেওয়া সংলাপ বলে।
একদিনেই অনেক পথ পাড়ি দিয়ে
বিশেষজ্ঞ—কিম্বা 'বৃদ্ধ' হওয়া।
দিন দিয়ে যায়না মাপা মাস
বয়সের মাপ দিয়ে যায়ন বছর।

## প্রণবকুমার পাল
## এবং সে সুখ

চেতনার গহীন অরণ্য হেঁটে
যদি কোন হিংস্র ভীমরুল খুঁজে পাও
তবে তার ভ্রূণ খুন করে
আমাকে উপহার দিও
আমি সুখী হবো।

চেতনার পুষ্পোদ্যানে
যদি কোন উচ্ছৃঙ্খল প্রজাপতি পাও
সংযমে আবদ্ধ ক'রে তাকে
আমাকে উপহার দিও
আমি সুখী হবো।

আমার সাম্রাজ্য হেঁটে
যদি কোন ক্ষুধার্ত যন্ত্রণা
অথবা
বন্ধ্যা গাছ খুঁজে পাও
ব'লো।
তাদের সাজিয়ে
আমি চিরবসন্ত উপহার দোব।
কেননা তবেই
আমি সুখী হবো
এবং সে সুখ মানে
পরিপূর্ণ কোন নিটোল সকাল।

## পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

### বসন্ত

যে বসন্তকালে তুমি দেখিয়ে দিয়েছো—অক্ষরেরা কারাগার
মৃত রঞ্জনের শবদেহ,
জানো বা জানো না, ঠিক সে ঋতুতে, আমি, ওই প্রণয়ে দেখেছি
অসংযোগের সন্দেহ।

আমার অক্ষয় থেকে তোমার প্রণয় বড়ো দীর্ঘপথ দূর, যাতে লাগে
শিরদাঁড়া সারাক্ষণ সোজা করে থাকার মতন পরিশ্রম—
রক্তরহস্যের খ্যাত প্রাচীন পাথেয়, সে কি সর্বক্ষণ থাকে ?
থাকে না, সেজন্যে আসে বারবার বসন্তবিভ্রম।

অক্ষরশূন্যের স্পর্শ, প্রেমপৃথিবীর রূপ থেকে
পার্থিবপ্রণয় আজ মেলে ধরে—দেব পাঠকের দিকে। কোনো নন্দিতরঞ্জন
আসবে না ? একা, বা অনেকে ?

বিলাপী পাপিষ্ঠ ঋতু তোমার চৈতন্য থেকে ঝরে যায়। চেয়েছে সংহার—
উত্তর পায়নি কোনো। তার ভুলে শেষতম গৃহযুদ্ধ, ঋষির ভাষার মতো তীক্ষ্ণধার

কবি আর প্রণয়ীর জন্যে আমি রেখে যাবো শুভ্র, ধর্মহীন আলিঙ্গন।

শংকর চক্রবর্তী

## অন্য আদিবাসী

তিনি চলেছেন একা, বনের অলক্ষ্মী, পর্বতের
মতো নোংরা, ছিন্নমুণ্ড হাতে
সংসার ছাড়িয়ে বহুদূর ;
তখন আকাশে বুক উপচে ওঠা মেঘ
তখন মেয়েটি ঘোমটা খুলে-ছিঁড়ে আঙুলে জড়ায়
একটি বেশ্যার মতো টুকরো বিবাগী ফুলের মালা।
তিনি হাসছিলেন, একা যতোটা গম্ভীর মুখে হাসি রাখা যায়
তারপর অরণ্যের উজ্জ্বল গোধূলি
বাদামী চামড়ার মতো ঠোঁটে স্বচ্ছ—শাদা আর কালো
রং-বর্ণ তুলে নেয় মেঘের—ন'মাস পরে একদিন বমি
মেয়ে যন্ত্র পাকস্থলী টেনে রাখেন ভিতরে, জলে
গুঁড়ি মেয়ে ব'সা অন্য আদিবাসী , তিনি কার পিতা ?
তাঁর রক্তে ভেজা হাত, শ্রাম্যমাণ খামের ভিতরে
পায় জলছবি—রাংতার কিছুটা নিচে গাঢ় ফর্সা মুখ
মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা. পাহাড় ইত্যাদি।

রঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

## এই বেশ এই ভালো

আমাদের পাখিগুলি মনোহর, পাখিগুলি দেখে
ঘন্টি বাজিয়ে যায় পুলিশের হাত, ক্রমশই
বিকল খাঁচায় ফেরে, 'কাঁটালতা কার নাম ?
এই নামে র'য়ে গ্যাছে বহু ঘরবাড়ী'—পাখিগুলি খোঁজে,
দালানকোঠায় শুধু বেড়াজাল, মনোরম পাখনা ও কিংবা রং
আদেশবলত কেন প্রচুর আসবেনা, আমাদের কথা চাউনিতে
কোমলভঙ্গি নেই। চোখ থেকে চোখে হাতড়ে খুঁজবো কাকে
পাখিগুলি ছাড়া আর কেউ জানে না বোধহয়, আমাদের হাত
পুলিশের মতো নয়, পয়সা দিলেও কিছুতেই বাজাতে চায় না
ঘন্টিগুলি, অথচ নির্বিকার বেজে যাচ্ছে ঠিক
ঘন্টার মতোন শব্দে পুলিশের হাতের মাস্তুলি ; আমাদের
এই ভালো এই বেশ, পাংশু শরীর থেকে নির্জলা জ্যোৎস্না শরিয়ে
নীলাকাশ দেখা, পাখিও থাকবে হাতে মনোহর, আসবে না
ব্যোমযানে চেপে কোনো শব, চুপচাপ বুঝে গেছি
ভ্রমণ বলতে বোঝা হাওয়া বদলানো, আকাশের নীচে কিছু স্বার্থ নিয়ে
পরার্থপর থাকা, অথবা নীরব।

## মীনা ভৌমিক

### বন্ধু

বিষাদ হ'তে বেরিয়ে আসে মন,
খুঁজে বেড়ায় আত্মার সংলগ্ন যে জন।
হৃদয় ভরে যায় পিপাসার বারিপাতে
মন সেথা হ'তে ফিরে যখন।
ক্লান্ত আমি হারিয়ে যাই সুধা পেয়ে
সে আত্মারে কাছে টানি একাত্ম বোধে।
অন্তরে ছোঁয়া পাই হিমের শিশির
মিশে যাই আত্মার সাথে গোপনে নিবিড়।
তুমি সবস্তে কাছে টান
আত্মার নিবোস তা-ও জান।
বিষাদ মুছে যায় পরশে তোমার
আত্মার বন্ধু, তুমি আমার।

## বাউল চৌধুরী

### সার্কাস

খেলা দেখায় বীর পালোয়ান
ধার করা জন্তু কামান
আহা আহা তারিফ তারি
দেখনেওয়ালে সারি সারি
পশ্চিমে বয় হিমেল হাওয়া
সাবাশ সাবাশ ইয়া ইয়া

ধুবড়ে কামান পড়ল ঘাড়ে টুন
ঠেঙ চিমাও চুঙ্।

স্বপন চক্রবর্তী

## চলে যাচ্ছি চলে যাচ্ছি

চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি বলে বন্ধ করে রাখিনি জানলার শার্সি
নীলামে বিক্রয় করিনি প্রিয় মেহগনি আসবাব, পুরানো
কাগজ কেনার গরীব বেনিয়াকেও
স্বহস্তে তুলে'ত দিইনি রক্তে মজ্জায় মিশে থাকা অন্ধ
বর্ণ পরিচয়
দু'হাতে ভেঙে চুরে ফেলিনি'ত প্রথম আখর লেখার শ্লেট
বল, শিশুর সরল নষ্টামি কি আমাতেও শোভা পায় ?

চলে যাচ্ছি, তবু ভাখো ঘরদোর করে রেখেছি পরিষ্কার
পাটভাঙা চাদরে আবৃত করেছি শয্যার সামগ্রী
স্নান ঘরে রেখে এসেছি আমার প্রিয় টয়লেট
জীবনানন্দের ছবির নীচে জেলে রেখে এসেছি কস্তুরী ধূপ
যেন বন্ধুরা কেউ এসে গেলে ভাববে
আমি বেড়াতে গিয়েছি কিছুক্ষণ।

চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি কেননা মধ্যাহ্নে সান্ধ্য সঙ্গীত
বড় ভুল করেও আসেনা
তাছাড়া আশ্বিনের দোরগোড়ায় বিসর্জনের বাজনা যদি বেজে ওঠে
আমি যদি তখন আঁকড়ে না রাখতে পারি সালংকার প্রতিমা
আমার লজ্জা হয়, বড় লজ্জা হয়।

কানাই ঘোষ

## ভালবাসা তোমাকে নিয়ে

এবার চিনেছি আমি তোমাকে রক্মিনী।
মনোধৃতা বিলাসিনী,
ভালবাসা। বড় ভয় দেখিয়েছে। আমার এ মন
নির্বোধ শিশুর মত দুহাত, ছড়িয়ে
উড়ন্ত সে ফড়িংটা ধরবো বলে ছুটেছি যখন
সে কেবলি পালিয়েছে আমাকে এড়িয়ে।
কী লজ্জা,—আলোর সকাল করতালি দিয়ে বলে গেছে
ছুয়ো, ছুয়ো'। সারাদিন সেই স্বর কেবলি ঘুরেছে
স্মৃতির গোপন ঘরে। সারাদিন ঘুনপোকা
কুরে কুরে খেয়েছে মনকে। কে যেন তর্জ্জনী তোলে
সমানে ক্ষেপায়। বোকা—বোকা—বোকা।
শব্দটা সাপের মত অহর্নিশি দোলে।
ভালবাসা। ভালবাসা।
বিষাক্ত ছোবল নিয়ে। বিলাসিনী। সর্ব্বনাশা।

অনুপকুমার আচার্য

## একদিন ছিলো

একদিন ছিলো—
বৃষ্টিধোয়া সকালের সৃষ্টির মৌল নীলাকাশ
শস্তের আশ্লেষে দুপুর আর ঘুঘুর বাতাস
সচ্ছল সন্ধ্যায় স্থিরচিত্র নক্ষত্রের জল।

কে জানে—
বিশ্বস্ত আকাশে এখন কী বিপন্ন আলো।
বন্যার পরে বাড়ী ফেরা? কিসের আশায়?
নতুন পলিতে কেউ বুনে গেছে বিষাক্ত অর্কিড।
কালবৈশাখী—নিজেই ক্লান্ত বড়ো, দীনদশা তার
কি দেবে নতুন করে গভীর আশ্বাস!
আতপ্ত বাতাসে, তবু হায়, অদূরের কেরীঘাট
বয়ে আনে সেই এক সুদূরের ঘ্রাণ।
অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জও আর কোন সান্ত্বনা নয়।
সবুজ আড্ডার বনবীথি মুখর প্রহর
কে দেখবে এসো আজ
মৌন হয়ে গেছে।

উজ্জ্বল সিংহ

## আমারও ক্লান্তি আসে

[ মৈত্রেয়ী গুহ'র প্রতি ]

আমার ক্লান্তি আসে গোধূলির একান্ত শিয়রে
শ্রমজীবি মানুষের হাতে যেরকম প্রবঞ্চক নারী
মৃদু পরশনে রেখে আসে বৈকালিক ঘাম
কালভার্টে করুণ ছাই জমে জমে অস্থায়ী পাহাড়।
কখনো ডায়াল টোনে ঘুমায় নৈঃশব্দ সাধ
তোমার কোনের কাছে লাল ফুলদানি ঘুমায় বধির
পুরীর সমুদ্র থেকে সৌন্দর্য চেতনা অই বসে থাকে হিম
আমারও ক্লান্তি আসে ঘুম পায় সম্মোহনে একটানা রিং।
তুমি অই ধূসর নয়নে রাখো মেধা
একাগ্রতা রেখে আসো গোপন শাওয়ারে
ধূম্রবর্ণ আলোর বাল্‌বে মলিন দেওয়ালে
আমার ক্লান্তি আসে অসময়ে গোধূলির কালে।

শ্যামলকান্তি দাশ

## একাকী সুন্দর

আনকো পাখিটি এসে খেয়ে যায় ও কার চঞ্চলতা
মর্ম, মেঘ, বনরাজি, ঝটিকা, পাথর ?
এখন কোথায় থাকে ভাঙা-ভাঙচা জীবনের ধুয়াতুয়া
লোভ, লিপ্সা, জ্বালাবোধ, সীমাবদ্ধ ঘর !

সিঁড়িটির এক কোণে ধারালো খড়্গের মতো
পড়ে থাকে মৌন, গেঁতো, সরু জল
যেন তার ঘুমে, স্বপ্নে, সুষমায় বেজে ওঠে গান
ভূতের দেশের অগ্নি ঘাই মারে ঐ গাঢ় শূন্যতায়
জলটির জটা থেকে, খচিত পঙ্কজ থেকে
একাকী সুন্দর নামে পারে পারে, নামে তার দিব্য অভিমান।

## সুশীল বসু

# দলে ভারী

ঐ একটাই ধারণা
আমায় জোর দিচ্ছে মদত দিচ্ছে
আমরা দলে ভারী।

মুখ শুকনো গাল ভাঙা চোখ বসা
ছেঁড়া পাৎলুন ফাটা জুতো তালি কোর্তা
কিন্তু তবু একটাই সান্ত্বনা দলে ভারী।

না চেয়ার না খেতাব-টেতাব না কেউ-কেটা না কিছু
তবু রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে যেই ডুব দিলুম
যেই চারদিকে চোখ ফেরাই
আমার মতন ফতুরদের সংখ্যাই বেশী তুলনায় অনেক বেশী
এবং সেই কথাটাই মগজে ঘুর্ ঘুর্ দলে ভারী।

মুষ্টিমেয়দের মতন আমাদের মুর্গীর ঠ্যাং চিবুতে হয় না
না পোলাউ পায়েস
আমাদের বরাদ্দ আধপেটা আধখানা রুটি ফুমড়োর ঘ্যাঁট
এবং ভাঙা থালা এবং হাজার ফ্যাকড়া।

তবু বাচ্চাটাকেও শেখাই, ভয় কি, বাবামণি, আমরাই দলে ভারী।
রাস্তায় আমাদের উথাল-পাতাল সমুদ্দুর
গড়ের মাঠে দেখ, আমাদের দুর্ভেদ্য দেয়াল মৃত্যু থম্‌কে থাকে
আর চিৎকারের চোটে ঠুন্‌কো ওই আকাশটায় ফাট ধরে

ছেঁড়া কোর্তা ফাটা জুতো বসা চোখ খোচা দাড়ি, এবং আধপেটা,—
তবু একটাই মোক্ষম জোর
অনেক অনেক অনেক অনেক বেশী
দলে ভারী!

## পূর্ণেন্দু পত্রী
## পাখি বলে যায়

ওপারে আমার ভিটি পড়ে আছে, এপারে জল।
অনর্গল
পাতা ঝরে পড়ে। বৃদ্ধ বটের দীর্ঘশ্বাস
মেটে আকাশ
কালো ঝাবা নাড়ে, যেন গোগ্রাসে গিলবে সব,
অর্বাচীন
পাখি বলে যায়, আজ দুর্যোগ ক্ষমতাসীন

ওপারে আমার ভিটি পড়ে আছে, এপারে চর।
ধূলিকাতর
পথের দুধারে দুঃখিত বন, ঝাপসা চোখ।
ভীষণ শোক
যে-ভাবে কাঁদায়, সেই ভাবে নামে নির্বিকার
মেঘলা দিন।
পাখি বলে যায়, আজ দুর্যোগ ক্ষমতাসীন।

ওপারে আমার ভিটি পড়ে আছে, এপারে ঘাট
খোলা কপাট
ঘরে ডেকে আনে সেই হাওয়া যার হৃদয় নেই।
চারিদিকেই
মনে হয় যেন মরণাপন্ন কারো অসুখ
চেতনাহীন।
পাখি বলে যায়, আজ দুর্যোগ ক্ষমতাসীন।

## রক্তেশ্বর হাজরা

## আমার বিদেশে

ভেঙেছে তোমার বাড়ি আমার বিদেশে
তার ভগ্ন অবশেষ দেখে
উড়ে যায় রোদ
সে রোদে হলুদ হয় পাতা
এবং আমার পরবাস
খেজুর গাছের নিচে শুয়ে থাকে পরিশ্রান্ত উট।
উটের দেহের গন্ধে বেড়ে ওঠে সুখী নির্জনতা
অথচ তা দেখে ফেলে হাওয়া—
হাওয়া তৎক্ষণাৎ গিয়ে দস্যু সর্দারের ছদ্মবেশে
তছ্‌নছ্‌ করে দেয় নিঃস্ব মহিমা—

তখন থাকে না আর তোমার প্রান্তরে দীর্ঘ ধু-ধু
ভেঙে পড়ে বাড়ি
তার ধুলোবালি মেখে উঠে আসে রোদ
এবং এখানে
বিকেলে বানিয়ে দেয় গেরুয়া রঙের কমণ্ডলু—

কবিতা সিংহ

# তুমি ও আমি

তোমার ভিতর থেকে কেটে পড়ছে
বিদ্বেষ
আমার অন্তর থেকে ঝরে পড়ছে প্রণাম
তোমার ভিতর থেকে ঘুরে উঠছে ক্রোধ
আমার ভিতরে দেখো ক্রমাগত শুধু উঠছে নাম
এ ভাবেই জপ উঠে এ ভাবেই সরে যায় কাম।
তুমি সারাদিনমান অশ্বের উপরে
খর রোদে
আমি সারারাত্রি ধরে জেগে আছে ব্যথা
মর্মরোধে
তোমার ভিতর থেকে ফুটে উঠছে শ্রমতিক্ত ঘাম
আমার ভিতরে দেখো ক্রমাগত উঠে আসছে নাম
এ ভাবে কাম যাবে, ফিরে আসবে প্রাণের আরাম

সাধনা মুখোপাধ্যায়

## সুখ

সুখের সংজ্ঞা নিয়ে কূটতর্ক
সুখ কারো কাছে
একটি সোনালী আভা
ঝুলে আছে গাছে
সোনার খাটেতে পা
রূপার খাটেতে পা
দাস দাসী ত্রস্ত ত্রস্তা
চোখের পলক পড়ে না
ছুটে আসে আজ্ঞাবহ
দেরী হয় পাছে

আমার সুখের সংজ্ঞা ভিন্নতর
সারাদিন
কর্মের ধারায় আছে
সুসজ্জিত ধরেধর
নেই অবসর
মাথার ভিতরে এক গুঞ্জিত ভ্রমর
গুণ গুণ বুনে চলে গান
কর্মের পীড়নে হবে
দুই হাত জরোজর
তারি মধ্যে অন্তঃসলিলা এক তীব্র নদী
কবিতায় কবিতায় যেন বহমান

শান্ত রায়

## বৃষ্টি, তুমি

বৃষ্টি, তুমি কাছে এসো, এইখানে, আমি আজ কোথাও যাবো না
উদার জানালা থেকে দেখতে চাই মনোরম দুষ্টুমী তোমার
তুমি মানে ফুল-ছুটি, আধো-ভিজে বাড়ি ফিরে মায়ের বকুনি, মাথা মোছা.
অবেলায় ছায়া-ছায়া অন্ধকার
মাস্টারমশাই যেন না আসেন সন্ধ্যেবেলা—এরকম নিরীহ কামনা
তুমি মানে ব্যাঙ-ডাকা, ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ, রিম্‌ঝিম্‌-রিম্‌ঝিম্‌
কারো মুখ মনে প'ড়ে যাওয়া···সদ্য চোখ-মেলা ভালোবাসা···
এসব একদিন ছিলো, ইদানীং কেন আসো হঠাৎ-হঠাৎ ?
কোনো-কোনোদিন
আজেবাজে পথে আমি ভিজে জাব হয়ে যাই, লরীর চাকার কাদা
শয়বরে ছেট্‌কায়
তোমার দুরন্তপনা শেষ হ'লে ট্রামে-বাসে ভিড়···।
আমার বিরক্তি পেয়ে তুমি অভিমানিনী হয়েছো ?

আজ, বৃষ্টি, তুমি এসো, জানালায় স্থির
প্রতীক্ষায় আমি ওইতো নরম ঘনকালো ছায়া পড়েছে পুকুরে
উদ্‌গ্রীব-সবুজ রঙ গাছে-গাছে, ফলে ও পাতায়
রিম্‌ঝিম্‌-রিম্‌ঝিম্‌ শব্দে ছুটে এসো, ভালোবাসাবাসি
হোক ; আজ আমি ফিরে যাবো সেই দূরের বয়সে।

## গোবিন্দ ভট্টাচার্য

### শোনো

ফাঁদ পেতে বসে আছি
গৃহীর ছলনা আর বশীকরণের বীজে।
শ্যামশস্প বনরাজি
আরণ্যক হিংস্রতায় উদ্বেলিত
অন্তর্গত কথাগুলি
তুলো দিয়ে মুড়ে রাখা অন্তরঙ্গ চিত্রপট
মধ্য আষাঢ়ের দাম্ভিক গর্জনে মুছে যায়।
হে সমূহ-নিঃসঙ্গতা : প্রাকার বেষ্টিত মনোরথ
হে লালিত প্রায়োন্মাদ প্রগল্‌ভতা
এখন শিকল ছিঁড়ে কোন্‌ শূন্যতায়।
শোনো, এই পরিখায় অসংবদ্ধ এপারে ওপারে
ফাঁস ছুঁড়ে কোনো বন্যপ্রাণী ধরা পড়বে না
চিন্তার বিরুদ্ধে;স্রোতে-যতো গান উৎসারিত
একদিন তারা শোকগাথা হয়ে যাবে।
অবতংসী সুপ্রাজ্ঞ প্রেমিক, শোনো
অঙ্গ যতো নিরপেক্ষ
স্রোতস্বিনী আনন্দে বিষাদে
পরাভূত বশীকরণের বীজে
কোনো বনস্পতি মাথা তুলবে না।

## পিনাকীরঞ্জন গুহ
# কবিতায় নারী

তুমি ঠিক প্রাত্যহিকে প'ড়ে আছ নারী !
পরিচ্ছদ—রত্ন—প্রসাধনে—
বনের পুরাতন দানের মতন ;
স্বধর্ম—নিষ্ঠায়,
বিপরীত-আনুগত্যে,
বিবিধ বিধানে।

এই সব নিয়মিত অনুষঙ্গে
অভিষিক্ত রয়ে গেছ আজও।
সময়ের প্রতিবিম্ব তোমাতে পড়ে না ;
তুমি কিন্তু সুচিত্রিত আলেখ্যের মতো
আমাকেই দেখাও দর্পণ।

ঘন পারদের গুণে জুড়ে আছে
অবিকল আমারই নমুনা।
নড়ে-চড়ে টের পাই—
তুমি অধিশ্বরী !
আর আমি,
বেমালুম বনেছি ভিখারী !

সমরেন্দ্র ঘোষাল

## একটি নদী : একটি বৃক্ষ : একটি জীবন

একটাই নদী
তবু কখনো কখনো তাকে দেখে মনে হয়
দুটি মুখে দুটি দিকে সে বয়ে চলেছে।
একমুখে সে আকাশকে আসছি বলে
অন্যমুখে এক সাগরের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে।

একটাই বৃক্ষ
তবু কখনো কখনো তাকে দেখে মনে হয়
মূল থেকে পাতায়, ফুল থেকে ফলে
তার বৃক্ষের সংসারে
সে নিজেকে অনেক করেছে।

একটাই জীবন
তবু অন্য জীবনের ফাঁদে ধরা পড়ে
বহু জীবনের স্বাদ পেতে
নিজেকে অনেক-করে
আবার কখন সে একা হয়ে একাই চলে যায়।

রঞ্জিত সিংহ

## নগর কীর্তন

প্রায় রাত্রে শুনি
কে যেন চিৎকার করে কাউকে ডাকছে।
রাস্তা জুড়ে ছোটাছুটি, কথাবার্তা,
কথা কাটাকাটি,
রক্তগঙ্গা উপক্রম।
তারপরই হাকুমঘাকুম রসগল্পো, ভেজা ভেজা গলা।
যা ভেবেছি তাই :
সেই ছুঁচলো শেয়ালমুখো মানুষটা—
ছাঁচিপান মুখে লুঙ্গি পরে পেশেন্স খেলেন,
পরের পুকুরে বড়শি ফেলেন,
—এতরাত্রে ডাগরডোগোর রুইকাতলা তোলার তাল।

রাত্রি এক অতীন্দ্রিয় আলোয়ান।
গায়ে জড়ালে চোখের ওপর ফুরুৎ।
কে যে তখন ছেলের বাপ আর কে বাপের ছেলে—
কেউ কাউকেই দেখতে পায় না।
রসে পাক খাচ্ছে পানতোয়া, রস টানছে পানকৌড়ি,
গা গরম হচ্ছে ভারী উনুনের তাপে—
এইসব রঙচঙের সোয়ামিপনা।

কিন্তু হুশ করে রাত্রি কর্পা :
'কে বাবা গৃহস্থ, সন্ধিক্ষণে রসাভাসে বাতিটা জ্বালালে!'

কল্লোল বিশ্বাস

## সমুদ্র-সঙ্গিনী

থেকে থেকে বর্ষা আসে আকাশের ছাদ থেকে নেমে
উচ্ছল উত্তাল হয় আন্দামান সাগরের ঢেউ।
খেয়ালী জলের খেলা জাহাজের চারিদিক ঘিরে,.
গাছঘেরা ছোটদ্বীপ উল্লাসের পেলো আস্বাদ।

সমুদ্র যদিও মত্ত, শান্ত মনে বসেছিলে তুমি
হয়তো বা অস্থিরতা আসে নাই শান্তির হৃদয়ে
উত্তর দ্বীপের দেশ পার হয়ে স্থির হোল জল
তোমার মনের যাদু শান্তি দিল সমুদ্রের মনে।

বিকেলের বিষন্নতা মেঘ ছায়া কিছু কিছু ঢেউ
রূপায়িত হোল এক শব্দহীন ভাষাময় রাতে।
আকাশের বহু নীচে কোকাদ্বীপ আলোঘর ছেড়ে
জল রাত্রি অন্ধকার পার হতে জাহাজ চলেছে।
রূপসী বন্দর : আলো : সাজঘর : অভিনয় : রূপবতী নারী
সম্মোহন, বিহ্বলতা, অনুচ্চার ভাষা ছিল রূপালী আঁধারে।
সে রাতের স্থিরচিত্তে তুমি দীপ্তিময়ী, দিলে কত আলোড়ন।
সমুদ্রে তোমার মনে সেই রাত্রি সেই আলো স্থির হয়ে আছে।
বেগুনী, গেরুয়া লাল, ফিকে নীল, গাঢ় নীল
আরো রঙে নেমে আসে উষা,
আকাশের অঙ্গনেতে অপার্থিব এই ছবি
সমুদ্র সম্মানে।
নীচের গভীর স্থির কালোজলে অনন্তের ভাষা
আমার তোমার সব মানুষের মুক্ত মন রঙের বাহারে,
কালোরাত্রি আলোরূপা, চঞ্চলতা উন্মাদনা গান,
উত্তাল সমুদ্র, উষা, আকাশের রঙতরা পট,
তুমি এই সব। তুমি স্থিরমনা সব অস্থিরতা নিয়ে,
বহুকালে বহুদেশে দেখেছি তোমার আমি অপলক চোখে

ক্ষণী বন্ধু

নজরুল

ভাবুন সেদিন
জীবন্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে যদি কোনদিন
হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে বোবা মুখে চেয়ে চেয়ে দেখে
ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে থাকে পঙ্গু হয়ে পিস্ট হতে থাকে
তবে লাভ।
সে হিসাব বুঝি না বুঝি না
আলো আর আগুনের নিদারুণ অপচয় বিনা
বিধাতার পরাজয় বিনা
হিসাব খুঁজি না।
তার চেয়ে এই ভালো থাক
অন্তত ঘুমাক।
অগ্নিবাণী স্তব্ধ তার আর যদি না হয় সবাক
দুঃসাহসী কাণ্ডারীর দুঃসময়ে হুঁশীয়ার ডাক
চির উন্নতশিরে বিদ্রোহীর হাঁক
যদি রুদ্ধ হয়ে থাকে—থাক
এতদিন জেগে থেকে
স্পষ্ট চোখে অবরুদ্ধ বুকে
অন্তিম ঘুমের সুখে
ঘুমাক—ঘুমাক
অন্তত ঘুমাক।

কমলা সরকার

## শালবনে শালবনে—হেমন্ত সকালে

কোন কথা নয়, শুধু চোখে চোখে চেয়ে
মনে হয় চেনা চেনা।
মুখহীন ছায়া এক সারা মুখে মাখানো—
শালবন, শালবন—শুধু শালবন—
অবশিষ্ট দৃষ্টিতে আমার।
কি তোমার দুঃখ বলো? নাকি ছায়া ছায়া সুখ,
শিশির সিক্ত এই হেমন্ত সকালে—
যতবার ফিরে চাই—উদাস বাউল
চুপিচুপি অনুভবে—মুগ্ধ আড়চোখে।
কিসে মুগ্ধ তুমি? শালবন নাকি এই মায়াময় মুখ?
হিমেল হাওয়ার এই হেমন্ত সকালে—
মসৃণ নির্জন পথে শালবনে শালবনে
একই গন্তব্যে যাত্রী—অজানা স্বজন॥

## বরেন রায়

## একদিন ভোরে

সূর্য ওঠেনি তখনো—
পিচ্ছিল ঘৃণা ঠোঁটে চেপে, দময়ন্তীকে দু'হাতে খুঁজি
কিন্তু অবশ শৈথিল্য মৃত্যুর মতো ভাস্কর ঠেকে
সে সময়।
কণিমনসার কাঁটা সেই অবসরে, মনের
সবুজ মাঠে অজস্র বিছন্ বুনে যায়। তীব্র গ্লানি বয়ে,
হিম ধমনী—উত্থান পতন ঘটে ইতিহাসের বাদশার
মতো ঘন ঘন।
স্বপ্ন নিরুদ্দেশ, উৎস মুখে সিন্ধু উথলে ওঠে,
প্রতিহিংসা পন্থা হয়ে যায়। সূর্যোদয়ের দেশ
উঁকি দিল যে সময়, ভাবনার জানালা দিয়ে,
বিভ্রম চৈতন্যে তখন—
ছলনার ভীড় খোকা খোকা ছায়া
হয়ে গেছে। একদিন ভোরে সত্যি আমার শিরা
উপশিরায় অবশান্ত ফাঁকা ময়দান এসে শুধু চমকায়।
আমি চোখ মন ভরে, উপলব্ধিতে স্নান সেরে হঠাৎ
একদম, কের নতুন মানুষ হয়ে যাই।

## রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়

## দৃষ্টি

কি ভাবে দৃষ্টি কাড়ো ? এই ভাবে দৃষ্টি কেড়ে নাও ?
প্রসাধন গন্ধ ছুঁড়ে মারে
পা দু'টো জড়িয়ে ধরে ম্যাক্সির পত্ পত্ করুণ মিনতি, রাস্তার অন্ধ ভিখিরি
কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে আনমনে বিড়বিড় আওড়ে নেয়,
পাশ দিয়ে চলে যায় রূপসী যুবতী।

দৃষ্টিপাত মাঝামাঝি কালাকালা চিরে দিয়ে
এপার থেকে ওপার—রাস্তা পারাপার করে একজন মানুষ সন্ন্যাসী।
কিছুক্ষণ আড়লে হলো কালোজামা,
গোলাপী ফিতে, পারফিউম্ নিটোল শরীর।

সন্দীপ দে

## পরাণ চলো ঘুরে আসি

পরাণ যাবে নাকি খেয়াঘাটে
শিমুলতলায়
যাবে নাকি বাঁশবাগানের হলুদবনে
হলুদবনে পরাণ তুমি যাবে নাকি
পলাশ ডাঙায় মৌরীঘাটায়
যাবে নাকি সমুদ্দুরে

পরাণ যাবে নাকি সমুদ্দুরে
পিপুলতলী
যাবে নাকি পিপুলতলী হলুদবনে মৌরীঘাটায়

পরাণ জানি কোথাও যাওয়া নিষেধ তোমার
তোমার কেবল যাওয়া আসা
বিন্দু ধরে বিন্দু ধরে বিন্দু ধরে।

সুখরঞ্জন রায়

## কলম আমার

কলম আমার তুমি প্রণয়ের দূত
গহন মনের গভীর প্রেমকে কর আলোকিত—
পৌঁছে দাও প্রেমিকার কাছে
যে এখনো দেখেনি চান্দুষ আমারে
তোমার ছোঁয়ায়—প্রেমিকা মোর সাধনার ধন
যুগ যুগ ধরে তাকে চাই—তাকে পাই
আমার প্রিয়ার পাশে তুমিও আপন
তুজনায় করেছ একাত্ম
তোমার এখনো কিছু আছে করণীয়
থাকে যদি শাশ্বত শুভ-বোধ আমার অন্তরে
আমায় তুমি করো হে অমর—শক্তিমান তুমি মসী
অসির অধিক।

অরণি বসু

## বিস্মরণ

কে যেন আমায় বলেছিলো ডেকে
চৈত্র মেলায় দেখা হবে ফের
সেই থেকে আসি ঘুরছি মেলায়
ভিনদেশী লোক, বিচিত্র বেশ
তার-ই মুখ শুধু মনেতে পড়ে না
খালি ভয় হয়, দেখা যদি হয়
তাকে আমি ঠিক চিনতে পারবো ?

ইন্দ্রনীল মিত্র

## সে

তুমি, আমি—আর 'সে' !
কিছুটা নাটক বা কিছুটা প্রহসন।
অনাবিল আনন্দে, ফাল্গুন হাওয়ায়, সবুজ ঘুঘুর বনে
বা কোন নয় পৃথিবীর হাতছানিতে
নাম না জানা তারার মত হারিয়ে থাকা।
পুরোনো ভালবাসায় ঘুরবীন ঝাপসা হয়ে যায়
অথচ মনের প্রজাপতি সোনার রোদে
ডানা মেলছে
রিম্‌ঝিম্‌ বৃষ্টির শব্দে
চার দেয়ালের নায়িকার স্বীকারোক্তি
সব মিলিয়ে অতীত নিস্তব্ধতা,
তুমি, আমি—আর 'সে' !

# চোর

**অজিত হাজরা**

গলায় ফাঁস টানছে নিশীথ চোখ বুঁজে। টাইয়ের ডবলনটের ওপর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর অনামিকা, ডান হাত ট্রাউজার্সের পকেটের ভেতর। টান টান, শরীর মুখ চক চক করে! ও ছোট একটু হাসল। ভাগ্যিস্ কেউ কারও মনের কথা টের পায় না। তারপর ঘুরে দাঁড়ায়। সাবলীল।

খাবার টেবিলে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সকলে—ওর স্ত্রী, ওর ছেলে ওর মেয়ে। আর টেবিলে প্রাতরাশের যাবতীয় আয়োজন। রুটি, মাখন, ডিম। টিপট মিল্কপট, সুগারবোল। সবই সাজানো। নিশীথ আর দেরী করে না। এগিয়ে আসে লঘু পায়ে টেবিলের দিকে।

এক পাশে দলবদ্ধ চন্দ্রা, চুয়া ও চন্দন। আর এক পাশে নিশীথ। একা। ও টোস্ট কামড়ায় আর ভাবে চন্দ্রা কেমন বাচ্চাদের নিয়ে ব্যস্ত। চুয়া কেন দুধ খাবে না, চন্দন রুটিতে একটু মাখন লাগাবে। নিশীথ যেন বাইরের লোক। চন্দন মা-র কথা না শুনলে বলছে না—কী হচ্ছে চন্দন! কোন কর্তৃত্ব নেই। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, চন্দ্রা আটপৌরে গলায় বলল—বাবাকে আজ দেখতে যেও। আড় চোখে নিশীথ মুখ ভাখে চন্দ্রার, নজর সিঁথির ওপর। কেন যে এত সিঁদুর মাখে! একেবারে খুনখারাবি ব্যাপার, যেন কেউ ডাওা মেরে মাথা কাটিয়ে দিয়েছে। নিশীথ কী রকম স্থানু হয়ে যায়, হাতের কাপ হাতে, চোখে পলক পড়ে না। আর চোখের সামনে ভাসছে একটা মুখ। পরস্ত্রীর। নিশীথের বার বার মনে হয় জোনাকি অনেক বেশী ছিমছাম, অনেক বেশী সুন্দর। ইচ্ছে করলে নিশীথ অনায়াসেই বলতে পারে—চন্দ্রা তুমি এত সিঁদুর দিও না। কিন্তু উৎসাহ পায় না, নিস্তব্ধ থাকে।

চন্দ্রার ছেলেমেয়ের ওপর কর্তৃত্ব অব্যাহত। চন্দনের রুটিতে মোটা করে মাখন লাগিয়ে দিচ্ছে। যে হাতে এগ-কাপ সে হাতে দশ গাছা চুড়ি আর একটা মকরমুখো নোয়া। নিশীথের গা ঘিন ঘিন করে। হাতে নোয়া, সিঁথির সিঁদুর, পায়ে আলতা। এত সতীপনা দেখানো কেন? উত্তর খুঁজে পায় না, অবসন্ন

বোধ করে ক্যাডাংবারাস। আসলে নিশীথ চন্দ্রাবতীকে ওর সীনিয়র শেখরের সঙ্গে জড়াতে পারে নি, তাই রাগ।

চুয়া চন্দন এবার স্কুল যাবে। চন্দ্রা চুয়ার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আবার বলল—অফিস ফেরত বাবাকে দেখে এস।—আচ্ছা, বলে নিশীথ উঠে দাঁড়ায়। আরও কিছু বলার ইচ্ছে কিন্তু জিভটা যেন খাপে জোড়া, নাড়লেও কথা বেরবে না।

ব্রেকফাস্টের পর নিশীথ সিগারেট ধরাচ্ছে। রোজই খায় আর ব্যাগে চন্দ্রা কেমন এই সংসারের মালিক। আলমারি খুলে টাকা বের করে, ঝি চাকরকে কাজ দেয়, ছেলে মেয়ে সামলায়। চন্দ্রা চুয়া চন্দনের বইখাতা, অ্যাটাচি, জলের ফ্লাস্ক, পেনপেন্সিল গোছগাছ করে, আর নিশীথ চুপচাপ ভাবছে অফিস আওয়ার্সের পর যা যা কাজ। ভুরু কোঁচকায়। আজ আবার দেখতে যেতে হবে শ্বশুর মশায়কে।

লেখাপড়া করার পর নিশীথের কাজ ছিল কলকাতায় যাওয়া। সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিত, সিলেকসন বোর্ডের ইন্টারভ্যু দিত। আর নিষ্ফলচায় যা হয়। মেট্রোর সামনে দাঁড়িয়ে দেখত মেয়েদের যাওয়া আসা। একদিন চোর পুলিস খেলা দেখল। সত্যিকারের। ছোটাছুটি করেও পুলিস চোরটাকে ধরতে পারল না। এদিকে রিটায়ার্ড বাপের সংসার অচল। পরীক্ষা ইন্টারভ্যু দেওয়াই সার, কিছুতেই লাগে না। নিশীথের কাজের ধারা বদলে গেল। কলকাতা যায় না। সহরতলীতেই টুকটাক কাজ করে। কোন কারখানার পাঁচিলের ভেতর দিক থেকে পাঁচ ছজন কুলের মুখ বাইরে পড়ে, নিশীথ সরায়। সাইডিংএ ওয়াগন ভাঙলে দু এক পেটি টেবিল ফ্যান। কয়লা কাঠ ইত্যাদি কাঁচামালও পাওয়া যায়। পাড়ায় পাঁচ জন পাঁচ কথা বলে। নিশীথের মা-র বড় গলা। ঝগড়া বাধে। আর বাপ রাগে না ভয়ে কে জানে কাঁপতে কাঁপতে বলেন- অ্যান্টিসোস্যাল। নিশীথ দুঃখ পায়। শালা, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। মুখ গোঁজ করে ঘরে বসে থাকে। তখন বাপ ধরলেন স্টার অফ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ম্যানেজার মল্লিক সাহেবকে ছেলের চাকরীর জন্যে। যত দূর সম্পর্কই হোক আত্মীয় তো।

আশায় আশায় নিশীথ মল্লিকের বাংলোয় যায়। কারখানা পেরিয়ে। অবিরত বসে থাকে সাজানো ড্রইংরুমে, যেমন চুল কাটাবার জন্যে সেলুনে তেমনি। সময় আর কাটে না। একরাতে নিশীথের মন বুক-শেলফের দিকে। আনকোরা নতুন

কোম্পানী অ্যাক্ট থানা ব্যাপারের নীচে লুকিয়ে ফেললে কেমন হয়? অত বই কাকপক্ষীও জানতে পারবে না। ছেড়ে দিলে অন্ততঃ পাঁচ টাকা। চোখ চক-চক করে। কী যে যোগাযোগ তখনই মল্লিক কিয়লেন। তাঁর মনে হল ছেলেটা খুব স্মার্ট তো। আসলে কিন্তু নিশীথ ঘাবড়ে গেছে। তিনি বললেন—কী করছ? নিশীথ বলল—আমি তো বুকশেলকে হাত দি নি।

এরপর মল্লিক নিশীথের চাকরী করে দেন। নিশীথ মল্লিকের মেয়েকে বিয়ে করে। লেনদেনের ব্যাপার।

এক যুগ হয়ে গেলেও নিশীথের সবই মনে পড়ে। এখন অফিস বেয়ারার মুখে হাসছে। বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল, কোন আনাড়ীও এমন করে না।

গেট খুলে বেরিয়ে আসতেই বড় রাস্তা। এক দিকে অফিসারদের বাংলো। নিশীথেরটার কম্পাউণ্ডের এক কোনে পানবিড়ির দোকান। সেখানে সিগারেটও পাওয়া যায়। নিশীথ ওই দিকে হাঁটছে। ডান হাতটা মুখের ওপর। ইমপোর্টেড ব্লেড না হলে কী মসৃণ কামানো হয়? আয়নায় প্রতিফলিত হতে দাঁড়াল—কিষণ আমার ব্লেড? কিষণ কান এঁটো করে হাসল—পাওয়া যাচ্ছে না স্যার। নিশীথ নিজের মুখ দেখতে ব্যস্ত। বয়স বাড়ছে, রগে দু একটা পাকা চুল। আরও পাকবে। গভীর গলায় বলল - মেম সাহেবের বেলায় তো বেশ পাওয়া যায়।

সহরতলী এলাকা। খুব খোলা মেলা। হু হু বাতাস বয়, বাতাসে ক্ষুরের ধার। নিশীথের গা শিরশির করে। ডিসেম্বরের না সাঁইত্রিশ বছরের শীতে কে জানে। সাঁইত্রিশ এমন কিছু নয়, কিন্তু মনে করলে? নিশীথের মন কেমন কেমন করছে। শ্বশুর মশায়ের সাতান্ন বছরে স্ট্রোক হল। আর কুড়ি বছর, ওরও সাতান্ন হবে।

এমন হলে নিশীথের মনে হয়, সূর্যের আলো থাকতে থাকতে ফসল কেটে ঘরে তোল। যা পার কয়ে নাও। নিজেকে বঞ্চিত কোরো না। নিশীথ এই সকাল বেলায় জোনাকির চোখের স্নিগ্ধ আলো দেখার ব্যাকুলতা বোধ করে। এবং জোনাকির হৃদয়ের আবাসভূমি। সিগারেট কিনতে কিনতে নিশীথ চোখ কোঁচকায়। কিষণের নাকের নীচে গোঁফের রেখা থুতনিতে ছাগল দাড়ি, গালে দুচারটে ব্রণ। কিষণ গরম জলের কেটলিটা ঠিক করে বসিয়ে বলল—আজ থেকে চা শুরু করলাম, স্যার। নিশীথ ওর মুখে পুবের কোমলতা খুঁজে পায় না।

বুঝতে পারে কিষণ আর বাচ্চা নেই। হঠাৎই মনে হয়, ক'বছরে বেশ উন্নতি করেছে কিষণ। গুমটি বানিয়েছে, চট টাঙিয়ে বসে নেই। নিশীথের ভাবিত মুখ। নিশ্চয় কিষণ চুরি করে। কেন যে চন্দ্রার ওকে কম্পাউণ্ডের ভেতর বসতে দেওয়া। কঠিন গলায় বলল—খুব যে! বেশী চুরি করবি না, বুঝলি? কিষণ বোকার মত হাসে। সাহেবের কথায় রাগ করতে নেই, এটুকু বুদ্ধি খোপড়িতে আছে।

নিশীথ কবজির ঘড়ি দ্যাখে, লং শটে তাকায়। বড় দেরী করছে শেখরদা। কবে যে নিজের গাড়ী হবে! এই সাধ অনেক দিনের। জোনাকির সঙ্গে ভালবাসা হওয়া ইস্তক বেড়েছে। চন্দ্রাকে লুকিয়ে মাইনের টাকা জমায়। তিলে তিলে তিলোত্তমা অসম্ভব বুকে ভাব জমাল শেখরের সঙ্গে। নিজের চেষ্টায়। গরজেও। অফিসে সুযোগ পেলেই, শেখরদা। লাঞ্চ রিসেসেও সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, অফিস ছুটি হলেও শেখরদা। যে অন্তরঙ্গতা সুজিত অবণী এইসব কলিগদের সঙ্গে হয়নি, তা শেখরের সঙ্গে। নিশীথ মনের কথা বলল শেখরকে। না বললেও শেখর টের পেয়েছিল, বাঁ চোখ টিপল—মহাবিদ্যা শিখে নাও, সব হবে। সে তো যে কোন শিশুও জানে। নিশীথ নিবেদন করল—ব্যাকিং দাও।

ফিকায় দু পাত্র পেটে পড়ার পর শেখর বলল—পারচেজিং অফিসারের টাকার ভাবনা। টু পার্সেণ্ট দিয়ে আরম্ভ কর, পার্টি বুঝে বাড়াবে। পার্টি আমি ধরিয়ে দেব।

নিশীথের রোজগার বাড়ে, খরচও বাড়ে। বাড়বেই। ওপর নীচে দিতে থুতে অনেক বেরিয়ে যায়। কাজিন ব্রাদারের সংখ্যাও এক কুড়ি।

শেখরের প্রিমিয়ার পদ্মিনী দাঁড়াল ক্যাচ করে। নিশীথ ভাবছে, কবে যে এমনি একটা হবে, শেখর বলল—বিরসবদন কেন? বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া নাকি? —পাগল, বলে নিশীথ ক্লিষ্ট হাসল—আজ আবার শ্বশুর মশায়কে দেখতে যেতে হবে। আর ভাল্লাগে না। শেখর ইঞ্জিন বন্ধ করেনি, নিশীথ উঠে বসতে গীয়ারে ফেলল, বলল—দরজা ঠিক মত লাগেনি, টেনে বন্ধ করে দাও।

প্রিমিয়ার রিক্সা, গরুরগাড়ী, সাইকেল টপাটপ পার হয়ে যায়। সামনে একটা ট্রাক, কয়লা বোঝাই। সেটা কিছুতেই সরছে না, শেখর গালাগালি করে, নিশীথ বলল—ড্রাইভার কী তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে? শেখর হাসল—সেই জন্যেই তো মনের সুখে গাল দিচ্ছি। তুমি চীফকে দাও না? নিশীথ হাসে। সুযোগ বুঝে শেখর ট্রাকটা ওভারটেক করল। সাঁ করে। ভয় পেয়ে নিশীথ

বলল—কী যে করো। একদিন ঠিক অ্যাক্সিডেন্ট করবে। শেখর অ্যাক্সিলারেটরে আরও চাপ দেয়। ফাঁকা রাস্তা।

অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের গ্যারাজে গাড়ী পার্ক করতে নিশীথ নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল—সেল্‌সে গেলে কেমন হয়? শেখর ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল। দৃষ্টিতে চেতাবনী।

অফিসের করিডর দিয়ে হাঁটার সময় নিশীথ বা শেখর কোন দিকে তাকায় না। রোজই। মুখ গম্ভীর রাখে ব্রীফ কেস দোলায়। যা কিছু দেখার দেখছে তির্যক দৃষ্টিতে। কেউ উইশ করলে বলছে, মর্নিং। শেখরের কামরা আগে পড়ে, ও ঢুকে পড়ল সুইংডোর ঠেলে। নিশীথ একা। ওকে বেকায়দায় ফেললেন গিরীশবাবু, বাবার বন্ধু, রিটায়ার করবেন এবছর। গিরীশবাবু সাহায্য, টাকা ধার এসব কিছুই চাননি, সরল হেসে হাত ধরেছেন—কেমন আছ নিশীথ? ওর বড় অস্বস্তি হয়। ভাল মন্দ কিছুই বলতে পারেনা। আজকাল কেউ ভাল আছে নাকি? আর ভাল নেই বললে তো অনেক কিছু বলতে হয়। এই এক রকম, বলে নিশীথ গা ঢাকা দেওয়ার মত তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল নিজের কামরায়।

টেবিলে এক গ্লাস জল ঢাকা দেওয়া থাকে। নিয়মিত। এক চুমুক খেয়ে নিশীথ খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়। মাঝে মাঝে বেশ ইন্টারেস্টিং খবর বেরোয় কন্‌ফিডেন্স ট্রিকসের।

সুখোক্ত বাতাবরণ। রুম এয়ার কণ্ডিসনারের গুব গুব শব্দ। নিশীথের ইচ্ছে করে না ফাইলের ফিতে খুলতে। বিমোয়। সোজাসুজি চাকরী করা কত সহজ, এমন মনে হতে শরীরটা টানটান করে। ভাউচার সই করতে করতে কলম বন্ধ করল। কেদারমলের পেমেন্ট আটকানো দরকার। ভাবতে থাকে কী লিখবে—সাবস্ট্যান্ডার্ড, নট আকর্ডিং টু স্পেসিফিকেশন। টেবিল ডায়েরীতে চোখ পড়ল। উনিশে মেসিন টুলসের টেণ্ডার খোলার দিন। নিশীথ চমকে ওঠে। চীফের চাপরাশী। সে বলল—সাব সেলাম দিয়া।

যখন চীফের সামনে দাঁড়াল, নিশীথকে দেখে মনে হবে অত্যন্ত কাজের মানুষ, হাতের আস্তিন গোটানো। আর সুন্দর মুখে সৎভাবটা চমৎকার ফুটেছে। চীফ মাথা তুললেন—এই আইটেমগুলো চেক করে দাও। নিশীথ পাতা ওল্টায়, শেষ নেই। চীফ মাথা নামালেন—আজই চাই।

নিজের কামরায় ফিরে এসে নিশীথ যে ছু আঙুল দিয়ে টাইয়ের নট ঠিক করেছিল তাই দিয়ে রগ চেপে ধরেছে। কাকে দিয়ে করানো যায়? কলিংবেলের

বোতাম টিপতে থাকে, পিওন আসে না। ও বেরিয়ে এল সুইংডোর ঠেলে। কী যে হয়েছে সব। বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন – আমাকে তো বলে যায় নি. স্যার। নিশীথ বলল—ওলে সেনগুপ্তকে ডেকে দিতে বলবেন।

সেকশনের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় নিশীথ দেখল তিনজন সুন্দরী কিতে খুলে বসে আছে। তারপর শৌচাগারে যেতে অবাক। তার পিওন তরল সাবান ঢেলে রুমাল কাচছে ওয়াশ বেসিনে। সাহেবকে দেখে অক্ষয় মুচকি হাসল। নিশীথ পিছন ফিরে প্যান্টের বোতাম খুলতে থাকে, যেন অক্ষয়কে দেখতে পায় নি।

এরপর নিশীথ সেনগুপ্তকে চীফের দেওয়া কাজ বুঝিয়ে দেয়। উচিত ছিল চেক করা কিন্তু করে না। ও মনে করে, সেনগুপ্ত করলেই ওর করা। নিবিষ্ট মনে সেনগুপ্ত রেটকন্টাক্টের সঙ্গে দর মেলায়, অর্ডার বুক দেখে নাম্বার ও কোয়ানটিটি চেক করে, যোগ দেয়। পাশে একটা কাগজ, যা যা গরমিল লিখে রাখছে সেটায়। নিশীথ নিশ্চিন্ত হয়, কাগজ পত্তরে ঠিক আছে। মোলায়েম গলায় বলল - সেনগুপ্ত চা খাবে?

চীফকে কাগজপত্র ফিরে দিতে যাবার সময় নিশীথ বারবার একই কথা ভাবল। সুজিত শালা নিশ্চয় ওপর তলায় লাগালাগি করছে। আজই ওকে নিয়ে বসা যাবে ট্রিকার, শেখরদাও থাকবে। থমকে দাঁড়াল। চীফের দরজায় মাথায় লালবাতি চাপরাশি বলল—ঠহরিয়ে। নিশীথ পায়ে পায়ে চীফের প্রার্সোন্যাল সেক্রেটারীর কামরায় ঢুকল—কী ব্যাপার? সেক্রেটারী ঠোঁট ওল্টাল ঃ জানে না।

মিনিট দশেক পর নিশীথ চীফের ঘোড়ার-ক্ষুর টেবিলে কাগজ পত্র রেখে উটের মত মুখ তুলে বসে আছে, হয়ত ঝড়ের গন্ধ পায়। উসখুস করে। চীফ দু-একটি আইটেম আণ্ডার লাইন করলেন—কমাতে হবে। নিশীথ যথাসম্ভব চিন্তিতভাব মুখে ফুটিয়ে ডায়েরীতে নোট করে নিল। চীফ আর কিছু বললেন না।

ছাড়া পেয়ে নিশীথ বড় ক্লান্ত বোধ করে, গলাও শুকনো। কী করবে ভেবে পায় না। টেলিফোন করল জোনাকিকে। ডায়াল করে কান পেতে রেখেছে রিসিভারে, ঘুঘু ডেকে যায়। আর অনেক কথাই মনে পড়ে। মুখুজ্জেদের বাগানে আম চুরি করে খেয়েছে, ধরা পড়েনি। এম.কম. চুরি করে পাস করেছে ধরা পড়ে নি। ভবের কী আছে? জোনাকি বলল—হ্যালো। সুমধুর।

বিস্তর ধানাই পানাই করার পর নিশীথ জিজ্ঞেস করল—আসবে? জোনাকি বলল—আসব। নিশীথ রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাবে সন্দেহ হল কে যেন লাইনে রয়েছে। ও কিন্তু হ্যালো, কে, এসব বলল না। চুপ করে রইল আর স্পষ্ট শুনল পুরুষালি হাসি।

অফিস ছুটি হওয়ার পর নিশীথের মনে হয়েছিল, কেদারমলকে খবর দেওয়া, সুজিতকে নিয়ে বসা, শ্বশুর মশায়কে দেখতে যাওয়া এ সবই দরকার কিন্তু কোনটাই করল না। একা একা বসেছে ট্রিকায়। চোখ বন্ধ করে। অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর চোখ বন্ধ না করলেও। মনের ভেতর জোনাকি জ্বলছে নিভছে। আটটা বাজতে জোনাকি এল। তখন নিশীথের শরীর মন বেশ চনমনে।

জোনাকি মুখ টিপে হাসছে নিশীথের কথা শুনে—কে আবার! ক্রস কনেকশন তো হামেশাই হচ্ছে। এভাবে হাসলে ওর কানের দুল ঝিকোয় আর চোখের পাতা ওড়াওড়ি করে বিমুগ্ধ নিশীথ বলল - হেসো না। ধরা পড়লে কী হবে অনুমান করতে পার? চোরের শাস্তি, বলে জোনাকি উঠে যায়। নিশীথ হাত বাড়াল

এই সময় পাওয়ার ফেলিওর অথবা লোডশেডিংএর জন্যে সারা হোটেল অন্ধকার। জোনাকি পালিয়ে বেড়ায় ঘরময়, নিশীথ ধরতে পারে না। ভয়ে কোথায় কী উল্টে ফেলবে তার ঠিক নেই। বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে চোখ ছুঁচলো করে। আলমারির গায়ে স্নিগ্ধ আলো। নিশীথ লাফ মারে।

ধরা পড়তে জোনাকি শান্ত মেয়েটি। এক মুঠো শরীর। আর নিশীথের সব রকম দুশ্চিন্তা—লাইনে কে আড়ি পেতেছিল শ্বশুর মশায় কেমন আছেন কিষণকে জায়গা দেওয়া নিরাপদ কিনা—মিলিয়ে যায়। সব অন্ধকার। বড় ভাল লাগে নিশীথের।

এরপর নিশীথ ছোটাছুটি করে ট্যাক্সি যোগাড় করল। করতেই হয়। জোনাকিকে ছেড়ে দিল তার পাড়ায়। যখন বাংলোয় ফিরল রাত গভীর। এবং অন্ধকার গাঢ়তর কলিং বেল টিপল, দরজা খুলল না। টোকা দিল, জানালা খুলল না। ডাকল চন্দ্রা, নিরুত্তর। ডাকল—চুয়া, চন্দন। নিরুত্তর। নিশীথের মন ধপাস ধপাস। সার্ভেন্ট কোয়ার্টার্সের দিকে পা বাড়ায়।

তরকারী বাগানের ভেতর দিয়ে রাস্তা। দুধারে সাদা সাদা ফুলকপি। চন্দনের ঘরের দরজায় তালা। নিশীথ ফিরে আসছে কার যেন গলা শুনতে পেল—ওই যে, ওই যে। খরগোশের মত কান খাড়া। কে? আবার সেই গলা আর ভারী বুটের আওয়াজ। নিশীথ চুপ করে থাকে, সাহস হয় না বলার—আমি নিশীথ রায়, এই বাংলো আমার। টর্চের আলো মুখে পড়ে। চন্দ্রাও বেরিয়ে এসেছে। দলবদ্ধ সকলে একদিকে। নিশীথ একা। কিষণ বলল—স্যার আপনি! আমি ভেবেছিলাম—কিষণ যা ভেবেছিল বলল না।

# আলেয়ার নীল আলো

**পুষ্পজিৎ কর্মকার**

কাল একটা রেজেষ্ট্রি চিঠি এসেছিল। কোত্থেকে সে হদিস পুরোপুরি পায়নি অতনু। সকাল থেকেই একরাশ পুঞ্জ পুঞ্জ সার্কে'র কেনার মত মেঘ এধার ওধার ছোটাছুটি করছিল। অতনু আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে চেয়েছিল। পারেনি। দুপুর থেকে জমানো টুকরো টুকরো একরাশ অন্ধকারের মত মেঘ কোত্থেকে এসে সার্কে'র কেনার স্বচ্ছ মেঘগুলিকে হটিয়ে দিতে লাগল। মাঝে মাঝে একটানা টেনগানের গুলির শব্দের মত মাঝে মাঝে বর্ষাকালের ভরানদীর বুকে থেকে থেকে কালো গুণ্ডক ভুস্ ভুস্ করে ভেসে ওঠার মত অনিয়মিতভাবে কামানের গোলার ভয়ংকর গুরুগম্ভীর কানফাটানো আওয়াজ পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা স্বপ্নিল মেঘগুলিকে হটে যেতে আদেশ দেয়। অতনু প্রতিবাদ করতে চায়। পারেনা। তার চব্বিশ বৎসরের বিধ্বস্ত খাঁটি যৌবন দৈত্যাকৃতি অমিত পরাক্রমশালী নিয়ন্ত্রণকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না। সাদা মেঘগুলোও প্রতিবাদের কথা মুহূর্তের জন্য না ভেবে, বিরুদ্ধাচরণের এতটুকু সাহস না দেখিয়ে পেছটান মারে।

আর আকাশ ভেংগে ঝম্ ঝম করে নৃত্যের তালে তালে জল আসে। বড় বড় ফোঁটা। আছড়ে পড়েই নিজে থেকে চুরমার হয়। চুরমার করে ফেলতে অন্য কেউ পারেনা। বিজয়গর্বে কালো মেঘের সেনানী, আর্টিলারী বাহিনী শ্রেণীবদ্ধভাবে এগোতে থাকে। মাঝে মাঝেই এক এক ঝলক রক্তের মত এক এক ঝলক আগুনের গোলা হস্ করে নেমে এসে পথ দেখায় সেনানীদের। আর স্বপ্ন আতংক একই সাথে সৃষ্টি করে অতনুর মধ্যে।

কড়—কড়—কড়াৎ—প্রচণ্ড শব্দে অদূরেই বাজ পড়ে। সংগে সংগে বিদ্যুতের তীব্র ঝলকানি। অতনুর মধ্যে এই বিদ্যুৎ আশার আলো সঞ্চার করে। কিন্তু পরক্ষণেই কড়-কড়াৎ দানবীয় শক্তির দুর্দমনীয় তেজ ওকে ম্লান করে। আতঙ্ক আনে। ওর সংগ্রামী জীবনে হতাশা আনে। যেন ওকেও পেছু হটবার ইংগিত দেয়।···কার্নিশ থেকে অতনু একটু পেছিয়ে আসে। ওর মনে হয় এই একটানা

প্রচণ্ড বৃষ্টি, অমাবস্যা রাত্রির নিশ্ছিদ্র কালো তিমিরের মত এই দিবা অন্ধকার, এই সামনের নির্বাসিত জনহীন গভীর বৃক্ষরাজী—এর মধ্যে যদি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে অথবা দেশলাই বাক্সের মত এই বাড়ী ঘর, পুতুলের সংসারের মত মানুষের এই সাজানো সংসার, হাঁস মুরগীচোর ক্ষুধী শেয়ালের মত ক্ষুধী মানুষগুলোর সাধের ভবিষ্যৎ যদি দামাল পাগলা হাতীর আক্রমণে দুমড়ে মুচড়ে তচ্‌নচ্‌ হয়ে যায় তবে কেমন হত। কেমন দেখাত?

কাল একটা রেজেষ্ট্রি চিঠি এসেছিল। কোত্থেকে সে হদিস পুরোপুরি পায়নি অতনু। পিয়ন নাকি বলেছিল উত্তর ভারতের কী এক শহরের বিদঘুটে নাম। মা মনে করে রাখতে পারেনি। অতনুর মায়ের পরিচয়ের গণ্ডী বেশী বড় নয়। শুনেও পরে ভুলে যাওয়া তাই অস্বাভাবিক নয়।·· নিজের ওপরও ভীষণ রাগ হয় অতনুর। সারাটাদিন বাড়ীতে থেকে কী দরকার ছিল পিয়ন আসার সময়ে বাইরে বেরোনোর। ঐ পাড়ার ঐ গলিটায় স্মৃতি ও ত কবে হারিয়ে যেতে দিয়েছে মন থেকে। তবু···

অতনু ভাবে কালকেও ত এমনি সময়ে বেশ বৃষ্টি ছিল। এখন বর্ষাকাল। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি লেগে আছে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের এই ছোট্ট জেলা শহরে বৃষ্টির পরিমাণ একটু বেশীই। মাঝে মাঝে একটানা চলে ক্ষান্ত হয়। সেটা বরং স্বস্তিকর। কিন্তু চিরিক চিরিক্‌ করে সারাদিন ঝরে যাওয়া ভীষণ বিরক্তিকর। অতনুর একদম সহ্য হয়না।···

কাল একটা রেজেষ্ট্রি চিঠি এসেছিল। কোত্থেকে সে হদিস পুরোপুরি পায়নি। অতনু অবাক হয়। মনে মনে গালাগালিও দেয়। বরং তুই আজ সকালে আসতে পারতিস। দুপুর থেকেই এত দুর্যোগ, এমন একটানা বৃষ্টি। বাল-বাচ্চা-বউ-মাগী ত তোর ঘরেও আছে। তবে কেন বাপু শুধু শুধু এই বৃষ্টিতে ভেজা। সর্দি জ্বর হলে, ব্রংকাইটিস্‌ অ্যাটাক করলে ঠ্যালা ত সামলাতে হবে নিজেকেই। কেউ পীরিত করে দিতে আসবেনা খরচটা—না হয় একটা রাত্রির লেট করে পেত সবাই চিঠি। পাচ্ছে বিকেলে, পেত সকালে।—সকাল সকাল খবর দেয়াও ভাল পাওয়াও ভাল।

মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হয় অতনুর। মা যেন কেমন সাদা-মাটা বোকা বোকা। ঠিক ওই কায়েতপাড়ার হরিশ-গিন্নীর মত। সাত চড়েও রা বেরোয়না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। (একবার জিব কাটে অতনু। ছিঃ মায়ের সম্বন্ধে কী যা-তা ভাবছে।) কেন পিয়নকে জিজ্ঞেস করে প্রেরকের নাম ঠিকানা

জেলে রাখতে পারত। অথবা পিয়নকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে রাখতে পারত। অতনুর মনে হয় অন্ততঃ অন্য কারও মা হলে তাই করত।

কার্নিশের ওই ধা•টার নজর পড়ে অতনুর। চুন বালি খসে খসে পড়ছে। দোতলার যে কোন দিকে তাকালেও একই অবস্থা। মনে হয় কে যেন খাবলা খাবলা মেখে তুলে নিয়েছে চুন-বালি-সুরকি। বাইরে থেকে ভেতরের অবস্থা বুঝবার উপায় নেই। শুধু বাড়ীর নয় বাইরে থেকে অনেক কিছুরই জাঁকরা রূপ চোখে পড়ে না। কোন্ সালে মনে নেই, অতনুর ঠাকুর্দা তৈরী করেছিল বাড়ীটা. সামান্য স্কুল মাষ্টারি করে। সে যুগে বলেই সম্ভব হয়েছিল। অতনু অন্ততঃ তাই মনে করে। তবে বাবার আমল থেকে অবস্থা অনেকটা পালটাল; ছোট্ট শহরের বুকে যে রেল স্টেশনটি রয়েছে তারই মাষ্টার ছিলেন তিনি। মানে স্টেশন মাষ্টার। ডান হাতের সাথে বাঁ হাতেও অনেক কিছু চলে আসত। হাত পেতে নিতে হতনা। দিয়ে যেত অনেকেই অনেক কিছু। গ্যাংম্যান থেকে জেলে, চালব্যবসায়ী এমনকি পাশের গ্রামের জমিদার অবনী চৌধুরী পর্যন্ত। বাড়ীতে তখন অঢেল সমস্ত জিনিষ। চাইবার আগেই সবকিছু হাজির। এক কথায় অতিস্বচ্ছল অবস্থা।

গণ্ডগোল বাঁধলো বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে। সরকারী চাকুরী; অমন ভাল চাকুরী। প্রথম আঘাতে তাই সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। অতনু আবার সবচাইতে বেশী। হাজার হোক বাড়ীর বড় ছেলে। এক বোন, এক ভাই এবং মা-দিদিমার সমস্ত ভার তার ওপর।

ছোটোবেলায় ভূগোলে পড়েছে। অথচ অতনু বুঝে পায়না একভাগ মৃত্তিকা কী করে তিন ভাগ জলের ভার সামলায়। কাল বড় বৃষ্টি গেছে। আজও অনেকক্ষণ থেকে রাতের একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দের মত বৃষ্টির বৈচিত্র্যহীন ঝম্ ঝম্ শব্দ। আর মাঝে মাঝে আম জাম বট গাছের পাতায় পাতায় শোঁ শোঁ শব্দ। এই মুহূর্তে কান পেতে আর কিছু শুনতে পায়না অতনু। শুধু বুকের কতস্থান থেকে উঠে আসা কাল বৈশাখী দিনের ঐ রকম একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ। একটা আকুপাকু ভাব।—কী করে এত জলভার ধরে রাখে ধরিত্রী। অতনু সত্যিই অবাক হয়। বাবা থাকাকালীন উত্তরবংগের ছোট মফঃস্বলশহর কালিয়াগঞ্জে বসে এমন করে ভেবে দেখেনি সে। ছোটো বেলা থেকেই বাবার হাতঘরে সে দেখেছে লোহার লম্বা দুটো লাইন সোজা অনেক অনেকদূর গিয়ে আকাশের সাথে মিলে যাবে। আর একটু বড় হয়ে অতনুর ভুল ভাঙল। সে

বুঝতে শিখল চোরাপথের সর্পিলগতি ছাড়া মিশে যাওয়া দূরের কথা, আকাশ ছোঁয়াও যায়না।

অতনু তবু ভালবেসেছিল পৃথিবীকে। ভালবেসেছিল বন জংগলময় কোকিল দোয়েলের মিষ্টি সুরে ভরা আধা মফঃস্বল আধা শহর এই জায়গাটিকে। ছোটো বেলা থেকেই টাংগন নদীর ধারটায় বসে থাকতে খুব ভাল লাগত। আর ভাল লাগত বাবার রেল-স্টেশনটা ঘুরে ফিরে দেখতে। কত নতুন অচেনা মুখ। কীরকম ব্যস্ততা।

কত আর বয়েস হবে? নয় কি দশ। সেই ছোটো বেলাতেই গভীর রাতের স্টেশন দেখেছিল অতনু। বাবা ছাড়া সব্বাই সেদিন দূরে কোথায় গিয়েছিল গুরুর সাথে দেখা করতে। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কি-রে আমার সাথে রাত এগারোটা পর্যন্ত স্টেশনে থাকতে পারবি ত?—স্টেশনের নামে অতনু এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল। কত মানুষ, কত জেলে, চালের কারবারী, সবজী-অলা, কত সুট-কোট পরা বাবুদের ট্রেন ধরবার জন্য ছুটোছুটি ব্যস্ততা। বিশেষতঃ কলকাতাগামী প্যাসেঞ্জারদের দার্জিলিং মেল ধরবার জন্য। একটুও ঘুমোয়নি অতনু সে রাতে! প্লাটফর্মের এদিক-ওদিক করেছিল শুধু। অতরাতে অত মহিলা প্যাসেঞ্জার দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, এরা সব এত রাতে কোন ট্রেন ধরবে বাবা?

—কলকাতা।

—কেন যাচ্ছে?

—তার কি ঠিক আছে। নানা লোকের নানা কাজ। কেউ যাচ্ছে পড়াশোনা করতে, কেউ ছুটির পর চাকরিতে জয়েন করতে, কেউবা শুধু বেড়ানোর জন্য।

—আর এই রকমকে জামা-প্যান্ট পরা ছেলেটা?

—হয়ত ছুটিতে কারও সাথে বেড়াতে এসেছিল। ফিরে যাচ্ছে।

অতনু কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বারবার ছেলেটির দিকে তাকাতে তাকাতে বলে ফেলল, আমিও বড় হয়ে কলকাতা যাব পড়তে, না বাবা?

—হাঁ নিশ্চয়ই।—তবে গেলেই ত হবেনা পড়াশুনো ঠিকমতো করতে হবে।

অতনু সেদিন বাবার কথায় খুব উৎফুল্ল হয়েছিল। গত বছর পাশের বাড়ীতে ওর বয়েসী একটি ছেলে এসেছিল কলকাতা থেকে। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, প্লানেটারিয়ম প্রভৃতি কতসব মজার মজার দর্শনীয় জিনিষের নাম করেছিল। অতনু বোঝেনি সবকিছু।...পড়াশুনো নিশ্চয়ই করবে। অতনু তাই মাঝে মাঝেই

বাবাকে তাড়া দিত কবে ওকে কলকাতায় পাঠানো হবে।

তারপর একদিন সত্যি সত্যিই অতনু কলকাতা গেল। নতুন জীবনের সাথে পরিচিত হল। এবং অবশেষে ডিগ্রী বয়ে নিয়ে এসে দরখাস্ত করে বাবার দিন কাটাতে লাগল।

—কাল একটা রেজেষ্ট্রী চিঠি এসেছিল। কোত্থেকে সে হদিস পুরোপুরি পায়নি অতনু।…নাঃ, অতনু এবারে ভীষণ বিরক্ত হল। বৃষ্টিটা কিছুতেই ধরে আসছেনা। পিয়ন ব্যাটা এই বৃষ্টিতে নিশ্চই কোথাও আটকে গেছে। হয়ত একগুচ্ছ রজনীগন্ধা থাকবে। মরুভূমিতে ঘাস গজানোর নতুন ফর্মুলাও থাকতে পারে।… কিন্তু পৃথিবীতে ভাল সবকিছু আটকে থাকে। সামান্য ফুটন্ত কেটলীর ঢাকনা ঠেলে ফেলবার সত্য পিয়নের ব্যাগের অন্ধকারে বহুদিন আটকে ছিল।

অগত্যা কিছু না পেয়ে চেয়ারটা টেনে ধপ করে বসে পড়ল। সামনে তাকাতে একদম ভাল লাগছিলনা। বৃষ্টির শব্দ, প্রকৃতি শাওয়ারে গাছগুলির আনন্দ অবগাহন, আড়ালে-আবডালে শালিক পাখীর পাখা ঝাপটানো রাস্তার কুকুরটার দ্রুত স্থান পরিবর্তন, ছাতা মাথায় লোকটার সাবধান পদচারণা—কিছুই অতনুর মনে দোলা দিতে পারছিলনা। অতনু আজকের বর্ষার আনন্দ না পাচ্ছে বিরিয়ানি কাটলেটে, না পাচ্ছে গরম খিচুড়ি বা গরম তেলেভাজায়।

সামনের দিকে তাকাতে ভাল না লাগলেও ওর দৃষ্টি বারবার গিয়ে পড়ছে কার্ণিশের ধারে ঝাঁঝরা ইঁট বারকরা কংকালে, আর কানে ভেসে আসছে শীত-কালের শিশির গাছের পাতার মর্মর শব্দ আটচালার বসে থাকা বৃদ্ধা গত যৌবনা কুকুরিটার অসময়ের করুণ কান্না। অতনু আঁতকে ওঠে মুহূর্তের জন্য অশুভ কিছু কল্পনা করে। তারপর দুর্বোধ্য কি এক যন্ত্রণায় ঝিম্ মেরে যায়।…বাবা থাকা কালীন মায়ের উত্তর ভারতে বিশেষতঃ কাশী, বৃন্দাবন ঘুরে আসবার কথা ছিল। যাওয়া হয়ে ওঠেনি।…বোনটা বায়না ধরেছে এবার পুজোয় দামী স্কার্ট-গাউন নেবে, আর একখানা ভাল সিল্কের শাড়ী।…বোন সবে শাড়ী পরা শুরু করেছে। মা বলছিল নজর মানে ছোটো ভাইটা সংসদোষে বখে যাচ্ছে। একটা ভাল স্কুল-বোর্ডিং-এ রাখতে পারলে ভাল হত।…মায়েরও বাইরে বেরোনোর জন্য ভাল কাপড় নেই।…বাড়ীটা রিপেয়ার হচ্ছেনা অনেক বছর থেকে।

অতনু জানে বাবা থাকাকালীন আর্থিক অভাবের দিকটা বুঝতে দেয়নি কাউকে। বোনটা আবদার করে যা চাইত তাই পেত।…অতনু বোঝে একটা কিছু করা দরকার। নিজের জন্য না হোক অন্ততঃ ছোট ভাই-বোনদের জন্য।

দাদা হয়ে বোনের সামান্য আবদারটা না রাখতে পারা দুর্ভাগ্যের। তাছাড়া ছোট ভাইটাকেও চোখের সামনে কতদিন আর নষ্ট হয়ে যেতে দেখবে।...অতনু হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে ছুটে ঢুকল নিজের ছোট্ট ঘরটায়। কিন্তু—, বানরের মত সেল্‌ফের অগোছালো জঞ্জাল থেকে টেনে ফেলতে লাগল সেক্সপিয়র রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে, চোখের বালি, শেষের কবিতা, মোপাঁসার ছোট গল্প সংকলন ইত্যাদি হাতের কাছে যা পেল তাই। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল গত একবছর ধরে জমানো অকেজো কাগজস্তূপের মধ্যে। চেয়ারটা টান মেরে ছুঁড়ে দিল। বেশ জোর শব্দ হল। বিছানায় মেঝেতে কাগজপত্র গড়াগড়ি খেতে লাগল। অতনুর যতদূর মনে হয় একবছর ধরে যে সব যায়গায় অ্যাপলিকেশন করেছে তার 'পারটিকুলার্স' এই বস্তা পচা স্তূপের মধ্যেই থেকে থাকবে। কিন্তু না। একটার পর একটা কাগজ টেনে দেখা সত্ত্বেও কোন হদিস করতে পারলোনা। একটা দুটো নয় বছর খানেক ধরে সংখ্যাহীন কতই'ত অ্যাপলিকেশন করে গেছে। অধিকাংশই বন্ধনঘরে। আজকাল চাকুরী দাতারাও চালাক হয়ে গেছে। নিজেদের ঠিকানা কখনও জানাতে চায়না আগবাড়িয়ে,ভীড় এড়ানোর জন্য।.. হতে পারে কোনও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক। প্রাইভেট কোম্পানির সেলস্ রিপ্রেজেন্টটিভের কোন কাজও হতে পারে। কে জানে, শুধু নর্থ কেন, সাউথ ইষ্ট বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ায় হতে পারে। কিন্তু এই কাগজটা এল কি করে এখানে? বলতে গেলে সমস্ত সম্পর্কই ঘুচিয়ে দিয়েছে অতনু। প্রেম-ফ্রেম আর যার দ্বারাই হোক ওর দ্বারা হবার নয়। বড় বেশী বাস্তব হয়ে গেছে এই ক'টা বছরের বিভিন্ন ঘাতে-প্রতিঘাতে। রোমান্টিকতা নিয়ে মাথা ঘামাতে বিরক্তি আসে। গায়ে জ্বালা ধরে।...তবু অর্চনা মাঝে মাঝেই খোঁজ খবর নেয় অতনুর। কিন্তু অতনু ত চায়না। কোনরকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে আজকাল সম্পূর্ণ নারাজ। ভাইবোনের প্রতি, সংসারের প্রতি যে দায়িত্ব আছে সেটার কিছুটা অন্ততঃ পূরণ হোক। তারপর দেখা যাবে মানসিকতার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব কিনা।

হঠাৎ অতনুর মনে হয় দুনিয়ার সবাই ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ভগবান বিশ্বাসঘাতকতা করে বাবাকে কেড়ে নিয়ে গেল। কলকাতায় পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষার নাম করে কতগুলি ডিগ্রি পকেটে পুরে দিয়ে বাবা। তারপর এই সমাজব্যবস্থা বিশ্বাসঘাতকতা করল। ওর কচি সরল মন, নিষ্পাপ ভালবাসার সমাধি রচনা করে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল নিজেই। আজ

প্রকৃতি ? সে ত এই দুর্যোগ, এই নিরবিচ্ছিন্ন ঝড় বৃষ্টি সৃষ্টি করে কাল প্রতারিত করেছে। আজও একটা বিরক্তিকর অস্বস্তিজনক পরিস্থিতিতে ফেলেছে। অর্চনা ? একটা খারাপ গালাগালি এসে যায় মুখে। ওই গলি, ওই অর্চনাই দায়ী কালকে—রেজেষ্ট্রি চিঠিটি না পাওয়ার জন্য। যতসব ফালতু চিন্তা। যতসব দুর্বলতা।···অতনু একটান মেরে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় একবছরের জঞ্জাল। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো চিঠিটা ফেলতে গিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে টুকরো টুকরো কাগজগুলো টুকরো টুকরো স্বপ্ন আলোর মত ঢেউ খেলে খেলে দুলতে থাকে। কিন্তু অতনু দেখে, ওর এক বছরের জঞ্জাল, ওর টুকরো টুকরো অন্যায়, ওর ছোটখাট পাপকে বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে পবিত্র করে গ্রহণ করে পৃথিবী।

—অতনু, বাবা তুই এসব কী শুরু করেছিস ? ঘরময় বইপত্তর ? কাগজগুলো ফেলে দিলি কেন ? দরকারী কিছু থাকতেও ত পারে !

অতনু ফিরে দেখে মা। কেমন একটা অভিযোগ মনের মধ্যে নিয়ে অতনু নিশ্চল বাকহীন থাকে—সারা মুখে চোখে আশি বৎসর বৃদ্ধের কঠিন গাম্ভীর্য।

—বিকেলে খেলিওনা কিছু। অত ভাবিস কেন ? ভগবান কতদিন আর বিরূপ থাকবেন। দেখিস ভাল খবরই আসবে।—

অতনু কোন উত্তর না করে পাশ কাটিয়ে চলে আসে আবার কার্নিশের ধারে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। সমস্ত পৃথিবীটাকে ক্রমশঃ গাঢ়ো এক অন্ধকার গ্রাস করছে। একটু দূরে গাছের আড়ালের প্রায় নিষ্প্রভ বিজলি বাতিটা টিম্ টিম্ করে জ্বলে অন্ধকারকে বিরূপ করতে চাইছে। আর গাছের নিচের ভৌতিক ছায়া যেন হেডলি-চেজ সৃষ্ট শিহরণময় পরিবেশ। আকাশটা এখনও ঝরে যাচ্ছে নির্বিকার একটানাভাবে। সেই গাছের পাতায় পত্ পত্ শব্দ। সেই ঝড়ের দাপটে ছায়াগুলির অবিশ্রান্ত নাচুনি।

অতনু নিরাশ হলেও ভাবে পিয়নকে নিশ্চয়ই একবার ঘুরে যেতেই হবে এদিক দিয়ে। আবার ভাবে, যদি না আসে। তবে ত আবার পুরো একটি রাতের অস্থিরতা—নিদ্রাহীন রাত্রির জল্পনা কল্পনা। তা বলে পিয়ন ছাড়া পাবেনা। বেশ দু-কথা শুনিয়ে দেবে কাল সকাল ন'টায় গিয়ে। কিন্তু ও কে রিক্সার পেছনে বর্ষাতি গায়ে ? পিয়ন না ?—মুহূর্তে অতনু ভুলে যায় দুর্যোগের কথা। সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে পড়ে রাস্তায়। আগে থেকে পিয়নকে ধরতে হবে। জানতে হবে কোথা থেকে এসেছে ; কী-ই বা তার ভাষা। —অতনু ছুটতে

থাকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বৃষ্টির জল গ্রাস করল মাথা, একটু একটু করে পুরো জামা তারপর প্যাণ্ট। অতনু তবু ছুটতে থাকে। মনে হয় সামনেই, এই খুব কাছেই সবুজ সংকেত—হাজার কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন চোখ ধাঁধানো আলো—আজকাল কি করছ'র উত্তর। অতনু ছুটতে থাকে। এখন ওর ভেজা কাকের মত অবস্থা। মাথা থেকে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে এসে পড়ছে জামায়। জামা প্যাণ্ট শরীরের সংগে একদম সেঁটে গেছে। অতনু তবু ছুটছে। গোলাপ ওকে প্রেম দেবে। বেঁচে থাকার নতুন ফর্মুলা দেবে। আর দেবে কি করছ আজকাল?—এর টানা টানা উত্তর। অতনু তাই ছুটছে—ছুটছে—। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে অতনু। পেছনে করলা খনি থেকে উঠে আসা দৈত্যাকৃতি অমাবস্যার সেই একরাশ অন্ধকার ভয়াল বিদীর্ণ দম্ভ নিয়ে তাড়া করে। সামনে অনেক অনেকটা দূরে ক্ষীণদ্যুতি যে বলয়ের মধ্যে এতক্ষণ হাজারো কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিজলী দেখেছিল তাকে মরীচিকা মনে হয়।—রিক্সায় দেখে মেঘবহুল, ঠেলে বেরিয়ে আসা মাংসল মাড়োয়ারী দম্পতিকে। এই দুর্যোগে হয়ত হেলেন-পদ্মার বই দেখে ফিরছে। ভাল ঘুম হবে রাত্তিরে।··· আর রিক্সার পেছনে লোকটা? ওটা পিয়ন নয়। অতনু পেছনে তাকিয়ে শিউরে ওঠে। মাথাটা ঝিম মেরে যায়—ঘুমের ঘোরের দমবন্ধ ব্যর্থ চীৎকারের মত প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করে উঠতে চায়। কিন্তু গলা দিয়ে টুঁ শব্দ বের হয়না।—কোন কিছু না পেয়ে লাইট পোষ্টটাকেই পরিত্রাতা মনে করে জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে থাকে। সম্বিত প্রায় হারিয়ে ফেলে। বৃষ্টির জলে পুরো ভেজা শরীরেও থরথর করে কাঁপতে থাকে। পেছনের দৈত্যের কথা মনে হতেই আরও জোর করে চেপে ধরে লাইট পোষ্টটা।—কার্নিশের খাবলা মেরে তোলা চুন সুরকী—বোনের ফ্রক গাউনের কথা—মায়ের কাশী বৃন্দাবন যাওয়ার কথা—'আজকাল কি করছো' প্রশ্নের ধাক্কার কথা সব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকে। নিজের অস্তিত্বের কথাও ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলতে থাকে। তবু চোখ বুজলেই মনে হয় অতনু আবার ছুটছে। ছুটছে—ছুটছে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে পড়ছে।—আবার ছুটছে—ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত দেখা হয় পিয়নের। পিয়ন হাসি মুখে তাদের দাদাবাবুকে এগিয়ে দেয় রেজিষ্টার্ড চিঠি।—কিন্তু অতনু হাত পেতে আর নিতে পারেনা।—অতনু ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত।—রেজিষ্টার্ড চিঠিটিও তখন তার কাছে মূল্যহীন।

বিকেলের এই দুর্যোগের এই কালো মেঘের বজ্রাঘাত যুবক গাছটার সংগে তার বুকেও শেল বেঁধে দিয়েছে। অতনু এখন পাঁকে কেবল পোকাই দেখছে। পদ্মফুল নয়। অতনু এখন কেবল মেঘে মেঘে বজ্রাঘাতই শুনছে। বিদ্যুতের ঝলকানি নয়।

# চরণ চরিত

**অশোককুমার সেনগুপ্ত**

কাছিমের পিঠের মত রুক্ষ বৃক্ষহীন ভুঁইটা আচমকা ঢালু হয়ে একটা কালি রেখে ক্ষেতে মিশেছে। কাছিমের মুখ বলে অনায়াসে অনুমান করা চলে অনতিপ্রশস্ত কালিটায় চরণদাসকে থমকে পড়তে হল। আলপথে হেঁটে আসছে তিনজন। ভ্রূ'র উপরে হাতের পাতা উপুড় করা নৌকার মত করে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করতে করতে মনে হল মাঝেরজন রতন।

রতন দু'দিন ঘর ছাড়া। দিনভর ছেলেটা ঘরে থাকতনা। তবু বাপবেটার সংসারে ওর অনুপস্থিতিতে কি খাঁ খাঁ শূন্যতা। তিন তিনটে দিন কেটে গেল কোথায় যে বাপধন! পাশের ডোবা ঘেঁষা বাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে কেবলই কেঁক কোঁক শব্দ, শুকনো খোপেঝাড়ে মুরমুর, বাগ্দীপাড়ার দিকে ঘরের কোল ঘেঁষে শীর্ণ রাস্তায় মানুষের ছায়া কি গলার শব্দ সবেই চমক—এই বুঝি রতন আসে গ। বিনিদ্র রাতে ছেঁড়া চাটাইয়ে এপাশ ওপাশ, রাতচোরা পাখির ডানার ঝাপটানি, শিয়ালের হাঁক, পাড়ার কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ—এই বুঝি রতন আসে গ। কে কাকে ডাকে হাঁক পেড়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ছোটে সুর, দীর্ঘতর হয়ে প্রত্যুত্তর ছুটে আসে, বুকে বাজে সেই শব্দ-এই বুঝি রতন আসে গ।

কিন্তু কোথায় রতন! না বলে ধন যে কোথায় গেল! সকাল থেকেই মনে মনে জিজ্ঞাসা, রতনকে দেখেছ আমার? অ বলাই, তুমি ত তাঁতিপাড়ার হাটে গেইছিলে, রতনকে দেখেছ? অ গোবিন্দ তুর সাথে ভাব ছিল আমার রতনের, তুকে বলে যায় নাই কুথা গেইছে? অ পিরন দাদা, রতনকে দেখেছ? আমার রতন গো; কালো রুগা চ্যাঙা পারা বটেক, কচি কচি মুখ, লুমের পারা দাড়ি গুঁফ, লাল ডুরা জামা পড়ে আছেক। কালু তু কাল সিউড়ী গেইছিলি, রতনকে দেখিস নাই?

না না। এক উত্তর। সঙ্গে কারও বা যোগ—ছুটুছেলে নয়। ঠিক আসবেক।

কিন্তু মন যে মানে না। গলা শুকনো, লালা শক্ত হয়ে আঠা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কেবলই ভয়কাতরতা, তার মধ্যেই বর্ষার আকাশের প্যানপানানির মত ঠোঁট

নড়ছে, রতন কুথা গেলি ?

মাটি গলে বিক্ষত দেওয়াল, বেঁকারি বেরুন ঘরের চাল, এক খুপরি ঘরের টিনের আগল দরজা, ঠেলে ঢুকতে যেন গিলতে আসছে একটা হাঁ-মুখো রাক্ষসের মত। দুর্গা প্রতিমার সোনালী রুপোলী রাংতা বসান শোলার মুকুটখানা বিসর্জনের সময় এনেছিল রতন, অক্ষত অবস্থায় টাঙান আছে ঘরের ভিতর. রোদ লেগে চোখ অন্ধ করে দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে কাজের জিনিষ ডাঁই হয়ে আছে। বাঁশের ছিলকে, তালপাতার টুকরো, অর্ধসমাপ্ত ঝুড়ি, হেঁসো, রঙের হাঁড়ি, হাটে নিয়ে যাবার জন্যে বাঁশের শান্‌কি, টোকা, পেছে, কুলো, চালুনি। একদিকে মাটির কালিপড়া ভাতের হাঁড়ি, এল্যুমিনিয়ামের প্যান, ভাঁটিভাঙা কাপ, কলাই-ওঠা গেলাস। হাত দিতে ইচ্ছে নেই। কাজ বন্ধ, খিদে নেই। পেটের ভিতর পাকে পাকে শুধু ব্যথায় চেলায় মোরাঘুরি।

আজ দুপুরে উবু হয়ে ঘরের মেঝের রতনের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে মনে হয়েছে—সিনেমা. রতন সিনেমা বড় ভালবাসে গ। কে জানছেক, বাপ উখানেই আটকে আছেক কি না। এবং ভাবনাটা এতই তীব্র হয়েছে যে মানুষটা ঘর ছেড়ে এই ভরা দুপুরে বেরিয়ে পড়েছে।

রতন বলে,—অ বাবা সিনেমা দেখলে না ত মায়ের গব্বেই থাকলে। সাদা কাপড়ে সব নাচে কুঁদে. সাদা কাপড়ে নদী হয়, সুমুদ্দুর হয়, রেলগাড়ী ছুটে, এল্যাপ্লেন ছুটে। তাবাদে সি কি দেশ, কেমন ঘরদুয়োর। তাবাদে লাচ আছে, গান আছে, হুরীপরী আছে। তুমি বালি বাঁশ দিয়ে টুকা পেছে করলে. গাঁয়ে গাঁয়ে বিচলে। বলি রাজেশ খান্নাকে চিন ? উত্তমকুমার ? ডিম্পল ? জীনাত আমন ? শালা ইকেই বলে মায়ের গব্ব। তারি লেগে বলি টাকা যে জমিন ছ, দিয়ে চল। আমাকে বিক্কেস নাই, নিজে খরচ করবে। দুজনাতে ফুর্তি করব। তাবাদে কলকাতা যাব। দেখবে গা কলকাতাতে শালা খালি সুখ।

ঘর থেকে বেরুনর পর যতই এসব মনে হচ্ছিল ততই চরণ আকুল হচ্ছিল। চৈত্রের দুরন্ত রোদ এবং ঝোড়ো বাতাসের তীব্র স্বপনে কেবলই কানের পাশে রতনের কণ্ঠস্বর। শুকনো পাতা কাঁকুরে ভুঁইয়ে কথা বলে যাচ্ছিল রতনের মত। দূরের তালের শ্রেণীর দীর্ঘশ্বাস বাতাস পেয়ে গম্ভীর ভঙ্গীতে রতনের কথাগুলোই নাড়াচাড়া করছিল।

আহা, কত কথা জানত রতন ! জানবে না, কতক্ষণ থাকত রতন এই গাঁয়ে, তার বাঁশের ঝাড়ের মাঝে এক খুপরি ভাঙা ঘরে। সকাল সন্ধে নেই রাজনগর

না হয় সিউড়ী। হাঁটলেই পিচরাস্তা। তারপর তো ভোঁ ভোঁ বাস চলছে। তারপর রিক্সাওয়ালা বন্ধুও হয়েছিল গো! নিয়ে যেত রতনকে। তাই না দুনিয়ার ঢেক ঢেক খবর ছেলে জেনে ফেলেছে। ট্রামে ধোঁয়া বেরুয় না, এখন রাজা নেই, বিলকুল মন্ত্রী, কলকাতাতে গাড়ীতে গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, পিঁপড়ের মত সারিবন্দী মানুষ হাঁটে, রেডিওতে ছবি দেখা যায় সিনেমার পারা—এসব কত কি। হুঁ, জানে না কোন সময় গাঁয়ের মাটি কি ফসল দেয়! জানে না ক্ষেতগুলোয় কখন কি বীজ বুনতে হয়, কখন জল দিতে হয়। জানে না ভাতের হাড়ি ফোটাতে কত পরিশ্রম? জাত ব্যবসাও জানে না। ডোমের ছেলে হয়ে শিখল না বাঁশের কঞ্চির কাজ। কিন্তু তাতে কি! শিখবে—শিখবে বৈকি একদিন!

ঝিনুল বাউড়ি কুঁজো পিঠ সোজা করতে করতে বলেছে: তুমার বিটা টি লায়েক হন্ গেল চরণ।

কালো ছোপ পড়া দাঁত বার করে টিউটিউে সুবলা বলেছে, অমন বিটার মুখে মুতি।

বলছে, বলে, আরও লোকে নানান কথা বলে চরণদাসকে। কিন্তু তাতে কি!

আসলে কেউ বুঝে না গ রতনকে। মুখে হাতি মারে, ঘোড়া মারে। তা মারুক। মা মরা ছেলে, আমি বাপ, কঠিন কথা বলতে লারি। তাবলে তুমাদের ত কেতি কিছু করে নাই! না হয় বলে পাড়ার সব শালা মুখ্যু। বলে, উর জাতভাইদের, তুদের সঙ্গে মিশতে ঘিরে লাগে। না হয় একটুক সাজগুজ করে। চকচকে জামা আর প্যাণ্ট! মুখে পাউডার লাগায়! চুল উল্টিন টেরি কাটে। পায়ে চটি লাগিন করয় করয় চলে। সিগ্রেট ফুঁকে। বুঝি-বুঝি সব বিটার দুষ! কিন্তক ছুটু ছেলে ত বটে! গোবিন্দ যে বললেক, বেঁচে গেইছ, ষাঁড় ঘরে না এলে তুমারই লাভ, এলেই গুঁতুবেক ত তুমাকে। উ কথা বলা কি ঠিক হল গ?

হুঁ, ভাত রাঁধি আমি, রতন খালি খায়, খালি বলে, পয়সা দাও। বলে রাঁধতে শিখলে নাই। খালি পুন্ত আর ভাত। কেনে মাছ পটল আলু করতে পার না? ভাতের থালা ফেলিক দেয়। তা রাঁধার সুয়াদ হয় না, আমার হাতের দুষ। ইতে লুকের কি বলার আছে। তুরা কেনে বাপ বিটার মাঝে কথা বলবি?

বাপ আমার দুকের কথাতে রাগ করে কুথা গেলি ? তুকে বলতম্, তু আমার বিটা, আমি তুর বাপ। তু আমার বাপ; আমি তুর বিটা। ঠিক কি না বল। আমার দুখ তু বলবি, তুর দুখ আমি বলব। বলতম্, ডুমের ছেলে বাঁশের কাজ শিখ। অ বাপ উড়্ উড়্ মুন করিস না। সিউড়ী যাব রিক্সা চালাব, বলিস্ না। শহরের ঢেক মারা। বলতম্, তু গাঁয়ের পুত গাঁয়েই থাক। বাপ আমার আকাশ থেকেন তুর মা লজর ফেলে রেখেছে!

গাঁয়ের শেষের খোঁড়া বোষ্টমের ঘরটাকে ফেলে কাছিমের পিঠের মত ডাঙ্গাটার উপর হাঁটতে হাঁটতে এসব কথা ভাবতে ভাবতে বুড়ো শরীর টলছিল চরণদাসের। ঘুংপিণ্ড মোচড় দিচ্ছিল। পা সামনে বাড়িয়েও মনে হচ্ছিল পিছনে টান মারছে। রাজনগর কত দূর গো। বাপ আমার আছে, ঠিক! অভুক্ত শরীর, ক্ষুধা নেই, অবশ্যই, তবু কি না বড়ই দুবলা মানুষটা। বয়সও তো কম হল না।

রতন শেষ বয়সের সন্তান। হংসী কম চেষ্টা করেনি গর্ভধারণের জন্যে। জড়িবুটি, ঠাকুর থানে মানত, ওষুধ পত্তর। কিসে থেকে কি কাজ হল কে জানে, রতন এসে গেল পেটে পাকা পনের বছর একসঙ্গে ঘর করার পর।

কালোকুলো হংসী মোটেই সুন্দরী ছিল না। চ্যাপ চ্যাপে শরীর, বোঁচা নাক, একমুঠো চুল মাথায়, মুখের গড়নে, শরীরের গঠনে পুরুষালি ভাব। গাছ কোমর বেঁধে বাঁশ কাটত, বেকারি চাছত। হাটে যেত টোকা পেছে নিয়ে। গলায় স্বরও মোটাসোটা। লোকে বলত, মদ্দ। কিন্তু চরণ জানত, ওর ভেতর বড় একটা মেয়েমানুষ ছিল!

বয়সের ফারাক ছিল অন্ততঃ এককুড়ি বছর দু'জনের। কিন্তু হংসী চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিল। গাঁয়ের মেয়ে, স্বামীর ঘর করতে যায়নি। ওদিককার পুরুষটারও সাড়া ছিল না। এদিকে চরণের অবস্থাও সমান। পুচকে বৌ ঘর করতে আসে না। ঘরে বুড়ী মা আর সে। তবে বরাবরই কাজ পাগল মানুষ। বাঁশের জিনিষ বানান ছাড়া দুনিয়ার আর কোন রহস্য জানার সময় ছিল না। তার মধ্যেই টোপ ফেলল ওই মেয়ে। ঘন ঘন আসে, কাজে হাত লাগায়, মেলা খেলায় গেলে জিনিষ কিনতে দেয়, চোখা চোখা কথা বলে, ধারাল ধারাল বান হানে শরীর তরঙ্গে। বয়সে বালিকা, কিন্তু ভাবে ভঙ্গীতে পূর্ণ যুবতী। মা মরতে চরণের ভাতের হাঁড়ি চাপানর অধিকার নিয়ে নিল। সারা পাড়ায় লোক খাওয়ান পড়ল পরে। পুরুষটিকে শাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকার তো করায়ত্ত ছিলই।

রতন জন্ম নেবার পর চরণদাসকে ছেড়ে বেটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত হংসী। যেন আর কোন মেয়ে মানুষের সন্তান হয় না। এমন ভঙ্গী কথায় কাজে দেখাত যে চরণদাসের মনে হত বেটাটাই শত্তুর। তা শত্তুর বৈকি। হংসীকে রোগে ধরল রতন আসার পরই তো। মেয়েলী রোগ। শেষ রক্ষা হল না। তিন বছরের রতনকে দিয়ে—দেখো ইকে, মরেও শান্তি পাব না—বলে একদিন চোখ উল্টে তার জগতই অন্ধকার করে দিয়ে গেল।

তারপর টিমটিমে বাতির মত রতনকে জীবনের ঝড় বাদল থেকে রক্ষা করতে করতে একটার পর একটা দিন পার হয়ে যাচ্ছে। আহা রতন ঠিক বুঝবেক। ঠিক একদিন ভাল হবেক গো। মা মরা ছেলে অমুন এক গুঁয়ে জেদী হয় গো!

কৈশোর ছাপিয়ে যৌবনের ছোঁয়া লাগতে মেয়েমানুষের বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করেছিল। নিতান্তই কুদে মেয়ে, ভীরু চাউনি, শাড়ীতে মোড়া বড় সড় কালো পুতুল। তবে একঢাল কালো চুল, আর বড় লাবণ্যময় সেই মেয়ের মুখ। ঘরে আসতে যেন রঙ ফিরেছিল ঘরের। আর চরণদাস আগামী দিনের একটা চমৎকার ছবিও দেখেছিল। মেয়েমানুষের নরম হাতের বন্ধন বড় শক্ত। আয়ত চোখের চাউনি পুরুষের চারপাশে দেওয়াল তৈরী করে দেয়।

কিন্তু দেওয়াল তৈরী হল না। রতন ধুতি পাঞ্জাবীতে পাখিকে চড়াতে যতখানি উৎসাহী ছিল বৌয়ের মুখ দেখে ততখানি নিরুৎসাহ হল। দিন কতকেই বলে দিল—ছিঁচ কাদুনিকে বাপের ঘরে পাঠিন দাও। চরণ বোঝাবার চেষ্টা করেছিল—সময়ে সব হবে। বেটা বৌকে রেঁধে ভাত দেওয়া. বাসন মজা. তরকারী কোটা, বুদ্ধি দেওয়া সবেই পাকা শাশুড়ীর ভূমিকাও নিয়েছিল। কিন্তু সময়ের অপেক্ষা করল না বেটা। নিতান্তই বালিকা বধূটিও খাঁচায় পোরা বন্য পাখির মত ছটফট করতে থাকল। তারপর বাপের ঘর যে গেল—ফিরল না। আসবে—আসবে ঠিক। চরণ ভেবেছিল। হুঁ, বেটা রতনই আনবে। যৌবনের নিয়ম অমান্যি করার মানুষ নাই দুনিয়াতে।

তিনজনের মাঝের জন রতন। এগিয়ে আসছে তারই দিকে। বাকী দু'জন কারা গো! সাঙাত? তা বাপ রতন বটে ত ঠিক? উহুঁ, রতনের পারাই, কিন্তুক কিন্তুক···। আহা ভাগাদা যে কেনে আসতে পারছে নাই! হেই মা কালী-যেন রতন হয়। ছেলেমানুষ, দুনিয়ার ভালমন্দ জানে না। তিন-তিনরাত যে কি করে কাটিয়েছে। হুঁ, ঘরে যেয়ে আগে বলব, খা, বাপ, তিজে ভাত রেখেছি তুর জন্যে। নিজে খাই নাই।

চৈত্রের এক ঝটকা উচ্চ বাতাস ধুলো আর শুকনো পাতা নিয়ে গা নাড়া দিয়ে গেল চরণের। খালি গা, কোমরে টুকরো কাপড়, ছেঁড়া গেঞ্জিটা কাঁধে ফেলা। দূরে যেতে এটাই সম্বল।

তিনজন নিকট হতে চরণ দেখল, রতন নয়। তিনজনই অচেনা। হস্ করে নিবে গেল সুখের প্রদীপ। চড়চড়ে রোদ আর পোড়ো বাতাসের ঝাপটা তার উপর সওয়া নিয়ে সে তাকিয়ে থাকল তিনজনের দিকে। এঁরা কি জানবেন গো আমার রতনকে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হল না! তিনজনেই তার দিকে একবার করে দেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পিছন ফিরে চরণ ওদের যাওয়াই দেখতে থাকল ফ্যাল ফ্যাল করে।

কুমুদপুর গাঁটা দেখা যাচ্ছে না। কাছিমের পিঠের ওপাশে লুকিয়ে আছে। গাছগাছালি ঝোপঝাড় এবং ঘরগুলো পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়ালে শীর্ষদেশে শুধু জানান দেবে অস্তিত্ব। এদিকে তিন পাশ খোলা। শুধু চৈত্রের শূন্য শুষ্ক ক্ষেত। আলের পর আল। মাকড়সার জাল যেন বিছান। পূবের ক্ষেতগুলো ডিঙিয়ে ঝোপঝাড় পুকুরের উঁচু পাড়, লালচে ইটের ভাঁটা নিয়ে একখানা গা রোদের গা ডোবা শরীরের ছিটেফোঁটা অংশ দেখাচ্ছে।

এই সময় চৈত্রের শেষ প্রকৃতিতে যেন বিজয়া দশমীর বাজনা। শুকনো পাতা খড় ধুলো বালি পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে। চারিদিকে আম অশথ তাল খেজুরে ঝোড়ো বাতাস লাগার শব্দ! চড়চড় শব্দে মাটি ফাটার কাল হয়নি। ঘাসেরা শুরু হচ্ছে। চটা উঠছে ক্ষেতের সবে মাত্র।

চারপাশেই খাঁ খাঁ শূন্যতা। কেবলই রোদের ঝলকানি। প্রাণীর চিহ্নমাত্রও নেই। আলপথও ফাঁকা। একবার চোখ বুলিয়ে চতুর্দিকে চরণ হাঁটা শুরু করল আবার রাজনগরের দিকে।

রাজনগর আজ গাঁ নয়, নাক টানলে শহরে গন্ধ মেলে। এককালে বীরভূমের রাজধানী ছিল। চিহ্ন ছড়িয়ে আছে অতীতের চারিদিকে। সবই ধ্বংসস্তূপ। রাজার মহল, মন্দির, কালোদীঘির মাঝে প্রাসাদ, ছড়ান ছিটান বিশাল বিশাল অট্টালিকা। শুধু ঝোপঝাড়ের মাঝে দূর দিনের দীর্ঘশ্বাসই শোনা যায়। তবে এপাড়া ওপাড়া করে ঝোপঝাড়ে গাঁ খানা পেল্লাই। তারপর সরকারী সব অফিসের রমরমা। থানা, ব্লক অফিস, কৃষি অফিস, হাসপাতাল ব্যাঙ্ক। কিছু হলেই ছোট রাজনগর। তারপর আছে সপ্তাহে জোড়া হাট, সিনেমা, চা মিষ্টির দোকান, কাপড়ের দোকান, মনিহারী দোকান। পিচরাস্তাও সিউড়ী থেকে সটান

ছুটে এসে একে ছুঁয়ে থেমে গিয়েছে। দিনভর এখন বাস ছুটে ছুটে আসে, সাইকেল রিক্সা ছোটে প্যাঁক প্যাঁক করে।

পুব মুখেই সিনেমা ঘর। সামনে হেটো চালার মত। পিচরাস্তার দু'ধারে দোকান। চা পানবিড়ি মুড়ি তেলেভাজা! লম্বা বাঁশের খুঁটিতে চটের উপর মারা সিনেমার রঙীন ছবি! টিনের উপরও ছবি মারা। নাচের ভঙ্গীতে স্ফীত-বক্ষা এক যুবতী। এরোপ্লেন উড়ছে, ঝুলছে প্যারাসুটে মানুষ। সুন্দর চেহারার দু'জন যুবক, হাতে পিস্তল। হিন্দী বই।

প্রথম চরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ছবিখানা। এতখানি পথ হাঁকড়ে রোদের উজ্জ্বলতা কমিয়ে হ্যারিকেনের আলোর মত লালচে ভাব এনে সে যে সিনেমা ঘরের সামনে এল তার ক্লান্তি এবং অবসাদ এ মুহূর্তে থাকল না। ভিড় এখনও লাগেনি। সবই পরিচিত মুখ ঘোরাফেরা করছে। একজন সাইকেল রিক্সাওয়ালা হর্ণ বাজাচ্ছে। ওদিকে দোকানের সামনে লেজ গুটিয়ে কুকুর ঘুরছে। সিগারেট ফুঁকছে একজোড়া ছোকরা। না, কেউই রতন নয়। তা ভেতরে ঢুকলে বলতে পারবেক উরা রতন সিনেমা দেখতে এসেছিল কি না!

পিচ রাস্তার উল্টো দিকে উবু হয়ে বসল চরণ। চোখ আবার গিয়ে পড়ল চটে আঁকা বিশাল রঙীন পোষ্টারে! কাকে যে জিজ্ঞাসা করবে চরণ। সাইকেল যাচ্ছে ক্রিং ক্রিং বাজিয়ে। মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। ধুলো উড়িয়ে একটা জিপ গাড়ী ছুটে গেল। তা রতন ঘুরলে ঠিক চোখে পড়বে। বাবার কাছে না যাক্ ছিনেমা আসবেক গো। ধুলোর উপরই মানুষটা বসে পড়ল। তারপর কোমরের গেঁজে থেকে বিড়ি বের করে ধরাল।

—চরণদা হিথা কেনে গো। সিনেমা দেখবে নাকি?

প্রায় লাফিয়ে উঠল চরণ। ঝিমুনি এসেছিল বোধ হয়। তবে চিনতে ভুল হল—প্রহ্লাদ। রাজনগরে ঘর। জাতভাই। ভারী আমুদে মানুষ। কুমুদপুরের জামাই। লতায় পাতায় একটা সম্পর্কও আছে ওর স্ত্রী কানিদের সঙ্গে। প্রহ্লাদ জমি চষে, বাঁশের কাজও করে। হাটে ঘাটে দেখাও হয়।

লুঙ্গিপরা মানুষটাকে দেখে এতক্ষণে চরণের মনে হল না বসে থেকে ওর ঘরে গেলে হত! এদিকে শেষবেলার সূর্য ঝিমিয়ে গিয়েছে। সিনেমা ঘরের সামনে ভিড় বেড়েছে। শব্দও হচ্ছে। মাইকে ঝমাঝম একটা গানের বাজনা বাজছে।

—অয় পেহ্লাদ। বিপদে পড়েছি ভাই, রতন তিনদিন ঘর আসে নাই। তা চোখে পড়ে নাই তুমার ইদিকে?

—উহুঁ। গেল কুথা?

—জানিনা। বলে যায় নাই।

—তাহালে ত ভাবনার কথাই বটেক।

—ভাবলম্ ছিনেমা ত বড় ভালবাসে। ইখানে থাকতে পারে। তারি লেগে এসেছিলম্।

—চল, ঘর দিকে চল, কথা হবেক।

—কিন্তুক রতনের লেগে বসে আছি।

—আহা এক ডুঙ্গ চা খেয়েই চলে আসব!

প্রহ্লাদের ঘরে গিয়ে চা মুড়ি খাওয়া হল। তার সঙ্গে গল্প। গাঁয়ের মেয়ে কানি। পাঁচ ছেলেমেয়ের মা। অভাবের সংসারে যৌবনেও শরীরে দৈন্যের ছাপ। ছেলেহারানর কথা শুনে গালে হাত দিল। তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল পাঁচ-গাঁয়ের সব ছেলে হারানর। কে ফিরেছে কে ফেরে নাই। ছেলে নিয়ে কতরকমের ব্যবসা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। পাশের ঘরের দু'চারজনও যোগ দিল। চরণকে বর্ণনা দিতে হল রতনের চেহারার বারবার। দেখতে পেলেই খবর দেবে সব, এবং রতন ফিরবে এমন সান্ত্বনাও দিল সকলে! গাঁয়ে এমন সহানুভূতি পায়নি চরণ. এখানে পেয়ে রতনের জন্যে কষ্টবোধ আরও উগ্র হয়ে বুকে বসল। চা মুড়ি যেন আটকেই থাকল গলায়।

প্রহ্লাদ বলল,—তাহলে চল চরণদা!

—কুথা?

—যা শুনলম, বিটা বাপকে ছাড়ুক, সিনেমা ছাড়তে লারবেক। উখানে আসবেকই।

এদিকে দেখতে দেখতে টুপ করে কখন জলের কৌটা পড়ার মত সূর্য ডুবে গেল। আঁধার নয়, কিন্তু একটা কালো চাদরের আস্তরণ ব্যপ্ত হয়ে উঠতে থাকল চরাচরে। দিনভর বাতাস কোথা যেন উধাও। ঢাকনা দেওয়া হাঁড়ির মত মাটির পৃথিবী। চারপাশ থেকে শুধু তাপ দিচ্ছে।

সিনেমা ঘরের সামনে এসে প্রহ্লাদ বলল,—চরণদা ইখানেই তুমি ফাঁদ পেতে বস।

—কিন্তুক ভিতরে যদি থাকে।

—সিনেমা দেখবে নাকি? বাতা সোন্দর বই। ভিতরটও দিখা হবেক।

মানুষের ঢোকার দিকে তাকিয়ে চরণ বলল, তা চল, দু'জনাতেই দেখি।

লালচে আলো জ্বলছে ঘরে। গান হচ্ছে। ছেঁড়া চটে বসে চরণ চারপাশে দেখতে থাকল। ওধারে মেয়েদের বসার জায়গা। একবার উঠে দাঁড়িয়ে রতনকেও খুঁজল। প্রহ্লাদ বসিয়ে দিল, বস, বস ; এখুনি আরম্ভ হবেক। আলো নিবে ঘুরু হল সাদা পর্দ্দায় কালোসাদায় খেলা। মানুষজন বাগান ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট। কিছুক্ষণেই চরণ অভিভূত। যাত্রা থিয়েটার দেখেছে চরণ, কিন্তু সাদাপর্দ্দায় খেলা দেখা জীবনে এই প্রথম। কোথা লাগে যাত্রা থিয়েটার ! ভুলে গেল চরণ রতনের কথা। সাদা পর্দ্দায় হিন্দী কাহিনী চিত্রের কুশীলবেরা এক ভিন্ন জগতই তৈরী করে দিল। এবং চরণ দাস ভাষা না বুঝলেও কাহিনীর মধ্যে টের পেল সমস্যাটা। নায়িকার বিয়ের রাতেই কাণ্ড। বিয়ে হতে দিচ্ছে না ভিলেন। তারপর ঘটনার ঘনঘটা, গাড়ী ছোটা, এরোপ্লেনে ফাইট, নাচ, গান, তার সঙ্গে প্রাসাদোপম অট্টালিকা, বিচিত্র সজ্জার মানুষ এবং বিবিধ আজব অদেখা সামগ্রী তার দু'চোখে মুগ্ধতার আবেশ এনে দিল।

সিনেমা শেষ হতে প্রহ্লাদের সঙ্গে ঘরে ফেরার পথে রাজনগর রতন কিছুই থাকল না। থাকল শুধু কিছু চমৎকার মুখ, কিছু দৃশ্য, এবং অদ্ভুত রহস্যজনক এক জীবন কাহিনী।

রাতে ফেরা হল না। সকালে কুমুদপুর এল চরণ। প্রহ্লাদ এগিয়ে দিয়ে গেল কিছুটা। রতনের কথা নয়, মানুষটা যে সিনেমাতে মোহিত তা বুঝে ফেলেছে প্রহ্লাদ। আবার আসবে। হাতে পয়সাকড়িও আছে বুড়োর। মুক্তে দেখা হবে তার সিনেমা। এদিকে ঘরে তো হা হা দৈ দৈ। চাষ করলেও পরের জমি, পেট চলে না ঠিকঠাক। আবার ঘরের মেয়ে মানুষ খরচেও ঘটে। সংসার মানেই যন্ত্রণা। এর মধ্যে অন্যের ঘাড়ে চেপে যতটুকু সুখ নেওয়া যায়।

—আবার আসছ ত চরণদা। ইপাশে আমিও খুঁজ রাখছি।

—আসব প্রহ্লাদ। দেখিগা ঘরে রতন এল কি না।

—তা এলেও খবর দিও আমাকে। ভাবব নাহালে।

—তা দুব।

—মা এলে কিন্তু সিনেমা ঘরের কাঁদটা ভুলো না। খিটা ই কাঁদে পড়বেকই ই তল্লাটে থাকলে।

সকালের রোদে হাঁটতে হাঁটতে চরণের মাথায় ঘুরতে থাকল পর্দ্দায় মুখগুলো, উত্তেজক ঘটনাগুলো, গানের সুর এবং নাচের ভঙ্গী। সকাল থেকেই চড়চড়ে রোদ। ঝোড়ো বাতাস এখনও স্তব্ধ হয়নি। ফলে রোদ বিঁধছে গায়ে। ঘাম

জমছে। পাখপাখালি উড়ে বেড়াচ্ছে। আগে আগে একটা মানুষ গরু নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মনে হল কেষ্ট বাউড়ী। লম্বা পা ফেলে হয়ত ওকে ধরা যায়। রতনের কথাও জিজ্ঞাসা করা যায়। কিন্তু এগুল না চরণ। আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল। কুমুদপুর আর কতটুকু পথ। সিনেমার কথা ভাবতে ভাবতে পথখানাও যেন ছোট হয়ে গেল। নিজেই অবাক চরণ। এত তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছে গেল। না রতন ফেরেনি। একটা চাপা শ্বাস পড়ল।

এক মানুষ গিয়েছিল একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে ঘরের টিনের আগল খুলল চরণ। তারপর রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক'দিন ভাত জোটেনি। প্রহ্লাদও মুড়ি খাইয়েছে। আজ ভাত খেতে হবে। ভিজে ভাত ও মদ হয়ে গিয়েছে। লালা কাটছে। তারপর রাজনগর! আজ কি দেখাবে সাদা পর্দা!

প্রহ্লাদ কম অবাক নয়। বুড়ো মানুষটার কি যে হয়ে গেল। মুখে কেবল সিনেমার গল্প। এত বাড়াবাড়ি যে হয়ে যাবে তা মোটেই ভাবে নি প্রহ্লাদ। দেখাতেই আমোদ তার। আর ও নিয়ে কিছুই ভাবে না।

কিন্তু চরণের ভাবনার যেন শেষ নেই। শুধু দেখা নয়; নায়ক নায়িকার নানান সমস্যা, দ্বন্দ্ব, ভিলেনের শয়তানি চরিত্র, বন্ধুর গুপ্তশত্রুতা, পুত্রের পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রেমে, জীবনে যেন তোলপাড় করে তাকে। ওদের সুখ-দুঃখ হাসি আহ্লাদের সঙ্গী হয়ে যায় সে। যেন ছবি নয়, সত্যিকারের জীবনকে সে দেখে। কখনও দুঃখে কখনও আহ্লাদে উচ্ছ্বাসে [redacted]লাদের সঙ্গে আলোচনাও করে। নিরুৎসাহী প্রহ্লাদের উপর বিরক্তও হয়। মোটকথা দিন কয়েক হিন্দী বাংলা বই দেখে গান বাজনা সাদা পর্দায় আলো আঁধারে খেলা মানুষটাকে ঘোর মায়ায় ফেলে দেয়। বিকেলে সিনেমাঘরের সামনে এমব্লিকায়ারে গান, চটের রঙীন ছবি সাঁটা, মানুষের যাতায়াত, তারপর উবু হয়ে বসে আলোর মায়ায় সে পোকার মত চিটিয়ে থাকে।

কানি বলল,—তুমি খুব সিনেমা দেখছ!

—আহা না দেখলে যি রতনকে দেখতে পাব নাই।

—বাইরে বসে থাকলে পার।

—তা পারি। কিন্তুক সময় যি কাটে না।

প্রহ্লাদ বলল,—বুঝলে বুড়ো বয়সে এমন সিনেমা দেখা ভাল নয়।

—কেনে?

—চোখ খারাপ হবেক।

—ধুস, তাহালে এত লুক দেখে কেনে ?

—কিন্তুক রতন ই তল্লাটে না থাকলে ত আসবেক নাই।

—আসতে হবেকই। বাবা, এমুন ফাঁদ পেতেছি! চরণ খুসীতে মাথা দোলাল,—তুমি ঠিক বলেছ, ছিনেমা ছেড়ে বিটা আমার থাকতে লারবেক।

প্রহ্লাদ চুপ করে গেল। বুড়োর পয়সা আছে। জমান টাকা আনছে। ফুর্তি হচ্ছে তাতে তারও হোক না!

কিন্তু প্রহ্লাদকে অবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যি ফাঁদে পড়ল রতন। চরণ বিকেলের লালচে রোদে দেখল শাড়ীপরা এক মেয়ের সঙ্গে রতন দাঁড়িয়ে। হুঁ রতন। সেই জামা, পাজামা, ঠোঁটে বিড়ি। মেয়েমানুষের গোলাপী শাড়ী, গোলাপী ব্লাউস। কালো শরীরে বড় উগ্র হয়ে ফুটে উঠেছে রঙটা। হাসতে হাসতে গল্প করছে রতনের সঙ্গে। সামনেই সিনেমার গেট। মাথার উপর পোষ্টারে রঙীন ছবি। তারপাশে টিনের ঘের। বাদাম চানাচুরওয়ালা বসে আছে। সামনে ছোট একটা জটলাও।

বারকতক দেখতেই হুহু করে যেন বুকের ভিতর দমকা বাতাস ঘুরে বেড়াতে থাকল চরণের। মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল পা। ছুটে গিয়ে 'বাপ আমার'—বলে জড়িয়ে ধরার শক্তিও থাকল না। শরীরের সব রক্ত শুধু বয়ে যেতে থাকল শিরা উপশিরার দুরন্ত গতিতে। যা শুধু শরীরময় এক অসহযন্ত্রনা বাজিয়ে তার চেতনার বুদ্ধির শক্তির সবদ্বার রুদ্ধ করে দিল।

প্রহ্লাদ পাশেই ছিল। বলল, কি হল ?

বিকৃতস্বরে চরণ বলল, রতন!

কই ? কই !—উত্তেজিত হয়ে কাঁধ ধরে চরণকে প্রায় ঠেলে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল প্রহ্লাদ।

রতন কিছু বলার আগেই হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল চরণ—অরে বাপ, কুথা ছিলি! বাপকে মুনে নাই তুর। আমি দুনিয়া চুঁড়ে বিড়াছি, তুর সুনা কত কষ্ট হচ্ছে···তুর মা থাকলে···।

লোক জমা হয়ে গেল ওদেরকে ঘিরে। মেয়েমানুষও জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রহ্লাদই সয়াল লোক। চরণের কান্নাও বন্ধ হল। তারপর রতন যা বলল, তা হল, সিনেমা দেখতে এসে বৌকে দেখতে পায় সে। দাদার সঙ্গে এসেছিল সিনেমা দেখতে। দেখা হতে কথাবার্তা হয়। তারপর শ্বশুরবাড়ী যায় রতন। অসুখে পড়েছিল ওর খুড়শ্বশুর। সকালেই কুমুদপুর ফেরার কথা।

শুড়শ্বশুর মারা গেল। আর তো ফেরা যায় না। দু'দিন দেরী হল। তারপর কুমুদপুর গিয়ে রতন বাপকে দেখতে পায়নি। খোঁজ নিয়ে জেনেছে বাবা নাকি তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। তাই আবার শ্বশুর ঘরেই ফিরে গিয়েছে। আজ বৌকে নিয়ে সিনেমা দেখতে এসেছিল!

শুনে অভিমানাহত গলায় চরণ বলল, তা তু গাঁয়ে গেইছিলি কেউ ত বলে নাই?

—সুবলাদার সঙ্গে দিখা হন্‌ছিল। উকে সুধিন্‌ছ?

—উহুঁ। আমি ত পেহ্লাদের ঘরে থাকি বাপ। কুমুদপুর যায় নাই।

—তাহালে।

বেটার সঙ্গে এখন অভিমান চলে না। ফিরে পেয়েছে সেই সুখের ঢেউ আছড়াচ্ছে বুকে। তারপর এই মেয়ে মানুষ যে পলকা নিতান্তই বালিকা সে বৌ জেনে সুখের উপর সুখ। ফাঁদ পাতা সার্থক হয়েছে। এখানের মাটি আঁকড়ে ছিল বলেই না এত সুখ। রতনকে ফিরে পাওয়া, সঙ্গে আবার বৌ।

সিনেমা মাথার উপর তোলা রইল। প্রহ্লাদের ঘরে বৌ বিটাকে নিয়ে উঠল চরণ। কিছুতেই ফিরতে দেবে না সে শ্বশুরঘরে। কুমুদপুরে যেতেই হবে।

প্রহ্লাদ বলল,—সেই ভাল। বাপ হামলে বিড়াছিল তুমাকে। কুমুদপুরেই যাও। আমি না হয় তুমার শ্বশুর ঘরে খবর দিন্‌ছব।

রতন বলল, বাবা যখুন এমুন করছেক, তাই যাই। ঘোমটা ঢাকা বৌকে বলল, হ্যাঁ গ কি বলছ?

ঘোমটা ঘাড় কাৎ করে পরিপূর্ণ সায় দিল।

রাজনগর পার করে দিয়ে প্রহ্লাদ বলল,—তাহালে চরণদা বিটা ত পেলে আর আসছ নাই।

—সি কি কথা। আসব বৈকি। চরণ একগাল হাসল—কিন্তুক সময় কি পাব! এখুন ঢেক কাজ। বিটাকে চাষে নামাতে হবেক। বৌট ডাগর হনছেক। উকে বুঝুতে হবেক, পুরুষ মানুষে বাড়ায় রাখ, কাজ করাও। তবে সময় পেলে আসব।

—বিটা ইবার তুমার কাজ ঠিক করবেক। আর উড়বেক নাই।

—কেনে?

চাপা স্বরে বলল, মেয়েবুয়ের আঁচলে ইবার বি বাঁধা পড়েছেক।

কুমুদপুরের ঘরে বৌ বেটাকে নিয়ে পৌঁছাল চরণ সকালেই। বৈশাখের খরা দিন। গুমোট গরম। বাতাস নেই। আইচাই করছে প্রকৃতির মত মানুষজন দুরন্ত সূর্যের দাপটে। কিন্তু মানুষটার গ্রাহ্য নেই। চাল ডাল তেল নুন জোগাড় করে রান্নার আয়োজন করে ফেলল। বৌ আমি রাঁধব—বলতে আহ্লাদে ডগমগ। পাড়ার লোকের কাছে রতন আর বৌকে কিভাবে বের করেছে তার গল্প বলে বলে মুখে ফেনা ভেঙে ফেলল। পড়শীরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে বলে,—ছেলে তাহালে তুমার ছেলেধরার হাতে ধরা পড়ে নাই, মাগের আঁচলে লুকিন্ ছিল—বলাতে নিজেও খুক খুক করে হাসল। রতন যে খুব চালাক বৌমা যে ছেলেকে বেঁধেছে সমবয়সীদের কাছে চাপা স্বরে বলে যেন নিজের যৌবনের সুখকেই আঁচলা আঁচলা তুলে ফেলতে থাকল। তার সঙ্গে কান্নাও আছে। সুখের কান্না।

—বাপ রতন আর বাইরে যুন করিস না। কাজ শিখ বাঁশের। নাহালে কারুও জমি চাষ কর।

—করব বাবা। বৌট মোড়া চৌকা পেছে করতে জানে খুবি ভাল।

—তাই নাকি? তাই নাকি?

—হুঁ। রতন ঘাড় ঘুরিয়ে বৌকে দেখল। ঘোমটার আড়াল তুলে বৌ চোখ মটকাচ্ছে!

বিকেলের ঢল নামতেই রোদে প্রকৃতিতে বুড়ো মানুষটা অন্যরকম হয়ে গেল। কাঁধে গামছা ফেলে বলল,—রতন তুরা থাক। আমি আসছি।

—কুথা যাবে তুমি আবার?

লাজুক লজ্জাজড়ান স্বরে চরণ বলল,—রাজনগর যাব। আজ নতুন বই আসবেক ছিনেমাতে।

# পাওনা

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

বিকেলের ডাকে চিঠিখানা এল।

শীতের অপরাহ্ণ বেলা তখন ফুরিয়ে এসেছে, সন্ধ্যার ছোপ ধরেছে চরাচরে শশীশেখর সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিলেন। পিয়ন এসে হাঁকল "চিঠি। রেজিষ্ট্রি চিঠি।"

উঠে বসলেন শশী। হাতের ইসারায় পিয়নকে বললেন বারান্দায় উ'ঠে আসতে। পিয়নের হাত থেকে লম্বা খামখানা নিয়ে জায়গা মত সই করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন চশমা সঙ্গে নেই। অন্ন গলা তুলে বি প্রমদাকে ডাকলেন, "প্রমদা। আমার চশমাটা একটু দিয়ে যেও ত—"

হাত এবং মুখ একই সঙ্গে চলে প্রমদার। যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণই গজরায়। সে গজরানোটা কখনও নিজের সন্তানদের বিরুদ্ধে, কখনো কাজের বাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে, কখনও বা স্বয়ং ভগবান ও ভাগ্যের বিরুদ্ধে। প্রমদার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটাকেও মেনে নিয়েছে সকলে, কেননা প্রমদার কাজকর্ম সত্যই নিখুঁত।

'চশমা না হলে যদি চোখ কানা তবে দিনের মধ্যে উনষাট বার চশমা হারানো কেন! এ কেমনতর চোখ রাখা বুঝি না বাপু। আর আমার হয়েছে মরণ। খাটেরতলা, বাথরুমের তাক, বইএর ভাঁজ কতজায়গা খুঁজি বল দিনি' আপন মনে বকতে বকতে প্রমদা চশমা হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, আর পরক্ষনেই পিয়ন আর চিঠি দেখে পলকে মুখে এক গাল হাসি টেনে নিয়ে এনে বলল, "কার চিঠি গো কর্ত্তাবাবা? দিদিমনির?"

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে শশী যথাস্থানে সই করলেন। তারপর পিয়ন চলে গেলে ভাল করে নজর দিলেন খামখানার দিকে। খামের ওপরে বড় বড় ছাপা হরফে লেখা—লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া।

শশীর কানাডা প্রবাসিনী মেয়ে সুনন্দার চিঠি কি না—একগলা কৌতূহল নিয়ে এখনও দাঁড়িয়েছিল প্রমদা। হাত নাড়িয়ে ওকে নাকচ করে দিলেন শশী, "নারে, দিদিমনির চিঠি নয়—"

হতাশ প্রমদা গজর গজর করতে করতে ফিরে গেল, "আজকালকার ছেলে-মেয়েদের ধরণ বুঝিনে বাপু। নমাসে ছমাসে একটা চিঠি দিয়ে বুড়ো বাপের খবরটা নেয় না, এমন কথা বাপের জন্মে শুনি নি—। তুই ছাড়া আর কে আছে বল দিনি মানুষটার—" প্রমদার ক্ষোভটা অহেতুক নয়। সে আজ বিশ বছর ধরে ঠিকে ঝিএর কাজ করছে এই বাড়িতে। কোলে পিঠে করেছে সুনন্দাকে, ছোট-বেলায় তাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েছে, স্কুল থেকে নিয়ে এসেছে—

আলোর স্বল্পতার দরুন শশীর খুব অসুবিধে হল চিঠিখানা পড়তে। চোখের খুব কাছে এনে ধরে ধরে পড়লেন। তোমার লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি ম্যাচিওর করেছে। এসে প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে যাও।

পলিসি, ম্যাচিওর—। শব্দগুলো সহসা খুব অচেনা ঠেকল। চিঠিখানা হাতে নিয়ে নির্বোধের মত সেদিকে তাকিয়ে রইলেন শশী। আজকাল এই রকম মধ্যে মধ্যেই হচ্ছে, হঠাৎ চেনা মুখ চিনে উঠতে পারেন না, কথাবার্তার সংলগ্নতা হারিয়ে ফেলেন, স্মৃতির পরম্পরা বজায় থাকে না, বহু দিনের পরিচিত শব্দগুলো অর্থহীন প্রলাপোক্তি বলে মনে হয়—। বড়জোর দু তিন মিনিট, তারপরই আবার সব কিছু খাপে খাপে জুড়ে গিয়ে চলতে থাকে ঠিক-ঠাক—

কাজকর্ম চুকিয়ে প্রমদা চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, "আমি যাচ্ছি কর্ত্তাবাবা, বাটিতে রুটি চাকা রইল। ষ্টোভ জ্বালিয়ে দুধটুকু ফুটিয়ে নিয়ে খেয়ে নেবেন, এই শীতের মধ্যে আমি আর এসে দেখে যেতে পারবনা"—আবছা অন্ধকারে প্রমদা মিলিয়ে গেলেও তার বকবকানি আরো কিছুক্ষণ শোনা গেল, "আমার হয়েছে যত রাজ্যের জ্বালা। বামুন মা ত দিব্যি সতী সেজে ভ্যাং ভাঙ্গিয়ে সগ্যে চলে গেল। এখন এই বুড়োটাকে কে দেখে শোনে বল দিনি—"

আসলে প্রমদারও কোনো দায় নেই শশীকে দেখা শোনার। মনোরমাও কিছু মরার সময় প্রমদাকে মাথার দিব্যি দিয়ে যায় নি যে ভাবছে। সুযোগও পায়নি মনোরমা সে সবের। মাস আষ্টেক আগে যে যখন মারা যায় তখন তার কোনো জ্ঞান ছিল না। বস্তুতঃ অচৈতন্য অবস্থাতেই ছিল সে নাগাড়ে সাত আট দিন, কদাচিৎ যখনই চেতনার রাজ্যে ফিরে এসেছে ছেলে শশাংকর নাম ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে আবার তলিয়ে গেছে জ্ঞানহীনতার অতল সমুদ্রে। শশাংকর মৃত্যু সংবাদটা অনেক দিন চাপা ছিল ওর কাছে, শেষ পর্য্যন্ত আর ঢেকে রাখা গেল না—

বিনয় যখন এল তখনও শশী বারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। কোলের কাছে হাত দুটো জড়ো করা, বাঁহাতের মধ্যে সেই চিঠি। আলো জ্বালেন নি।

"একি শশীকা। অন্ধকারে বসে আছেন কেন?" যেন কাঁকুনি পেয়ে সম্বিত ফিরে পেলেন শশী। হাত থেকে চিঠিখানা মেঝেতে পড়ে গেল, "কে? কে?"

"আমি। বিনয়—" হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপতেই চড়া আলোয় শশীর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল বিনয়, "চিঠি পেয়েছেন শশীকা?"

"চিঠি? কিসের চিঠি?"

"আপনাকে গেল সপ্তাহে বলে গেলাম যে—" বিনয় বলল, "দু'চার দিনের মধ্যেই চিঠি পেয়ে যাবেন। নিজের চোখে দেখে এলাম চিঠি ছাড়া হচ্ছে, অথচ এখনও এসে পৌঁছল না। কি যে হচ্ছে আজকাল"—বলতে বলতেই ইজিচেয়ারের তলায় মেঝেতে লুটোনো খামখানার ওপর নজর পড়ল বিনয়ের। কথা থামিয়ে ঝুঁকে সে তুলে নিল সেখানা, "আরে। এইত—। আর আপনি কি না বললেন আসেনি চিঠি"—

বিনয় সমনোযোগে চিঠিখানা পড়তে সুরু করল, আর তখন খুব আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যাপারটা ফিরে এল শশীর স্মৃতিতে। গেল মাসেই তার পলিসিটা ম্যাচিওর করেছে। শশীর নিজের খেয়াল ছিল না। একদিন বিনয় নিজেই এসে মনে করিয়ে দিল, "ও শশীকা। আপনার পলিসিটাও ম্যাচিওর করল। এবার ত খোঁজ পাত্তা লাগাতে হয়"—

বিনয়ের মুখে টাকার অংকটা শুনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন শশী, বিনয়ের হাত দুটো ধরে খুব কাতরভাবে অনুরোধ করলেন, "তুমি একটু দেখ বাবা বিনয়। এই গরীব বুড়োর টাকাটা না মার যায়"—

আশ্বাস দিয়েছিল বিনয়, ছিঃ ছিঃ শশী কা। আপনি অমন করে বলছেন কেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার টাকা আপনার হাতে পৌঁছে দিয়ে তবে আমার ছুটি।

মনোরমা মারা যাওয়ার পর থেকেই ভেঙ্গে পড়েছে শরীরটা। আজকাল ত হাঁটা চলাই করতে পারেন না। একে ওকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন বিনয়কে, বলেছেন, "ও বিনয়, কি ব্যবস্থা করলে বাবা টাকাটায়?"

ব্যস্ত বিনয়ের কণ্ঠস্বরে পেশাদারী ভাবটি গোপন থাকে নি, "ও আপনি ভাববেন না শশীকা। শীগগিরিই ব্যবস্থা হয়ে যাবে—"

"দেখ বাবা। আমারও দিন ঘনিয়ে এসেছে। চলে যাওয়ার আগে যেন পাওনাটায় না ফাঁকি পড়ি—" শশীর কণ্ঠস্বর খুব করুণ শুনিয়েছে, তারপর আবার বলেছেন কতকটা আত্মগত ভাবেই, "পাওনা বুঝে নিতে এই পৃথিবীতে আর কের জন্মাবার সাধ নেই বাবা। সাধ আমার ঘুচে গেছে একেবারে—"

চিঠিখানা পড়া হয়ে গেলে বিনয় বলল, "আর কি শশী কা। এইবার পলিসিটা দিয়ে দিন আমার কাছে। দুচার দিনের মধ্যেই চেক পেয়ে যাবেন। আছে পলিসিটা হাতের কাছে কোথাও?— "

"পলিসি—"একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল শশীকে, 'খুঁজতে হবে যে একটু—'

বিনয় বলল, "ঠিক আছে। আপনি বরং খুঁজে রাখুন। আমি কাল সকালে এসে নিয়ে যাব—'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল বিনয়। সে কাজের মানুষ, অপ্রয়োজনে সময় নষ্ট করলে তার চলে না। শশী ডাকলেন, 'বিনয়…'

"বলুন শশীকা"—কোমলস্বরে জবাব দিল বিনয়।

"রাজেনের খবর কি? কেমন আছে সে?"

বিনয় তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "বাবা ভালই আছেন। তবে বয়স হয়েছে ত—"

'সে যে একেবারে ভগবান হয়ে গেল। দর্শন পাওয়াই ভার। মাঝে মধ্যে এলে টেলে পুরোনো দিনের গাল গল্প করা যায় - '

মাথা চুলকোয় বিনয়, 'না, মানে—আজকাল ত বেরোন টেরোন না বেশী। আর চাইলেও আমরা দিই না—'

একটু চুপ করে রইলেন শশী। কি যেন ভাবলেন। বললেন, "রাজেন কে বল একবার যেন দেখা করে। বল, আমি বলেছি—"

"বলব শশীকা।" বিনয় চলে গেল।

বিনয়ের বাবা রাজেন ঘোষ অনেককাল আগে শশীর বন্ধু এবং সহকর্মী ছিল। চাকরী করতে করতেই সে লাইফ ইন্সিওরেন্স এজেন্সী নিয়ে পুরোদমে ব্যবসা সুরু করে। বরাবরই একগুঁয়ে পরিশ্রমী ধরণের মানুষ ছিল রাজেন। খুব শীগগিরই তার এজেন্সী ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল। বছর কয়েকের মধ্যেই এমন একটা অবস্থা হল যে চাকরী আর ব্যবসা দুটো বজায় রাখা সম্ভব নয়। চাকরীই ছেড়ে দিল রাজেন।

সহকর্মী না হলেও বন্ধুত্বটা অক্ষুণ্ণ রইল। বাড়িতে যাতায়াত ছিল. মনোরমাকে বৌদি বলে ডাকত। শশীর এই পলিসি নেওয়াটা বস্তুতঃ রাজেনেরই প্ররোচনায়। অনেক দিন ধরেই কানে মন্ত্র দিচ্ছিল রাজেন, কিন্তু প্রথম প্রথম একেবারে পাত্তা দেননি শশী। হেসে বলেছেন "দেখ রাজেন। আমার যা উপার্জন তাতে এমনিতেই মাস কুলোয় না আমার। এর ওপর একটা নিয়মিত বাড়তি খরচ—"

রাজেন অবুঝ নয়। সে একটু চুপ করে থেকে বলেছে, "সবই বুঝি। কিন্তু তুমি বিবাহিত, ছেলেমেয়ের বাপ। ঈশ্বর না করুন তোমার যদি তেমন কিছু হয় আজ, কোনো একসিডেন্ট, কি সংস্থান তুমি রেখে যাচ্ছ তাদের জন্য? কোথায় দাঁড়াবে ওরা? আজ ওদের খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখা যেমন তোমার কর্তব্য তেমনই ওদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার ভাবনাটাও কি তোমার কর্তব্যের অঙ্গ নয়?—'

এ সব কথা শুনলে কার না মন দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন কোনো কথা বলে নি শশী, কিন্তু রাত্রে পাশে শুয়ে মনোরমার কাছে কথাটা পেড়েছেন, "রাজেন বলছিল যদি একটা দুর্ঘটনা কি কিছু ঘটে যায়—'

"দুর্ঘটনা? তার মানে? মনোরমার কণ্ঠে ত্রাস।"

"এই ধর হঠাৎ গাড়িটাড়ি চাপা পড়ে গেলাম, কি একটা মারাত্মক অসুখ বিসুখ—"

ঝটিতি পাশ ফিরে শুয়েছে মনোরমা। দুই ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে শশীর কথা থামিয়ে দিয়েছে, 'তুমি চুপ কর। কাল আসুক রাজেন ঠাকুর পো, আমি জিজ্ঞেস করব এই সব কুডাক ডাকতে তাকে কে বলেছে—'

অন্ধকারে নিঃশব্দে জেনেছেন শশী। মেয়েদের আজন্ম সংস্কার সামান্য খোঁচাতেই ফোঁস করে উঠেছে। এখনও বলে যাচ্ছে মনোরমা, 'ঐ সব ইনসিওর মিনসিওর কিছু করতে হবে না তোমায়। সেধে ঘরে বিপদ ডেকে আনার কোনো দরকার নেই।'

পরের দিন রাজেন আসতে খুব একচোট নিল মনোরমা, "খবরদার বলছি ঠাকুর পো, ঐসব আকথা কুকথা কোনোদিন যেন আর মুখে শুনি না।'

প্রসন্ন সহিষ্ণু হাসি হেসে রাজেন সব শুনেছে, তারপর মনোরমার উত্তেজনাটা খানিক কমলে দু হাত জোড় করে বলেছে, "আপনি আমায় মাপ করুন বৌদি, আর যদি কোনোদিন এমন হয় ত কবে কান মুলে দেবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে

একটা কথাও ভেবে দেখতে অনুরোধ করি—'

থমথমে গলায় মনোরমা বলল, "কি কথা ?'

শুনেছি শশাঙ্ক আপনার খুব ভাল ছেলে। ক্লাসে কার্ট সেকেণ্ড হয়। আচ্ছা পয়সার অভাবে ওর হায়ার এডুকেশনটা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে কেমন হবে ?"

একটু যেন ঘাবড়ে গেল মনোরমা, "তার মানে ?"

রাজেন রহস্যময় হাসি হাসল, কিংবা ধরুন, অর্থাভাবের দরুন আপনি আপনার মেয়ে সুনন্দাকে সুপাত্রস্থ করতে পারলেন না। তার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। যা হয়ে আপনি সে দুঃখ সইতে পারবেন ?'

স্পষ্টই ভেঙে পড়েছিল মনোরমা, "এ সব আপনি কেন বলছেন ঠাকুর পো ?"

রহস্যময়তার খোলশ ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসে রাজেন সহজ ভাবে হাসল, 'বলছি ছেলে মেয়েদের পড়া বা বিয়ের কথা ভেবে একটা আধলাও ত জমাতে পারছেন না। অথচ কিছু কিছু জমান উচিত। তাই বলছি একটা ইনসিওর করা থাকলে সেটা এক রকম বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হয়ে দাঁড়ায়। যাকে বলে ফোর্সড সেভিংস—'

হাসল এবার মনোরমাও সহজ ভঙ্গীতে, "তাই বলুন। শেয়ালের নজর ঠিক বেগুন খেতের দিকেই—"

হাস্য পরিহাসের মধ্যে তখন কথাটা চাপা পড়ে গেলেও ভেতরে ভেতরে মনোরমাকে যে জীর্ণ করতে শুরু করেছিল তা প্রমাণিত হল রাত্রে। একথা সেকথার পর মনোরমা নিজেই বলল, "বুঝলে, রাজেন ঠাকুরপোর কথাগুলো একেবারে ফেলে দেবার মত নয়। সত্যিইত, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো বিয়ে এসবের কথা ভেবে সবাই কিছু না কিছু বাঁচায়। অথচ আমরা চলেছি একেবারে গা ভাসিয়ে—"

অন্ধকারে অল্প হাসল শশী, "তাহলে কি বল একটা ইনসিওর করেই ফেলি।"

"করে ফেলি বললেই কি করা যায় নাকি। হিসেব নিকেশ করে দেখতে হবে কোথায় কতটা সাশ্রয় করা যায়—"

এরপর দু দিন ধরে স্বামী স্ত্রীতে শুধু পরামর্শ চলল, কাগজ পেন্সিল নিয়ে কত রকম হিসেব করতেন। প্রাত্যহিক দুধের পরিমাণ খানিকটা কমান যায়, চা এবং সিগারেটের ব্যাপারে আরো খানিকটা সংযত হওয়ার সুযোগ আছে শশীর তরফে। ছেলেমেয়েদের স্কুল যাতায়াতের জন্য বাসের বদলে একটা লোক রেখে

দিলেই হয়—

কদিন পরে রাজেন এলে মনোরমাই কথাটা উত্থাপন করল, "বুঝলেন ঠাকুরপো, আমরা অনেক ভেবে চেবে দেখলাম, একটা ইনসিওর করা যেতে পারে।"

রাজেনের উল্লাসটা দেখার মতই হল। হুর্‌রে হুর্‌রে করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এক কাণ্ডই বাধিয়ে বসল সে। তারপর সঙ্গের পোর্টফোলিও ব্যাগের ভেতর থেকে একরাশ কাগজ পত্র ফর্ম সব বার টার করে বসল জাঁকিয়ে, "বলুন, কত হাজারের পলিসি নেবেন। কত বছরের। এই দেখুন চার্ট। হাজার প্রতি, বছর প্রতি, প্রিমিয়ামের রেট—"

পলিসিটা খুঁজে বার করতে হবে। অথচ কোথায় যে আছে সেটা কিছুই জানেন না শশী। টাকা পয়সা হিসেব নিকেশ ইলেকট্রিকের বিল লাইফ-ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়ম জমা দেওয়া-এ সবই ছিল মনোরমার এক্তিয়ারে। শেষ বাৎসরিক প্রিমিয়ামটাও সেই দিয়ে গেছে—।

ঘরের দেয়াল ঘেঁষে ওপরে ওপরে চারটে পুরোনো রঙচটা লোহার ট্রাংক। মনোরমার কাছে যা কিছু মূল্যবান দরকারী বা রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্য মনে হত সবই সে রাখত ঐ একটা না একটা ট্রাংকের মধ্যে। সুতরাং আশা করা যায় ট্রাংকগুলো খুঁজলে পলিসিটা পাওয়া যাবে। কিন্তু কি ভাবে সুরু করবেন ভেবে দিশা পাচ্ছিলেন না শশী। হয়ত প্রথম চোটেই পেয়ে যাবেন, আবার হয় ত আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে হবে সব কটা বাক্স—। অথচ কোমরে ভাল জোর পান না শশী দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে পারেন না এক নাগাড়ে বেশীক্ষণ—

সন্তর্পণে প্রথম ট্রাংকটার ওপর হাত বোলালেন শশী। আঙুল বোলালেন পুরু হয়ে জমে যাওয়া ধুলোর আস্তরণে। এলোমেলো কতগুলো বক্র রেখা ছুটে উঠে একটা ডিজাইন সৃষ্টি হল। আঙুলে আঙুল ঘষে শশী ধুলো ঝাড়বার চেষ্টা করলেন আঙুলগুলো নোংরা হয়ে গেল শুধুই। সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শশীর মনে হল, ধুলো ময়লার ভয় করলে চলবে না।

শশী ওপরের ট্রাংকের ডালাটা খুললেন। ট্রাংকটাকে একটু সামনে টেনে ডালাটাকে হেলিয়ে দিলেন পেছনে, যাতে হুমড়ি খেয়ে সেটা হাতের ওপর না পড়ে। ট্রাংক ভর্ত্তি কাপড় চোপড়। বেশীর ভাগই শাড়ি। থাকে থাকে গোছানো সব। শাড়িগুলো তুলে তুলে দেখলেন শশী, যদি তলায় বা

ভাঁজটাজের মধ্যে থেকে থাকে। দরকারী জিনিষ মনোরমা অনেক সময় ঐ ভাবে রেখে দিত। মেয়েলি বুদ্ধি ত।

শাড়িগুলো আবার গুছিয়ে তুলতে গিয়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন শশী বিস্ফারিত চোখে। কত পুরনো পুরনো শাড়ি সব, কত যত্নে রেখে দিয়েছে মনোরমা। কত রকমের শাড়ি সব। তাঁত সিল্ক দামী সস্তা—সমান আদরে বাক্সবন্দী হয়ে আছে। ভুরে রঙা পাছা পেড়ে—এক এক সময় এক একটার চল উঠেছে, পুজোর সময় প্রতিবার একটা মোটামুটি দামী শাড়ি কিনে দিতেন শশী, তা ছাড়া বিয়ের তারিখ আর মনোরমার জন্মদিন—তারিখ দুটো শশীর ঠিক খেয়াল থাকত, বছরের ঐ দুটো দিনে দুখানা শাড়ি বরাদ্দ ছিল মনোরমার। পলিসিটা নেয়ার পর টানাটানির সংসারে মনোরমা শাড়ি নিতে চাইত না, বলত, কি হবে গাদা গুচ্ছের শাড়ি জড়ো করে বাক্সের মধ্যে। তবু দুচার বছর শশী জোর করেই শাড়ি এনেছেন, তারপর মনোরমা খুব শক্ত হয়ে উঠল, ছুতো দিল বয়স হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠছে এখন আর ঐ সব ছেলেমানুষী মানায় না। বয়সের অজুহাতে পুজোর সময়ও দামী শাড়ি নেয়া বন্ধ করে দিল মনোরমা। এখন কি আর সেদিন আছে যে রঙবাহারী সিলকের শাড়ি পরে প্যাণ্ডালে প্যাণ্ডালে ঠাকুর দেখে বেড়াব—মনোরমার মুখের হুবহু জবানী। অথচ শশী ঠিকই জানতেন, গয়না টয়না নয়, শাড়ির ওপর একটু অতিরিক্ত দুর্বলতা আছে মনোরমার, খুব দামীটামি নয়, মাঝেমাঝেই দু একখানা শাড়ি পেতে সে ভালবাসে। আসলে ঐ পলিসিটার মুখ চেয়েই মনোরমা নিজের সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়েছিল। এখন বিভিন্ন সময়ে কেনা শাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে শশী যেন ঐ শাড়ি পরা বিভিন্ন বয়সের মনোরমাকেই চক্ষের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। একজন নয়, অনেক মনোরমা। কিশোরী যুবতী মধ্যযৌবনা বয়স্কা মনোরমারা এসে চারপাশ দিয়ে ঘিরে ধরল শশীকে, কেউ চোখ মটকাচ্ছে, কেউ ঠোঁট টিপে হাসছে, বাঁ গালের পানের পুটলি ডান গালে চালান করে দিল, পানের রসে ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল. আবার গম্ভীর বিষণ্ণ চিন্তিত মনোরমা—

ঝটিতি তালাটা বন্ধ করে দিলেন শশী। একা ঘরে এই অনেক মনোরমার সমাবেশে তিনি যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠলেন। দরকার নেই ঘাঁটাঘাঁটির, সব কিছু বন্দী হয়ে থাক রঙচটা ট্রাংকের গভীর গোপন অন্ধকার কোটরে। দেখা যাক দ্বিতীয় ট্রাংকটায় পাওয়া যায় কি না—

দুপাশের আংটা ধরে প্রথম ট্রাংকটাকে মেঝেতে নামাতে গিয়ে প্রায় হুমড়ি

খেড়ে পড়ে যাচ্ছিলেন শশী, অতি যত্নে নিজেকে সামলালেন। খুললেন দু নম্বর ট্রাংকের তালা। ছেঁড়া খোড়া ন্যাকড়া, গেঞ্জীর বাক্সর মধ্যে নিখুঁত ভাবে গোটানো শাড়ির পাড়, ক্রুশ কাঁটার বোনা লেশ, গেঞ্জী—বোধ হয় শশাংকর, আরো কত কি টুকিটাকি। হাতড়াতে হাতড়াতে ন্যাকড়ার ভাঁজের মধ্যে চৌকো শক্ত মত কি যেন ঠেকল হাতে। বুঝি পলিসিটাই পাওয়া গেল—তাড়াহুড়ো করে টেনে বার করলেন শশী। বোর্ড বাঁধাই ফটো একখানা। সুনন্দা আর শশাংকর।

শশাংকর তখন আট বছর, সুনন্দার তের। শশীর বন্ধু সখের ফটোগ্রাফার অনাদি তুলেছিল ফটোটা। অনাদির হাতের গুণে নয়, নিতান্তই দৈবযোগেই অসাধারণ ভাল উঠেছিল ছবিটা। উল্লসিত অনাদি এনলার্জ করে এক কপি উপহার দিয়েছিল মনোরমাকে। প্রথম প্রথম মাঝে মধ্যেই ছবিটা বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙ্গানর কথা বলত মনোরমা, কিন্তু উদ্যোগের অভাবে ব্যাপারটা আর ঘটে ওঠে নি। তারপর ক্রমে ক্রমে মনোরমা ভুলে গেল। বাক্স বন্দী হয়ে আটকে রইল শশাংক আর সুনন্দা আট আর তের বছরে অনড় অটল হয়ে। আর এদিকে বাইরে দুজনেই বেড়ে উঠল বছর বছর। ক্রমে কিশোরী সুনন্দা যুবতী হল, স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে ঢুকল কলেজে, তারপর ইউনিভার্সিটি। পড়তে পড়তেই তার আলাপ হল কানাডা প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার ব্রতীনের সঙ্গে। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল খুব দ্রুত ছন্দে। ব্রতীনের ছুটি ফুরিয়ে আসছিল। আলাপ, রেজিষ্ট্রি বিবাহ এবং সুনন্দাকে নিয়ে কানাডায় উড়ে চলে যাওয়া—এক সপ্তাহের মধ্যে যেন একটা তুমুল ঝড়ে ওলট পালট হয়ে গেল জীবনের অভ্যস্ত ছকটা।

প্রায় পর পরই ঘটল শশাঙ্কর ব্যাপারটাও। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র সে তখন, লেখাপড়ায় যথার্থই ভাল ছিল, কলেজে ঢুকে বিপ্লবাত্মক রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠল। প্রথম প্রথম চাপা ছিল ব্যাপারটা, ক্রমে প্রকাশ পেতে লাগল। কলেজ—ওরা বলত দালাল তৈরীর কারখানা—ছেড়ে বাড়ি ঘর মা বাপকা ছেড়ে চলে গেল নদীয়া না মুর্শিদাবাদের কোনো অজ গ্রামে সংগঠনের কাজে। এ সব জেনেছিলেন শশী অনেক পরে। তারপর একদিন আস্তানা ঘেরাও করা পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সারা রাত ধরে গুলি বিনিময়। শশাঙ্কর ঐটুকু সুকুমার শরীরে গোটা আষ্টেক গুলি বিঁধেছিল। একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়ে ছিল শরীরটা—

হাতে ধরা ছবিখানা চোখের জলে ঝাপসা দেখছিলেন শশী। করতলের

পিঠ দিয়ে রগড়ে চোখ মুছলেন। তারপর আবার চোখের কাছে এনে ভাল করে দেখতে লাগলেন শশী সুনন্দা আর শশাঙ্ককে। আজ এই মুহূর্তে তিনি আবিষ্কার করেছেন ওদের কারো মুখই তার মনে নেই। এখন এই ছবিতে শশাঙ্ক আর সুনন্দা আট আর তেরতে কেমন স্থির অবিচল হয়ে রয়েছে, এখান থেকে অনেক সরে এসেও এই মুখের আদল, সুনন্দার গালের টোল, শশাঙ্কর কপালের কাটা দাগ এগুলো সবই ত ছিল শেষ পর্যন্ত অবিকল। শশী মুখের ওপর ছবিখানাকে চেপে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। গভীর ব্যথায় বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল—।

বাকি দুটো বাক্সেও পলিসিখানা খুঁজে পাওয়া গেল না।

বিনয় বলল, "তাইত শশীকা, আপনি ত মুস্কিলে ফেললেন। হারানো পলিসির টাকা উদ্ধার করা কি সহজ কথা—" ওর কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আভাস।

বিনয়ের বিরক্ত কণ্ঠস্বরে শশী একেবারে মরমে মরে গেলেন, "বুঝলে বাবা বিনয়, ঝড়টা ত কম গেল না এই বুড়োর ওপর দিয়ে। সব একেবারে তছনছ হয়ে গেল। বুঝতে পারছি তোমাকে খুব অসুবিধেয় ফেললাম। কিন্তু কি করি বল—" তারপর শশীর কণ্ঠে আরো কাতরতা ফুটল, "দেখ বাবা বুড়োর টাকাটা না মারা যায়—"

খানিক গুম হয়ে বসে রইল বিনয়। ওর চোখে মুখে বিভ্রাট ঝনঝাটের রেখা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। নিজেকে খুব অপরাধির মত মনে হচ্ছিল শশীর। কিছু বলা দরকার এই বিবেচনা থেকে বললেন, "তুমি বরং একবার রাজেনকে বল। সে যদি কিছু করতে পারে—"

স্পষ্টই এবার চটে উঠল বিনয়, "বাবা। বাবা কি করবেন। তিনি কি ভগবান নাকি!"

"—না, না—। তবে সে ত অনেকদিন করেছে এসব। ওর অনেক জ্ঞান শোনা, ইনফ্লুয়েন্স—"

"ইনফ্লুয়েন্সের ব্যাপার নয় এটা—।" অধীরতা ফুটল বিনয়ের কণ্ঠে, "ব্যাপারটা হল আইন কানুনের—। বাবাও যা করবেন আমাকেও তাই করতে হবে—"

এতক্ষণে বুঝলেন শশী। রাজেনের কাজকর্ম উত্তরাধিকার সূত্রে বিনয়ই দেখছে এখন। রাজেনের নাম উল্লেখ করে ওর অহংকারে ঘা দিয়ে বসেছেন শশী। বিনয় আরো খানিকক্ষণ ভ্রুকুটি কুটিল মুখ নিয়ে বসে রইল। তারপর আচ্ছা,

দেখা যাক, কতদূর কি করা যায় বলে উঠে চলে গেল।

বিনয় চলে গেলে আবার একা হয়ে পড়লেন শশী। হাতে অফুরন্ত সময়। সকালেই খবরের কাগজ পড়া হয়ে গেছে আদ্যোপান্ত। আপন মনে বসে থাকতে থাকতে কখন যেন পলিসি সংক্রান্ত ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গেলেন। অনেক কষ্টের ফল স্বরূপ আজ ম্যাচিওর করেছে পলিসিটা। এর জন্য যেমন নিজে অনেক বঞ্চনা সয়েছেন তেমন বঞ্চিত করেছেন স্ত্রী ছেলেমেয়েকে। অনেক টাকা। অথচ সামান্য একটা ক্রটীর জন্য সেই টাকা আজ বিপন্ন।

ভাবতে ভাবতে সহসা হতাশাজাত এক ধরনের উদাসীনতা যেন চেপে বসল শশীর ওপর। অনেক টাকা। কিন্তু কি হবে আজ সে টাকা দিয়ে। কাদের জন্য এই টাকার আয়োজন—নুনন্দার বিয়ে, শশাঙ্কর উচ্চ শিক্ষা—এক টুকরো স্নিগ্ধ হাসি ফুটল শশীর মুখে—কোনো সুযোগই পেলেন না শশী, আর স্ত্রী মনোরমার ছোটখাট সাধ আহ্লাদ—মনোমত ছোট একখানা বাড়ি, সামনে একখানি বাগান—হায় মনোরমা আগেই চলে গেছে অন্য বাড়িতে। শশী নিজেও ত রয়েছেন এক পা বাড়িয়ে। চুলোয় যাক সব। আর তিনি টাকা টাকা করে কাঙালপনা করবেন না। যা খুশী করুক বিনয়—।

বস্তুতঃ যত দিন যেতে লাগল এই দুই বিপরীতমুখী ভাবনার মধ্যে ক্রমান্বয়ে আন্দোলিত হতে লাগলেন শশী ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। কখনো খেলনা-হারান শিশুর মত কাতর হয়ে ওঠেন—টাকা, আমার টাকা, আহ আমার টাকাগুলো—। কের একটু পরেই হয়ে ওঠেন সন্ন্যাসীর মত বিবিক্ত—। আর কটা দিন ত মাত্র। তারপরই একদা ঘণ্টা বেজে উঠবে চং চং চং—। অশ্রুত ঘণ্টা। কেউ শুনবে না, ইথার তরঙ্গে ভেসে ভেসে এসে শুধু ডাক দিয়ে যাবে শশীকে, আর তিনি পলকে সব ছুঁড়ে ছেড়ে পেছনে রেখে বেরিয়ে যাবেন এক মুক্ত পুরুষের মত—

মাঝে মাঝে বিনয় আসে এটা সেটা সই করাতে। শশী তার মেজাজ অনুসারে আচরণ করেন বিনয়ের সঙ্গে। কখনো বা নিস্পৃহ ভাবে সই করে দেন বাড়ানো কাগজের তলার দিকে। মুখে বলেন, আর এসব করে কি হবে বিনয়। কি করব আমি একরাশ টাকা দিয়ে—আবার কোনো দিন বিনয়কে দেখেই তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, "ও বিনয়, সত্যি করে বল, শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে ত টাকা গুলো। আমার অনেক কষ্টের টাকা—" বিনয় সান্ত্বনা দেয়, "আপনি ভাববেন না শশীকা। যে কেস এ হাত দেয় বিনয় তার হিল্লে না করে ছাড়ে না।"

শশী তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। মনে হয় রাজেন যদি নিজে ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাত তা হলে বোধ হয় ব্যবস্থা হয়ে যেত কিছু। রাজেনের অসীম ক্ষমতা। সে প্রায় অসাধ্য সাধন করতে পারে ঈশ্বরের মত। বরাবরই রাজেন জোর দিত পলিসি নেয়ার পর পলিসি হোল্ডারদের সেবা যত্নের ওপর। বলত, 'আফটার সেলস সারভিস।'

কিন্তু বিনয়ের কাছে রাজেনের নাম উল্লেখ করতে ভরসা পান না শশী। প্রথম দিনই সে যেমন চটে উঠেছিল, তাতে ভয় হয়। তাই কৌশলের আশ্রয় নেন, "ও বিনয়, বল না একবার রাজেন কে। একবার দেখা করে যাবে আমার সঙ্গে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটু গল্প করতে সাধ হয়। পারলে নিজেই যেতাম—"

বিনয় সহিষ্ণু হাসি হাসে, "বলব শশীকা। আসলে বাবার ও ত একই হাল।"

হয়ত বলে বিনয়, কিংবা নানান কাজের ঝামেলায় ভুলে যায়। রোজই শশী বিকেলের দিকে বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে সামনের রাস্তার ওপর দু চোখের দৃষ্টি বিছিয়ে রাখেন—

কিন্তু রাজেন আসে না।

তারপর এক বিকেলে একটা দুঃসাহসের কাজ করলেন শশী। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে মনে হল আজ যেন তিনি অন্যান্য দিনের চেয়ে সুস্থ। তখনই ভাবনা টা মনে এল। আজ একবার রাজেনের বাড়ি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে এলে কেমন হয়। ভাবনাটা নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করতে লাগলেন শশী, ততই যেন আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে লাগল।

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠলেন শশী, লাঠিখানা হাতে নিলেন। বেশী সাড়াশব্দ না করাই ভাল। এখনি হয়ত ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঝি প্রমদা পথ আগলে দাঁড়াবে "কোথায় চললেন কত্তাবাবা এই সময়ে একা একা। আপনি দেখছি একটা কেলেংকারী না ঘটিয়ে ছাড়বেন না—"

নিঃসাড়ে খোলা জমিটুকু পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। কোনো শব্দ না করে ঠেলে লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। লাঠির ওপর ভর রেখে নিজের জোরটা আর একবার যাচিয়ে নিতে চাইলেন শশী। বুক ভরে একটা নিশ্বাস টেনে নিলেন। আসলে বসে থেকেই অথর্ব হয়ে যাচ্ছেন, নইলে যতটা অসুস্থ মনে হয় নিজেকে ততটা তিনি নন—।

বেশ খানিকটা পথ তড়িঘড়িই এগুলেন শশী। পথ হাঁটতে ভালই লাগছে।

না হেঁটে হেঁটে পায়ের অসাড় পেশীগুলোর আড়ষ্টতা ক্রমে ভাঙছে। নিজেকে মনে হচ্ছে সুস্থ স্বাভাবিক। হাতের লাঠিখানাকে মনে হচ্ছে যেন বাহুল্য—

আধাআধি পথ অতিক্রম করে এসে হাতে পায়ে কাঁপুনিটা সুরু হল। প্রথমে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইলেন। নিজেকে বোঝালেন শশী—আসলে এটা হচ্ছে মানসিক। অনভ্যাস ভয়—এই সবের প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই কাঁপুনিটা প্রবল হয়ে উঠল। এক সর্বাত্মক শ্রান্তি ও ক্লান্তি যেন একখানা ভারী কম্বলের মত জাপটে ধরল শশীকে, কপালে ঝিন ঝিন করে ঘাম ফুটে উঠল, শিরদাঁড়া বেয়ে ঘামের স্রোত কুলকুল করে নেমে যেতে লাগল নীচের দিকে। হাত পা আর নিজের আওতায় নেই। একটু আগেই যে লাঠি-খানাকে প্রয়োজনহীন ভেবেছিলেন, এখন সেই লাঠিতে শরীরের সমস্ত ভার রেখে আর প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে এগিয়ে চললেন সামনে। সামনে—সামনে প্রায় এসে পড়েছেন—রাজেনের বাড়ি ঐ দেখা যায়—

রাজেনের বাড়ি থেকে রশিখানেক পথ আগে জ্ঞান হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন শশী পথের ধুলোয়।

মৃত্যুর আগে একবারের জন্য জ্ঞান ফিরেছিল শশীর।

তিন দিন অচেতন অবস্থার পর চোখ খুলে দেখলেন সব ঝাপসা। অবশ হাতখানা তুলে সেই ঝাপসা পর্দাটা সরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু সফল হলেন না! মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে রাজেন ডাকল, "শশী, ও শশী—"

অনেক দূর থেকে যেন ডাকটা ভেসে এল শশীর কানে। আপ্রাণ চেষ্টায় ঘোলাটে চোখের চঞ্চল মণি দুটো স্থির করলেন। ঝাপসা পর্দার ওপারে আবছায়া একখানা মুখ। প্রৌঢ় স্থিতধী মুখে একমুখ দাড়ি। শশী অস্ফুটে বললেন, "কে, ভগবান নাকি—"

"শশী, আমি রাজেন—"

"না। তুমি ভগবান।" শেষের দিকে যখনই ঈশ্বরের কথা ভাবতেন শশী, এমনই একখানা মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। শান্ত, নিরাসক্ত, আর কি জানি কেন সে মুখে থাকত এক মুখ দাড়ি—। এখন চোখের সামনে সেই মুখ অস্পষ্ট, আবছা—কিন্তু শশীর চিনতে ভুল হয় না—

রাজেন হাত বাড়িয়ে শশীর ডান হাত খানা তুলে নিল। তারপর সেই হাতের মধ্যে গুঁজে দিতে চাইল সবুজ রঙের এক চিলতে কাগজ, "শশী, তোমার পাওনা টাকা। এল আই সির চেক। নাও ধর—"

শশী হাত মুঠো করেন না, যা করতে পারেন না—

"নাও ধর শশী। এটা নিয়ে আমাকে ঋণ মুক্ত কর—"

তবু হাত মুঠো হয় না শশীর। মুমূর্ষু মুখে বিকেলের আলোর মত এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে—

"ও শশী, শশী—"

অনেক কিছু বলতে চান শশী, কিছুই বলতে পারেন না: দুচোখের ধার বেয়ে জল গড়িয়ে নামে শুধু, অনেক কষ্টে বলেন, "আমার অনেক পাওনা। অনেক বেশী প্রিমিয়াম দিয়েছি আমি—"

কষ্টে চোখ বুজে আসে শশীর।

রাজেন চিৎকার করে ওঠে, তার কণ্ঠস্বর থেকে যেন আতঙ্ক ঝরে পড়ে, "শশী, তুমি টাকা না নিয়ে চলে যেওনা শশী—"

চোখ বুজেই শশী জবাব দেন, "আবার আসব। সব পাওনা বুঝে নিতে এখন যাই—"

# মোহনবাঁশি ও ট্রানজিসটার

**রত্নেশ্বর বর্মণ**

পলাশবনী পাহাড়টা এমন কিছু নয়, বরং পাথরের একটা বড় ঢিবির মতো। আর পাহাড়ের গা ঘেঁষে পলাশবনী গ্রাম। ইউক্যালিপটাস, শাল, পেয়ারার ছায়া ঘেরা। দশঘর বাসিন্দে—চাষী গোয়ালা আদিবাসী মিলেমিশে। শহরে সভ্যতা, হুজুগ থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়া একটা নিভৃত গ্রাম। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতোই স্থির শান্ত নিরবধি কাল।

কখনও কখনও এমনি গ্রামীন নিভৃতিতেও চাঞ্চল্যের ঢোল পড়ে, দূর শহর থেকে সংবাদ এসে পৌঁছে। কলকাতা থেকে মদনের চিঠি এসেছে, সে শীঘ্র বাড়ি আসবে। অন্যান্য পাঁচটা আকর্ষণীয় সংবাদের মতো এ খবরটাও অচিরে সারা পাড়া ছড়িয়ে।

মদনের আগে এ গ্রামের কেউ কলকাতা যায়নি। আর মদনও সেখানে রীতিমত বসবাস করছে। অন্যদের দৌড় বড়জোর ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর পর্যন্ত। সেও মামলা-মকদ্দমা তদারকের জন্য। যাওয়া এবং পত্রপাঠ বিদায়।

বস্তুত মদনকে পলাশবনীর সবাই ভুলে গিয়েছেন। কে কাকেই বা দীর্ঘদিন স্মরণে রাখে অকারণে। এতদিন সে শুধু তার মায়ের বুক জুড়ে ছিল। আর করুণাও তাকে ভুলতে পারেনি, একদিনের জন্যও না। মদনের মা চিঠিখানা পাড়ার তিনজন ছেলেকে দিয়ে পড়াল। তারপর একই বিবরণ সবার মুখে শুনে নিশ্চিত হল যে, সত্যি সত্যি মদন আবার পলাশবনীতে আসছে। করুণারও ইচ্ছে ছিল, চিঠিখানা নিজে একবার দেখে। কিন্তু সে পড়তে জানেনা; তা ছাড়া চাইতেও কেমন লজ্জা করে।

করুণা ইউক্যালিপটাসের সরকারী বনের সারি দেওয়া শিশু গাছগুলির ফাঁক দিয়ে পাথর বেয়ে বেয়ে সোজা পাহাড়ের ওপরে উঠে যায়। এখানে অখণ্ড নিস্তব্ধতা, শুধু দূর থেকে ঘুঘুর ডাক শোনা যায়। পাহাড়ের ওপর থেকে বহুদূর দেখা যায়—শ্যামল প্রান্তর, ঝুঁয়ে পড়া শস্যক্ষেত্র, মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া রূপোলী-রেখা ভুলং নদী। আবার বন, শুধু বনজ শ্যামলীমা দিক্‌চক্রবাল জুড়ে। এ সব বন-পাহাড়-নদী-শস্যক্ষেত্র পেরিয়ে গেলে পৃথিবীর কতো বিচিত্র ভূভাগ,

কত জনপদ। করুণা জানেনা, কল্পনাও করতে পারেনা।

এমনি নির্জনতা করুণার ভালো লাগে। গত তিন বছরে কোন এক অদৃশ্য হস্তের স্পর্শে করুণার যে রূপান্তর ঘটেছে, তা সে উপলব্ধি করে।

এখন কতো স্বপ্ন, কল্পনা এ চতুর্দ্দশীকে ঘিরে থাকে, তা সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

তুলং নদী ছড়িয়ে যে দূর বনাঞ্চল, তার ওপর দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে। কলকাতা থেকে টাটানগর। আগে পাহাড়ের ওপরে বসে ওদিকে তাকালে ট্রেনের ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যেত। মদন ওকে অনেকবার অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়েছে। করুণা শুনেছে, এখন নতুন ইঞ্জিন রেলগাড়ী টেনে নিয়ে যায়। সে সব গাড়ী কোন ধোঁয়া না ছেড়ে নিঃশব্দ গতিতে বনের ওপার দিয়ে পারাপার করছে। কোন কোনদিন গভীর রাতে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেলে করুণা যেন বহুদূরে একটানা ট্রেন চলাচলের শব্দ শুনতে পায়। ওর বুকের মধ্যে হুপুর বাজিয়ে একটানা ট্রেন চলতে থাকে। ওর দারুণ কষ্ট বোধ হয়।

এমনি কোন নিঃশব্দ-ট্রেন চেপে মদন কলকাতা থেকে ফিরবে। গত দুর্গা পূজার সময়ে করুণা গিডনি গিয়েছিল ঠাকুর দেখতে। রেললাইন এবং রেল চলাচল সে অপার কৌতূহলে প্রত্যক্ষ করেছে। রেল লাইনগুলো বহুদূরে শূন্যবিন্দুতে গিয়ে মিশেছে। সেই শূন্যবিন্দুর অন্তরাল থেকে নিঃশব্দে লাফাতে লাফাতে যেন ট্রেনগুলো বেরিয়ে আসে। অন্তত করুণার এমনটা মনে হয়েছে।

মদনের কথা স্মরণ হলেই করুণার স্মৃতির ঝাপিটা খুলে পড়ে। পুরানো দিনের কথা মনের কোণে ভিড় জমায়।

একটি বিশেষ দিনের কথা এখন করুণার খুব মনে পড়ে। লুকোচুরি খেলতে খেলতে সে বনে হারিয়ে গিয়েছিল। হারিয়ে গিয়ে এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি করেছিল। মদনকে চিৎকার করে ডাকছিল, কাঁদছিল। অথচ মদন কাছেই বনের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। সামনে এলেই করুণা মদনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওকে রাগে ধামচে দিয়েছিল। মদন নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছিল, হাসছিল। মদনকে কোন রকমে জব্দ করতে না পেরে করুণা মাটিতে বসে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। মদন খেলার ছলে জাবড়ে ধরে করুণাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। করুণা নিষ্ফল আক্রোশে দাপাদাপি করছিল। এমন সময়ে মদন সজোরে করুণার মুখ-চুম্বন করল। করুণা মদনের মুখে কাঁচা পেয়ারার গন্ধ পেল এবং এক অনাস্বাদিত আনন্দের আবেশে ক্লিষ্ট হচ্ছিল। সে

কথা ভাবলে এখন সে দারুণ রোমাঞ্চ বোধ করে।

করুণা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে জানতে পারল, মদন এসে গেছে। ও ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওর এমনি সংশয় ছিল যে, মদন বুঝি কোনদিন আসবে না। ও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ভাবনা হল, গত তিন বছরে ওরা কত পালটে গেছে। হাফ-প্যান্টের ওপরে ময়লা গেঞ্জি অথবা গামছা পরা সেই গ্রাম্য কিশোরকে করুণা এখন কী রূপে দেখবে, কে জানে! মদনের একহারা রোগা শ্যামলা চেহারাটা করুণার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

নিজেই ভাবতে পারেনি করুণা, কী আশ্চর্য তার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রথম দিনে দেখতে চেষ্টাও করেনি মদনকে। মদন পলাশবনীতে ফিরে এসেছে অথচ করুণা ওকে দেখেনি। ও নিজে নিজেই বিস্মিত হল। এমন একদিনও ছিল না, যখন ওরা দুজনে গরু চরাতে যায়নি।

মদনের ট্রানজিসটারের গল্পটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। রুপোলী রংয়ের ঝকঝকে ট্রানজিসটারটার রুপোর কাঠি টেনে দিলেই ঝমঝম আওয়াজে মন মাতানো গান বাজতে থাকে। সেই সব সুখশ্রাব্য সঙ্গীত, নৃত্যের তাল, উদ্দামতা, জলপ্রপাতের ঝলরোলের মতো উচ্ছ্বসিত জীবনের গতিধারা হয়ে বইতে থাকে। পলাশবনীর লোকেরা এসব বুঝতে পারে না, শুধু লোভ-লালসা মাখান দৃষ্টিতে দেখে।

ট্রানজিসটারের আওয়াজ শুনেই করুণা বুঝল, মদন আসছে। হঠাৎ করুণার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। সে একটা গাছের আড়ালে চুপচাপ বসে রইল। দেখল, ট্রানজিসটার হাতে মদন আসছে, ওর পরনে হলদে রংয়ের একটা প্যান্ট, গায়ে গভীর নীল রংয়ের ছাপ দেওয়া জামা, মাথায় বড় বড় চুল। যেমনটি নেই পাড়ার অন্য কোন ছেলের। অন্যদের মধ্যে মদনকে রৌদ্রদগ্ধ অরণ্যে বৃষ্টিস্নাত সবুজ বনস্পতির মতো অস্বাভাবিক মনে হল। এত-দিনের পরিচিত মদনকে করুণার দারুণ অপরিচিত মনে হল।

মদন কী এখন করুণাকে চিনতে পারবে। করুণার মনে সংশয় ভর করে। কেননা করুণাই চিনতে পারত না মদনকে। কি বিপুল পরিবর্তন। আগেকার মদন আগাগোড়াই পালটে গেছে যেন কোন ভোজবাজীর প্রভাবে। মদনের সঙ্গে করুণার বিয়ে হবে, ওদের উভয়েরই অভিভাবকদের এমনি ইচ্ছে অনেকদিন থেকে। এখন এই নতুন মদনকে দেখে করুণা নিজেই ভেবে স্থির করতে পারল

না যে, তার খুশী হওয়া উচিত কিংবা দুঃখ পাবে। একথা ঠিক, করুণা প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। তবু এই লোকটাকে নিজের বলে ভেবে নিতে কষ্ট হয়। অথচ আগেকার মদন ও ওর নিজের ছিল। ও মনে মনে মদনকে স্বামী হিসেবে, প্রেমিক হিসেবে, নিজের মনের মানুষ হিসেবে ভেবে এসেছে এতদিনে। তবু আজ মদনকে নিজের বলে ভাবতে কেমন, গর্ব বোধহয় করুণার। এই কারণে, মদনকে যেন মাথায় তুলে রেখেছে পলাশবনীর মানুষ। করুণার স্বামী একমাত্র মানুষ যে কলকাতায় থাকে। মদনের সঙ্গে তুলনা করলে গ্রামের অন্য ছেলেদের দারুণ নিষ্প্রভ মনে হয়।

মদনের অবারিত আনাগোনা চলল যুবকদের আড্ডা থেকে বৃদ্ধদের মজলিস পর্যন্ত। মদন তার চাকরির কথা, কলকাতার নানান অভিজ্ঞতা মুখরোচক করে শ্রোতাদের পরিবেশন করতে লাগল। সে সব কাহিনীর কিছু কিছু করুণারও কানে এল। এক অবুঝ অভিমান তাকে আচ্ছন্ন করল। সে মনে ভাবল, এতদিন মদনের এইসব বন্ধুরা কোথায় ছিল। তখন কী সে করুণা ছাড়া আর কাউকে জানত। মদন এখন এসে কী করুণার সাথে আগেকার মতো কথা বলতে পারে না—'এই করুণা কি রকম আছিস।' করুণা জবাব দিতে পারবে না, সে হয়তো কেঁদেই ফেলবে। মদন কী জানে না করুণা কেমন আছে? ওর মদনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে – গত তিন বছরে একদিনও কী তার করুণার কথা মনে হয়নি? কিন্তু করুণা আকস্মিক আবিষ্কার করল যে, এই সামান্য কালের ব্যবধানে, এক অদৃশ্য পরিবর্তনের আবর্তে পড়ে ওরা দুজন দুজনের সঙ্গে আর আগেকার মতো মেলামেশা করতে পারে না। করুণা যত এই সব ভাবে ততই হতাশ হয়, বিষণ্ণ হয়, তার নিজেকে খুব একাকিনী, দুঃখিনী মনে হয়। নিদারুণ নির্জনতা ওকে আচ্ছন্ন করে। ও ভেবে স্থির করতে পারে না, কী করবে।

ওদের দুজনের নিভৃত সাক্ষাতের সুযোগ জুটে যায় এক রকম অভাবিত ভাবে। আজ বিকেলে মদন ওদের বাড়ি আসবে। করুণার বুকের নিভৃত কোণে আনন্দের ক্ষীণ ধারা তিরতিরিয়ে বয়ে যায়। ও গুণ গুণ গান করে—'জ্বালাইয়া গেলা মনের আগুন, নিবাইয়া গেলা না।' খোপের মধ্যে পায়রা বক বকম করে। করুণা পায়রা তাড়ায় মেহদী রাঙান হাতের তালুতে তালু বাজিয়ে—ই যা ই যা। দু হাতের কাঁচের চুড়ি ঝন ঝন করে।

আজ তিন বছর বাদে মদন আবার এ বাড়ি আসবে। করুণা চারদিক

তাকিয়ে দেখে, সেই পুরাতন বাড়িই আছে। তেমনি নিকানো দেওয়াল, বিচালীর ছাউনি দেওয়া ঘর, নোনা আতা গাছ, ইঁদারা. গোলাঘর—খাঁ খাঁ শূন্য গোলা। অবিকল আগেকার মতো।

করুণার মা করুণাকে বলে—'করুণা টুই সাজগোজ করনালো।' করুণা মায়ের কথার গূঢ় রহস্যটা ধরতে পেরে লজ্জায় জড়সড় হয়ে যায়। যদিও ওর নিজেরও ইচ্ছে করে পরিপাটি করে সাজগোজ করতে। অথচ পোষাক প্রসাদনের আয়োজনের অপ্রতুলতায় সংকুচিত বোধ করে। তবু ডুরে শাড়িটা পরে, মেলা থেকে কেনা সস্তার স্নো পাউডার মুখে ঘসে।

মদন বগলে ট্রানজিসটার নিয়ে শিস্ দিতে দিতে আসে। করুণার মা সশব্যস্ত অভ্যর্থনা করে—'আস আস বাপ আস।'

মায়ের অভ্যর্থনার সুরটা করুণার মনোরঞ্জন করে না নিশ্চিত। মদনের পায়ের চকচকে বুটজুতো মস্‌মস্ আওয়াজ করে। মদন ঘরের মাটিতে জুতোর দাগ এঁকে এঁকে তক্তপোশের ওপরে এসে বসে। চটপট কথা বলে—'কেমন আছ গো মাসি। তুমরা সকলে কেমন আছ।' এখন মদনকে নিদারুণ চপল, চতুর এবং সপ্রতিভ মনে হয়।

মা করুণাকেই খাবার দিতে পাঠায়। কাঁসায় থালায় ঘরে তৈরী মুড়ি, ছোলা ভাজা আর আখের গুড় সাজান থাকে। করুণা মাথা নিচু করে ঘরে ঢোকে, খাবারের থালা নিঃশব্দে তক্তপোশের ওপর রাখে। এক পলক চোখ তুলে মদনের দিকে তাকায়। দেখে, মদন ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মিটি মিটি হাসছে। মদনের চাহনি করুণার ভালো লাগে না। ওর এতক্ষণের যাবতীয় পরিকল্পনা এক পলক হাওয়ায় উড়ে যায়। করুণা ত্রস্ত পায়ে পালিয়ে চলে আসে। মদন করুণার মাকে বলে—'করুণা লাজ পেয়ে চলে গেল'। তারপর সশব্দে হাসতে থাকে। গমকে গমকে হাসতে থাকে। মদন ট্রানজিসটারের রূপোর কাঠি টানে এবং গমগম গান বাজতে থাকে। মদন দৃষ্টির আড়ালে গেলেও সেই সব সঙ্গীত বাজতে থাকে। বেজে বেজে ঘুরে ঘুরে চলে যায়। মিলিয়ে যায়।

করুণা তক্তপোশের ওপর চুপচাপ ভয়ে কাটায় সারা বিকেল। ওর কিছু ভালো লাগে না, কিছু না। কি হলে ভালো লাগবে তাও বুঝতে পারে না। এক সর্বব্যাপী বিষণ্ণতা তাকে আচ্ছন্ন করে।

মদন আবার কলকাতায় ফিরে যাবে। যাক ফিরে শহরে। করুণা দীর্ঘশ্বাস

কেলে। কি করতে পারে সে। অসহায় ভাবে ছটফট করে। মদনের কথা ওর কানে বাজে—মাসি, তুমহাদের মদন একই রকম আছে।' মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা। করুণা অদৃশ্য মদনের সঙ্গে কলহ করে। তুমি পালটে গেছ। বদল হয়ে গেছ।

আজ বিকেলে মদন কলকাতা চলে যাবে। করুণার মাকেও চিন্তিত মনে হচ্ছে। মদনের সাথে করুণার প্রস্তাবিত বিয়ে সম্পর্কে কোন অগ্রগতি না দেখে সম্ভবত হতাশ। করুণার নিজেকে খুব একাকিনী মনে হয়।

করুণা কলসী নিয়ে গ্রামের বড় পুকুরে যায়। চারদিক নুমসাম। বড় ভাল লাগে। কিন্তু চমকে ওঠে। হঠাৎ ট্রানজিসটারে গান বেজে ওঠে। দেখে, অদূরে মদন বসে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। করুণা থমকে দাঁড়ায়। যেন নড়াচড়া করতে পারে না। মদন হাতছানি দিয়ে ডাকে—'করুণা ইদিকে আয়।' ওর চোখে অনুনয়ের ছায়া পড়ে। আবার মাথা নেড়ে ডাকে—'ইদিকে আয়।'

করুণা পেছনে ফিরে দেখে, দুদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। পেছন ফিরতে চায় হয়তো, পারে না। সামনের প্রলোভন হাতছানি দেয়। মদন আবার চোখের ইসারায় ডাকে—'ইদিকে আয়।' প্রেম প্রলোভন হাত ধরাধরি করে। করুণা এক পা এক পা করে এগোয়। মদন নিঃশব্দ আহ্বানে ডাকে—'আয়, আয়।'

করুণা স্বপ্নে দেখেছিল—মদনের গায়ে চাপা ফুলের গন্ধ আছে। রজনী-গন্ধার গন্ধ। প্রত্যেক যুবক পুরুষের গায়েই এমনি থাকে। করুণা মদনের বুকে মাথা রেখে কান্নার আবেগে গলে গলে নদী হয়ে যাবে।

অদৃশ্য আকর্ষণে করুণা মদনের নাগালের মধ্যে চলে যায়। সমস্ত পৃথিবী বিস্মরণে ডুবে যায়। তখনি করুণা প্রথম চুম্বনের স্বাদ স্মরণ করে। মদনের ঠোঁট জুড়ে কচি পেয়ারার গন্ধের কথা ভাবে।

কিন্তু এ কী, মদন ধীরে ধীরে অক্টোপাসের মতো করুণাকে বেষ্টন করে। করুণা আটকে পড়ে ফাঁদে। মেলা থেকে কেনা কাঁচের চুড়ি মদনের দুগালে ঝন ঝন শব্দে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। হিংস্র দাঁতালের ক্রোধ মদনের দুচোখ থেকে ঠিকরে বের হয়। করুণার নবনীত কোমল স্তনে, পুষ্পকোরকের মতো ওষ্ঠে দংশনের বেদনা টলমল করে। করুণা মরীয়া হয়ে ছোটে। মদন করুণার আঁচলের এককোণে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে থাকে, বিবসনা করুণা তার বিশ্বাস প্রেম, সারল্য সব কিছু হারিয়ে শুধু যেন প্রাণ রক্ষার তাড়নায় ছুটে বেড়ায়। ওর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়ায়।

ওরা দুজন সমস্ত বনস্থলী জুড়ে লুকোচুরি খেলে।

# দুখী

**মদন দাশ**

[ এক ]

একদিন আমি তোমার সামনে নতজানু হবো, বলবো মহুয়া তুমি অমন নিষ্ঠুর হাসি আর হেসোনা।

তুমি যখন সামনে আসো আমার সেই সুবর্ণরেখা নদীর কথা মনে পড়ে। নদী যেখানে জলপ্রপাত একদা সেখানে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। পাহাড় জোড়া সেই শান্ত বনভূমিতে আমি যখন পৌঁছালাম তখন এক নিরবচ্ছিন্ন গুঞ্জন-ধ্বনি বাতাসে। গাছগাছালির গভীর জটলার মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে পথ। সেই নির্জন বনভূমিতে সেই আশ্চর্য পথের মুখে দাঁড়িয়ে আমার বুকে দ্রিম দ্রিম শব্দ···

···তারপর আমি নামছিলাম আর নামছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে। কখনো ডাইনে বাঁক কখনো বামে এবং গাছেরা আরও নিবিড়। আমি যতই নাম-ছিলাম গুঞ্জনধ্বনি তীব্রতর হচ্ছিল, এবং একসময় তা গভীর গর্জন। পাহাড়ের দেওয়ালে দেওয়ালে সেই গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও উত্তাল হয়ে উঠছিল। প্রতি মুহূর্তে আমার বুকের দাপাদাপি বাড়ছিল, আমার মনে হচ্ছিল এখনই আমি এক অভ্যাশ্চর্য দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়াবো। এভাবে চলতে চলতে এক সময় তার মুখোমুখি।···আমি আত্মবিস্মৃত দাঁড়িয়েছিলাম, সূক্ষ্ম জলকণা আমার মুখে চোখে পোষাকেআশাকে ঝরে পড়ছিল, আমি নিজেকে পরিপূর্ণ তার কাছে সঁপে দিয়েছিলাম্··· ।

মহুয়া তুমি জানো না তুমি সামনে এলে আমার চারপাশে জেগে ওঠে নির্জন বনভূমি আর বুকের ভেতর সেই সব অনুভূতি। তখন আমার নিজের ওপর আর কোনো দখল থাকে না। মহুয়া, মুখোমুখি তুমি যখন উচ্ছল হাসো আমি ক্রমশঃ গভীর বিষণ্ণতায় ডুবে যাই। আমি বুঝতে পারি তুমি জেনে ফেলেছো আমার দুর্বলতা। তখন আমি খুব দুখী হয়ে যাই। মনে মনে বলি, মহুয়া, তুমি বুঝতে পারো না আমি তোমাকে কত গভীর ভালবাসি···।

তীব্র হর্ণ বাজিয়ে ব্রেক কষল একটা সবুজ রঙের বাস। হেডলাইটের ঝলকে

তার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। মুখ ফিরিয়ে সে দৃষ্টি ঠিক করতে চাইল। ব্যাগ কাঁধে কনডাক্টর ভাঁজ করা একটা কাগজ হাতে বাস থেকে নামল, তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল গুমটির দিকে। সে খুঁটিয়ে দেখতে চাইল কনডাকটরের মুখ, এদিকে ঝুঁকে পড়ে বাসের নম্বর দেখল—হ্যাঁ এইতো নম্বর মিলছে। তার হাতে বাসের একটা টিকিট ছিল, টিকিটে ছাপা বাসের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল—হ্যাঁ এই বাস। সে পিছন ফিরল, কন্‌ডাকটর সময় লেখাচ্ছে।

আজ সকালে অফিস যাওয়ার সময় সে যখন বাসে টিকিট কাটাবার জন্ত পয়সা খুঁজল দেখল মানিব্যাগে খুচরো পয়সাতো নেইই, খুচরো টাকাও নেই। সাধারণতঃ যা হয়—এই ভীড়ের সময় ব্যস্ত কনডাকটরকে দশটাকার নোট দিলে ভীষণ বিরক্তি সূচক কিছু কথাবার্তা শুনতে হয় এবং সেই সব অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা ভাবতে ভাবতে সে একটা দশটাকার নোট বার করল। কন্‌ডাকটর কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে তাকে খুচরো পয়সা সমেত টিকিট দিলো এবং বলল ন'টাকা পরে দিচ্ছে। ব্যাপারটা সুস্বজনক হওয়ায় সে স্বস্তিবোধ করল ও সম্মতি জানাল।

এরপর বাস চলছিল ভীড় বাড়ছিল এবং বাসের গুঞ্জন ঝাঁকুনি ও যাত্রীদের কথাবার্তা এসব থেকে ক্রমশঃ সরে গিয়ে সে নিজের মধ্যে···ইদানিং প্রায়শই এরকম হ'য়ে যায়···অন্ত মনে ভাবনা মনের মধ্যে নিজের ইচ্ছা মতো গুছিয়ে বসে ···সে জানতেও পারে না···নানাবিধ সংলাপ চলে নিঃশব্দে অভিমান, অভিযোগ কিংবা গুনগুনি ··মহুয়ার নাকছাবির পাথর ঘুরে ঘুরে ঝিলিক দেয়···

এভাবে কখন রাস্তা ফুরিয়ে যায়। ডালহাউসি স্কোয়ারে বাস পৌঁছে যখন ভীড় সরে যায় তখন সে আবার বাসের মধ্যে ফিরে আসে, অবসাদগ্রস্তের মতো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, ক্লান্তে নেমে পড়ে। দ্রুত পা চালায় অফিসের দিকে।

ব্যাপারটা তার খেয়াল হ'লো টিফিনের সময়। মানিব্যাগ খুলে সে দেখল খুচরো কটা পয়সা এবং একটা টিকিট। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল নীতিশদা, বলল, কি হ'লো রমেন? সে মুখচুণ করে বলল ভীষণ ভুল হ'য়ে গেছে, কনডাকটরকে দশটাকার নোট দিয়েছিলাম, খুচরো পয়সা দিয়েছিল টাকাটা বলেছিল পরে দেবে—আর দেয়নি।

—আর দেয়নি? টাকাটাতো তোমার? তুমিতো চেয়ে নেবে? কথাটা ঠিক করে বলো,—তুমি নাওনি, তা না বলে বলছ কনডাকটর দেয়নি। নীতিশদা গজ্‌গজ্‌ করে, তারপর ক্যান্টিনের কাউন্টারে পয়সা দিয়ে দেয়।

ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসে নীতিশদার হৈ হৈ। সব ব্যাপারেই উনি যেরকম চেঁচামেচি করেন সেভাবে গলা তুলে সকলকে ডেকে—শুনেছ অমুক শুনেছ তমুক আজকে রমেন্দ্রনারায়ণ কি করিয়াছেন···সে লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে যাচ্ছিল, ন'টাকার চাইতে তখন তার এই পরিস্থিতি চাপা দেওয়ার জন্য যদি নীতিশদাকে ন'শো টাকা দিতে হয় সে ভাবছিল দিতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশঃই আরও জটিল হচ্ছিল এবং সে খুব অসহায়বোধ করছিল, নিজেকে মনে হচ্ছিল খুব দুখী।

···আঃ! বুকের ভেতরে আমার এক অলস পাখী বাসা বেঁধেছে। যতবার পাখীটাকে তাড়া দিয়ে খোঁচা দিয়ে বাসা থেকে হিঁচড়ে বার করে দিই আবার কখন চুপিচুপি সে ঠিক ঢুকে পড়ে, গুটিগুটি হ'য়ে বসে এবং পুনরায় উত্তাপ সঞ্চালন··তখন সব কিছু ভুল হ'য়ে যায়···এভাবেই চলছে···আমি কিছুতেই পেরে উঠিনা, শুধুই হেরে যাই···।

হেরে যাওয়ার দুঃখ তাকে আরও দুখী করছিল। তার চারপাশে সকলে যখন মুখর সে ক্রমশঃ কোন এক গহ্বরে ঢুকে পড়ছিল।

একসময়ে নীতিশদা বললেন—তোমাদের ওখান থেকে তো প্রাইভেট বাস ছাড়ে?

সে হ্যাঁ বললে নীতিশদা বললেন, কই টিকিট দেখি?

—টিকিটটা?—সে মানিব্যাগ বার করল, খুলে খুঁজল টুঁজল কিন্তু টিকিটটা নেই!—ওটাতো ফেলে দিলাম মনে হচ্ছে, সে মৃদু গলায় বলল।

—ফেলে দিলে? কোথায়?

—বোধ হয় ক্যান্টিনে।

নীতিশদা চুক করে একটা বিচিত্র শব্দ করলেন, বললেন যাও খুঁজে নিয়ে এসো।

অতঃপর সে ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরুল। কিছুই ভালো লাগছিল না তথাপি লিফটের কাছে এলো, সুইচ টিপল। ঊর্দ্ধমুখী লাল তীরের আলো জ্বলল আঙুলের পাশে, সে অন্যমনস্কভাবে তীরের আলোর আঙুল বোলাল।

ক্যান্টিনে ঢুকে দেখল মেঝে ঝাঁট দেওয়া হচ্ছে। যেন সাতরাজার ধন মাণিক হারিয়েছে এভাবে সে ছুটে গেল কাউন্টারের কাছে এবং দেখল হ্যাঁ মেঝেতে একটা বাসের টিকিট পড়ে আছে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে সে আর লিফটের জন্য দাঁড়াতে পারলনা, দ্রুত

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একেবারে ডিপার্টমেন্টে এসে যেন বিস্ময় করে এলো এভাবে টিকিটটা এগিয়ে দিলো নীতিশদার দিকে।

— এইতো টিকিটে বাসের নম্বর রয়েছে—নীতিশদা যেন 'আর্কিমিডিস,'—'ইউরেকা ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, টিকিটটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা রেখে যাও, বাড়ী ফেরার সময় সোজা তোমাদের বাস টার্মিনাসে চলে যাবে, দেখবে এই নম্বরের বাস আছে কিনা, যদি না থাকে গুমটির 'টাইম-কিপার'কে জিজ্ঞাসা করবে যে এই নম্বরের বাস কখন ফিরবে, ওরা তোমায় মোটামুটি সময় বলে দিতে পারবে, বাসটা ফিরলে কনডাকটরকে ধরবে, মনে হয় টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবে।

কনডাকটর ফিরে দাঁড়িয়েছে, সে কিছু বলতে চাইল কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ আর অস্বস্তি তাকে পেয়ে বসল—নাঃ। ফিরে যাই, যাকগে কটা টাকা, এখন যদি কনডাকটর অস্বীকার করে?—এরকম ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে ঘড়ি দেখল সে—আটটা দশ—গুমটির লোকটি বলেছিল ঐ বাস আটটা পাঁচে ফেরার কথা, কিন্তু সে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ এখন—আমার দ্বারা কিস্যু হবেনা—আমি একটা—সে হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল। কনডাকটর তাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ গুমটির জানালা থেকে টাইমকিপার মুখবাড়াল—ও মশাই। এইযে শুনছেন? আপনিতো তখন আঠাশ'শ পঞ্চাশের খোঁজ করছিলেন না? আপনারইতো টাকা ফেরত নেননি?

কনডাকটর দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে একবার কনডাকটরের দিকে তাকাল—একবার 'টাইমকিপারের' দিকে, তারপর ঢোক গিলে বলল, —হ্যাঁ কনডাকটর আপনাকে আমি দশটাকার নোট দিয়েছিলাম—তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, যেন কনডাকটর তাকে ধমক দেবে।

—হ্যাঁ, আপনি কখন নেমে গেছেন, আমি আপনাকে খুঁজলাম,—বলতে বলতে কনডাক্টর ব্যাগ থেকে টাকা বার করছিল।

এখন সে খুব প্রভুল্ল। সিগারেটের দোকানে গিয়ে দাঁড়াল, দুটো টাকা এগিয়ে দিয়ে বলল এক প্যাকেট কিন্টর উইলস্। সে খুব কম সিগারেট খায়, সে জন্য প্যাকেট কেনার দরকার হয় না, কিন্তু এখন সে বেজাজে প্যাকেট কিনল, সিগারেট ধরালো।

ধীরে সুস্থে এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ঘাড় তুলে দেখল

করেকটি ছেলে কেস্টুন টাঙাচ্ছে। সে একটু চমকে উঠল···পুজো এসে গেল··· একটা বছর চলে গেল—ভাবতে ভাবতে রাস্তা পেরুল সে একবছর আগের আমি আর আজকের আমি? মহুয়া শুনছ? আমি তোমাকে ভালবাসি। মহুয়া—আমি—তোমাকে—ভালবাসি—এভাবে মনে মনে ধীরে ধীরে বলল সে—কিন্তু তোমাকে ভালবাসতে গিয়ে আমি ক্রমশঃ আরও দুখী হ'য়ে যাই···

মুখ নীচু করে সে খুব ধীর পায়ে হাঁটছিল, তথাপি ভাঙা একটা গর্তে বৃষ্টির জল জমে আছে—তাতে পা পড়তে পড়তে সামলে নিলো। পাজামা সামান্য গুটিয়ে জল ডিঙিয়ে গেল তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক দেখল।

···বাঁদিকের এই রাস্তা ধরে মহুয়াদের বাড়ী চলে যাওয়া যায়। কতক্ষণ লাগবে? দুমিনিট! কিন্তু? একবছরেও আমি এটুকু রাস্তা অতিক্রম করতে পারিনি। আচ্ছা এখন যদি এরকম হয় মহুয়া কোথাও গিয়েছিল এখন ফিরছে—সে পিছু ফিরে তাকাল, যেন সত্যি মহুয়া ফিরছে! হতাশভাবে ঘাড়ের চুলে আঙুল ডুবিয়ে ঈষৎ ঝাঁকুনি দিলো তারপর বাঁদিকের রাস্তা বাঁদিকে রেখে সোজা হাঁটতে থাকল।

···মহুয়া কতদিন তোমাকে দেখিনি। মহুয়া, জানো, আমার এরকম মনে হয় সারাক্ষণ আমি এক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহন করছি বুকের মধ্যে। সারাক্ষণ অতি সাবধান। যে কোন মুহূর্তের অসাবধানতায় রক্তক্ষরণ হ'য়ে যায়। কি যন্ত্রণা। মহুয়া তুমি অমন কেন? একদিন আমি তোমার সামনে নতজানু হবো, বলবো, মহুয়া তুমি অমন নিষ্ঠুর হেসোনা।

[ দুই ]

ঘটনাটা ঘটেছিল এরকম :

বিজয়া দশমীর পরদিন সে সকালের দিকে মাসীমার বাড়ী যাচ্ছিল। পুজো প্যাণ্ডেলের সামনে পল্টু বিকাশ আর মধু তিনজন জটলা করছিল, এমন সময় পল্টু হাঁক দেয় এই রমেন কোথায় চললি?

—মাসীমার বাড়ী।

—বাহবা! বাঃ। ভুলবাবু সেজে মাসীমার বাড়ী। কি মজা মাইরি! যতক্ষণ প্যাণ্ডেলে ঠাকুর ততক্ষণ সবাই মাজা দিয়ে খিলিক দেয়। কিন্তু শালা খাটবার বেলায় না আগে না পরে কোনো দাদার পাত্তা থাকে না।

—একথা বলছিস কেন?—সে প্রতিবাদ করে যদিও গলায় বিশেষ জোর পেটেনা—আমি খাটিনি?

—খাটিনি!—পল্টু ভ্যাঙচায়—কবে ঘি দিয়ে পান্তা খেয়েছিস তো ব্যস হাতে গন্ধ লেগে আছে। দায় শালা যতো যেন আমার। যেন আমার বাপের বিয়ে!

—খামোকা আজে বাজে বকছিস কেন? এখন আবার কি কাজ?

—ও যে শালা, আবার চোখ রাঙাচ্ছে! বলে এখন কি কাজ! তোর অফিসে তোকে যে কেন মাইরি জেনারেল ম্যানেজার করে দেয় না—বলতে বলতে পল্টু খাবা তোলে, পিঠে আদর লাগাবে। সে তৎক্ষণাৎ কায়দা করে পিঠ বাঁচায়।

—ঠিক আছে, মাসীমাকে ঝড়াক্সে প্রণাম করে আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এসো, হিসেব নিয়ে বসতে হবে। হিসেব পত্তর করে আমি এখনই দেখব খরচ খরচা বাদ দিয়ে কতটাকা বাঁচছে। বিজয়াসম্মিলনীর জলসা হবে টাকার ওজনটা দেখতে হবেতো? ফাংশান আমার ভালো চাই। দুর্গাপূজা তো এখানে এক তজন হয়, আমার মতো ফাংশান কজন করে? এটাই আমার স্পেশাল ব্যাপার। আর হ্যাঁ—এবারে 'এ্যানাউন্স' করবি তুই, বুঝেছিস? তোর ধুতিতে কোঁচা আর পাঞ্জাবীতে গিলে দিয়ে রাখিস।

—আমি মানে 'ফাংশনে' এ্যানাউন্স? সে তো তো করে।

—আলবৎ। তুমি শালা কণ্ঠে লিখতে পারো মাসে মাসে ক্লাবে সাহিত্য সভা করতে পারো, আর ফাংসানে 'এ্যানাউন্স' করতে পারবেনা? ইয়াকি পেয়েছো?

সে রাগ করে চলে যায়। পল্টু চেঁচায়,—রাগ করো আর যাই করো ফাংশানে মাইকে না দাঁড়ালে তোমার হিরো হিরো চেহারা আমি একেবারে বাংলার পাঁচ করে দেবো·।

তারপর:

বিজয়া সম্মিলনী। বিশাল প্যাণ্ডেলের কারুকার্য করা সামিয়ানার মাঝখানে আলোয় ঝলমল ঝাড়লণ্ঠন, নীচে থৈ থৈ মানুষ আর মানুষ। কোথাও একটা চেয়ারও খালি নেই। চেয়ারের এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দৃষ্টি ছড়ায় সে—দাঁড়ানো মানুষের দুর্ভেদ্য দেওয়াল।

সে দাঁড়িয়েছিল মঞ্চের ওপর। সামনে মাইক। এই বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে তার বুক কাঁপছিল। পাঞ্জাবীর পকেটে গোঁজা ধুতির কোঁচা মুঠোয়

মধ্যে নিয়ে সে আলতো মুখ মোছে।—কাঁপা হাতে কাগজ খোলে, অনেক চিন্তা করে লেখা—

'নমস্কার। তিনের পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পক্ষ থেকে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। অন্যান্য বৎসরের মতো এবারেও যে আমরা আপনাদের আনন্দদানের জন্য এই বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছি এজন্য আমরা নিজেরা গর্বিত। স্বনামধন্য শিল্পীদের অনেকেই এসে গেছেন এবং অন্যান্যরাও এসে যাবেন। তবে আমাদের প্রত্যেক বছরের অনুষ্ঠানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আমরা আমাদের এই এলাকার কয়েকজন শিল্পী-যাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে আমরা মনে করি, তাদের আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত করে থাকি। এবারেও আমাদের সেই ঐতিহ্য রক্ষা করবো। আশা করি আপনারা এই নতুন শিল্পীদের উৎসাহ দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।'

মাইক থেকে সরে সে মঞ্চের পেছন প্রান্তে চলে যায়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আবার ধুতির কোঁচায় মুখ মোছে। তারপর—

—এই পল্টু, কি রকম বললুম বলতো! ঈষৎ গর্বের ভঙ্গীতে বলে সে।

—থাম্! কি রকম বললুম বলতো। পল্টু ভ্যাংচায়। হাঁটুতে হাঁটুতে ঠক্‌ঠক্ করছে – যেন 'গ্রামার' বই রিডিং পড়ল—আহারে।

সে একটু মুষড়ে পড়ে।—এই তোর দোষ—মিউ মিউ করে বলে সে, কিছুতেই তোর মন পাওয়া যায় না। যাঃ! আমি এ্যানাউন্স করবো না।

—সে ষ্টেজ থেকে নামতে যায় –এ্যাই মাইরি। কি ভ্যানতাড়া করছিস্! —পল্টু ওর হাত ধরে। জানিস এটা আমার একটা চ্যালেঞ্জ? আখনা শালা দেবেশ সেনের খোঁতা মুখ কেমন ভোঁতা করে দিয়েছি। ব্যাটা রেডিওতে চাকরি করে বলে পায়া ভারী হ'য়ে গেছে। পাড়ার লোক, প্রতি বছর এটুকু করে যাতে অনুষ্ঠানটা ঠিকঠাক হয়—তা ব্যাটা এবছর আমাকে বলে কিনা টাকা দিতে হবে।

—ও টাকা চেয়েছিল নাকি? কই বলিসনিতো? সে অবাক হয়ে রাগ ভুলে যায়।

—বলিনি। বললেই তো তোরা সকলে মিলে বলতিস যাগকে এতো টাকা যখন খরচ হচ্ছে ওকে কিছু দিয়ে দে! আমি শালা পল্টু আছি, কারো রোয়াবী সহ্য করিনা, হ্যাঁ! যাগকে, যারা যারা এসে গেছে আমি নামগুলো বলে দিচ্ছি

চটপট লিখেনে—

মঞ্চের বাইরে চারিদিকের সমস্ত আলো নিভে গেছে। সহসা মানুষের গুঞ্জন থেমে যায়। রজনীগন্ধার গন্ধে ভারী বাতাসে নিশ্বাস নেয় সে।

—আজকের প্রথম শিল্পী মহুয়া রায় প্রথম শিল্পীর নাম ঘোষণা করে সে এবং মঞ্চের সিঁড়ির দিকে তাকায়— ঠিক তখন তার বুকের মধ্যে কেমন এক দুঃখ।

আলোকোজ্জ্বল মঞ্চের ওপর দিয়ে হেঁটে আসে একটি মেয়ে। প্রথম বর্ষার মেঘের মতো চুল তার। কাঁধের ওপর বেড় দিয়ে নেওয়া নীল শাড়ীর আঁচল। চিকন গালের পাশে দোলে লাল টুকটুকে পাথরের দুল। সবুজ কার্পেটের মাঝে এসে দাঁড়ায়, বসতে যায়, মুহূর্তে চোখ তুলে দেখে— চোখে চোখ। সহসা স্ফুরিত নাকের পাতায় ঝিকমিকিয়ে ওঠে হীরের মতো নাকছাবি, চোখ নামায়, হারমোনিয়মের সামনে বসে।

দেখতে দেখতে তার বুকের মধ্যে দুঃখ উত্তাল। এমন দুঃখ সে আর কখনও অনুভব করেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ভারী হয়ে ভেতরে চাপ দেয়, কার্পেটের প্রান্তে বসে পড়ে।···অনেক অনেক দূরে আছে মেঘমদির মহুয়ার দেশ···সারাদিন সমস্তক্ষণ সেখানে ছায়া ফেলে দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য···আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস রাতের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে···আমার ক্লান্তির পরে ঝরুক মহুয়া ফুল·· নামুক মহুয়ার গন্ধ···

তার মনে হয় নির্জন বনভূমিতে পাহাড়ের নিম্নগামী পথে সে একা। চারপাশে ঘন অরণ্য এবং সমস্ত চরাচরে দূরবর্তী ঝরণার কলস্বর···

গান শেষ হ'লে উঠতে যায় মেয়ে, চোখ তোলে, আবারও স্ফুরিত নাকের পাতায় ঝিকিয়ে ওঠে নাকছাবির পাথর, দ্রুত পায়ে চলে যায়।

এতক্ষণ সে যেন ছিল ঘোরের মধ্যে, সহসা প্রকৃতিস্থ হয়, দাঁড়ায়, হাতের কাগজ তুলে পরবর্তী শিল্পীর নাম ঘোষণা করে—কোনক্রমে কথাগুলি শেষ করে ষ্টেজ থেকে দ্রুত নেমে আসে। এদিকেও গাদাগাদি মানুষ, মাঝ দিয়ে বাঁশ বাঁধা সরু পথ দিয়ে মহুয়া চলে যাচ্ছে; সে দ্রুত এগিয়ে আসে, কাছাকাছি এসে বলে— শুনুন আপনি যেন চলে যাবেন না, সামান্য 'রিফ্রেশমেন্ট' এর ব্যবস্থা করেছি আমরা— মহুয়া দাঁড়ায় মুখ তুলে তাকায়।

সে এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা তুলে ডাকে—এই বিকাশ—যদিও বিকাশকে

সে দেখতে পায়নি তথাপি—

—আপনি ব্যস্ত হবেন না, মহুয়া বলে। সে মহুয়ার মুখের দিকে তাকায় আর টুপ করে শান্ত হ'য়ে যায়, হাসি হাসি মুখে বলে, আপনার গান খুব ভালো হয়েছে।

—সত্যি! মহুয়া অনেক হাসে। মহুয়ার চোখ দুটিতেও হাসি উপছে পড়ে, নাকছাবির পাথরও ঝিক্ করে হেসে ওঠে।

মহুয়ার এতো হাসিতে সে কেমন সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়, আস্তে চোখ সরিয়ে নেয়।

মহুয়ার মুখে কিন্তু হাসি লেগেই থাকে, বলে, কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন? আমার দাদা আনন্দ—আপনার বন্ধু।

—তাই নাকি? সে উচ্ছ্বসিত হয়। আনন্দর সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই। সেই যে ও চাকরি পেয়ে বম্বে চলে গেল—কিন্তু আপনাকে আমি কখনো দেখিনি, সে বলে। মহুয়া আবার অনেক হাসে,—'এখনও আমাকে আপনি বলছেন।'

—'তুই কি রে? এখানে আড্ডা মারছিস?'—হঠাৎ পল্টু কোথা থেকে উড়ে আসে—'কারো ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না।'

মনে মনে তার খুব রাগ হয়—পল্টুটা যেন কি! মহুয়া তখন খিলখিল হাসে সে রাগ রাগ চোখে মহুয়ার দিকে তাকালে মহুয়া আরও উচ্ছল হ'য়ে ওঠে, বলে, একদিন আমাদের বাড়ী আসবেন—শুনতে শুনতে সে ফিরে যেতে যেতে একবার মুখ ফেরাতে চায় কিন্তু পারে না। তার কষ্ট হয়—আঃ, আমি একেবারে ভীষণ ছাংলার মতো—মহুয়া হেসে হেসে কিভাবে আমাকে—খুব দুঃখ হয় তার।

এভাবে তার জীবনে দুঃখ আসে। দিনের মনে দিন চলে যায়। প্রাত্যহিক জীবনে কোন পরিবর্তন নেই, অথচ বুকের ভেতর নির্জন বনভূমিতে পাহাড়ের ধাপ বেয়ে বেয়ে সে ক্রমশঃ নেমে যায় উত্তাল ঝরণার কাছে, সূক্ষ্ম জলকণা রাশি রাশি—ভিজিয়ে দেয় সমস্ত শরীর · চরাচরে গভীর কলস্বর···।

এভাবে ক্রমশঃ তার দুঃখ বাড়ে, এভাবে ক্রমশঃ বুকের ভেতর ঝরে যায় মাটি ও পাথর···ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ নিষ্ঠুর একটা অনুভূতি তাকে দিনে দিনে জড়িয়ে ধরে।

এভাবেই সময় যায়। তারপর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার:

শীতের সন্ধ্যা বড়ো দ্রুত নেমে আসে। অফিস থেকে ফিরতে ফিরতেই

অন্ধকার। কালো কম্বল গায়ে জড়িয়ে চুপ করে যেন শুয়ে পড়ে রাত্রি। চারিদিকে ধোঁয়ার জটলা, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। এরকম সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার সময় নিজেকে খুব বিষণ্ণ মনে হয় তার। এভাবেই সেদিন সে বাস থেকে নেমেছে, বুকের ওপর পরস্পর ভাঁজ করে রাখে দুই হাত, ধীর পায়ে হাঁটে। হঠাৎ তাকে দ্রুতপায়ে অতিক্রম করে সামনে আসে মহুয়া, সে চমকে তাকায়, এলোমেলো হ'য়ে যায়, কিছু বলতে ভুলে যায়।

মহুয়া অজস্র হাসে, গায়ে জড়ানো লাল রঙের শাল খসে পড়তে চায়, নাকের নাকছাবি হীরের মতো ঝিকমিকিয়ে ওঠে।—অফিস থেকে ফিরছেন? মহুয়া জিজ্ঞাসা করে। সে ঘাড় নাড়ে, স্বাভাবিক হ'তে চায়, ফুলহাতা সোয়েটারের হাত দুটো খানিকটা গুটিয়ে দেয়, বলে, 'আপনি'?

মহুয়া খিলখিলিয়ে হাসে, এবং সে ভীষণ দমে যায়।

মহুয়া হাসির দমক থামিয়ে বলে, 'আবার আপনি?' সে কিছুটা যেন মরীয়া হ'য়ে যায়, বলে, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

ঈষৎ ঘাড় কাৎ করে করেক মুহূর্ত শান্ত তাকায় মেয়ে, ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি বলে, 'উঁ'—মানে, যেন এইতো ঠিক হয়েছে দেখছি। তারপর গায়ের শাল গুছিয়ে নিতে নিতে বলে, আমি বালিগঞ্জ গিয়েছিলাম—গানের স্কুলে।

—তুমি কোথায় গান শেখো?—অভিভাবক সুলভ ভারী গলায় সে প্রশ্ন করতে চায়।

—শিখি নয়, শিখতাম—দক্ষিণীতে, আপনি, জানেন?

—জানি না। রেডিওতে প্রোগ্রাম শুনেছি কতবার! কিন্তু শিখতাম বলছ কেন? ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

—বারে, তা কেন? কোর্স শেষ হ'য়ে গেল, পাশ করে গেলাম, এইতো সামনের রবিবার আমাদের সমাবর্তন উৎসব, রবীন্দ্রসদনে, আপনি যাবেন? আমাদের সার্টিফিকেট দেবেন শান্তিদেব ঘোষ, গানটানও হবে। জানেন আমি ফার্স্ট হয়েছি।—মহুয়া বালিকার মতো ঘাড় কাত ক'রে বলে, চোখ বড়ো বড়ো করে, সে মুগ্ধ হ'য়ে অপলক তাকায়।

মহুয়া হাতের ব্যাগ খোলে, ঘাড় নীচু করে খোঁজাখুঁজি ক'রে কার্ড বার করে, ওর দিকে এগিয়ে ধরে, বলে ঠিক যাবেন তো? সে হাত বাড়িয়ে কার্ড নিতে চায়, কিন্তু ঈশ্বর অথবা শয়তান তাকে অপদস্থ করে—কার্ডটা হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। মহুয়া খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, আবার লাল টুকটুকে শাল

এলোমেলো হ'য়ে যায়, আবার নাকছাবি হীরের মতো ঝিকমিকিয়ে ওঠে। সে অভ্যস্ত পরাজিত সৈনিক যেভাবে নীচু হ'য়ে অস্ত্র কুড়িয়ে নেয় সেভাবে কার্ডটা তোলে তারপর যাবার জন্য পা বাড়ায়। মহুয়ার মুখে তখন হাসি লেগেই থাকে, পিছন থেকে বলে, 'একদিন আমাদের বাড়ী আসবেন।'

তার ডানদিকে সীট উপচে পড়া একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক এবং বাঁদিকে একটি পুঁচ্‌কে ছোট্ট মেয়ে যে বারবার ঘাড় উঁচু করে মঞ্চের দিকে দেখতে চাইছিল। সে বাঁদিকে হেলে বসল, তখন মঞ্চের পর্দা সরে যাচ্ছে, হলের আবছা আলোগুলিও নিভে গেল।

রবীন্দ্রসদনের 'লবী'তে সে অনেকক্ষণ এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করেছে, কখনো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে। অজস্র মানুষ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল, হলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল। কেউ কেউ এলোমেলো দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। এইসব মানুষজনের মাঝে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা—সুতরাং সে হলের ভেতর আসে এবং আবছা আলোয় তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকায়, ইচ্ছা হয় গোটা প্রেক্ষাগৃহ একবার ঘুরে নিতে কিন্তু পারে না, অতঃপর নিজের আসন খুঁজে নিয়ে বসে।

মাল্যদান ভাষণাদি চলাকালীন সে পিছনে হেলান দিয়ে চুপচাপ, কখনো বা চোখ বুজে থাকে এবং একসময় মাইকে মহুয়ার নাম—সে চমকে ওঠে, সোজা হ'য়ে বসে, দূর থেকে দেখে মহুয়া মঞ্চের পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়, 'সার্টিফিকেট' নেয়, প্রণাম করে—অপর প্রান্ত দিয়ে নেমে যায়। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র—আবার অন্ধকারে হারিয়ে যায় মহুয়া।

একে একে নাম ডাকা চলছিল, একজন করে মঞ্চে উঠে যাচ্ছিল, এবং এই ভাবে একঘেয়ে দৃশ্য—তার কিছুই ভাল লাগছিল না। অন্ধকার তার বুকের ওপর ক্রমশঃ ভারী। ঘুরে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চ—তার ইচ্ছা হচ্ছিল ওখানে চলে যায়, মহুয়াকে খুঁজে নেয়, পাশাপাশি বসে. তাহলে মধুময় হ'য়ে উঠবে সময়…।

এইভাবে একসময় এইসব ব্যাপার শেষ হ'লে মাইকে ঘোষিত হয় পাঁচ মিনিট বিরতি এবং তারপর সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হবে। চারিদিকে আবছা আলো জ্বলে ওঠে, অনেকে উঠে বাইরে যায়। সে কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে, একেবারে সামনের সারির দিকে চোখ, সেখানে দাঁড়িয়ে মহুয়া একজন মহিলার সাথে কথা বলছে। এত দূর থেকেও সে বুঝতে পারে মহুয়া একটুও হাসছে না বা দুলছে

না, খুবই স্বাভাবিক শান্ত হ'য়ে কথা বলছে। তারপর মহুয়া ধীর পায়ে এগিয়ে আসে. 'প্যাসেজের' ওপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়, আবার একটু এগিয়ে দাঁড়ায় আবার এদিক ওদিক দেখে, এভাবে তাকে অতিক্রম করে যায়।

মহুয়া কি আমাকে খুঁজছে ?—সে ভাবে। মনে ভাবে একবার উঠে দাঁড়ায় হাত তুলে বলে - মহুয়া এইযে আমি এখানে—পরক্ষণে একটা ভয় তাকে দমিয়ে দেয়—তাহলেই তো মহুয়া তীক্ষ্ণ হেসে উঠবে, আর এইযে চারিদিকে অজস্র মানুষ তাকিয়ে দেখবে, তখন ? আর ওঠা হয় না, দু হাতে মুখ গুঁজে বসে থাকে, ভাবে, -- না মহুয়া আমাকে খুঁজছে না, আমাকে খুঁজবে কেন ? নিশ্চয় ওর মা বাবা বন্ধু বান্ধব অনেকে এসেছে—তাদের কাউকে খুঁজছে··· ।

আলো নিভে যায়। মঞ্চের পর্দা সরে যাচ্ছে। সে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, বেরিয়ে আসে, তখন সমবেত গান আরম্ভ হচ্ছে, গম্ভীর ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে, সুরধ্বনি তাকে একবার বুঝি পিছনে টানে, কিন্তু সে জোর পায়ে হেঁটে হল থেকে বেরিয়ে আসে।

নির্জন ক্যাথিড্রাল রোড দিয়ে হাঁটে সে। হু হু করে শীতের বাতাস। গায়ের শাল ভালো করে জড়িয়ে নেয়, তথাপি শীত যেন তার বুকের গভীরে ঢুকে কাঁপায়। কোথাও জনপ্রাণী নেই, শুধু দুপাশে গাছেরা আর আলৌকিক-স্তম্ভেরা। নিজেকে তার খুব অসহায় মনে হয়, মনে হয় নির্জন কোনো দ্বিতীয় পৃথিবীতে নির্বাসিত ··।

[ তিন ]

মা বললেন—কি রে টাকা ফেরৎ পেলি ?

সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

—তবে মুখ অমন গোমড়া কেন ?

সে অত্যধিক উচ্ছ্বসিত হ'তে চায়—কি যে বলনা। গোমড়া আবার কোথায় দেখছো ? জানো মা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম বুঝি কন্‌ডাক্টরের সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে, কিন্তু কোথায় কি। বলতে না বলতে টাকাটা দিয়ে দিলো, আবার বলে কিনা আপনি কখন নেবে গেছেন, আমি কতো খুঁজলাম···এভাবে অনেক কথা বলতে চায় সে এবং বলতে বলতে ঘরে চলে যায়।

···সকলেই আমাকে ইদানিং এই কথা বলে। আমি কি দিনে দিনে খুবই

বিষণ্ণ হ'য়ে যাচ্ছি ? তাহলে ? আমার মুখে চোখে চেহারায় তাহলে কি দৈন্য ফুটে উঠছে ?

ঘরে আলো জ্বালায় না, কিছুক্ষণ চুপচাপ মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকারে, তারপর চুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে, বালিশে মুখ গুঁজে নিথর পড়ে থাকে।

…সারাক্ষণ আমি এক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহন করছি বুকের মধ্যে—সারাক্ষণ যন্ত্রণা, কষ্ট, তবু— তবু মনে হয় কতকাল দেখা হয়নি—যদিও দেখা মানেই যন্ত্রণা —তথাপি বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে হাহাকার · আঃ, এভাবে অন্ধকারে নিঃশব্দে নিঃশেষ হ'য়ে যেতে ইচ্ছে করে মহুয়া একদিন আমি তোমার সামনে নতজানু হবো·· না, মহুয়া আমি এখান থেকে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবো···

ঠিক এই কথা যখন তার মনে আসে তখন সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে, সুইচ টিপে আলো জ্বালায়···ঠিক কথা, আমি অফিসে বদলির জন্য চেষ্টা করতে পারি, যদিও বদলির সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই তবু চেষ্টা করে আমি অন্য কোন প্রদেশের ব্রাঞ্চ অফিসে চলে যেতে পারি—হ্যাঁ এভাবেই, একমাত্র এভাবেই আমি মুক্ত হ'য়ে যেতে পারি··· ।

অথচ যখন পুনরায় মুখোমুখি তখন আবার বুকের ভেতর নির্জন বনভূমি এবং জলপ্রপাতের শব্দ চরাচরে, রাশি রাশি সূক্ষ্ম জলকণা ভিজিয়ে দেয় মুখ চোখ সমস্ত শরীর···সে মহুয়ার কাছে এগিয়ে যায়।

অফিসে প্রায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সে কাজ করেছে। পূজা বোনাস সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ শেষ করে ফেলার জন্য সে কাজ করছিল। কাজ করতে করতে হঠাৎ কি হলো—সে মুখ তুলেছিল আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ জুড়ে ছিপছিপে অন্ধকার ···কয়েক মুহূর্ত···আবার সব ঠিকঠাক।

ইদানিং মাঝে মাঝে এরকম হ'য়ে যায়। ইদানিং প্রায়শই রাত্রে ভালো ঘুম হয়না এবং সারাদিন ক্লান্তি আর অবসাদ জুড়ে থাকে সমস্ত শরীর।

সে কাগজপত্র গোটায়, ফাঁকা বিশাল হলঘর, একরাশ চেয়ার টেবিল যেন ঘুমিয়ে আছে, অনেকটা দূরে দারোয়ান বসে আছে তার অপেক্ষায়, সে গলা তুলে ডাকে।

বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ায় সে, ভাদ্রের গুমোট গরমে আর ক্লান্তিতে মাথার মধ্যে জটলা ভাব, ওপরে তাকায়, মনে হয় যেন মেঘ করেছে, ভেবে নেয় এখন সোজাসুজি একেবারে বাড়ী যাওয়ার বাস এখান থেকে পাওয়া যাবেনা, হাওড়ায়

গিয়ে বাস বদল করতে হবে। সুতরাং হাওড়াগামী একটা বাসে উঠে পড়ে সে।

হাওড়া স্টেশনের বাস টার্মিনাসে সে যখন পৌঁছায় তখন টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হ'য়েছে, দ্রুত পা চালায় এবং বাসের কাছাকাছি পৌঁছলে বাসের জানালায় মহুয়ার মুখ – তার দিকে তাকিয়ে।

…দেখা হয়নি কতকাল…কতকাল… মহুয়া তুমি আমাকে নির্জন কোনো দ্বিতীয় পৃথিবীতে নির্বাসন দিয়েছো—এরকম ভাবতে ভাবতে বুকের ভেতর জলপ্রপাতের শব্দ নিয়ে সে বাসে উঠে পড়ে এবং মহুয়ার কাছে এগিয়ে যায়। মহুয়া কিন্তু মুখ ফেরায় না, একইভাবে বাইরে চোখ রেখে চুপচাপ বসে থাকে সে দেখে কোলের ওপর দুটি হাত অলস, কানের দুলও দোলেনা, শুধু বাইরের বৃষ্টির সাথে ফিরফির হাওয়া শুরু হ'য়েছে সেই হাওয়ায় কপালের আর গালের পাশে চুলগুলি ঈষৎ কাঁপে।

বাসে বসার জায়গা নেই, বরং দু'একজন লোক ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি বাড়ছে, জানালার ধারের মানুষজন শার্সী বন্ধ করে। বৃষ্টি এসে মহুয়ার গা ভিজিয়ে দেয় কিন্তু সে একইভাবে বসে থাকে, জানালা বন্ধ করেনা। ওর পাশে বসে এক বৃদ্ধা মহিলা, তিনি বলেন জানালাটা বন্ধ করে দাওনা ভাই, কিন্তু সে নিঃশব্দ। বাস চলতে শুরু করে।

সে হাত বাড়িয়ে জানালা বন্ধ করে দেয় এবং এভাবে তার বাহুতে মহুয়ার গালের স্পর্শ – সহসা শিহরণে সে কেঁপে যায়, চকিতে মহুয়া চোখ তোলে – চোখা-চোখি – হাসতে চেষ্টা করে সে, অনেকটা নীচু হ'য়ে ছিল সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, মহুয়ার মুখে কিন্তু কোনো অভিব্যক্তি নেই, আস্তে চোখ ফিরিয়ে নেয়, যেন চেনেইনা।

তার খুব কষ্ট হয়।…ঠিক আছে আমিতো চলেই যাবো অনেক দূরে…এরকম ব্যবহার তোমার…এতো ভালই, অন্ততঃ সেই তীক্ষ্ণ হাসির চেয়ে এই অবহেলা অনেক অনেক ভালো…

ভালো, তথাপি তার কষ্ট বাড়ে, দাঁড়িয়ে থাকতে পা ব্যথা করে, হ্যাণ্ডেল ধরে রাখা হাতদুটো খুব ভারী মনে হয়। কন্‌ডাক্টর টিকিট চায়, সে দুটো টিকিট কাটে, কনডাক্টর জিজ্ঞাসা করে আরেক জন কে—সে মহুয়াকে দেখিয়ে দেয়।

…শুনছ মহুয়া, আমি অনেকদূরে চলে যাবো—সে মনে মনে ভীষণ চিৎকার করে বলে, কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই, সেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এবং মহুয়াও নীরব।

কিছুক্ষণ পর তার পাশ থেকে কে যেন বৃদ্ধাকে হাত বাড়িয়ে ডাকে এবং নেমে যায়। কিন্তু তার বসতে ইচ্ছা করেনা—শুনছ মহুয়া, তোমার পাশে বসার জন্য আমার একটুও ইচ্ছা করছেনা—সে মনে মনে বলে, অথচ বসে পড়ে। হাতে টিকিট দুটো নিয়ে সে নিবিষ্ট মনে নানাবিধ খেলা করে, টিকিটের নম্বর ইত্যাদি সব খুঁটিয়ে বারবার পড়ে এবং একবারও মহুয়ার দিকে তাকায় না। এভাবেই বাস চলে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে বাস থামে, লোক নামে এবং ক্রমশঃ বাস ফাঁকা হ'য়ে যায়।

টার্মিনাসে বাস যখন পৌঁছায় তখন তারা দুজন ছাড়া আর একজন লোক—তার হাতে ছাতা—দিব্যি নেমে যায়. কনডাকটর দুজন নেমে ছুট দেয় গুমটির দিকে, মহুয়া উঠে দাঁড়ায়।

তার খুব রাগ হয়, ওকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য জায়গা দেয়না, শুকনো শুকনো গলায় বলে—বৃষ্টি খুব জোরে পড়ছে। মহুয়া কোনো কথা বলে না দাঁড়িয়েই থাকে এবং সেও ওকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য জায়গা দেয় না। এভাবে কিছুক্ষণ, তারপর মহুয়া বসে পড়ে। ড্রাইভার বাসের আলো নিভিয়ে দেয়।

—'আলোটা জ্বলুক না', সে চেঁচিয়ে বলে কিন্তু ড্রাইভার বোধহয় শুনতে পায় না। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরে যায় অন্ধকারে তারা দুজন অপরিচিতের মতো বসে থাকে।

এভাবে সময় যায়—তার মনে হয় এক যুগ সে এভাবে বসে আছে এবং বুকের ভেতর কোনো অনুভূতি বেঁচে নেই, দুঃখ না সুখ এরকম এক অদ্ভুত অবস্থা নিয়ে বসে থাকে।

ক্রমশঃ বৃষ্টি থেমে আসে। অন্ধকার চোখে সয়ে গেছে, মোটামুটি আবছা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সব, সে উঠে দাঁড়ায়, শুকনো গলায় বলে, মনে হচ্ছে বৃষ্টি থেমেছে। মহুয়ার পাথরের মূর্তি নড়ে চড়ে, উঠে দাঁড়ায়।

খুব হালকা ফিন্‌ফিনে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তারা পাশাপাশি হাঁটে. মহুয়ার বাড়ীর রাস্তার মুখ ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসে।

গলির মুখে এসে মহুয়া এগিয়ে যায় এবং তখন না সুখ না দুঃখ এরকম অসাড় বুকের মধ্যে হঠাৎ ছলকে ওঠে রক্ত, সে বুঝতে পারে মহুয়া তাকে চিরকালের মতো নির্বাসন দিয়ে চলে যাচ্ছে।

—মহুয়া যাচ্ছো? সে নিম্নস্বরে বলে, তার কণ্ঠে আর্তি। মহুয়া ঘুরে দাঁড়ায়, বুকের কাছে জড়ো করা দুইহাত, দৃষ্টি অভিব্যক্তিহীন, কথা বলে না শুধু মাথা

নাড়ে। তার গলার কাছে ঠেলে ওঠে ব্যথা, দৃষ্টি ঈষৎ ঝাপসা হ'য়ে আসে বলে 'ও'! তারপর ফিরে যায়।

—'আপনিতো একদিনও আমাদের বাড়ী এলেন না.' মহুয়া বলে।

মহুয়া কেঁপে ওঠে সে. বুকের মধ্যে জলপ্রপাত গর্জনে উত্তাল, সে ফেরে, মহুয়ার খুব কাছে এগিয়ে আসে. দেখে মহুয়ার ঠোঁট কাঁপে. চোখের পাতা বারবার ওঠে নামে আর স্থিরমান নাকছাবির পাশ দিয়ে টুপ করে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।

# বিপিনবাবুর সুখ দুঃখ

দীনেশচন্দ্র সিংহ

ফ্ল্যাট পাড়ার বাসিন্দাদের জন্য এক কালি কৃপণ খালি জমি। সেটুকু একাধারে পার্ক ও পার্কিং। সকাল সন্ধ্যা ভাগ্যবান কুকুর কুকুরীর বায়ু সেবন ও প্রাতঃ সান্ধ্যকৃত্যাদির জন্যই তার ব্যবহার। শুধু এক কোণে পাঁচ সাত জন পক্বকেশ বিরল কেশ বা কেশহীন শেষের যাত্রী। তারা পুরনো সে দিনের কথা বলে আফশোস করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এবং রোদ তেতে গেলে বা অন্ধকার গাঢ় হলে যে যার কোটরে ঢোকে। বিপিনবাবু কোয়ার্টারকে কোটর বলেন এবং মানুষ যে পুনরায় বিবর বা গুহাবাসের পর্যায়ে ফিরে যাচ্ছে সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় জ্ঞাপন করেন।

এ পাড়ায় বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার সংখ্যাল্পতা চোখে পড়ার মত। স্বামী স্ত্রী এবং একটি বা দু'টি সন্তান নিয়ে সুখী পরিবার সব ফ্ল্যাটে। কোন দম্পতিই ত্রিশের কোঠা পেরোয়নি। সীমিত সন্তান নিয়ে এখানকার পরিবারগুলি যেন ছন্দহীন গদ্য কবিতা। অমিলেও মিল, অ-সুরেও সুর। সাড়ে আটটা বাজতেই একে একে অফিসে বেরিয়ে পড়ে। কেহ একা, কেহবা জোড়ায়। ঘরের দরজায় বাই বাই টা টা। তারপর দড়াম। দরজাবন্ধ।

মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটে। কোন কোন ঘর থেকে পাকা চুল, টাকমাথা, ভোবড়ান গাল, বাঁকানো পিঠ, পাকান দেহ উঁকিঝুঁকি মারে। অস্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে এদিকওদিক তাকায়। চশমার ফাঁকে ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে এর ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। চাহনিতে একটা অসন্তুষ্টি অতৃপ্তি। এখানকার কিছুই তাদের মনের মত নয়। ওদের চোখে মুখে সেভাব সুস্পষ্ট। এরা রজনীবাবু বিপিনবাবু সুরেন বাবুর দল। হরমোহিনী, সুভাষিণী অনঙ্গবালার দল। এদের সংখ্যাও দ্রুত ক্ষীয়মান। প্রতি শীতেই দু'একজন বলহরি হরিবল। এদের বিয়োগে কান্নার রোল ওঠেনা। পুত্রবধূর মুখ একটু ভারাক্রান্ত হয়। পুত্র চশমা সরিয়ে রুমালে চোখ মোছে।

তিন ছেলে দুই মেয়ে বিপিনবাবুর। দেশান্তরের আগেই মেয়ে দুটিকে পাত্রস্থ করেছিলেন। প্রাণ ও মান রক্ষার তাগিদে বাস্তুত্যাগের সময় তিন ছেলে

ও স্ত্রী সুভাষিণীকে নিয়ে পাড়ি দিলেন এ বঙ্গে। বড় মেয়ে-জামাই গেল আসামে আর ছোটটি আগরতলায়। পারস্পরিক দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ। চিঠিপত্রে কুশল বিনিময় কখনোসখনো। নাতি নাতিনের কথা দূরে থাক, মেয়ে জামাইকেও আজ চিনতে পারবেন বিনা সন্দেহে।

বড় বাড়ীর অন্যতম শরিকদার ছিলেন বিপিন বাবু। চল্লিশ বছরের মধ্যেই সারাগ্রামের কর্তা পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সে পদ কোন সরকারী মানমর্যাদা সূচক নয়। সাধারণই তাকে ওপদে বসিয়েছে। তাঁর পিতাও ছিলেন গাঁয়ের কর্তা। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির ভাগিদার থাকলেও 'কর্তা'টি ভাগাভাগি হয় নি। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি একাই তার মালিক।

মাইনর স্কুলের সামান্য শিক্ষক বিপিন বাবু। সারাবছরের খোরাকীর ধান হয় পরিমান চাষের জমি। খরা বা বন্যায় চাষ নষ্ট হলে কিনেও খেতে হতো। জোতদার বা তালুকদার বলা যায়না কিছুতেই। বাড়ীতে চারপাঁচটা পুকুরের কিছু কিছু অংশ, একটু সুপারী বাগান, কয়টা নারকেল ও আমগাছ—এই নিয়ে তাঁর ষোল আনা সম্পত্তি। কাউকে ধারতেন না, পারলে সামান্য ধার কর্জ দিতেন কারো বিশেষ প্রয়োজনে—বিনা সুদে। পাড়ার ঝগড়া কাজিয়ায় মধ্যস্থতা করতেন। বিষয় সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারায় সালিশী করতেন। পিতাপুত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে হাড়ি ভাগাভাগিতে মাতব্বরের ভূমিকা নিতেন। প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়ের বিয়েতে পাকা কথাবার্তার সময় লেনদেনের ব্যাপারে অচলাবস্থায় সৃষ্টি হলে ভাঙাগড়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। কোন পক্ষই তাঁর মতামতের অমর্যাদা করত না। বারোয়ারী হরিসংকীর্তন কালীপূজা দুর্গাপূজা প্রভৃতি তারই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হতো। পার্শ্ববর্তী মুসলমান পাড়াতেও ঝগড়া কাজিয়া মিটাতে মুরুব্বি হিসাবে তার ডাক পড়তো। দুপুরে স্কুলের সময়টুকু ছাড়া সকাল বিকাল গামছা কাঁধে জমির আলে বসে হাললাঙ্গলের তদারক করা, জমিতে নিড়ানি ও কোপানির সময় জনমজুরদের কাজ দেখা ইত্যাদি কাজেই দিনগত। হাটবারে কালীর হাট, মজুমদার হাট, কখনো বা চন্দ্রগঞ্জ চৌমুহনী বাজারে যাতায়াত।

ফ্ল্যাটের অন্যতম বাসিন্দা সুমিত। পাড়ার সাতেপাঁচে থাকে না। যে কোন বাইরেরকী ব্যাপারে তার দেখা পাওয়া ভার। তার একরোখা চালচলন, বেয়াড়া কথাবার্তা অনেকেরই না-পছন্দ। কোন পাড়াটে ব্যাপারে ভাড়াটেদের থেকে চাঁদা তোলবার জন্য স্ব-নিযুক্ত আদায়কারীকে দ্বিতীয় দিন

দরজায় কড়াঘাতের সুযোগ সে দিত না। যা দেবার দিয়ে আপদ বিদায় করে। অবশ্য পয়ের পয়সায় কালচারী করে বেড়ান যে অসঙ্গত অশোভন সে সম্পর্কে দু'-চারটা অমধুর কথাও শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না। সুতরাং পাড়ায় যারা পয়ের বাপের পয়সায় ফুর্তি করে বেড়ায় সুমিতের সঙ্গে তাদের অবশ্যই মিত্রতা কি যাত্রা সম্পর্ক নয়।

বিপিন বাবুর বড় ছেলে কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে ছোটখাট কেউকেটা। দিল্লীতে বাড়ী করে সপরিবারে বাস করছে। মেজটি জাহাজ কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে সারা পৃথিবী চুঁড়ে বেড়াত। তারপর এক শ্বেতাঙ্গিনীকে জীবনসঙ্গিনী করে ইংল্যাণ্ডে তরী ছেড়ে তীরে উঠে স্থায়ী আস্তানা পেতেছে। বিপিনবাবু ও সুভাষিণী দেবী এখানে ছোট ছেলের কাছে আছেন। সে প্রাইভেট কোম্পানীর মাঝারি অফিসার। ফ্ল্যাটের একটি ছোট রুমে বিপিনবাবু ও তার স্ত্রী তাদের বৃহৎ বিশ্বকে গুটিয়ে এনেছেন। এহেন বিপিনবাবুর সঙ্গে সুমিতের বেশ ভাব। তার সুখ দুঃখের একমাত্র নীরব ও ধৈর্যশীল শ্রোতা।

বিপিন বাবুর অনেক সুখ অনেক দুঃখ। অতীতের সুখচারণ বর্তমানের দুঃখ মোচনে হয়তো তাকে কিছুটা সহায়তা করে। তাই তিনি সুমিতকে কাছে পেলেই—বুঝলে বাবা সুমিত, আমাগো আশে···। কখনো—কি কইমু বাবা, আমাগো সময়ে···।

বিপিনবাবু বড় সুখে ছিলেন। সাধারণ সুখ, সরল সুখ। এক বিঘাট পরিত্যক্ত রাজবাড়ী তার পূর্বপুরুষেরা সরকার থেকে ইজারা নিয়ে বসতবাড়ী তৈরী করেছিল। তিন শ্রোণ তের কানি জমি এক চকে। দিঘি পুকুর কিল্লা নিয়ে সে এক এলাহি কাণ্ড। এত বড় বাড়ীর আংশিক মালীক হলেও ষোল আনা সুখভোগে কোন বাধা ছিল না। ঐ বাড়ী ও দিঘির কথা উঠলে বিপিন-বাবুর উৎসাহে বান ডাকত। খাঁচায় বন্ধ নীলাকাশবিহারী পাখির যন্ত্রণা কাতরানি বলেই মনে হত সুমিতের।

—চারদিকে শুনি সবাই বাড়ী করছে। কিন্তু সেগুলি বাড়ী নাকি। আড়াই কাঠা তিন কাঠা জমি ও একটা লোকের হাগামুতার জন্যই দরকার। আমরা তিনবংশ—পাল-সিংহ-ঘোষ মিলে কুড়ি ঘর এক বাড়ীতে বাস করেছি। খাল চোদ্দ খানা টিনের ঘর। বাইর থেকে দেখলে মনে হবে গরুবাজার। ছন নারকেল পাতা ও সুপারীর বাইলের ঘরও ছিল অন্ততঃ বিশ পঁচিশখানা। সেগুলি রান্না-ঘর, ঢেঁকিঘর, লাকড়ি ঘর ও গরুঘর। বসতবাড়ীর চারপাশ ঘিরে ঘন সুপারী

বাগান। বাগানের মাঝে মাঝে নারকেল, আম, জাম, মান্দার, ভাদি, কাউ, জামুরা, লেবু আনারসের চাষ। বাড়ীর সামনেই বড় পুকুর। দক্ষিণ পাড়ে শীতলা ও বাস্তদেবীর স্থান, ঠাকুর ঘর, ফুল বাগান। স্থলপদ্ম ও গন্ধরাজের রাশি। সাজিতে কুলাত না; বুড়ি ভরতি করে ফুল তুলতে হত দুর্গাপূজা সরস্বতী পূজায়।

কিছুক্ষণ থেমে আবার সুরু করেন স্মৃতিচারণ :—প্রায় আধ মাইল লম্বা হবে বাড়ীর দরজা। সোজা পুকুরের দক্ষিণ পাড় ধরে বাদামতলা বরইতলা দিয়ে দিঘির দক্ষিণপাড়ে চড়াই, দোলের সামনে সমতলে পদার্পণ। কালীতলা ধরে বরাবর পুব দিকে বজডুমুর তলায় গিয়ে উৎরাই শুরু এবং কদম তলায় গিয়ে পুবকানীর সমতলে মিলন। ছোট বেলা একদমে এই পথ পার হতে পারতেন না। আহা দিঘি ত নয় যেন সাগর। দক্ষিণ পাড়ে কালীতলা ও দোলমঞ্চ। পশ্চিমপাড়ে সুদীর্ঘ করই গাছ ও উলুখেত, উত্তর পাড়ের মাঝামাঝি জলের কোল ঘেঁষে হাম্মাহানা ও তুলা গাছ। অনবরত জলের ঢেউ তাদের তলদেশের মাটি ক্ষয়ে নিয়েছে। শিকড়ের জট বের হয়ে পড়েছে। তার ফাঁকে ফাঁকে বাসা করে বড় বড় লাল ইচা। তিনদিকে জাঁওই দিয়ে ঘিরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাঁওই ভরতি ইচা মাছ ধরেছেন। পুব পাড়ে তুলাগাছ ও ছনখলা। ছন খেতের মাঝেমাঝে করই গাছের কচিপাতা খেয়ে উড়ে বেড়াত সোনা ফড়িং। সেগুলি ধরার জন্য জিংলা হাতে কত ছুটেছেন। ওদের পাখায় ভারি সুন্দর কপালের টিপ হয়। উলুখেতে লাফিয়ে বেড়ায় সদাসতর্ক খরগোস। কাঁটা ছড়িয়ে ছুটো-ছুটি করে হেঁজা। শেষ রাতে ভয়ে লোভে তাল কুড়াতে যেতেন—দোলের পেছনে। পারিবারিক শ্মশানের ওপর টিনের ছোট মঠের দিকে সাঁজসন্ধ্যা দুপুরে ভয়ে ভয়ে তাকাতেন—কোন ভূত পেত্নী গ্রীষ্মবর্ষায় তাতে আশ্রয় নিয়ে তামাক খাচ্ছে কিনা।

দিঘির চারপাড়ে মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় হা-ডু-ডু, দাড়িয়া বান্ধা, বৌ-চুরি, ডাংগুলি ও জামুরা দিয়ে ফুটবল খেলেছেন। স্থল ও জলাশয়ের মাঝে চাতালে দাঁড়িয়ে 'হু'-দিলে তা উঁচ নিচু লহরে এপাড়ে ওপাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে 'জান' দিয়ে বের হয়ে যেত। উত্তর পাড়ে বাঁধা থাকত সারি সারি মাছ ধরা নৌকা। একখানা খুলে বাবদিঘিতে নিয়ে "ও রঙিলা বন্ধুরে" বলে বেসুরা টান। কখনো বা 'চৌধুরীর লড়াইর' ছড়া ধরে চড়া সুরে টান দিতেন—"হিন্দুর কাইতের জঙ্গল কাটি বান্ধাইল রাজবাড়ী—চৌধ্রী সাজিলারে।"

এই বাড়ী ও দিঘির কথায় বিপিনবাবুর বড় সুখ। বলতে বলতে নিজের ছেলেবেলায় ফিরে যেতেন যেন। বিশেষতঃ সুমিতের মতো নীরব শ্রোতা পেলে। নিবন্ত প্রদীপকে উস্কে দেবার মতো সুমিত শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য করে মাত্র।

—মনুষ্যহীন অবস্থায় এ দিঘি কখনো দেখা যায়নি। চব্বিশ ঘণ্টা দিঘিতে মাছ ধরা কাপড় কাচা গরু বাছুর মানুষের স্নান চলছে। নিশুতি রাতেও ঝুপ করে জাল ফেলার শব্দ। বুড়োদের ধারণা ভূত পেত্নীমাছ ধরছে। না হয় এত রাতে কে আসবে জাল ফেলতে। সারা রাত টাঙ্গা বঁড়শী ফেলে কোরাল বোয়াল মাছের আশায় রাত জাগত রশিদ ও মুজহর। দীঘির একেক ধারে একেক মাছের প্রাচুর্য। পূবপাড়ে রুইকাতল, দক্ষিণ পাড়ে কোরাল। উত্তর পাড়ে বাইলা চিংড়ী বোয়াল। বর্ষায় জাল টানা দেবার সময় চটাস চটাস শব্দে লেজের বাড়ি মারে বাঘাতারা ইচা। দু'চারটা লাথি গালে মুখেও লেগেছে। জানের কাছে ধোড়া আর মাইট্যা সাপের উৎপাত। পোলা খাদাইন্যা বাঁশতলায় পচা বিষকাটালীর মাঝে চাঁদা ও চাঁদাবৈচার আড়ত। গাজার মাঝে পাওয়া যেত প্রচুর পরিমানে কড়া ইঁচা; কখনো বা লইন্যা বা চাঁপা ইঁচার ঝাঁক।

বাজার থেকে আড়াই শ' গ্রাম ফুচো চিংড়ী দু'টাকায় যেদিন আসে সেদিন বিপিনবাবুর বড়ই দুঃখ। তিনি সঙ্গী না পেলে আপন মনেই অনেক সময় বকবক করেন। মাঝে মাঝে সুভাষিণী দেবীর বিরক্তি প্রকাশ। "ওই দিঘি থাইক্যাও ত কোন ভোগে লাগে নাই। জনমভোর খাজনা টাইন্যা মরেছ।

হাঁ, কথাটা ঠিক। বাড়ীর এক অভাবগ্রস্ত অংশীদার গোপনে মাত্র সামান্য এক পয়সার অংশ পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভিন্নধর্মী প্রতিবেশীদের কাছে বিক্রী করে দেয়—অনেকটা বড় অংশীদারদের জব্দ করার মানসে। ফেরাও চালাক। তারা সারাগ্রামের লোক মিলে ওটুকু অংশ ক্রয় করে ষোল আনার ভোগদখলের মালিক হয়ে বসে। যে যত পার ধর। কার্তিক মাসে বাইরের জলে টান পড়লে সারা মাঠের খালের মাছ এসে দিঘিতে ঢোকে। মাছে জলে থৈ থৈ। অগ্রহায়ণ মাসের কোন একদিন দিঘিতে মৎস্য লুট উৎসব। হাট বাজারে ঢোল সহরৎ হতো, "হিন্দুর কাইত দিঘির মাছ লুট অইবো—ঢং চং ঢং।" পাঁচ দশখানা গাঁয়ের লোক যার যা সরঞ্জাম নিয়ে মাছ ধরতে হাজির হতো। তাদের হাতে বাওলি, জাঁওই, হাইজাল, ধর্মজাল। ভেরাল টক্কিজাল, হলপা, টেঁটা, কোচ।

শতাধিক সড়কী নৌকা। বিশ ত্রিশটি এক এক দলে জড়ো হয়ে চারদিক থেকে চক্রব্যূহের মতো ঘিরে এসে জাল ফেলে। "মারমার, ধর ধর, আছে আছে, গেছে গেছে, উজা উজা" জিগিরে দিনের শর দিন দিঘি তোলপাড়। এই মৎস্যমেধ যজ্ঞে সোনে বোল আনা অংশের মালিক বিপিনবাবু ও তার জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইয়েরা নীরব দর্শকমাত্র। সারা বছর খাজনা জুগিয়ে যেন। ভোগের স্থানে শূন্য।

জলাখলা মিলে ষাট বিঘার জলাশয়। বর্ষার তরঙ্গলহরী দেখার মত। ছোট খাট নাইউরী নৌকা নিয়ে মাঝিরা মাঝ-দীঘি অতিক্রম করতে সাহস করতো না। খননকালে মগ জাতীয় মাটিখালরা নাকি পারা জাতীয় কি এক পদার্থ দিঘির মাঝখানে পুঁতে যায়। তারই গুণে দু'তিন শত বছর পরেও দিঘিতে কচুরি পানা জন্মাত না।

বিপিনবাবু একদিন তাদের এই বাড়ী দিঘির কথা ছোট বৌমার কাছে গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন। শুনে পুত্র বধূ মুখ টিপে হেসেছিল। স্বামীকে একান্তে বলেছিল —তোমার বাবার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। লাল দিঘির চেয়ে বড় দিঘি হয় নাকি।

এই কথা শুনে বিপিনবাবুর বড় দুঃখ। সুভাষিণী দেবী গঞ্জনা দিয়ে বলেছিলেন—এইসব কইলকাত্তার মাইয়ার কাছে বাখাতি মারতে যাও ক্যান্। এরা ঘটি মাইপা স্নান করে, ডুব স্নানের মজা কি বুঝবো।

তবে বিপিনবাবু সুখী হলেন শুনে যে তার ছেলে নাকি মোক্ষম জবাব দিয়েছিল বৌমাকে,—আখ, আমার বাবার দুঃখ আমি বুঝি। বাবা মিথ্যা বা বাড়িয়ে বলার লোক নন্। যা বলেছেন বরং কমই বলেছেন। আমাদের সদর দরজার সাধারণ ব্যবহারের পুকুরটা দুটো লাল দিঘির সমান; আর তোমার গোটা কুড়ি লাল দিঘি ঢুকিয়ে রাখা যাবে সিন্দুর কাইত দিঘির মাঝে। এ ছাড়া আরো চার-পাঁচটা পুকুরে কাকা জ্যেঠাদের সঙ্গে আমাদেরও কিছু কিছু অংশ ছিল।

এসব কথা তিনি পরে সুভাষিণী দেবীর কাছে শুনেছিলেন।

—কি বললো বাবা সুমিত, বড় পুণ্যফলে ঐ বাড়ী আমার বাপ জ্যেঠারা আরম্ভ করেছিলেন। আর অনেক পাপে আমরা তা ছাড়তে বাধ্য হয়েছি।

ঐ এক বাড়ীর ভিতর এককালে অনেক বাড়ী ছিল। বাড়ীর বিভিন্ন অংশের নাম এখনো তার কণ্ঠস্থ। দাই বাড়ী, ঠাকুর বাড়ী, কড়ি ঘোষের

বাড়ী, শঙ্খ ঘোষের বাড়ী, বাগের ভিটা, রাণী হাটখোলা, মহিষ খোলা, উত্তর কিল্লা, দক্ষিণ কিল্লা, পশ্চিম কিল্লা—নানা নামে বাড়ীর বিভিন্ন অংশের পরিচিতি। কতগুলি পুকুরই ছিল তার মধ্যে। তাদের প্রত্যেকটার মাছের বৈশিষ্ট্যই ছিল আলাদা। ছাতাবাড়ীর পুকুরের উজাইন্যা কই মুণ্ডবালা পুকুরের গুইল্যা-হল্কা, মোটকা-পুকুরের ভেদা-খইয়া, ফুল পুকুরের শোল-গজার, দাই পুকুরের শিং ছাওর। আর বড় পুকুরের জানে ধরা পুঁটি-কাঁচকি-চাপিলার ত আলাদা খ্যাতি। সে বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠানে চাপিলা ভাজি একটা বিশেষ লোভনীয় খাদ্য ছিল। আস্তা, হারোল, টুয়া, চাই, বেংতা আঁধা বঁড়শী, লেইত বঁড়শী, কইয়া জাল প্রভৃতি দিয়ে কত মাছ ধরেছেন।

একদিন ছেলে পাঁচ টাকা দিয়ে এক কিলো ল্যাংড়া আম এনেছিল। শুনে বিপিনবাবুর দুঃখের অন্ত ছিল না। ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন—এসব আইন্যা কেন দুঃখ বাড়াস। দেখলে বাড়ীর কথা মনে পড়ে রে। আহা, কত আম খাইছি। খো তোর বেনারসী আম। আমাগো দুলামতী, মধুমতী, কাঁচকইয়া, দধইল্যা, ছিলইন্যা, সিন্দুরগা আমের সোয়াদ তিরিশ বছর পরেও জিহ্বায় লাইগ্যা আছে। সুভাষিণী দেবীও মাঝে মাঝে ছেলের মুখে জিনিসপত্রের দাম শুনে চমকে ওঠেন।—কইস কি? বৈচা মাছের কিলো বার টাকা! আর আমাগো পুকুরের বৈচা চাপিলা কুটতে কুটতে হাত ব্যথা অইয়া গ্যাছে। মিষ্টির কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—কি ছানার সন্দেশ দেখাস, আমাগো নাইয়কলের মচকার সঙ্গে কি কারো তুলনা হয়।

বিপিনবাবুর বড় দুঃখ, রাষ্ট্র বিপর্যয়ে ভাঙ্গা সংসার তিনি আর জোড়া দিতে পারলেন না। কৃষ্ণনগরে বেশ কিছু জমিজমা নিয়ে বাড়ী করেছিলেন। আশা ছিল ছেলেপুলে নাতিনাতকুড় দোল দুর্গোৎসবে আবার আনন্দের বাজার মিলাবেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্তরূপ। চাকুরীসূত্রে স্থানান্তরের ফলে তার পরিবার সীমা ছেড়ে অসীমে ছড়িয়ে গেছে। একদিন বিপিনবাবু পথে ঘাটে চলার পথে নমস্কার সেলাম পেয়েছেন; কেমন আছেন, ভাল আছেন নি বলে আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়েছেন। এখানে রাস্তায় বের হলে কেহ তাকে পোছে না। ডেকে দুটো কথা বলেনা। কুশল সংবাদ নেয়না।

বিপিনবাবুর মন বিশেষ খারাপ। কামিনী বাবু মারা গেছেন কয়দিন হলো। দেশে তিনি ছিলেন পাশের গাঁয়ের অন্যতম মাতব্বর। স্কুলের সেক্রেটারী হিসেবে বিপিনবাবুর সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা। এখানে ফ্ল্যাটের কাছাকাছি এক জবর

দখল কলোনীতে পৃথগন্ন ছেলেদের সঙ্গে ভাগে বাস। মাঝে মাঝে লাঠি ঠুকঠুক করে আসতেন। বিপিনবাবুও কখনো কখনো যেতেন। অচল সময় কাটাতে।

চলতি আবহাওয়ায় মা বাবাই ছেলেদের কাছে বোঝা। সাজ পোষাক, বৌদের সাধ আহ্লাদ, শ্বশুরকুলের আত্মীয়বর্গের আদর আপ্যায়ন লোক লৌকিকতায় ঘাটতি নেই। অভাব শুধু বুড়োবুড়ীর বেলায়। কামিনী বাবুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বিপিনবাবু গিয়েছিলেন শেষ দেখা দেখতে পাড়ার করটা বখাটে ছোঁড়া যেমনতেমন ভাবে কামিনীবাবুর সৎকারের ব্যবস্থা করল। বুড়ী হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। কে একজন টিপ্পনী কাটল—এদেশে এমন ছোট লোকের মতো কাঁদে নাকি! কালীঘাটে ঠিকা চুক্তিতে পারলৌকিক কাজ সারা হলো। ভোজন পর্বও তথৈবচ। স্থানভ্রষ্ট না হলে এই সদাশয় সম্মানী লোকটার মৃত্যুতে সাড়া পড়ে যেত। শ্মশানে করেক শ' লোক জড়ো হতো। শ্রাদ্ধ দান ভোজনাদিতে একমাস পাড়ায় উৎসব লেগে থাকত। এসব ভেবে বিপিনবাবুর বড় দুঃখ।

কামিনীবাবুর মৃত্যুতে বিপিনবাবু কেমন হয়ে গেছেন। নোঙ্গর তোলার ঘণ্টাধ্বনি অহরহ কানের কাছে বাজছে যেন। ঘণ্টাধ্বনির কথা মনে হলেই তার কানে বাজে চাঁদপুর গোয়ালন্দে স্টীমার ছাড়ার ঘণ্টিগুলি। স্থলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে জলে ভাসার সঙ্কেত। কেমন একটা অসহীয় ব্যথা ও উদাসীনতা শিরায় শিরায় বয়ে যেত। ট্রেন ছাড়ার সঙ্কেতের সঙ্গে তার মিল নেই। কেমন দীনভাবে যে তার শেষ অঙ্ক সমাধা হবে তা ভেবে তিনি আরো মন মরা হয়ে পড়েন। অথচ তার পিতা পিতামহরা যেন ঐদিনটির জন্য উৎসুখ অপেক্ষা করতেন। শেষের সেদিন তাদের কাছে মোটেই ভয়ঙ্কর ছিল না। এ যেন এক হাটের বেচাকেনা সেরে আরেক হাটে যাত্রার প্রস্তুতি। কোন আমগাছটা দিয়ে তাদের কাঠ করবে, কি পর্যায়ের শ্রাদ্ধাদি হবে, এমন কি ভোজনের ব্যবস্থাদিও দিয়ে যেতেন। পুত্রের হাতের আগুন নাতির হাতের ছাতির জন্য কি অসীম আকাঙ্ক্ষা। বিপিনবাবুর ভাগ্যে কি অপেক্ষা করছে কে জানে।

বিপিনবাবুর মনে সন্দেহ তার ছেলে-বৌর মধ্যে কোন্ সম্পর্কটা জোরদার। সহধর্মিণী না সহকর্মিনী। শুধু তার ছেলে-বৌ কেন? এ পাড়ায় প্রায় সব পরিবার সম্পর্কেই একই প্রশ্ন। সব ঘরেই কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। কর্তা প্রায় উহ্য, সাইলেন্ট। বিপিনবাবুর মতে সমাজে মাতৃ-শাসন পিতৃ-শাসন অন্তে

এখন কর্ত্রী-শাসন চলছে। মাতৃ-পিতৃ-শাসনে যে স্নেহের ছোঁয়া ছিল কর্ত্রী-শাসনে তা উবে গেছে।

দু'জনের আয়ে এদের সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার চলতে পারে। কিন্তু তাতে তৃপ্তি নেই। সব সময় অর্থের পেছনে ছুটছে। ফুল-টাইম সার্ভিসের পরে ওভার-টাইম পার্ট-টাইম করে মরছে। কেহ বা মাড়োয়ারী বাড়ীতে টুইশ্যনী খোঁজায় ব্যস্ত। টীট ফাণ্ড, পীয়ারলেস নিয়ে মাথা ঘামায় ছুটির পর। লটারীর টিকিট গছাবার জন্য হন্তে হয়ে ঘোরে প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের দোরে। 'অধিক অর্থ কামাও জমাও'—এই যেন জীবনের সার। ঘর বাড়ী ত রাত্রিবাসের হোটেল।

অথচ এদের কিই বা এমন খরচ। বলতে গেলে আপনি-কৌপনীর সংসার। ভাইয়ে বোনে যোগাযোগ ক্ষীণ। মাতৃকুল পিতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণতর। যত সামাজিকতা আতিথেয়তা শ্বশুরকুলের সঙ্গে। একটি কি জোর দু'টি সন্তান। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে স-ফল সাংসারিক জীবনের যবনিকা। তার পর ত শুধু বীজশূন্য চাষ। কর্মেই অধিকার, ফলে নয়। বাচ্চাদেরও মা বাবার চেয়ে আয়াদের সঙ্গে ভাব। সেটা অকারণ নয়। মায়ার চেয়ে আয়ার সঙ্গেই ত তাদের দিন কাটে। তাদের কাছে যত আবদার অনুরাগ। একটু বড় হলেই কেজি বা কনভেন্টে চালান। ন'টার পরে সারা পাড়া নিঝুম নীরব। কচি কণ্ঠের কিচির মিচির নেই। বিপিনবাবু আফশোস করেন—সারা পাড়াটা যেন খোজা আর বাঁজায় ভরে গেল।

একটি মাত্র নাতি বিপিনবাবুর। সাত আট বছর বয়স। স্কুলে পড়ে। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। নাতি নাতিনদের কচি স্পর্শের জন্য, গায়ে গড়াগড়ির জন্য প্রাণ আকুলি বিকুলি করে। সুভাষিণী দেবী মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠেন। বলেন—আর পারি না বাপু। রেশনের চালের কাঁকর বাইছা আর সময় কাটে না। বুড়াকালে ভাল চাকরী জুটছে। কর্তা গিন্নী ত ড্যাং ড্যাং করে চাকরী করতে গেলেন এখন বুড়াবুড়ী বাড়ীর দারোয়ানগিরি করি।

তার মনে পড়ে এই বয়সে তার শাশুড়ীর দিন কি কর্মব্যস্ততায় কেটেছে। ভোর হতেই মাহিন্দারকে জাগিয়ে গরু বের করা, দুধ দোহান। বৌয়েরা কেহ ঘর নিকোচ্ছে কেহ গোবর ছড়া দিচ্ছে উঠানে। থালাবাসন ধুতে একজন গেল পুকুরে। নিজে স্নান সেরে ফুল তুলসী বেলপাতা তুলে ঠাকুর ঘরে ঢুকেছেন। বেরিয়ে গুড় নারকেল মুড়ী চিড়া দিয়ে জল খাবারের ব্যবস্থা। কিছুক্ষণ পর আবার

পেতে ধরা ইঁচা বৈচা চান্দা ভাজি দিয়ে বা লোনা ইলিশ ঝলসিয়ে পান্তা ভাত। নারকেল কোরা, লঙ্কা পোড়া লেবু পাতা মেখে কখনো বা। কোন গাছে নারকেল ঝুনা হয়েছে কোন গাছে আম পেকেছে তার খোঁজ। আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বতালাস। বর্ষায় মেয়ে জামাই বা বাপের বাড়ীতে এক ফাঁকে নৌকা করে বেড়িয়ে আসা। ছেলে-বৌ-নাতিনাতনি-জন-মজুর পোষ্য নিয়ে যেন মা দুর্গার সংসার।

বিপিনবাবুর আজ বড় সুখ বড় আনন্দ। তার হাতে একখানা চিঠি। চার পাতা ঠাসা লেখা। সুমিতকে দেখিয়ে বলেন—দেখ, ওরা আজো আমাগোরে ভুলে নাই। সুমিত চিঠিখানা নিয়ে পড়তে থাকে। কোন এক "স্নেহের সুধীর' শব্দের পর শব্দ বাক্যের পর বাক্য দিয়ে সাজিয়েছে একখানা পূর্ণাঙ্গ সুখ স্মৃতিপট। কচি কলাপাতার রকমারি ফুলের ডালি যেন। একটি লাইন তিনি বারবার পড়ছেন—"আপনাদের কথা বলিয়া সুরমা এখনো চোখের জল ফেলে।"

বিপিনবাবু বলেন—বুঝলে সুমিত আমার বড় দুঃখ আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠী ও নিকট আত্মীয়রা সারা ভারতে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি একবার ভেব দেখ অবস্থাটা। তিনকুলের সঙ্গেই আমাদের আত্মীয় বন্ধনটা বেশ দৃঢ় ছিল। উৎসবে আনন্দে দুঃখে আমরা কখনো নিজেদের একা ভাবতে পারিনি। আমার ভাই বোনেরা নদীয়া মুর্শিদাবাদে পাঁচ জায়গায় পাঁচজন। মাতুল বংশ জলপাইগুড়ি খুড়াত ভাইরেরা দণ্ডকারণ্য। জ্যেঠাত ভাইগণ আন্দামানে। মাসাত সোষ্ঠী আসামে। শ্বশুরকুল আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছে। এরা বড়ই নিকট আত্মীয়। অনেকের নাম ভুলে গেছি। চেহারা ও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি না। এদের বংশধরদের সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিচয়ের উপায় নেই। আর পাড়াপ্রতিবেশীরা যে কে কোথায় তা ভগবানই জানেন। অথচ এরা কত না আপন। এক রক্তের সম্পর্ক। একের সুখে অপরের মুখে হাসি। দুঃখে অশ্রুপাত।

আজ বিপিনবাবুর বড় সুখের দিন। তার স্কুলের এক সহকর্মী আজো তাকে মনে রেখেছে। তার স্ত্রী সুরমা এখনো তাদের জন্য চোখের জল ফেলে। সুধীর বা তার স্ত্রীই শুধু নয়। আরো অনেকে তার সামনে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই যেন বলছে—আমরা আপনাগোরে ভুলি নাই কর্তা। তার নৌকার মাঝি দরবেশ আলী, ছৈয়াল রাজা মিয়া, বর্গাইত মস্তাজ, নাপিত নবীন শীল, ধোপা হরকুমার যেন এখনো তার সঙ্গে বিষয়আশয় নিয়ে কথাবার্তা বলছে। মাহিন্দার যইগ্যা ও ভগবান নূর মহম্মদকে নিয়ে সুপারা নারকেল পাড়াচ্ছে।

মিন্নতি শরৎ সুধন্য কাস্তে কোদাল নিয়ে ধানক্ষেত পাটক্ষেতে ঘামে জলে ভিজে কাজ করে যাচ্ছে। মণ্ডবী ভারত ও মনার বাপ পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। ধান-ভানা বুড়ী ভইনদি এক নাগাড়ে বকর বকর করছে আর ঢেঁকিতে ঘনপাড় দিচ্ছে। দিঘির পাড়ে পচা পাট ছাড়াচ্ছে উষার মা, অমরগার মা, রাউজ্যার মা, ও তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি। আউশের পচা খড় ঝেড়ে ধান বের করছে হারাইন্তার মা, শৈচ্যার মা, রক্ষইত্যার বৌ। এদের নাম এখনো তার মুখস্থ। এত দিনে অনেকেই কবরে মাটি, শ্মশানে ছাই হয়ে গেছে। তবু ঘোলাটে চোখে এদের তিনি সুস্পষ্ট দেখতে পান।

বিপিনবাবু বিড়বিড় করে বলেন—তোগোরেও আমি ভুলি নাই।

# শিউলি মন

**প্রভাস ভক্ত**

ইতিমধ্যেই লাল নীল সিগন্যাল এবং হাইপাওয়ারের সার্চ লাইটগুলো জ্বলতে সুরু করেছে।

য়্যাডার যন্ত্রটা বিরতি-বিহীন ঘুরছে। দূরে ধোঁয়াটে আকাশ। দিনের আলো ক্রমশ মরে যাচ্ছে। ত্রস্ত কয়েকটা পাখি সারিবদ্ধ ঘরে ফিরে গেল। আবছা অন্ধকার মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। শীতল নিস্তব্ধতা। গাছ থেকে খসে পড়া শুকনো পাতার মত ভঙ্গি করে এক একটি প্লেন ল্যাণ্ড করছে।

টার্মাকে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে।

মেয়েটির বয়স তের থেকে পনেরো প্রায়। বেশ বাড়ন্ত শরীর। দেখে আরো বেশি বয়স মনে হয়।

মেরুন রঙের ম্যাক্সি পরা মাথন রঙা মেয়েটি বিস্ময়ের সঙ্গে চারদিক নিরীক্ষণ করছে। তার পোশাক প্রসাধনে চূড়ান্ত আভিজাত্য। ড্রেসিং করা খাটো রেশমি চুল। চোখে বাঁকানো ফ্রেমে বর্ডার দেয়া সান গ্লাস। হাতে পাখির মত পাখনা ছড়ানো ব্যাগ। খুব সরু করে আঁকা নকল ভুরু। ঠোঁটে রক্ত রং লিপষ্টিক। পায়ে হাইহিল জুতো।

দীর্ঘক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটি ক্রমশ নিস্তেজ এবং নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকে। মণিবন্ধের ঘড়িতে ঘন ঘন সময় দেখে। এখন পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। সওয়া ছ'টায় প্রার্থিত প্লেনটা ল্যাণ্ড করার কথা।

অর্থাৎ সে একটু তাড়াতাড়িই এসে পড়েছে।

দূরে একটি নিঃসঙ্গ ট্রেনিং প্লেন দাঁড়িয়ে। মেয়েটি অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে উন্মনা হয়।

ঠিক সওয়া ছ'টায় ল্যাণ্ড করল প্লেনটা। সদর্প শব্দে মেয়েটির আনমনা ভাব কেটে যায়। লাউঞ্জের বাইরে রুক্ষচূড়া গাছে এক ঝাঁক পাখি অন্ধকারে কিচির মিচির সোরগোল তোলে। কিছুক্ষণ বাদে আবার নিস্তেজ হয়ে যায়।

মেয়েটি চঞ্চল হয়ে ওঠে। মণিবন্ধের ঘড়িতে সময় দেখে। অশান্ত পায়চারি করে। ইতি উতি তাকায়। তার আচরণে বেশ অস্থির উদ্বেগ এবং ব্যস্ততা

ফুটে ওঠে।

এক সময় অসংখ্য লোকজনের ভিড় এবং চাঞ্চল্য এড়িয়ে মেয়েটি লাউঞ্জের বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরে অপেক্ষমান প্রাইভেট কারগুলোর নম্বরে চোখ বুলিয়ে নিরাশ হয়।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এইমাত্র ল্যাণ্ড করা প্লেনটায় নিশ্চিত তার কোন প্রিয়জন আসার কথা আছে। সে রিসিভ করতে এসেছে। সম্ভবত সেই প্রিয়জনটিকে রিসিভ করতে আরো এক বা একাধিক জনের আসার কথা আছে।

সে তাদেরকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না।

সামান্ত কিছু সময়ের জন্ত চাঞ্চল্য উচ্ছলতা এবং উচ্ছ্বসিত কথা সমষ্টি ধ্বনিত হ'ল। তারপর অংকের মত হিসেব মিলিয়ে বিভিন্ন কাউণ্টারগুলো ফাঁকা হয়ে যায়।

মেয়েটি বিমর্ষ মুখে এয়ার ইণ্ডিয়া কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে।

তার চোখের সানগ্লাস এখন হাতের ব্যাগে। সে কারণে, চোখের আয়নায় হতাশা অসহায়তা এবং লজ্জায় ম্লান মুখটা নজরে পড়ার মত।

এক সময় তার অভিমানী উৎকণ্ঠিত কাজলটানা চোখ দু'টো এয়ার ইণ্ডিয়ার ঝুলন্ত বোর্ডে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। ভেনাসের সুন্দর মূর্তিটায় গ্লাইডার দিয়ে হাত জোড়াচ্ছে রাজা। ওপরে বড় হরফে লেখা 'প্যারিস'।

সে তার ডান হাতের সরু আঙুলগুলো পর্যায়ক্রমে কোটালো। তারপর বাম হাতের আঙুলগুলো। দুগ্ধ ধবল আলো ঝলমল শান্ত সুন্দর পরিবেশে কয়েকটি মৃদু মিষ্টি শব্দ হয়। একমুঠো দীর্ঘশ্বাস উড়ে যায়। সে আলতো ভাবে দাঁতে ঠোঁট কাটে। একরাশ অস্বস্তি আর লজ্জা বুকে জড়িয়ে ঘুরে এয়ার ফ্রান্স কাউণ্টারের দিকে তাকায়। চকিতে সঙ্কুচিত মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এয়ার ফ্রান্স কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বছর পঞ্চাশ বয়সের একটি লোক। দীর্ঘ এবং স্বাস্থ্যবান পুরুষ। সাহেবী পোশাক পরা। লালচেপনা ঝুলন্ত চুল। গালে চাপ দাঁড়ি। ঠোঁটে জলন্ত চুরুট। মোটা কালো ফ্রেমে হাইলেন্সের চশমা চোখে।

লোকটি মাঝেমধ্যে চোর চোখে মেয়েটির দিকে লক্ষ্য করছিল। চুরুটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল। মেয়েটির আচরণে সে বেশ অপ্রস্তুত বোধ করে। এয়ার ফ্রান্স কাউণ্টার থেকে সরে অন্তত্র চলে যায়।

হঠাৎ শান্তসুন্দর নিস্তব্ধতার বুক চিরে ব্রডকাষ্টের তন্দ্রা ভাঙে। ঘোষিত

হয়—এ্যাটেনশন প্লিজ, মিসেস নীতা সেনভার্মা এ্যাণ্ড মিস রিণি—মিঃ আর কে ভার্মা ইজ ওয়েটিং হর বোথ অব ইউ এ্যাট আওয়ার এনকোয়ারী কাউণ্টার প্রেমিসেস।

এবার বেশ স্পষ্টত বোঝা যায়, কিছুক্ষণ আগে এয়ার ক্রাফ্ট কাউণ্টারের সামনে অপেক্ষমান লোকটি মিঃ ভার্মা; এবং সেই মেয়েটির নাম রিণি। কেননা, রিণি একটা ছোট্ট ঢেউ-এর মত মিঃ ভার্মার বুকে আছড়ে পড়ে। সতৃপ্ত স্বরে বলে ওঠে, ও ড্যাডী আই অ্যাম সো হ্যাপি। ম্যয় তুমকো বিলকুল পহেচান না সেকা। আই অ্যাম ডেফিনিট—মামনি তোমাকে চিনতেই পারবে না।

অর্থাৎ, রিণি হিন্দী বাংলা ইংরেজি তিনটি ভাষাতেই অভ্যস্ত। মিঃ ভার্মাও।

মিঃ ভার্মা রিণির মাথায় চুলে এবং কপালে শব্দ করে চুম্বন দেয়। অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, নীতা কোথায়?

রিণি মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব, ক্যায়া মালুম। ক্যাক্টরীসে সিধা এয়ারপোর্ট আনেকা বাত থা।

—সিমলাসে কবে এসেছো।

—তিন রোজ হলো।

বছরে একবার রিণি এখানে আসে। শীতের ছুটিতে। তখন দেখা হয়। গতবছর ওদের স্কুল থেকে সাউথে ট্যুর ছিল। ট্যুর শেষ মাত্র সাত দিনের জন্ত যেদিন এখানে এল, ঠিক তার আগের দিনের ফ্লাইটে মিঃ ভার্মা নতুন কারিগরী ট্রেনিং নিতে বিদেশে পাড়ি দেয়।

অর্থাৎ দু'বছর পরে এবারকার দেখা।

মিঃ ভার্মা নতুন কোন কথা খুঁজল না। একটু আত্মমগ্ন হ'ল। কিছুক্ষণ আগে সে তার বুকের মধ্যে রিণির শরীরের নরম স্পর্শ পেয়ে বুঝতে পেরেছিল, গত দু'বছরে রিণি অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেক বড়। রিণির এখনকার মুখটা যেন তার কতকালের চেনা। প্যারিসের প্রসিদ্ধ ভেনাস মূর্তিটার মত; ধুলোয় ঢাকলেও চিনে নিতে অসুবিধা হয় না—সৌন্দর্য উপচে পড়ে। রিণির মুখের আদলে অনেক কাল আগে চেনা সেই বিশেষ একটি মুখের মত প্রশান্ত প্রলেপ মাখানো। তেমনি স্বচ্ছ সুন্দর হাসি খুশি দৃষ্টি। সেই জোয়ার ভাকা পূর্ণিমার সঙ্গে বিন্দুমাত্র তফাত নেই।

রাত সাতটা পর্যন্ত ঘন ঘন ঘড়ি দেখা পায়চারি করা এবং টুকটাক কথায়

সময় কাটে।

মিঃ ভার্মা একসময় চিন্তিত হয়ে বলে, তোমার মামনি আসবে না। লেট আস এ্যাভেল এ ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিতে বসে সমস্ত পথ পাড়ি দিতে দু'জনে প্রায় নির্বাক থাকল। রিণির ম্লান মুখ ট্যাক্সির জানলা দিয়ে আকাশে। তার কোয়ারা উচ্ছ্বাস এবং চাঞ্চল্য স্তব্ধ। পাশে বসে থাকা মিঃ ভার্মার নীরবতায় সে সবিশেষ বিস্ময়বোধ করে। দু'বছর পরে বাবার সঙ্গে দেখা—অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেসব উবে গিয়ে শুধুই বিষণ্ণতা। সারাটা পথ আকাশ ভরা তারা দেখা। আকাশ থেকে খসে পড়া চুমকি দেখে বিব্রত বোধ করা।

বিলাস বহুল বিরাট প্রাসাদের অভিজাত ডাইনিং টেবিলে বসে গুমোট গাম্ভীর্যের নিস্তব্ধতা নিয়ে খাবার খেল মিঃ ভার্মা। পাশে চুপচাপ বসে রিণি অপরিমিত নিরুৎসাহে বিষণ্ণ বোধ করে।

ড্রইংরুমে দীর্ঘক্ষণ নির্বাক বসে ম্যাগাজিন জার্ণালের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অস্বস্তির পর্দা সরিয়ে রিণিই প্রথম জিগ্যেস করে, তোমার ভবিষ্যত ঠিক আছে তো?

—বিলকুল ঠিক হ্যায়

—দেন হোয়াই আর য়্যু সো মুমি? বহুত ছোটাসে ম্যায় দূর হোস্টেলমে। যব হাম ঘর আতি তুম বাহার; তুম ঘরমে তো হোস্টেলসে মেরী ছুট্টি নেহি মিলতি। দো সাল বাদ দেখা লেকিন—

—আই এ্যাম রিয়েলী সরি। রিণির কথা শেষ করতে না দিয়ে ঝটিতি জবাব দেয় মিঃ ভার্মা। বলে, নীতা কে ধ্যানমে ম্যায় বহুৎ পরিশান হু।

—ডোন্ট ওরি। শুনা, ফ্যাক্টরীমে লেবার ট্রাবল চলছে। সেজন্য হয়তো—

—ফ্যাক্টরীতে ফোন করেছিলাম। সী সেকট অ্ব ফ্যাক্টরী অফিস এ্যাট ফাইভ ও ক্লক।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মিঃ ভার্মা ডাকল, রিণ্

—ইয়েস ড্যাডী

—তোমার হোস্টেল সুপার যে তোমাকে বহুত ভালবাসে, কী নাম যেন? ম্যায় তো ভুল গিয়া—

—রমেশ মামা?

—হাঁ হাঁ আতি ইয়াদ আয়া। আই হ্যাভ নেভার সীন হিম। কিন্তু তোমার

মুখে বহুৎ নাম শুনেছি।

—রমেশ মামা বিলকুল আপনা মামা কা মাফিক। এবার ছুটিতে আমি রমেশ মামার সাথেই এসেছি।

—একরোজ উনকো ইনভাইট করো। হাম ভি মিল সেকে।

—কিন্তু আমি কী করে ইনভাইট করবো। মামণি বাহার যেতেই দেয় না। ডে এ্যাণ্ড নাইট স্লেক রেকর্ড প্লেয়ার এ্যাণ্ড ম্যাগাজিন - বহুৎ বোরড লাগতি। একরোজ রমেশ মামা এসেছিল। তিনহো মে বহুৎ বাত চিত গোসিপ হুয়ি। রমেশ মামাকো খানা খিলাকে তব ছোড়া।

মিঃ ভার্মা একটু বিস্ময়ের সঙ্গে অনুযোগ দিয়ে বলল, ইউ আর নো মোর বেবি। বিলকুল ইয়াং লেডি। তবু নীতা তোমাকে বাহার যেতে দেয় না?

—হাঁ। সী ইজ মেন্টালি ভেরি কাওয়ার্ড এ্যাণ্ড ব্যাক ডেটেড।

—ভেরী ট্রেঞ্জ। এ্যারসা তো নেহি থি। আই থল ইন লাভ থর হার একট্রা অর্ডিনারী থরওয়ার্ডনেস।

রিণি সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে বলল, গাট মিনস্ তোমাদের লভ ম্যারেজ? পহেলে বার শুনছি। কনগ্রাচুলেশান।

মিঃ ভার্মা বর্ষার জলের মত রিণির প্রাণোচ্ছল হাসিতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল এই হাসির সেতুবন্ধে অনেককাল আগেকার চেনা একজোড়া প্রাণোচ্ছল দুষ্টুমিভরা চোখ দেখতে পেল। রিণির সোনার কণ্ঠস্বরেও যেন পূর্ব পরিচিত একটি কণ্ঠের অনুরণন। মিঃ ভার্মা আনমনা হয়ে বসেছিল। রিণি পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে মিঃ ভার্মার গালের কাছে মুখ আনল। চুলের অরণ্যে আঙুলের আঁচড় কেটে অনুযোগ দিল, তুমি কিরডি ভারী বদমিয়া।

মিঃ ভার্মা নিরুত্তর স্মৃতির ডানা ওড়াতে থাকে। চোখ বুজে শরীরময় শিহরণ অনুভব করে। অতীত স্মৃতি নিয়ে বড় বেশি আলিঙ্গন করে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয়। ছুটন্ত গাড়ির গতি কমানোর মত দক্ষতা দেখিয়ে রিণিকে কাছে টেনে নেয়। সহজ স্বাভাবিক আলতো হেসে বলে, এইতো হাসছি।

রিণি খুশি হয়ে কাছে সরে আসে। মিঃ ভার্মার বুকে মুখ রাখে। ওর সরু মসৃণ আঙুলগুলো মুঠোয় নিয়ে আদর করে মিঃ ভার্মা। দৃষ্টি নিবদ্ধ-ঘুরে দেয়ালে টাঙানো অয়েল পেইন্টিং ছবিতে। নিচে ছোট্ট ক্যাপসন, আদম ইভ।

কোন কথা নেই। দীর্ঘক্ষণ বোবা নিস্তব্ধতা। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। রিণি উঠতে যাচ্ছিল। তার আগেই মিঃ ভার্মা ব্যস্ত পা ফেলে ঝটিতি এগিয়ে

যায়। রিসিভার তুলে হ্যালো এবং হাঁ হাঁ। ইয়েস। ইয়েস। ইয়েস। থ্যাঙ্ক ইউ। ওকে।

কোন প্রশ্ন নয়। অন্য কোন জবাব নয়। যেন সাঙ্কেতিক কিছু বাক্য বিনিময় হ'ল। গতানুগতিক নীরবতা ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে রিসিভারটা রেখে দেয় মিঃ ভার্মা।

রিনি বলে, আই অ্যাম ওভার সীওয়—মামণির কোন।

—হাঁ। ক্রম নার্সিং হোম।

—হোয়াট হ্যাপেণ্ড? প্রায় চমকে ওঠে রিনি।

—ডরনে কো কোই বাত নেহি। মিঃ ভার্মা অভয় দিয়ে বলে, মাইনর এ্যাক্সিডেণ্ট অন দ ওয়ে টু এয়ারপোর্ট। থোড়াসা জখম হুয়ি।

রিনি নার্সিং হোম যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। মিঃ ভার্মা আদর করে গাল দু'টো টিপে দিয়ে বলে, ইউ রিল্যাক্স, আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি। রিনি দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে জেগে বসেছিল।

মিঃ ভার্মা একা ফিরে এল। বলল, তোমার মামণি এখন ঘুমোচ্ছে। থোড়া সা চোট লাগা। লেকিন, প্লাস্টার করতে হয়েছে।

রিনি সহজ হতে পারল না। চোখে মুখে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং বিবর্ণতা আরো প্রকট হয়ে উঠল। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগল। রাত্রের খাবারে মন বসল না।

খাওয়া শেষ হতে মিঃ ভার্মা বলল, নার্ভাস হনে কা কোই বাত নেহি। যাও আরামসে ঘুমিয়ে পড়।

হঠাৎ বৃষ্টি এলো। বাইরে বিদ্যুতের চমক লাগানো বৃষ্টি। ঠাণ্ডা দমকা হাওয়ায় শরীর মনে শিহরণ জাগে। রোমকূপে রীতিমত কুঞ্চন ও অনুরণন। অস্বাভাবিক একটা জড়তা অনুভব করে রিনি। এর আগেও সে অনেকবার ঝড় এবং বিদ্যুৎ চমক দেখেছে অথচ আজকের প্রাকৃতিক দুর্যোগটা কেমন যেন বাড়াবাড়ি এবং রোমাঞ্চকর লাগল।

শিয়রের কাছে আলো জেলে আধশোয়া অবস্থায় জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছিল মিঃ ভার্মা। রিনিকে ঘন ঘন এপাশ ওপাশ ফিরে শুতে দেখে জিগ্যেস করল, ঘুম আসছে না বেটি?

—হাঁ।

মিঃ ভার্মা উঠে গিয়ে জানলার পর্দাগুলো টেনে দিল। রিনির গায়ের

চাদরটা পরিপাটি জড়িয়ে দিল। শিয়রের কাছে বসে বাতিটা নিভিয়ে দিল। তারপর রিনির চুলে আলতো আঙুল বুলিয়ে বলল, আভি আ যায়েগা। ট্রাই টু আম্লিপ।

রিনির চোখে তন্দ্রা এলো। মিঃ ভার্মা নিজের খাটে ফিরে যেতে তৎপর হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে প্রচণ্ড গর্জনে একটা বজ্রপাত হ'ল। রিনি চমকে উঠে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মিঃ ভার্মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অস্পষ্ট আওয়াজ তুলল, মামনি।

মিঃ ভার্মা হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালে। বিস্মিত চোখ মেলে নিদ্রিত রিনির মুখের দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকে।

এ কী দেখছে সে? উজ্জ্বল স্নিগ্ধ প্রশান্ত মুখ। মুখের ওপর বিন্দু বিন্দু মুক্তোর সাথে থাকা কয়েকটা রেশমি চুল। অনেক কাল আগেকার সেই মুখের আদলে ঠিক তেমনি চোখ মুখ চিবুক। মিঃ ভার্মা আকস্মিক রক্তচাপ অনুভব করে। স্পর্শ গন্ধ মাদকতায় ক্রমে শিরা উপশিরায় জোয়ার আসে। মনের ভিতর দ্বন্দ্ব-লড়াই চলে। মনে মনে ভাবে, রিনি যদি আমার মেয়ে না হতো।

এক সপ্তাহ হয়ে গেল নীতা ঘরে ফিরে এসেছে। ডাক্তারের নির্দেশ মত বিকেলের ম্লান আলোয় প্রাসাদের সামনে সবুজ লনে আস্তে আস্তে পায়চারি করছিল নীতা। ছুটির দিন। রিনি তার বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নীতা কিছুটা পরিশ্রান্ত হয়ে লনের ওপর সাজানো বেতের চেয়ারে বসল। পায়ের প্লাস্টারের ওপর হাত বোলায়। ডাক্তার বলেছে, খুব সম্ভবত তিন সপ্তাহ শেষে ব্যাণ্ডেজ খোলা যাবে। অর্থাৎ এখনো সপ্তাহ দুই বাকি। নীতা বিমর্ষ হয়ে গা এলিয়ে দেয়। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, আজকাল তার মেজাজটা কেমন যেন তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছে। সে নিঃসঙ্গ বোধ করে। রিনি যেন আজকাল তাকে একটু এড়িয়েই চলতে চেষ্টা করে। খুব একটা কাছে আসে না। মিঃ ভার্মার কাছাকাছি থাকতেই ভালবাসে।

রিনি রোজ সন্ধ্যায় তার বাবার সঙ্গে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যায়। ক্লাব রেস্তোঁরা সিনেমা মার্কেটিং ইত্যাদি লেগেই আছে। বাড়িতে থাকা সময়টুকুতে নিজের রিডিং রুমে নয়তো মিউজিক জার্নাল নিয়ে পড়ে থাকে। বাবার সঙ্গে যাবা খেলে কিংবা খুঁজে খুঁজে কচিৎ তার এক আধটা পাকা চুল তুলে দেয়।

গল্প করে। গল্প শোনে। প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্যের সংস্কার মুক্ত জীবনের নোংরা কথা শোনে। শুনে উৎফুল্ল হয়। নীতা জলে পুড়ে একশেষ।

গাড়ি বারান্দার নিচে বিলিতী ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে।

নীতা গাড়িটার দিকে লক্ষ্য রাখছিল। সে হাসপাতাল থেকে এসে অবধি সর্বক্ষণ একটা সন্ধানী তির্যক দৃষ্টি ছড়িয়ে রাখে। অতি ছোট্ট ভুল ত্রুটিগুলোকেও বড় করে দেখে। বড় বেশি খুঁতিয়ে দেখতে গিয়ে সামান্ত সহজ ব্যাপারটাকেও কেমন যেন তিক্ত করে তোলে।

কিছুক্ষণ বাদে মিঃ ভার্মা এবং রিনি চমক লাগানো পোশাক প্রসাধনে প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে এল। দু'জনেই খুশি ঝলমল। ক্রমশ লনে নীতার কাছে এগিয়ে আসে। রিনি একটু দূর থেকেই ডাকল, হাই মামনি। নীতা বিষণ্ণ চোখ তুলে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। রিনি কাছে এসে অনুযোগ দেয়, একটু লেট হয়েছে, ব্যস ভারী বন গিয়া। সো সেন্টিমেন্টাল।

—এ্যাণ্ড কনজারভেটিভ। মিঃ ভার্মা চেয়ারে বসে অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য জুড়ে দেয়।

আসলে এই দু'টো শব্দই রিনি তার মা-র প্রসঙ্গে প্রায়শ বলে থাকে। সেজন্তেই হয়তো মিঃ ভার্মা বাকি শব্দটা যোগ করে দিল। রিনি তার বাবার মন্তব্যে মনে মনে ভয় পেল। তার মুখের হাসি এবং উচ্ছলতা স্তিমিত হয়ে যায়। ঝড়ের আশঙ্কা করতে থাকে।

কেননা, এ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে রিনি তার মা-র আচার আচরণে অনেক সময় অস্বাভাবিক অস্থিরতা লক্ষ্য করছিল। মনে হয়েছে, বাবা এবং মামনি—এই দু'জনের মধ্যে বোধহয় খুব একটা বনিবনা নেই। মামনি একটু সেকেলে। বাবা অনেক বেশি আধুনিক এবং উদারপন্থী। ঠিক সেকারণে কিনা তা না বুঝলেও রিনি অনুমান করতে পারে, মামনি যেন বাবাকে কিছুটা ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের চোখে দেখছে। মা-র প্রতিও বাবা-র অহেতুক অবহেলা এবং ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্ত নজরে পড়ার মত।

লনের টেবিলেই বিকেলের চা জলখাবার এলো। তিনজনে নির্বাক বসে খাবার খেল। শুধুই শুমোট নিস্তব্ধতা। মিঃ ভার্মা এবং রিনি বেড়াতে বেরিয়ে সহজ হতে পারল। বুকে জমাট কান্না নিয়ে নীতা দীর্ঘক্ষণ সন্ধ্যা-অন্ধকারে লনের চেয়ারেই বসে থাকল।

যথাসময়ে নীতার পায়ের প্লাস্টার কাটা হল।

প্রথম কয়েকটা দিন হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। ডাক্তার বলেছে, সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিক আগের মত চলা ফেরা করতে পারবে। তবে শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় নেবে। মানসিক ভীতি, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতাই এই দুর্বলতার সূক্ষ্মতম কারণ।

ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনে মিঃ ভার্মা দুর্গাপুর যাবে।

খবরটা নীতার কানে রিণিই প্রথম পৌঁছে দিল; এবং বলল, মামণি আমি কোনদিন দুর্গাপুর ব্যারেজ দেখিনি।

রিণি কী বলতে চাইছে তা বুঝতে নীতার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হ'ল না। বেশ কিছুটা রাগত স্বরে জবাব দিল, তুমি কচি খুকি নয়—তোমার এখন বয়েস হচ্ছে। এ বয়সে উচ্ছ্বাস থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা হরিণের শিং এর মতই সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর।

নীতা ইংরেজি এবং হিন্দীতে দখল থাকা সত্ত্বেও সাধারণত বাংলাতেই কথা বলে থাকে। মিঃ ভার্মা এবং রিণি বুঝতে পারলেও মাঝেমাঝে অনেক বাংলা শব্দের অর্থ বুঝে উঠতে পারে না। বিশেষত নীতা রাগত অবস্থায় যে সব কথা বলে তা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য মনে হয়।

এক্ষেত্রেও রিণি তার মা-র মুখে শোনা কথার সঠিক অর্থ খুঁজে পেল না। কিন্তু বুঝতে পারল, মা একটা কিছু খারাপ ইংগিত করতে চাইছে। স্বভাবতই মনক্ষুণ্ণ হ'ল। কিছুটা হতাশ হয়ে ম্লান মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিঃ ভার্মা তার কাজের ঘরে বসে একটা জরুরী ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছিল। চুরুটে আগুন ধরাতে গিয়ে দরজায় দাঁড়ানো রিণির দিকে নজর পড়ল। একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, আও আও—আন্দার আও। ইজ দেয়ার এনিথিং রং?

রিণি কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। চোখ দু'টো ছল ছল করে উঠল। অগত্যা মিঃ ভার্মা ফাইল বন্ধ করে রিণিকে কাছে ডেকে পাশে বসালো। কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, মনে হচ্ছে, তোমার মামণি কুছ ইল বিহেভ করেছে। অ্যাম আই রং?

রিণি তার মায়ের কথাগুলো হুবহু জানাল। মিঃ ভার্মা মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেও সহজ ভঙ্গিতে রিণিকে কাছে টেনে আদর করে বলল, ডোণ্ট টেক ইট

সিরিয়াসলি। ইউ আর এ মডার্ণ গার্ল। তোমার মামণির মত দেহাতি বা ব্যাক ডেটেড হলে চলবে কেন। আমি জানি সে আজকাল সিনিক হয়ে যাচ্ছে। ননসেন্স।

শেষের কথাগুলো দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল মিঃ ভার্মা। চোখে মুখে তীব্র উত্তেজনা এবং ক্রোধ ফুটে ওঠে। অস্পষ্ট স্বরে স্বগতোক্তির মত আরো কী সব বিড় বিড় করে। রিনিকে উদ্দেশ করে বলল, গো ব্যাক টু ইওর মামণি। বলো, ড্যাডী তৈয়ার হনেকো বলা। উই উইল স্টার্ট ফর দুর্গাপুর উইদিন এ্যান আওয়ার।

নীতা আপত্তি তুলে বলল, তোমরা যাবে যাও—আবার আমাকে কেন?

মিঃ ভার্মা এক ঝিলিক উলঙ্গ হাসি ছড়িয়ে সহজ খোলা মনে বোঝাল, তিনো রহেনেসে ব্যায়দা মজা আয়েগা। বাহার ঘুমনেসে দিলভি বহেলেগা। তাছাড়া তুমিও তো ব্যারেজ দেখনি।

নীতা বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে ধরল। নতুন করে কথা বাড়ালো না।

বিকেল। দুর্গাপুর দামোদর নদীর ওপর ব্যারেজে দাঁড়িয়ে তিনজন—মিঃ ভার্মা, নীতা এবং রিনি।

মিঃ ভার্মা একটু উন্মনা হল। দূরে বাঁকুড়ার রুক্ষ লাল বুক বেয়ে দামোদরের মন্দস্রোত সর্পিল পথ। যতদূর দেখা যায় ধূ ধূ বালুচর। বালুচরে ইতস্তত কিছু লতাগুল্মের ঝোপঝাড়। আরো দূরে গ্রাম। গ্রামের সবুজের সঙ্গে আকাশটা মিশে গেছে যেন। মিঃ ভার্মার মনে রিক্ত বালুচর আর শীর্ণস্রোতা নদীর প্রভাব প্রকট হয়ে উঠল। বুকের ভিতর অনেক গভীরে দীর্ঘদিনের একটা জমাট ব্যথা কেমন যেন তোলপাড় করে উঠতে চাইল। সে আরো একটু প্রশান্ত নীরবতা প্রত্যাশা করল। লোকজন গাড়ি কোলাহল ভাল লাগল না। পায়ে পায়ে একটু এগিয়ে গেল।

বাঁধ দেয়া জলে অঢেল যৌবন। মধ্যিখানে মাটির চর পড়ে একটা দ্বীপের মত সৃষ্টি হয়েছে। কিছু গাঙচিল সেই দ্বীপটাতে বসে। কিছু জলের ওপর ভাসছে।

যেদিকটা বাঁধের শেষ সেদিকে এগিয়ে যায় মিঃ ভার্মা। ফুল এবং হরেক রকম বাহারী গাছ দিয়ে সাজানো বাগিচা। কয়েকটা পার্কের বেঞ্চি বসানো। একটা বেঞ্চিতে নীতা এবং রিনি বসে আছে। একসময় মিঃ ভার্মা ওদের পাশে গিয়ে বসে।

পশ্চিম আকাশে একটু আগে সূর্য অস্ত গেছে। সামনের জলে তার রক্ত-রেশ। ঝিরঝিরে হিমেল হাওয়া বইছে বিক্ষিপ্ত ভাবে। মিঃ ভার্মার মনে অনেকক্ষণ আগেকার পুরনো স্মৃতিটা উড়ে এসে বসল। শ্রী বৈজয়ন্তীর মুখটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল রিনির মুখে। তার সমস্ত শরীরে অস্থিরতা আত্মগ্লানি এবং ঘাম ফুটে উঠল। মনের কাছে প্রশ্ন রাখল, সী গিভস হার বেষ্ট অব লাভ কর মী। বাট আই?

এই মুহূর্তে মিঃ ভার্মার মনে হ'ল, নীতার অনেক বয়স হয়েছে। মুখের চামড়ায় বেশ ভাঁজ পড়েছে। চোখের কোণে দৃষ্টিকটু কালচে দাগ। অর্থাৎ সে আর দৃষ্টি আকর্ষণী সুন্দরী নয়—যে সৌন্দর্যের নেশায় সে একদিন বৈজয়ন্তীকে খুব বদনাম দিয়েছে। সাজানো ঘটনা পরম্পরায় ডিভোর্স করতে পেরেছে।

যেন কিছুক্ষণ ধরে মিঃ ভার্মা আত্মবিলাপ অনুশোচনা এবং বিবেক দংশনে সময় কাটালো। পাশে বসে থাকা নীতা এবং রিনির অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। স্মৃতিচারণে ছেদ পড়ল রিনির কথায়। রিনি বলল, মামনি ইজ ফিলিং আনইজি।

অর্থাৎ উঠে পড়া এবং ফিরে যাওয়া দরকার—বুঝতে পারল মিঃ ভার্মা। উঠে দাঁড়াতে নীতার সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। কিন্তু কোন কথা নয়। যেন একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছে।

বাংলোয় ফিরে নীতা বালিশে মুখ গুঁজলো। দু'চোখে অনেক দিনের পুঞ্জীভূত দুঃখ ক্ষোভ অভিমান ঝরতে থাকল। মিঃ ভার্মার ওপর ঘৃণা অবিশ্বাস এবং ক্রোধে দারুণ জ্বলতে থাকল।

মিঃ ভার্মা ঘরে ঢুকে আলো জেলে দিল। নীতা বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে জিগ্যেস করল, বাত্তি কিঁউ নাহি জালায়া?

—রিনি কোথায়? নীতা প্রশ্ন এড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে।

—বাহার মে। আভি আ যায়গী। লেকিন তুমহারা ভবিষ্যত ক্যায়সা?

—এতদিনে এই প্রথম জিগ্যেস করার সময় হল?

—ডক্টর বোলানা জরুরী হো তো বল দেনা।

—কী হবে ডাক্তার ডেকে? সব রোগ ডাক্তারে সারানো যায় না।

—রিয়েলি। তব দিল বীমার হো ডক্টর সে ক্যায়া ইলাজ হোগা।

—সেজন্য তুমিই দায়ী। তুমি ঠিকঠাক থাকলে অমন বীমার হোত না।

—ভাট মিনস্ তুমহারা মালিক ব্যাক ডেটেড ভাবনা ঔর সংস্কার লিয়ে চলনা জরুরী হ্যায় ?

—সংস্কার আছে বলেই এখনো সমাজে পবিত্রতা আছে।

—আই নেভার বিলিভ ইট। ওসব পাপপুণ্য পবিত্রতা হাম নাহি মানতা। আই স্তাল নট পাস দিস ওয়ে এগেইন। সো, দিল জো চাহাতা হ্যায়, ইট মাই বি নাও—নো ডিলে।

—সেজন্যেই ভাবছো নীতার দিন খতম হয়ে গেছে। আমাকে আর দরকার নেই—তাইতো ?

—কোয়াইট সো। লেকিন ম্যয়নে তুমকো মিষ্টি কে বর্তন কী তরহ সমঝকর নাহি ফেক দিয়া। বহুত আদমী এ্যায়সা করতা।

—করুণা। দাক্ষিণ্য। বিদ্রূপ করে বাঁকা হাসল নীতা। বলল, এটা তোমার মহানুভবতা নয়। এখনো আমাকে প্রয়োজন আছে বলেই মাটির ভাঁড়ের মত ফেলা সম্ভব হচ্ছে না—তা আমি জানি।

—স্যাটস্ ইওর রং আইডিয়া। সো ফুল ইউ আর। তুম যো প্রোপারটিকো আপনা শোচতা—ও বিলুকুল ভুল হ্যায়। অল ভাট প্রোপারটি পার্চেজড্ বাই মাই দি দেন পার্টনার মিঃ মেহেরা। কান খোলকর শুন, আভি হামারে বিজনেস মে কোই পার্টনার নেহী হ্যায়। নো মোর পার্টনার টু ডে। এ্যাণ্ড অল হিজ প্রোপারটি আর আণ্ডার মাই কাস্টোডি।

—এবং সেজন্যেই বোধহয় আজকাল আমার মুখোমুখি বস না। মন জুগিয়ে ভাল ভাল সাজানো কথা বল না। এমন কী গত একটা বছর কীভাবে কাটালাম তাও জানতে ইচ্ছে করে না।

—ইউ ক্যান থিঙ্ক এ্যাজ ইউ লাইক। তুমহারী তবিয়ত ঠিক নেহী। আই ডু নট লাইক টু ডিসটার্ব ইউ।

মিঃ ভার্মা রাগত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুর্গাপুরে এই যে বাংলোটায় মিঃ ভার্মা উঠেছে এটি ওর এক বন্ধুর। ছোট্ট বাংলো, অনেক পুরাতন। মোট তিনটি ঘর। বাংলোর সামনে এক চিলতে লন। বাংলোটি দেখাশোনার জন্য একটি ঘরে একজন লোক থাকে। বাকি দু'টো ঘর এখন মিঃ ভার্মার দখলে। মালিক বন্ধুটি মাঝে মধ্যে এখানে এসে ফুর্তিটুর্তিতে সময় কাটিয়ে যায়। সেজন্য একটা বড় খাট আলমারী এবং কিছু

আসবাবপত্র আছে। খাটটা দু'জনে সহজে শোবার মত। অসুবিধা হলেও তিনজনে চালিয়ে নেবার মত।

শাতে বেশ জোরে বৃষ্টি নামল। অসময়ে বৃষ্টি —আবার সহসা থেমে গেল। দূরে বন জঙ্গল থেকে পেঁচা শেয়ালের ডাক শোনা গেল। পাশের বস্তি থেকে একটা নেড়ি কুত্তা রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে বেশ কিছুক্ষণ শ্রুতিকটু হাঁক ডাক দিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

একই খাটে শুয়ে যথাক্রমে মিঃ ভার্মা এবং অন্য মুখী শুয়ে নীতা। রিনি ঘুমোচ্ছে। বাকি দু'জনের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। জানালা দিয়ে ঝির ঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। পাতলা একটা চাদর তিনটি শরীরের ওপর ছড়ানো। অথচ, সকলেই যেন অন্যজগতের।

চাদরের নিচে উত্তপ্ত হতে থাকে মিঃ ভার্মা। নীতা ঘুমিয়েছে কিনা বোঝার চেষ্টা করে। কিছুটা স্বস্তি দোলায় দুলতে থাকে। রিনিকে কিছুতেই নিজের মেয়ে ভেবে নিতে পারে না। এবার ক্রাস কাউন্টারে দাঁড়িয়ে এবার ইণ্ডিয়া কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েটির প্রতি প্রবুদ্ধ দৃষ্টিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। ভাবে, হারানো বৈজয়ন্তী বোধহয় রিনির মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

মিঃ ভার্মা ক্রমশ এক অদ্ভুত মাদকতায় নিজের ভারসাম্য হারাতে থাকে। অন্যমুখী নীতা শুয়ে।

মিঃ ভার্মা হাতের কনুই-এ শীতল নগ্ন স্পর্শ পায়। শরীরময় রক্তচাঞ্চল্য ছড়িয়ে যায়। একটু নড়েচড়ে অপর হাত আলতো করে নিদ্রিত রিনির বাঁকানো শরীরের ওপর রাখে। হাতটা ক্রমশ অশান্ত হয়। অন্ধকারে অনুমানে মুঠোরা চোরের মত বৈজয়ন্তী হাতড়ে বেড়ায়।

অবিশ্বাস্য নোনতা স্বাদে রিনি জেগে ওঠে। তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্ন স্বপ্ন গ্লানিতে কুঁকড়ে আরো ছোট হয়ে যায়। শরীরময় কী যেন কী যেন একটা উষ্ণ প্রস্রবন দাপা-দাপি করে ওঠে। মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে অন্যমুখী শুয়ে থাকা মাকে জড়িয়ে ধরে।

নীতা একরকম লাফিয়ে উঠে ঘরের আলো জ্বালল। বিছানার দিকে তাকাল। মিঃ ভার্মা এবং রিনি কপট ঘুমে শুয়ে।

নীতা দরজা খুলে সামনের ঘরে চলে যায়। সেই সুযোগে একরাশ শীতল হাওয়া পর্দা উড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে।

কিছুক্ষণ শীতল নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ তরঙ্গের মত ঢেউ খেলে ডুকরে ডুকরে কান্নার একটা আওয়াজ ঘরের ভিতর তিরতির প্রবাহের মত আসতে থাকে। কান্নাটা যে কার মিঃ ভার্মার বুঝতে অসুবিধা হ'ল না।

একটা অবশ চেতনা নিয়ে সামনের ঘরে যায় মিঃ ভার্মা।

জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে নীতা। বাতাসে তার এলো চুল এবং কাপড়ের আঁচল উড়ছে। পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে মিঃ ভার্মা জিগ্যেস করে, তুম ইতনি ঠানর্ঢাক মে কিঁউ খাড়িহো?

নীতা কোন জবাব দিল না। মিঃ ভার্মা অধৈর্য হয়ে বেশ কয়েকবার একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে নীতা বেশ বিরক্তির সঙ্গে ঝাঁজালো মেজাজে এক সময় জবাব দেয়, ইচ্ছা হ'ল তাই।

—ইউ কান্ট ডু সো।

—হাঁ পারি। নিজের ইচ্ছা মতই এবার থেকে আমাকে চলতে হবে অনেক সহ্য করেছি।

—এ্যাণ্ড নাও, হোয়াট ইজ ইওর ডিজায়ার?

—মুক্তি। তোমার মত ইতর পশুর হাত থেকে মুক্তি।

—ইট্স এ গুড স্টেপ কর ইউ এ্যাণ্ড মী। দরওয়াজা খোলা হ্যায়।

—আমি জানি। কাল সকালেই রিনিকে নিয়ে আমি চলে যাব।

—হোয়ার?

—যেদিকে খুশি।

—কোই বাত নেহি লেকিন রিনি ইহা রহেগী। আই কান্ট লীভ হার ইন ডেজার্ট অর ফুটপাথ।

—কোন অধিকারে ওকে রাখতে চাইছো?

—ইন ভার্চ রাইট এ্যাট হইজ বেয়ারিং হার লায়বিলিটিস্।

—সেটা নিঃস্বার্থে নয় তা আমি জানি। কিন্তু আমার মেয়েকে নিয়ে তোমাকে ইতরামি করার সুযোগ আমি দেব না।

—তোমহারী আঁখে বহুত কমজোর হ্যায়। বাট রিগার্ডিং ক্যারেকটার তুমহারা কুছ বলনা বহুত বুড়া লাগতা। ডোন্ট ফরগেট, ইউ আর নট এ্যাট অল মাই ম্যারেড ওয়াইফ। কিয়উি হাম তুমকো বহুত ইজ্জত সে রাখ্যা। হাম এভি জানতে, ইউর হ্যাজবাণ্ড মিঃ সেন—কা কোই বালবাচ্চা নেহি থা। তুমহারী এক লড়কী হ্যায়—এভি শুনায়া পুরা ছয় সাল বাদ। আই থিঙ্ক সী

ইজ ইওর ইললেজিটিমেট ডটার।

—যদি তাই হয়।—তোমার তাতে কী এসে যায়।

—য়িনি মেরা আপনা খুন কী লেড়কী নেহি। আই নেভার গট সাচ এ্যান অপরচুনিটি টু ব্রিং হার আপ এ্যাজ এ কাদার। হাম কভি উসকো আপনা লড়কী নাহী সোচা।

—অতএব তাকে ভোগ করা চলে তাইতো? আমি তোমাকে—

—মার্ডার করেগা। ব্যায়সা আপনে পভিকো কিয়া?

ধপ করে নিভে যাওয়ার মত নীতা স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখে মুখে ভয়ার্ত বিস্ময় ফুটে ওঠে। অজানা আশঙ্কায় ভীষণ অসহায় বোধ করতে থাকে।

মিঃ ভার্মা বুঝতে পারল, নীতা নিদারুণ ভাবে পরাস্ত হয়েছে। সুতরাং অসহায় অবস্থায় বাগে পেয়ে পুনরায় বলল, চুপচাপ কিউ—হাম কুছ ঝুট বোলা? আই হ্যাভ নাথারল অফ ডকুমেন্টস এ্যাজ এভিডেন্স। ইফ আই সো লাইক, আই ক্যান হ্যাণ্ড ইউ ওভার টু পুলিশ এ্যাট এনি টাইম।

—তা তুমি পার। কেননা, তোমারই চক্রান্তে আমি এখন খুনী—তা আমি জানি।

—আভি শোচ লিজিয়ে পুলিশমে জানেকে বাদ য়িনিকা হাল ক্যায়া হোগা।

—সেটা আমি ভেবেছি। ভেবেছি বলেই তোমার স্ত্রী বৈজয়ন্তীকে কথা দিয়েও আজ প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে। উপায় নেই। আমি জানি সত্যকে গোপন রাখতে গিয়ে য়িনিকে ক্রমশই বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

—কিয় কই নয়া চাল মালুম হোতা।

—যা খুশি ভাবতে পার। কিন্তু য়িনি তোমারই মেয়ে এটা নির্মম সত্য। তোমাদের ডিভোর্সের সময় বৈজয়ন্তী প্রেগন্যাণ্ট ছিল।

—ইজ ইট টু? চমকে উঠল মিঃ ভার্মা।

—কর গর্ডস্ সেক—এতটুকু মিথ্যে বলছি না।

—বৈজয়ন্তী কাঁহা?

—বেঁচে নেই।

—কেন?

—অধৈর্য হয়ো না। বলছি। সবটুকু শুনলে দেখবে তোমার চাল আর জালে তুমি নিজেই জড়িয়ে গেছো।

মিঃ ভার্মা কিছুতেই ধৈর্য রেখে শান্ত থাকতে পারল না। দারুণ বিচলিত

হয়ে নীতার হাত ধরে অনুনয় করে বলল, আই বিলিভ ইউ। ছুপাইয়ে যাত্। জলদি বলিয়ে—হাম বিলকুল তৈয়ার হায়।

নীতা কিছুটা উদাস হয় অতীতে স্মৃতি চিত্রে হারিয়ে গেল।

নীতা নামে মহিলাটি তখন বিধবা। কিন্তু বৈধব্যকে সে কোন দিক থেকেই মেনে নেয়নি। উত্তর প্রদেশের অবাঙালী মিঃ ভার্মার সঙ্গে তখন তার প্রেম প্রণয় খেলা চলছে। দু'জনের অবাধ মেলামেশায় কোন বাধা ছিল না। নীতা জানতই না যে মিঃ ভার্মা প্রকৃত পক্ষে বিবাহিত ; এবং তার স্ত্রী বৈজয়ন্তী থাকত উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে। সুতরাং মিঃ ভার্মার বাড়িতে একাধিক বার রাত কাটালেও নীতা জানত, মিঃ ভার্মা চিরকুমার। সোসাইটিতেও একটা গুঞ্জন শোনা যেত, 'চিরকুমার মিঃ ভার্মা তাহ'লে সত্যিই বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে চলেছে।' নীতার মনেও তেমন একটা গোপন ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কোন একদিন বিকেলে নীতা মিঃ ভার্মার সঙ্গে পার্টিতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল—এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। নীতা ভাবল, বুঝিবা মিঃ ভার্মাই দেরী দেখে অধৈর্যে চলে এসেছে। অথচ, দরজা খুলে দেখল, তার এক বান্ধবী আরতির স্বামী মিঃ রমেশ শর্মা সামনে দাঁড়িয়ে।

নীতা অবাক হয়ে বলল, আপনি ? লক্ষ্ণৌ থেকে কবে এলেন ?

মিঃ শর্মা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, কাল।

—আসুন। ভিতরে এসে বসুন।

মিঃ শর্মা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়েই বলল, না। ভিতরে যাব না। বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। এক্ষুণি আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কিন্তু কোথায় ? আমার যে একটা জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—তবু আপনার যাওয়া দরকার। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছি। চলুন ট্যাক্সিতে যেতে যেতে সব শুনবেন।

মিঃ রমেশ শর্মার কলকাতায় জন্ম। কলকাতাতেই পড়াশুনো করেছে। ওর স্ত্রী আরতি বাঙালী। পরিষ্কার বাংলা বলে মিঃ শর্মা। বাংলাতেই সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল।

সেদিনই প্রথম জানলাম, মিঃ শর্মার বোন বৈজয়ন্তী নামে তোমার বিবাহিত স্ত্রী আছে।

বৈজয়ন্তীর মৃত্যু শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে খুব অস্পষ্ট স্বরে কষ্টকর বাংলায় বলল, আপনি নীতা দেবী ? আসুন বহিন, ইধার কাছে আসুন। বড় ভাইয়ার পাছ আমি সব শুনা। আপ্‌নাকে আমার কোই রাগ নেহি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল বৈজয়ন্তী। কোটরগত চোখ শীর্ণ রক্তহীন শরীর। চোখের কোণ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আমি অপরাধীর মত চুপচাপ অসহায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার পা দু'টো কেঁপে কেঁপে উঠল।

কিছুক্ষণ বাদে আবার চোখ খুলল বৈজয়ন্তী। ইশারা করে কিছু একটা আনতে ইংগিত করল। মিঃ শর্মা ফুটফুটে মেয়ে রিণিকে কাছে নিয়ে এল। বৈজয়ন্তী আমাকে উদ্দেশ করে বলল, আমার লেড়কী রিণি। আমার বহিন নীতা কো দেদাম। নিজের লেড়কী মাফিক বড় বানাবে বহিন।

আর কিছু বলতে পারল না। চোখ ফেটে শুধু জল আর জল। কান্নায় আমার চোখ দু'টো ভিজে এল। আমি কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেলাম। দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম। সেই থেকে রিণি আমার মেয়ে হ'ল।

বৈজয়ন্তী কাশতে কাশতে খুশিতে ঝলমল করে উঠল। ওর মুখ থেকে চাপ চাপ রক্ত বেরিয়ে এল।

বৈজয়ন্তী দম নিয়ে বলল, বিশোরাস্ করুন, রিণি বিলকুল ভার্মাজীর খুন সে পয়দা হয়েছে। যদি সে বিশোরাস্ না-করবে সেজন্য আপ্‌নি মাৎ বলবেন। আপনি ওয়াদা দিজিয়ে হাম খুশিতে মরতে যাব।

আমি কথা দিলাম। বৈজয়ন্তী মরে গেল।

পর্দার দিকে নজর পড়তে চমকে উঠল নীতা। পর্দার পিছন থেকে কে যেন ছুটে পালাল। মিঃ ভার্মা এবং নীতা—দু'জনেই স্পষ্ট বুঝতে পারল, পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে রিণি এতক্ষণ সব কথা শুনেছে। মিঃ ভার্মা ছুটে ভিতরের ঘরে গেল।

রিণি বালিশ আঁকড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

বছর আটেক আগে জন্ম দিনের কথা মনে পড়ছিল। তার আগে জানাই ছিল না যে, মা ছাড়া তার বাবাও আছে। জীবনে বাবাকে প্রথম কাছে পাওয়া —সে যে কী মূল্যবান উপহার মনে হয়েছিল।

মিঃ ভার্মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। রিণির গায়ে স্নেহের হাত রাখতে গিয়ে ইতস্তত করল। লজ্জা সঙ্কোচ অনুশোচনায় কুঁকড়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেকার

স্বপ্ন ঘটনা স্মরণে এল। আত্মগ্লানিতে দীর্ঘ দেহের ওপরকার মাথাটা ক্রমশ যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল। যথেষ্ট দ্বিধা সঙ্কোচের সঙ্গে আলতো করে রিনির চুলে হাত রাখল। বলল, রোও মৎ মেরে বাচ্চী। দেখ তেরা ড্যাডী হাত জোড় কর মাফি চাহাতা হ্যায়।

কান্নায় ভেঙে পড়ল মিঃ ভার্মা। রিনি বালিশ থেকে মুখ তুলে তার বাবাকে কাঁদতে দেখে অবাক হ'ল। দু'জনে কিছুক্ষণ খুশিতে পরস্পর চোখে নিষ্পলক চোখ রেখে তাকিয়ে থাকল। পরম স্নেহে রিনিকে কাছে ডাকল মিঃ ভার্মা। রিনি শব্দ করে কেঁদে মিঃ ভার্মার বুকে মুখ লুকলো। মিঃ ভার্মা বলল, হামকো মাফ কর দিয়া তো?

রিনি কান্না ভিজিয়ে জবাব দিল, মাৎ রোনা।

মিঃ ভার্মা বলল, গৌস্তেমে হামকো কভি মাৎ ছোড়কে জানা।

রিনি আবার বলল, মাৎ রোনা ড্যাডী। মাৎ রোনা।

জানলার ধারে অনেকক্ষণ মমির মত দাঁড়িয়েছিল নীতা। বাইরে ক্রমশ ভোরের আবছা আলো ফুটে উঠছে। দূরে শাল অরণ্যের অন্ধকার। পাকা সড়কে সারিবদ্ধ দেওয়ালী প্রদীপের মত আলো জ্বলছে। নীতা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছিল। এই মুহূর্তে নিজেকে অনেক দায়দায়িত্ব ভারশূন্য মনে হ'ল। এতকাল মুহূর্ত-জন্ম রিনিকে অপরের মেয়ে মনে হয়নি। এখন মনে হ'ল।

একটা বিরাট শূন্যতা নিয়ে তাকে চলে যেতে হবে। এক্ষুণি—এই ভোরের আবছা আলোয়।

বাইরে আবছা অন্ধকার ধোঁয়াশায় মিলিয়ে যেতে যেতে নীতা একবার অস্পষ্ট ডাক শুনতে পেল— মা মণি-ই-ই। শব্দটা অতিক্রত স্পষ্টতর হয়ে এগিয়ে আসছে যেন।

থমকে দাঁড়াল নীতা। মনে হল, ছোটবেলাকার অসহায় রিনি যেন তাকে ডাকছে। নীতার অনেক গভীরে—তার মাতৃত্ব স্নেহ ভালবাসা তোলপাড় করে উঠল।

অন্ধকারের বুক চিরে যেন স্বপ্ন স্বর্গের আলোক কন্যা কাছে এল। নীতা দু'হাত বাড়িয়ে রিনিকে বুক টেনে নিল। আদর আলিঙ্গন করল। অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিল। বুকের গভীরে উথাল পাথালি হ'ল। মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস

ছড়ালো। শুধু অনুচ্চারিত শূন্যতার হাহাকার। অস্থির যন্ত্রণা দগ্ধ করল। দেবদারু আর পাইন পাতার মত ঠোঁট দু'টো শিরশির কাঁপল।

এক সময় নীতা বলল, লক্ষ্মী সোনা—গো ব্যাক টু ইণ্ডিয়া ফাদার। তোমার ভ্যাডীর কাছে ফিরে যাও।

ক্রমশ ভোরের আলো উজ্জ্বল হচ্ছিল। সামনে মান-সারা যুবতীর মত একটা শিউলি গাছ দাঁড়িয়ে। নিচে অজস্র ঝরা ফুল। সুন্দর মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। আজন্ম রক্তবিলাসী মিশি তার দু'হাতে নীতাকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরে জবাব দিল, না মামণি মেরা কোই ভ্যাডী নেহি থা, আডি ভি নেহি। তুমিই সব।

# স্পর্শক

জ্যোৎস্নাময় বসু

কেন যে লিখতে বসে গেলাম জানি না। যে কথায় আমার নিজের সংশয় রয়েছে তাই লিখতে বসেছি। নির্ভুল লিখতে পারব কিনা জানি না। তবুও আমাকে লিখতে হবে।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর থেকে আমার শয়ন ঘর সংলগ্ন ব্যালকনিতে বসে আছি অনেকক্ষণ। আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে। আজ আকাশের চাঁদ পেঁজা তুলার মত মেঘের নিচে দীপ্ত। মেঘ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সারা আকাশে। মেঘের নিচে চাঁদ দীপ্তিমান। সে মেঘ ভাঙ্গা ভাঙ্গা সাদা। সেই সাদা মেঘের ভিতর দিয়ে ঘন নীল আকাশ। মেঘ আর আকাশের মাঝে হাল্কা নীলের চারপাশে লাল মাটির মত গোলাপী রং। সব মিলে মিশে আকাশ বড় সুন্দর বড় স্নিগ্ধ। এত সুন্দর স্নিগ্ধ আকাশ আমার মনের মেঘকে আলোকিত করতে পারছেনা—পারছে না সেখানে রং ধরাতে। এই সুন্দর পৃথিবীতে আমার মন বিষাদ জর্জরিত।

আজ রাতে বিষাদ নিয়েও বিলাসিতা করবার আমার সময় নেই। আমাকে ভাবতে হবে। ভেবে কোন কূলকিনারা পাইনি। তাই লিখতে বসেছি।

সুমিতা, আমায় ক্ষমা করো। তোমার কথা লিখতে বসে তোমার বিচার করতে বসিনি। তুমি বরং আমার বিচার করতে পার। সে অধিকার আজ তোমার আছে। তুমি আমার বিচার করে আমাকে শাস্তি দিলে অনেক ভাল হত। কিন্তু তুমি আমার বিচার করনি—শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা ; আমাকে অভিযুক্ত পর্য্যন্ত করনি। সেজন্যই আজ আমি বসে বসে ভাবছি। আকাশের যেমন কূলকিনারা পাই না তোমাকেও তেমনি আমি বুঝতে পারিনি। তোমার কথা তাই আমি লিপিবদ্ধ করে তোমাকে বুঝতে চাই—তোমাকে চিনতে চাই।

তোমাকে বুঝতে হলে তোমার কথাগুলি পরপর গুছিয়ে সাজালে হয়ত সুবিধা হবে। ছোটবেলায় অঙ্কের মাষ্টার মশাই বলতেন যে, অঙ্কটাকে ঠিকমত সাজাতে পারলে বুঝতে সুবিধা হয় এবং সমাধানও পাওয়া যায়। যত সহজে বলতেন তত সহজে অবশ্য অঙ্ক বোঝা যেত না ; কিন্তু গুছিয়ে সাজাতে পারলে

সমাধান হয়ে যেত ঠিকই।

অঙ্কের সমস্যা আর জীবনের সমস্যা এক নয়, একথা আমিও জানি অঙ্কের সমাধান আছে কিন্তু জীবনের সমস্যার সমাধান আছে কি? হয়ত আছে, হয়ত বা নেই। আমি জানি না। সমস্যা আছে, জটিলতা আছে, কোন সহজ সমাধান নেই এটুকু অন্তত আমার বোধগম্যের বাইরে নয়।

আজ সকালে তুমি যে ব্যবহার করেছ আর তুলনা হয় না। এ ব্যবহার শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু সেই অতুলনীয় ব্যবহারই আবার আমাদের মধ্যে জটিলতা এনে দিয়েছে। এর কোন সমাধান আছে বলে আমি জানি না। হয়ত বা আমার ভুল—আমাদের স্থিতাবস্থা হয়ত এখনও বজায় আছে। হয়ত বা এই আকাশের রং চাঁদের দীপ্তি আমার মনে জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না আজ তুমি তোমার মত পরিবর্তন করে ব্যবসায়ে যোগ দিলে। ভুলতে পারি না যে আমার কাছ থেকে অনেকটা সরে গেলে। আমার আপত্তির কথা তোমার অজানা নয় এবং নতুন করে মনস্থির করবার আগে আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ পর্যন্ত করলে না।

আমার মনে আজ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে তোমার আমার মধ্যে আজই একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। ওই যে কি বলে দেয়াল না প্রাচীর, সেটা ভেদ করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? সেই প্রাচীরটা যদি গড়ে না উঠত তাহলে? দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখে প্রশ্ন:

—অত প্রাচীর প্রাচীর করছ কেন? কোন প্রাচীর নেই। আর যদি গড়ে উঠেই থাকে সে দায়িত্ব কি আমার, দেব?

—না, দায়িত্ব আমার। কিন্তু প্রথমেই তুমি সেটা ভেঙ্গে দিতে পারতে।

—আমি কি করে বুঝব যে তুমি অত বোকামী করবে?

কি লিখতে বসে কোথায় চলে এসেছি। এরকম কোন কথা সুমিতা বলে নি আজ। এ আমার মনের কোণের আশার প্রতিফলন। সুমিতা যদি এ রকমভাবে ও অনুযোগ করত তাহলে হয়ত আমি শান্তি পেতাম। বলতে গেলে তার সঙ্গে আজ আমার কোন তর্কই হয়নি। মনে মনে এ তর্কও আমার ভাল লাগছে। এজন্য অবশ্য আমি দোষী নই। সুমিতার সঙ্গে একা আজ মুখোমুখি হইনি—তর্ক করা তো দূরের কথা। এ আবার আমার সৌভাগ্যও বলতে হবে। মনে মনে তর্ক করা এক জিনিষ; আর সুমিতার মুখোমুখি হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রাত কটা বেজেছে জানিনা। কিন্তু ঘটনাগুলি আমাকে সাজাতেই হবে। রাত ভোর হবার আগেই সাজাতে হবে।

কিন্তু সাজাব কি করে? এলোমেলো সব কথা মনে পড়ছে। কত মধুর স্মৃতি কত আনন্দ কত ভালবাসা। ভালবাসা? তাই কি?

ভালবাসার সংজ্ঞা যে পাল্টে গেছে—সে কথাই তুমি বোঝাতে চেয়েছ। আমাদের এতদিনের আদর্শ, এত কাব্য, এত রূপকথা সব ভালবাসা নিয়ে। সব ক্ষেত্রে ভুল অর্থই কি আমরা জেনেছি? এতদিনের মজ্জাগত বিশ্বাস কি ভাঙ্গা সম্ভব? তোমার কথায় যুক্তি আছে জানি; কিন্তু মন আমার মানছে না, কিছুতেই মানছে না। এখানে অবশ্য আমার নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছে. বলি যে আমার আবার মন! মনের কথা বলবারও যে আমার মুখ নেই। তবু কি আমি ভুলতে পারি সে সব দিনের কথা? আজ আরও বেশী করে মনে পড়ছে—মনে পড়ছে শ্রীপর্ণার বিয়ের দিনের কথা।

শ্রীপর্ণা আমার মাসতুতো বোন। শ্রীপর্ণার বিয়ে যখন স্থির হল আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা সাঙ্গ করেছি। আমার তখন হাল্কা মন। ব্যবহারিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত তখনো আমাকে স্পর্শ করেনি। শ্রীপর্ণার বিয়ে আমার কাছে একটা আনন্দের উৎসব বলে মনে হয়েছে। খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম সেই বিয়ে উপলক্ষে। কেন উৎসাহিত হয়েছিলাম সেকথা আজ আর বলতে লজ্জা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা সাঙ্গ করার পর আমার মনের কোণে তখন এক রঙীন স্বপ্ন। আমাকে উপলক্ষ্য করেও এমনি একটা দিন উৎসব মুখর হয়ে উঠবে। সেই আনন্দে আমি শ্রীপর্ণার বিয়েতে মেতে উঠেছিলাম।

শ্রীপর্ণার বিয়ের কদিন আগে থেকেই লেগে গিয়েছিলাম নানা কাজে। মাসীমাও আমার উৎসাহে খুশী হয়ে কিছু অকাজের কাজে আমাকে লাগিয়েছিলেন বিয়ের আসর ও বাসর ঘর সাজাবার ভার তিনি আমার উপর ন্যস্ত করেছিলেন। একাজ মেয়েরাই সাধারণত করে থাকে; কিন্তু স্থপতি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি বলে তিনি আমাকে ঘরবাড়ী সাজাবার কাজে একজন বিশেষজ্ঞ ঠাউরেছেন।

একাজে আমিও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই একটি নাম আমি বারকয়েক শুনেছি। আলপনা আঁকবে সুমিতা—শ্রীপর্ণার বন্ধু সুমিতা। এক সময় শ্রীপর্ণা আমাকে ঠাট্টা করে সাবধান করে দিয়েছিল। আমার

নাকি মুণ্ডু ঘুরে যেতে পারে। আরও কি সব বলেছিল যেন। বিশেষ কান দিইনি। গর্ব করে বলেওছিলাম যে আমার মুণ্ডু ঘোরাবার মত মেয়ে এখনও জন্মায় নি।

সুমিতাকে তার আগে কখনও দেখি নি কিন্তু শ্রীপর্ণা ও মাসীমার কাছে তার গুণের ফিরিস্তি শুনতে শুনতে তাকে দেখবার আগ্রহ হয়েছিল।

বিয়ের দিন সকাল বেলায় একটু কাজে বেরিয়েছিলাম। বাড়ী ফিরতে শ্রীপর্ণা আমাকে ডেকে পাঠাল তার ঘরে। সেখানে আর একটি মেয়েকে শ্রীপর্ণার সঙ্গে দেখতে পেয়ে বুঝেছিলাম—এ সুমিতা! সুমিতার কথা যত শুনেছিলাম তার থেকেও তাকে বেশী মনে হল। চোখের স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি আমার সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছিল। ঘরে ঢুকেই বুঝেছিলাম শ্রীপর্ণা সুমিতার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেবার জন্ত আমাকে ডেকেছে। শ্রীপর্ণা কিছু বলবার আগে আমি বললাম :

—নমস্কার সুমিতা দেবী। আমার নাম বাসুদেব, শ্রীপর্ণার মাসতুতো ভাই। আমার এখনও মুণ্ডু ঘুরে যায় নি। ভবিষ্যতের কথা বলতে পারছি না।

—নমস্কার। পরিচয় হবার আগে যে নমুনা দেখাচ্ছেন তাতে আপনার মুণ্ডু না ঘুরলেও আমার যে মাথা ঘোরাবে না একথা হলপ করে বলা যাচ্ছে না। আপনি আমার শিরঃপীড়ার কারণ হবেন না তো?

—গ্যারাণ্টি দিতে পরি। এবং আপনার শিরঃপীড়া হলে তার চিকিৎসার কাজে লাগতে পারি।

—শুনে সুখী হলাম বাসুদেব বাবু। আপনার কথা শুনে শুনে কানটা আমার পচে যাচ্ছিল।

—আশা করি কান পচবার আর কোন কারণ থাকবে না।

—কেন?

—আপনার সঙ্গে তো আমার পরিচয় হয়ে গেল।

শ্রীপর্ণা আমাদের কথা শুনে অবাক। —তোমাদের আগে থেকেই পরিচয় আছে না কি?

আমি তখন সাহস দেখিয়ে জবাব দিলাম :

—সুমিতা দেবী রাগ না করলে বলতে পারি আমাদের জন্মজন্মান্তরের পরিচয়।

—রাগ করবার এতে কিছু তো নেই। আপনার অলীক কল্পনা তো আপনার ব্যাপার।

মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা। সব আমার মনে আছে। এখনো চোখের সামনে সেই দৃশ্য ভেসে উঠছে। সুমিতা তারপর আলপনা আঁকবার কাজে লেগে গেল। আমি মাঝে মাঝে ঘুরে এসে তার আলপনা আঁকা দেখছিলাম।

এক সময় সুমিতা আমার সঙ্গে আলপনার নক্সা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। আমি যথাসম্ভব মতামত দিয়েছিলাম। আমার পরামর্শ সে কাজে লাগাচ্ছিল না কিন্তু তবুও আবার পরামর্শ চাইছিল।

আলপনা আঁকা শেষ হলে সবাই সুমিতার প্রশংসা করতে লাগল। প্রশংসা শুনে আমারও আনন্দ হল—যেন আমিই সেই আলপনা এঁকেছি।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তারপর সুমিতার সঙ্গে দেখা হয় নি। যখন দেখা হল সুমিতা জানতে চাইল :

—আলপনা সম্বন্ধে আপনার মতামত জানালেন না তো ?

—এবার কিন্তু আমার মুণ্ডু ঘুরবার মত অবস্থা হয়েছে।

—শুনে সুখী হলাম।

বিকেল থেকে শুরু হয়েছিল মেয়েদের সাজগোজের পালা। কনে সাজাবার ভারও সুমিতার উপর বর্তেছে। এদিকে বিয়ের আসর সাজাতে আমি ব্যস্ত কিন্তু কিছুতেই আর মনোমত হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল সুমিতা নিশ্চয়ই আরও ভাল সাজাত। আমি এদিক ওদিক যাবার ছুতায় নজর রাখছিলাম,—কনে সাজান শেষ হতে সুমিতাকে ডেকে নিয়ে এলাম। সুমিতা আপত্তি করল।

—আমাকে একটু সাজগোজ করবার সুযোগ দেবেন না দেখছি।

আমি অবাক হলাম : —আপনি সাজগোজ করবেন ? দরকার আছে ?

—আপনার মুণ্ডু সত্যিই ঘুরেছে দেখছি।

—এ বিষয়ে অনেক কথা বলতে পারতাম কিন্তু আজ নয়। একবার আসর সাজান অনুমোদন করে যান। তাহলেই এখনকার মত ছুটি।

ভীড়ের মধ্যে আরও বারকয়েক সুমিতার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। প্রতি-বারই আমরা দু একটা টুকরো কথা বলেছিলাম।

রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে সুমিতা একসময় চলে গেল। ভাগ্য বলতে হবে আমার সঙ্গে দরজাতে দেখা।

—চলি তাহলে।

—চললেন ? এরই মধ্যে ?

—অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু···। চলুন না একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

সুমিতা আপত্তি করল না। রাস্তায় বেরিয়ে বললাম।

—সুমিতা দেবী, বড় ভাল লাগল।

—হ্যাঁ. শ্রীপর্ণার বিয়েটা বেশ ভাল কাটল।

—আবার কবে দেখা হবে?

—দেখা নিশ্চয়ই হবে কোন দিন।

—কোনদিনটা কি কাল হতে পারে না?

—পরশু শ্রীপর্ণার ফুলশয্যায় যাচ্ছি। আপনিও যাচ্ছেন তো?

শ্রীপর্ণার ফুল শয্যার তত্ত্ব সাজাতেও আমার উপরে ভার দিলেন মাসীমা। আমি একটার পর একটা ট্রে সাজাতে লাগলাম। সুন্দর সুন্দর ট্রে, স্বচ্ছ রং বেরং এর কাগজ, কাঁচি, টেপ ইত্যাদি দিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে তত্ত্ব সাজিয়ে চলেছি। এই ধরণের কাজ আমি আগে কোনদিন করিনি। এই সব মেয়েলী কাজে আমার উৎসাহের কারণ ছিল সুমিতা। সে কথা আমি তখন বুঝিনি কিংবা বুঝলেও নিজের কাছে স্বীকার করিনি। আজ বুঝতে পারি সেদিন সুমিতা সে কাজে আমার সহকারী না হলে এত উৎসাহ আমার হত না বা এত সুন্দর করে সাজাতে পারতাম না।

তারপর দল বেঁধে চলে গিয়েছিলাম শ্রীপর্ণার শ্বশুর বাড়ী সেখানেও বিরাট উৎসব। সেই উৎসবে আমরা ছিলাম অতিথি। তত্ত্ব সাজিয়ে দেওয়া আর আপ্যায়িত হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন কাজ ছিল না। ওরই মধ্যে আমি সুমিতার কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করছিলাম।

কিন্তু সুমিতা সেই যে শ্রীপর্ণার কাছে গিয়ে বসে আছে আর উঠবার নাম করছে না। সেখানে মেয়েদের ভীড়। আমার সেখানে থাকা শোভন নয়। তা সত্ত্বেও দুচারবার সেখানে গিয়ে সুমিতার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টায় ছিলাম। যতবারই গিয়েছি দেখেছি শ্রীপর্ণা এবং তার শ্বশুর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে সুমিতা খুব উৎসাহের সঙ্গে গল্প করছে। আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে মনে হল।

ফিরবার পথে মাসীমার বাড়ী পর্য্যন্ত সবাই একসঙ্গে এলাম। গেট থেকে সুমিতা বিদায় নিল—আমিও তাই করলাম। প্রস্তাব করলাম সুমিতাকে পৌঁছে

দেবার।

—দরকার নেই। আমার একা যাতায়াত করবার অভ্যাস আছে।

— একা চলার অভ্যাস চিরকালের জন্য থাকবে এমন কোন নিয়ম আছে?

—তেমন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম না থাকলেও এত রাত্তিরে আপনাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন?

—যদি বলি আমি আনন্দিত হব?

—আমি বলব এত উৎসাহ ভাল নয়। চোরের মন বোঁচকার দিকে বলে একটা কথা আছে না।

—কোনটাই আমি মানছি না। উৎসাহ ভাল নয় বলে মানতে পারছি না। আর চোর? সে তো আমি নই।

— অত নিশ্চিন্ত হলেন কি করে?

—আমার জিনিষ চুরি হল আর আমি হব চোর?

—আপনার জিনিষ বুঝি প্রায়ই চুরি হয়?

—আগে আমি সাবধান ছিলাম কিন্তু গত পরশু থেকে দরজা জানালা আর বন্ধ করতে পারছি না।

সুমিতা আর জবাব দিল না। আলোচনার গতিতে বোধ হয় ভরই পেল। তখন আমি বললাম:

আচ্ছা এই আলোচনা কাল করা যাবে। আসুন না কাল দুপুর বেলা—ধরুন দুটো নাগাদ—গ্লোবের সামনে।

আমার এ কথারও জবাব পাব না জানতাম। একটু সময় দিয়ে আবার বললাম!

—আমি থাকব আপনার অপেক্ষায়।

একথা বলে আর দাঁড়াইনি। মুখের উপর না বলবার সুযোগ দিইনি।

আমি তখন একজন আর্কিটেক্টের সঙ্গে যুক্ত। কাজ শিখছি এবং যৎসামান্য পারিশ্রমিক পাচ্ছি। পরদিন অফিসে গিয়ে বিশেষ জরুরী কাজের অছিলায় বেলা একটার সময় অফিস থেকে চলে আসার আজি মঞ্জুর করালাম।

সেদিন অফিসে আর সময় কাটছিল না। মনে হচ্ছিল ঘড়ি বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। বার বার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, বার বার অকারণে জল খেয়ে, বাথরুমে গিয়ে বার বার চুল আঁচড়িয়ে অনেক সাধ্য সাধনার পর ঘড়িতে একটা বাজল।

মনে যত তাড়া বাইরে তত কম তাড়া দেখাবার চেষ্টা করলাম। আর্কিটেক্ট রহমান সাহেব কোথাও বেরোচ্ছিলেন—আমার দিকে নজর পড়তে হেসে ফেললেন।

—ওহে বাসুদেব, তোমার বোধ হয় তেমন তাড়া নেই। এক কাজ কর আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত অফিসেই থেক।

—আমার যে খুব তাড়া আছে। এক জায়গায় যেতে হবে। বিশেষ দরকার।

—তাই নাকি? আমার মনে হল তোমার বিশেষ তাড়া নেই।

—না না, খুব তাড়া আছে।

—তাহলে যাও।

আমি আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম।

মোবের সামনে পৌঁছে দেখি তখনও দেড়টা বাজেনি। নিজের ঘড়িকে ভরসা করতে পারছিলাম না। দু একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিনেমা হলের বাথরুমে গিয়ে চুলটা বেশ করে আঁচড়িয়ে ঘড়িতে দুটো বাজাতে আমাকে অনেক প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল।

দুটো বাজবার একটু আগে থেকে মোবের সামনে দাঁড়িয়ে আমার সন্তুষ্টি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল এখানে বোধ হয় আমাকে দেখা যাবে না। একবার এখানে একবার ওখানে দাঁড়িয়ে সবগুলি রাস্তার দিকে নজর রাখতে রাখতে দুটো বেজে গেল—সোয়া দুটোও বেজে গেল। মনে হতে লাগল সেখানকার সব লোক আমার কীর্ত্তিকলাপ দেখছে। শুধু শুধু আর দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন মনে করলাম না। জুতো পালিশ করাতে লাগলাম।

দুপায়ের জুতোয় কালি লাগান হয়ে গেল। একপাটী জুতোয় পালিশও হয়ে গেল। আমার অবশ্য জুতোর দিকে নজর ছিল না। ব্রাশ দিয়ে জুতোয় ঠক ঠক করাতে অজান্তেই আমার পা ওঠা নামা করেছে। দ্বিতীয় পাটী জুতোয় ব্রাশ দিয়ে পালিশ শুরু করতেই আমি সুমিতাকে দেখতে পেলাম।

আমার পা নিয়ে রীতিমত টানাটানি শুরু হয়ে গেল। আমি পয়সা ফেলে পা টেনে নিয়ে যেতে ব্যস্ত আর পালিশওয়ালা আমার জুতো ছাড়বে না। কাপড় দিয়ে পালিশ করে ঝকঝকে না করে—সে জুতো ছাড়তে রাজী নয়। আমি প্রায় রুক্ষ ব্যবহার করে একপাটী জুতোর অসমাপ্ত পালিশ নিয়ে ছুটে গেলাম। সুমিতা আমাকে দেখতে পেয়েছে কিন্তু একটুও দাঁড়াল না। হাটতে

লাগল। আমিও তার সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম।

—কতক্ষণ এসেছেন?

—এই তো এলাম। জুতো পালিশ করাবার সময়ও দিলেন না।

—করালেই পারতেন।

—তা নয়। এক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা যে কত শক্ত সে কথা জানলে আপনি এত দেরী করতেন না।

—আমি তো আসবই না ভেবেছিলাম। সকাল থেকে তাই স্থির করেছিলাম; কিন্তু দুটো বাজতে মনে হল আপনি হয়ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।

—আমার সৌভাগ্য। সে যাকগে, কোথায় যাবেন বলুন।

—আমি কি জানি?

—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল?

—না, সে বড় বিশ্রী হবে।

—তাহলে চলুন রাস্তায় হাঁটা যাক।

—সেটা মন্দ নয়।

—আপনার কষ্ট হবে না?

—চলুন দেখাই যাক।

কথা বলতে বলতে আমরা লাইট হাউসের সামনে দিয়ে চৌরঙ্গী পেরিয়ে গেলাম। সেখান থেকে সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যু, বৌবাজার রোড ধরে কলেজ স্ট্রীটে। কলেজ স্কোয়ারে এসে একটু বসবার লোভে ঢুকলাম কফি হাউসে। সেখানে ধোঁয়ার দরুন চোখ জ্বালা করতে লাগল। একটা টেবিলে বসে দুকাপ কফি চাইলাম। আমি এই কফি হাউসের কথা অনেক শুনেছি কিন্তু কোনদিন আসা হয়নি।

এখানে এত হল্লার মধ্যে নিরিবিলি কথা বলতে কোন অসুবিধা হয় না। এক একটা টেবিলে নিয়ে এক একটা দল কোন একটা বিষয় নিয়ে তুমুল তর্ক করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় হাতাহাতি লেগে যাবে। আমি জানতে চাইলাম:

—এখানে আগে কখনও এসেছেন?

—হ্যাঁ। বার কয়েক এসেছি।

—কারো সঙ্গে নিশ্চয়ই?

—তা তো বটেই। এখানে কেউ একা আসে নাকি?

— ওঃ।

— এই তো আজ আপনার সঙ্গে এলাম।

যে উৎসাহ নিয়ে আজ সকাল থেকে মেতে ছিলাম কেন জানিনা সে উৎসাহ আমার দমে গেল আমি আর কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ বেয়ারার উপর রাগ হল। কতক্ষণ কফি চেয়েছি এখনও দিল না।

বেয়ারাকে ডাকলাম। আমি কিছু বলবার আগে সুমিতা বেয়ারাকে একটু তাড়াতাড়ি কফি দেবার জন্য অনুরোধ করল। সম্মতি জানিয়ে বেয়ারা চলে গেল। বেয়ারাকে এত অনুনয় আমার ভাল লাগল না।

—এখানে একটু দেরী হয়। তাছাড়া এখানে যারা আসে তাদের বিশেষ তাড়া থাকে না।

—আপনিই জানেন ভাল। আমি তো আগে আসিনি। কারো সঙ্গেও আসিনি।

—কোনদিন দল বেঁধে এখানে আসেননি?

—না।

—আমি দল বেঁধে এখানে এসেছি। কত বিষয়ে তর্ক করেছি। তবে দোকলা এলাম আজই।

তারপর আমরা দুজনে গল্পে মজে গেলাম। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথার মালা সাজাতে লাগলাম। কফি খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। চোখও আর তেমন জ্বালা করছে না। অন্যান্য অনেক টেবিলে তখন দল বদল হয়েছে, তর্কের বিষয় বদল হয়েছে। আমাদের কোন বিষয়ও ছিল না—দল বদলের সম্ভাবনাও নেই।

একসময় মনে হল আর টেবিল আটক করে রাখা ঠিক হবে না। কাজেই আবার রাস্তায়। রাস্তায় এসে আবার সমস্যা —কোথায় যাই? কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে হেদোয় পৌঁছে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম। সুমিতার ওদিকে দরকার ছিল। তখন মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে।

সুমিতা চলে যাবার পর আমি অকারণে রাস্তায় অনেকক্ষন বেড়িয়েছিলাম। ঘুরে ফিরে আবার হেদোর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম।

বাড়ী ফিরে খেয়াল হল আবার দেখা হবার কোন কথা আমাদের হয়নি। তখন এত ভাল লেগেছিল—মনে হয়েছিল আমরা বহুদিনের পরিচিত এবং আমাদের এভাবে ঘুরে বেড়ান স্বাভাবিক। আবার দেখা হবার জন্য স্থানকাল

স্থির করতে হবে সেকথা মাথায় আসেনি। নিজের উপর খুব রাগ হল। মনে মনে খুব ঘমে গেলাম—ভয় হল আমি হয়ত সুমিতাকে হারালাম। সুমিতার ঠিকানাও জানি না। জানলেও সেখানে যাবার কথা ভাবা যায় না।

কয়েকদিন ধরে সুমিতার সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্ত ছটফট করতে লাগলাম। মনে মনে নানা ফন্দি আটলাম। সে সব ফন্দি এত উদ্ভট যে কার্যে পরিণত করা যায়নি। সৌভাগ্য বশতঃ একদিন মাসীমার বাড়ীতে শ্রীপর্ণার দেখা পেলাম।

—শ্রীপর্ণা। তোমার সেই বন্ধুর কি খবর?

—কোন বন্ধু?

—সেই যে আলপনা এঁকেছিল।

—সুমিতা? ওর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস তুমি মনে করিয়ে দিলে।

শ্রীপর্ণা তখনই সুমিতাকে টেলিফোন করল। আমি মনে মনে টেলিফোন নম্বর মুখস্থ করে ফেললাম। তারপর সুমিতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা স্থান-কাল স্থির করতে আর অসুবিধা হয়নি।

মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হত। কলকাতা শহর ছাড়াও দমদম ডায়মণ্ডহারবার, চন্দননগর, ব্যাণ্ডেল ইত্যাদি স্থানে আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি মনের আনন্দে। একসময় আমাদের মধ্যে আর লুকোচুরি থাকল না। আমাদের পছন্দ অপছন্দের কথা হল, ভালবাসার কথা হল। আমাদের ভবিষ্যৎ সংসারের রঙীন পরিকল্পনা হল. আরও কত কথা হল। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কিছুই বাদ গেল না। আমরা হাতে হাত মেলালাম, আমরা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম। প্রথমদিন চুমু খাওয়ার কথা এখনও মনে আছে।

সেদিন গঙ্গার ধারে বিকেল থেকে বসেছিলাম। সুবিধাজনক স্থান বেছে নিয়ে, সুমিতার হাত ধরে। সেই যে বাঁ হাতে সুমিতার ডান হাত ধরে রেখে-ছিলাম আর ছাড়িনি। সুমিতা ছাড়াবারও চেষ্টা করেনি। কত লোক আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল—সবাই আমাদের হাতে হাত দেখতে পেল। আমরা কিছুই গ্রাহ্য করিনি।

একটা ঘোরের মধ্যে ট্যাক্সি করে সুমিতাকে ওর বাড়ী দরজায় নামিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ী ফিরে নিজের ঘরে চলে এলাম। সে রাতে আর কিছু খেলাম না। আমার জিবের স্বাদ নষ্ট করতে চাইনি। সারারাত ধরে নরম ঠোঁট,

উষ্ণ জিব আর ভেজা মুখের আস্বাদ পেলাম।

তারপর আমাদের আবার যেদিন দেখা হয় সেদিন আমরা দুজনে দুজনকে লজ্জা করতে লাগলাম। তেমন স্বচ্ছন্দ ছিলাম না। আমিও না, সুমিতাও না। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো কথা বলছিলাম বটে কিন্তু বিষয় ছিল স্বতন্ত্র। আমাদের রঙীন স্বপ্ন নিয়ে কোন কথা পরিহার করেছিলাম।

সেদিন আর গঙ্গার ধারে যাইনি। রাস্তায় কিছুক্ষণ হেঁটে চলে গিয়েছিলাম ইডেন গার্ডেনে। ঝিলের ধারে বসেছিলাম অন্যান্য দিন যেমন আমরা অনর্গল কথা বলতাম সেদিন আর তেমন হয় নি। গঙ্গার ধারে আমরা মুখে কোন কথা না বললেও হাতে হাত মিলিয়ে মনে মনে কত কথা বলেছিলাম; কিন্তু ইডেন গার্ডেনে ঝিলের ধারে আমরা কেউ কারোর হাত ধরতে পারিনি। এমন কি, একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসেছি। রাস্তায় চলতে চলতে টুকরো টুকরো যে সব কথা বলছিলাম ঝিলের ধারে বসে তাও বন্ধ হয়ে গেল।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আমার কি রকম যেন মাথার গোলমাল হয়ে গেল। বললাম: —সুমি, আমাদের ভালবাসা কি সত্যি?

সুমিতা জবাব দিল না। চুপ করে বসে রইল। আমি আবার বললাম— সুমি, এই যে আমাদের আকর্ষণ, এ কি আমাদের ভালবাসা না দেহের আকর্ষণ?

—দেব, যদি চাও তো আমরা আর না এগিয়ে এখানেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারি। তোমার ভাল না লাগলে আমি কিছু মনে করব না।

—না, তা নয়। আমার কিরকম যেন মনে হচ্ছে—ঠিক বুঝতে পারছি না। নিজেকেই যেন বুঝতে পারছি না।

সুমিতা কোন উত্তর দিল না। আমি আরও কথা হয়ত বলেছিলাম। মনে নেই কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ টের পেলাম সুমিতা কাঁদছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। তার কান্না আরও বেড়ে গেল। তখন আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। সুমিতা বাধা দিল না; কিন্তু সাড়াও দিল না। ওকে আদর করতে লাগলাম—সান্ত্বনার কথা বললাম - আমার মন অশান্ত হয়েছিল বলে অসঙ্গত কথা বলেছি। এ ধরনেরই কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। সুমিতার কান্না আরও বেড়ে গেল। একসময় আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে লাগল:

—দেব, তুমি কেন আমাকে ওরকম বল? কেন আমাকে কষ্ট দাও, দেব? তুমি কি জান না আমি তোমাকে কত ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব কি করে, দেব আমাকে বলে দাও।

আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলাম। সুমিতা একটু শান্ত হলে তাকে জানালাম যে তাকে ছাড়া আমিও থাকতে পারব না। ওকে আমি জীবনে কখনও দুঃখ দেব না। চিরকাল ভালবাসব ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে কত সান্ত্বনা দিয়েছি। পরম স্নেহে ওর মাথা আমার বুকে নিয়ে সেখানে বসেছিলাম অনেকক্ষণ।

আজ সে সব কথা নতুন করে মনে পড়ছে। এত সুখের স্মৃতিতেও আজ আমার মন ভারাক্রান্ত। আজ পর্য্যন্ত সুমিতা কখনো আমার দুঃখের কারণ হয় নি! আজ বুঝতে পারছি আমাদের অজান্তে আমরা অনেকটা সরে এসেছিলাম পরস্পরের কাছ থেকে। এই সরে আসাও এত স্বাভাবিক হয়েছিল যে আমি সে কথা জানতেও পারিনি।

সুমিতা আজ কত সহজে কত জটিল কথা বলে গেল। আমাকে কোনরূপ দোষারোপ করেনি। কিন্তু সেটাই কি সবে? তার সঙ্গে আজ আমার আলাদা কোন কথা হল না। আমি অবশ্য একা তার মুখোমুখী হতে চাইনি কিন্তু বড় আশা ও আশংকা ছিল সে নিজে আমার সঙ্গে কথা বলবে। আমি অবশ্য গভীর ভাবে এ সমস্যার কথা ভাবিনি কোনদিন ; কিন্তু সুমিতা তো ভেবেছে। আমরা দুজন একসঙ্গে আলোচনা করলে হয়ত ভাল হত।

আজ সে শ্রীপর্ণার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে আমাকে শুধু বলে গেল সে সে শ্রীপর্ণার ব্যবসাতে যোগ দিচ্ছে। আমাকে বাধা দেবার সুযোগও দিল না। ফিরেছেও অনেক দেরী করে—আমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। আমি তার আগেই আমার নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

না, আমার চিন্তা আবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সুমিতাকে—শুধু সুমিতাকে কেন—আমাকেও আমার বুঝতে হবে।

ঘটনাগুলিতে নিজেকে না জড়িয়ে ফেলে পরপর সাজাতে চেষ্টা করছি ; কিন্তু পারছি কই? আবার মনে পড়ছে বিয়ের আগে সুমিতার সঙ্গে সে সব দিনগুলির কথা। কত কথা, কত তুচ্ছ ঘটনা. কৃত সাধ, কত আশার কথা মনে পড়ছে। আশার কথা? আশার কথা কেন আসছে। আমার কোন আশা কি সুমিতা অপূর্ণ রেখেছে? তাহলে আজ এ সমস্যা কেন? একসময় সুমিতার কাছে কখন যাব বলে ব্যাকুল হয়ে থাকতাম আর আজ? আজ আমি তাকে এড়িয়ে চলছি। সেই যে প্রেম, ভালবাসা, আকর্ষণ, মাখামাখি এসব কি মিথ্যা? মাখামাখি? বিয়ের আগে আমাদের মাখামাখির খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশী সময় লাগেনি।

আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম। আমার বাবা খুব রাশভারী লোক ছিলেন। শুনেছি আমার বাবা যখন হাইকোর্টে সওয়াল করতে উঠতেন তখন অনেক জজ-সাহেবও বিশেষ কথা বলতে ভরসা পেতেন না। বিপক্ষ দলের কৌঁসুলীরা তাঁকে অপদস্থ করবার অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু বাবা তাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর অনেকেই কথার মাঝখানে থেমে গেছেন। এ হেন বাবাকে ভয় করব না? ভয় থাকলেও আমিও তৈরী ছিলাম। প্রয়োজন হলে বাবাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেব যে আমি সুমিতাকে বিয়ে করব। কিন্তু এসবের কোন দরকার পড়ল না। বাবা আমাকে কিছুই বললেন না।

শ্রীপর্ণার কাছেও খবর গিয়েছিল। সে খুব খুশী হয়েছিল। আমার সঙ্গে একদিন দেখা হতে আমার মুণ্ডু সত্যি সত্যি ঘুরেছে বলে ঠাট্টা করল। তারপর একদিন সুমিতার সঙ্গে কথা বলে বাবা ও মার কাছে আমাদের বিয়ের কথা তুলল। বাবা সুমিতার খবরাখবর নিলেন; তারপর মা একদিন সুমিতাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য আমাকে বলেন।

ওদিকে সুমিতার বাবা মার কানেও খবর পৌঁচেছে। সুমিতার বাবা একটা ব্রিটিশ কোম্পানীর বড় অফিসার, চীফ এক্সিকিউটিভ। মোটা মাইনে ইত্যাদি ছাড়াও মুনাফার শেয়ার পান। বাবার মত তিনি রাশভারী নন। হাসিখুশী মানুষ। বাড়ীতে তাকে কেউ ভয় পায়না কিন্তু সবাই ভালবাসে। তাঁর স্ত্রী সংসারের সর্বেসর্বা। তিনি সেখানে একেবারেই নাক গলান না। ভাল খেতে পেলে খুব খুশী, আবার না পেলেও অনুযোগ করেন না। তিনি একদিন শ্রীপর্ণাকে ডেকে পাঠালেন। শ্রীপর্ণার কাছে সব খবরাখবর নিয়ে সুমিতাকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন।

এদিকে মুস্কিল হল। কে আগে যাবে? সুমিতার ইচ্ছা সে আগে আসে তার ধারণা আমাকে দেখে তার বাবা খুশী হবেন। এদিকে সুমিতাকে পছন্দ বা অপছন্দর উপর আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে হবে বলে তাঁর ধারণা। সুমিতার ভয় আমার বাবা মা তাকে পছন্দ নাও করতে পারেন। আমি কিন্তু বিপরীত ধারণা পোষণ করি। আমাকে পছন্দ করা এবং সুমিতাকে না পছন্দ করার কোন কারণও আমি দেখতে পাইনা। তাহলেও সুমিতাই আগে আমাদের বাড়ীতে আসুক সেটাই আবার আমার ইচ্ছা।

শুভস্য শীঘ্রম। কাজেই বাড়ীতে আগে না জানিয়ে একদিন বিকেলে সুমিতাকে নিয়ে এলাম। বাবা তখন কোর্ট থেকে ফিরেছেন মাত্র। সুমিতাকে

দেখে প্রসন্ন হয়েছেন বলে মনে হল। দুএকটা কথা বলে তিনি পোষাক পাল্টাতে চলে গেলেন। মা এসে আমাকে সুমিতার সামনেই ধমকালেন—সকালে বলিনি বলে। মেয়েটা প্রথম দিন আমাদের বাড়ীতে এল, তাকে একটু ভাল করে খাওয়াতেও পারবেন না বলে দুঃখ করলেন। তারপর ঠাকুরকে চপ বানাতে বললেন। বাবা সেখানে আসতে মা উঠে গেলেন। ঠাকুরের উপর ভরসা করতে পারলেন না। মা চলে যাওয়াতে আমার ভয় ভয় করতে লাগল। বাবা সুমিতাকে জেরা করতে লাগলেন। সুমিতা একটুও ভয় পেল না—কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম বাবা জেরা বন্ধ করে গল্প করতে লাগলেন। আমি মনে মনে আশ্বস্ত হলাম।

তারপর মা ও বাবা সুমিতাকে চপ ও সন্দেশের সঙ্গে চা খাইয়ে তার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে বিদায় দেবার কালে বললেন :

—তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাকে বলো আমার সঙ্গে কথা বলতে। না কি আমিই বলব? প্রথমে তিনি বললে ভাল হয়—সেটা আমাদের দেশী রীতি।

আমাকে হুকুম করলেন সুমিতাকে পৌঁছে দিতে। বাবা তাঁর গাড়ীটাও দিয়ে দিলেন। এই প্রথম আমরা বাবার গাড়ীতে দুজনে একসঙ্গে উঠলাম। সুমিতাকে পৌঁছে দিলাম, আমি নামলাম না। সুমিতারও তাই ইচ্ছা। আর একদিনের জন্য আমাদের প্রোগ্রাম হয়ে গেল।

দু'একদিনের মধ্যেই সুমিতার বাড়ী গিয়েছিলাম। সুমিতার সঙ্গে গিয়েছিলাম বলে পরিচয় দেবার ভার সেই নিয়েছিল। সুমিতার বাবা তখনো ফেরেন নি। কোন কোন দিন তার দেরী হয়ে যায়। সুমিতার মা আমার সঙ্গে দু একটা কথা বলতেই তিনি এলেন।

সুমিতার মা তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি প্রণাম করতে আমায় জানালেন যে অফিসের ধড়াচূড়া পরে বাড়ীতে কথা বলা তার পছন্দ নয়। কাজেই তাকে একটু সময় দিতে হবে—বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। সুমিতার মা আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আমাদের পারিবারিক বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন। আমি ভবিষ্যতে কি করব জিজ্ঞেস করলেন। আমি ঠিক কি করব তখনো সেকথা গভীরভাবে ভাবিনি। স্থিরও করিনি কিছু। হঠাৎ মাথায় আসতে দুম করে বলে ফেললাম -আমি ব্যবসা করব। শুনে খুশী হলেন। আরও জিজ্ঞেস করতে আমি জানালাম যে এখন কাজ শিখছি কিছুদিন পর নিজেই আকিটেক্ট

কারবার খুলে ফেলব। রহমান সাহেব একদিন তার ব্যবসা শুরু করবার ইতিহাস বলেছিলেন। আমি হুবহু তারই ইতিহাস আমার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে বলে গেলাম।

সুমিতার বাবা ইতিমধ্যে এসে চুপ করে বসে আমার কথা শুনলেন মন দিয়ে। আমার কথা শেষ হতে তিনি বললেন :

—কাজের কথায় আসা যাক। তুমি আমার মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট ?

আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। ঘাবড়ে গেলাম প্রশ্ন শুনে—আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম বেরোতে লাগল। তিনি আবার বললেন।

—মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। এবার বল, তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও ?

এবারে আমি ঘাড় নাড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে আমার সম্মতি জানালাম।

—ব্যস্ হয়ে গেল। আজকের মত কাজের কথা শেষ। এবারে মধুরেণ সমাপয়েৎ। বাসুদেবকে মিষ্টিটিষ্টি খাওয়াও, আমরাও ভাগ পাই।

সুমিতার মা বিব্রত বোধ করলেন।

—তুমি যে কি ? বাসুদেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে ; না সব উদ্ভট প্রশ্ন শুরু করলে। ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্যই তো ডেকে পাঠান হয়েছে।

— কি মুস্কিল। আমি তবে এতক্ষণ করলাম কি ? কথাই তো বললাম। কাজের কথা আগেই সেরে নিলাম।

—বাসুদেব, তুমি কিছু মনে করো না। উনি ওই রকমই কথা বলেন।

—দেখ, দেখ বাসুদেব। এখনো তুমি আমাদের জামাই হওনি হবু জামাই মাত্র। এরই মধ্যে আমার নামে নালিশ করা শুরু হয়েছে। একবার জামাই হয়ে দেখ না তোমার কি অবস্থা হয়।

—তুমি একটু চুপ করবে ?

—এই বলছ কথা বলতে, আবার বলছ চুপ করতে ; আমি কোনটা করি বল দেখিনি। বাসুদেব, এখনো সময় আছে। শাশুড়ী পছন্দ হয়নি বলে বিয়ে নাকচ করবার একটা রেকর্ড স্থাপন করতে পার।

—তোমার যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। এভাবে বাইরের একজন ভদ্রলোকের সামনে···

—বাইরের ভদ্রলোক ? সে আবার কে ? বাসুদেব ? সে আবার এখন বাইরের কোথায় ? আমাদের কথা হয়ে গেল না ? এইমাত্র তো সব কথা হল।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে সুমিতার বোন অমিতা এল। অমিতা দেখতে অনেকটা সুমিতার মত। সুমিতার থেকে বছর দু'য়েকের ছোট কিন্তু ছেলে-মানুষীভাব নেই। ছিপছিপে, লম্বা এবং মুখশ্রী বেশ ভাল। হঠাৎ দেখলে সুমিতার থেকে বেশী সুন্দরী বলে মনে হয়। তাহলেও তার চেহারার মধ্যে কিছু একটা অভাব আছে। মুখের ভঙ্গী ও চোখের দৃষ্টিতে সুমিতার যেমন স্নিগ্ধভাব আছে অমিতার তেমন নয়—বরং একটু রুক্ষতাই প্রকাশ পায়।

অমিতার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন তার বাবা।

—বাসুদেব, অমিতা হবে তোমার একমাত্র শালী।

—ও আপনিই সেই? দিদিকে বাগিয়েছেন তাহলে?

—কি করবে বেচারা? তোর সঙ্গে তো আগে দেখা হয়নি। তবে কে কাকে বাগিয়েছে সেটাই প্রশ্ন।

সুমিতার মা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার স্বামীকে আর থামাতে চেষ্টা করেননি। শুধু একসময় মনে করিয়ে দিলেন যে আমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে। শুনে তিনি আমাকে বললেন যে শিগ্‌গীরই একদিন যাবেন আমাদের বাড়ী।

আরও কিছুক্ষণ আমি সেখানে ছিলাম। চা এবং জলখাবার খেয়ে বেরোতে বেরোতে বেশ রাত হয়ে গেল। এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওরা আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। আমার সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল।

তারপর আমাদের বিয়ে হতে আর দেরী হয়নি। বিয়ের উৎসব দু'বাড়ীতে বেশ জাঁকজমক করে হয়েছিল। শ্বশুরমহাশয় আমাকে প্রচুর উপহার দিয়েছিলেন। জামাতা ও বধূ পেয়ে দু'বাড়ীই আনন্দিত।

সুমিতাকে আমাদের বাড়ীতে তার নিজস্ব স্থান করে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সুমিতা প্রথম থেকেই বাবার জলখাবার নিজে তৈরী করে খাওয়াত বলে খুব খুশী। ক্রমে দেখা গেল তিনি সুমিতার কাছে আর অত রাশভারী ভাব নিয়ে থাকেন না। সুমিতাকে খুব স্নেহ করতেন। বলতেন:

—আমারই ছেলে তো। পছন্দ আছে সেকথা স্বীকার করতেই হবে।

সুমিতাদের বাড়ীতে আমাকে সবার সঙ্গে গর্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। সুমিতার বাবা বলতেন:

—সুমিতাকে একটা মেডেল দেওয়া উচিত। অমন জামাই লাখে এক।

আমার শাশুড়ীঠাকরুণও খুব খুশী হয়েছিলেন। আমার সামনে তাদের

সংসারের কোন কথা আর রেখে ঢেকে বলতেন না। এমনকি অনেক ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শও করতেন।

অমিতা এত বাড়াবাড়ি পছন্দ করত না। মাঝে মাঝে ফোঁস করে উঠত।

—অত কি? বাসুদেব দা এমন কিছু কার্তিক ঠাকুর নন যে তোমরা এত বাড়াবাড়ি করবে। দিদি আরও ভাল বর পেতে পারত।

—কার্তিক ঠাকুর? তা কেন? বরং কেষ্ট ঠাকুর হতে পারি। তোমাকে গোপিনী করে নেব।

—এ ধরনের অসভ্য ঠাট্টা আমার একেবারে পছন্দ নয়।

—তোর বর এলে তখন বোঝা যাবে।

এরকম কথাবার্তা সুমিতাদের বাড়ীতে প্রায়ই হত কিন্তু অমিতার সঙ্গে ঠাট্টা করা কখনই এগোত না।

বিয়ের পর একটা বছর যে কখন কেটে গেল আমি টেরই পাইনি বলতে হবে। বাড়ীতে একটা ছোট্ট উৎসব হয়েছিল শুধু দুই পরিবারকে নিয়ে। বাবা এই এক বছরের মধ্যে অনেক লঘু কথাও বলেছেন। সুমিতা এবং তাঁর বৈবাহিক মহাশয় তাকে রাশভারী ভাব রাখতে দেননি।

সেসব দিনের সুখময় ছবি এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে রয়েছে। সুমিতা আমাকে কোন অভিযোগ রাখতে দেয়নি। আমি তখন সব কিছুতেই উৎসাহ পেতাম। কিছুদিন কেটে যাবার পর খেয়াল হল নিজে ব্যবসা করব একথা শাশুড়ীঠাকরুণকে বলেছিলাম বিয়ের আগে। হঠাৎ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কথাটা বলেছিলাম সত্য কিন্তু সেকথা আমি ভুলিনি। এবার স্থির করলাম যে এখনই ব্যবসা শুরু করবার প্রকৃষ্ট সময়। বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে তিনি রাজী হলেন। সুমিতাও আপত্তি করল না।

একদিন আমি রহমান সাহেবকে আমার পরিকল্পনার কথা বলে তার সহায়তা চাইলাম। তারপর কাজে ইস্তফা দিয়ে একটা অফিস খুলে বসলাম। প্যাড ছাপালাম, কার্ড ছাপালাম, ছোট সাইনবোর্ডও লাগালাম। আমাদের বাড়ীতে বাইরের দিকের একটা ঘরে আমার অফিস হল রহমান সাহেবকে অনুরোধ করলাম তিনি যে সব কাজ ছোট বলে বাতিল করেন সেগুলির জন্য যেন আমার নাম সুপারিশ করেন।

রহমান সাহেবের সহায়তায় আমি কয়েকটা কাজ পেয়ে গেলাম। একা পেরে উঠি না বলে একজন সহকারী এবং দুজন শিক্ষানবিশ নিলাম। প্রথম

করেকটা কাজ ভাল করেছিলাম বলে এবং রহমান সাহেবের সুপারিশে আরও কাজ আসতে লাগল। রহমান সাহেব একদিন একটা বড় কাজও আমাকে ধরিয়ে দিলেন। আমার ব্যবসা তার পর থেকে বেশ জমে উঠেছে। বছর পাঁচেকের মধ্যে আমিও কলকাতার একজন অন্যতম স্থপতি বলে পরিগণিত হলাম।

আজ মনে হচ্ছে আমি ব্যবসায় না নামলেই বোধহয় ভাল হত। এই ব্যবসার নেশায় আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি এই ব্যবসার জন্যই ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। যে রহমান সাহেব আমার এত উপকার করেছেন আমি তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। নিছক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে কথা ছিল কিন্তু আমি সত্যমিথ্যা, ছল কৌশল সবই প্রয়োগ করেছি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আমার ভাল মন্দ বোধ, উচিত অনুচিতবোধের ধার কমে গেছে অনেকটা।

একবার নাম হয়ে যাবার পর অবশ্য আমাকে নিজে থেকে ব্যবসা বাড়াতে হয়নি, ব্যবসাই আমাকে বাড়িয়ে নিয়ে গেছে উত্তরোত্তর। একেবারে গুটিয়ে না নিলে আমি চেষ্টা করেও বোধহয় আমার ব্যবসার কলেবর ছোট করতে পারতাম না।

ব্যবসা নিয়ে আমি এত ব্যস্ত থাকি যে সুমিতার সঙ্গে বেশী সময় দিতে পারি না। সুমিতা কিন্তু আমার সব রকমের সুখ সুবিধা স্বচ্ছন্দের দিকে নজর রাখে। আমি সবকিছুই পেয়ে যাই।

আমি যেমন ব্যবসা নিয়ে থাকি সুমিতা তেমনি ঘরের কাজ নিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে সুমিতার কোলে একটি ছেলে এসেছে। তাকে নিয়েই বলতে গেলে সুমিতার সময় কাটে।

আমার যখন ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে, তখন আমাদের একটা শোকের কারণ ঘটল। শ্রীপর্ণার স্বামী একদিন হঠাৎই মারা গেলেন। জ্বর নিয়ে অফিস থেকে ফিরে রাতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারেননি। সব রকম পরীক্ষা শেষ করবার আগেই তিনদিনের দিন তিনি মারা যান। আমরা বাড়াবাড়ি রোগের খবর পেয়ে শ্রীপর্ণার বাড়ী গিয়েছিলাম। শ্রীপর্ণার সঙ্গে তখন আমাদের বিশেষ ভাব। আমার আত্মীয়, সুমিতার বন্ধু; ওর মাধ্যমে আমাদের পরিচয় এবং আমাদের বিয়ের ব্যাপারে ওর ভূমিকা নিয়ে সে আমাদের বিশেষ বন্ধুস্থানীয়। সুমিতা এই সময় শ্রীপর্ণার জন্য অনেক করেছে। দিন কয়েক তার সঙ্গেই থেকেছে। এই ঘটনায় আমরা সকলেই অল্পবিস্তর শোকার্ত হয়েছি।

শ্রীপর্ণা শক্ত মেয়ে বলতে হবে। তার স্বামী ভালই রোজগার করতেন। লাইফ ইন্সুরেন্সও ছিল অনেক টাকার। তবুও ছেলেমেয়েকে ভালভাবে মানুষ করবার সঙ্কল্প নিয়ে সে রাসবিহারী এভেন্যুতে একটা দোকান দিয়ে বসল—মেয়েদের পোষাকের দোকান।

শ্রীপর্ণার হাতের কাজ খুব ভাল। কাজেই তার দোকান মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেল। রেডিমেড জামা কাপড় ছাড়াও, মেড-টু অর্ডারের অনেক কাজ পেতে লাগল। ছাট-কাট ও সেলাই-এর জন্ত কয়েকজন মেয়েকেও দোকানে নিয়েছে।

আমি ও সুমিতা শ্রীপর্ণাকে আবার বিয়ে করবার জন্ত পরামর্শ দিয়েছিলাম। শ্রীপর্ণা রাজী হয়নি। সে বলেছে যে তার সংসারে না বাধলেও সে বিয়ে করবার কোন প্রয়োজনবোধ করছে না। আমরা আর পীড়াপীড়ি করিনি। তার দোকান নিয়ে সুখে আছে। শ্রীপর্ণার বাড়ীতে যেতে আমি তেমন সময় পাই না। সুমিতা যায়, মাঝে মাঝে শ্রীপর্ণাও আসে—অনেক সময় ছুটির দিনটা আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যায়।

তারপর আরও কতদিন কেটে গেছে। আমাদের বিয়ের পর প্রায় পনর বছর। ইতিমধ্যে ছেলে বড় হতে তাকে আমি দেরাদুন সৈনিক স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছি। সুমিতার ইচ্ছা ছিল না অতদূর পাঠাতে, কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে বাধা দেয়নি। আজ মনে হচ্ছে ছেলে আমাদের সঙ্গে থাকলেই ভাল হত। আমাদের আজ যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা হত না হয়ত। গতস্ত শোচনা নাস্তি। সেকথা ভেবে আর লাভ নেই।

কি করে আমরা—আমি আর সুমিতা আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি—সেটা আমাকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে সুমিতাকে, বুঝতে হবে আমার নিজেকে। কিন্তু সব কিরকম এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আজ মনে পড়ছে কত বছর হল যে আমি সুমিতাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাইনি। নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। একটা সময় ছিল যখন সুমিতা আমার পাশে না থাকলে ঘুম হত না। মাঝ রাতে কখনও সুমিতা বিছানা থেকে উঠে গেল আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত। আর আজ খেলাচ্ছলেও সুমিতাকে জড়িয়ে ধরি না। কবে থেকে যে আমাদের এ পরিবর্তন এসেছে জানি না। আর সুমিতা না বললে হয়ত জানতেও পারতাম না।

সুমিতার উপর কখনও বিরক্ত হয়েছি ব আমার মন বিষিয়ে গেছে এরকম কখনও হয়নি। এইতো সেবার আমার ব্যবসা নিয়ে একসময় বড় বিব্রত ছিলাম। একটা ক্যাক্টরী তৈরী হবার সময়ে ধসে যেতে বসেছিল—আমারই একজন

সহকারীর ভুল হিসাবের জন্য। সে নিয়ে খুব বিব্রত ছিলাম। দেখেছি সুমিতাও বিব্রত। অনেক টাকার খেসারত দিয়ে নিজের খরচে সেই ইমারতের ধকল সামলেছি। আমার কার্যের বদনাম হতে দিইনি। কার্যের সুনামই ছিল আমার মূলধন।

এইরকম কত ঘটনা ঘটেছে। সুমিতা আমাকে কখনও দোষারোপ করেনি। প্রতিবার বুঝতে চেয়েছে পরামর্শও দিয়েছে। এবারেও তো সুমিতা আমাকে দোষারোপ করছে না।

আবার এলোমেলো ভাবছি। না: এরকম এলোমেলো ভাবলে আমাদের সমস্যার কোন সমাধান হবে না। সমস্ত ঘটনা আমাকে ঠিকমত সাজিয়ে এর একটা সমাধান বের করতেই হবে। তবে হয়ত সুমিতার কথা বুঝতে পারব।

কদিন ধরে লক্ষ্য করছি অমিতা আমাদের বাড়ী ঘন ঘন আসছে। সুমিতাকে একা কিছু বলতে চায়।

অমিতার এখনও বিয়ে হয়নি। বয়স ত্রিশ বত্রিশ হল। আজকাল অনেকে আরও বেশী বয়সে বিয়ে করে। তবে তাদের সংখ্যা নগন্য বলতে হবে।

আমার বিয়ের সময় অমিতা রীতিমত যুবতী। আমার একমাত্র শালী বলে যে কাব্য করব সে গুড়ে বালি। বড় ঝাল শালী। তাছাড়া আমার উপর খড়্গ হস্ত—প্রথম থেকেই।

মনে পড়ে আমাদের বিয়ের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা আদর্শ দম্পতি বলে আমাদের সুনাম হয়েছিল। অমিতা সে কথা কখনো মানেনি।

—আদর্শ দম্পতি না হাতী। দিদি একটা বোকা মেয়ে আর দেবদা অতি চতুর। আমার কাছে ও সব আদর্শ দম্পতি ফলাতে এস না।

একথা সে সবার সামনেই বলত। ওই তার স্বভাব। যে কথা সবাই বলবে অমিতা তার উল্টো বলবে। তার এখনও বিয়ে না হবার এও একটা কারণ। তাছাড়া তার ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব আছে; কিন্তু সেকথা সে মানে না। তার ধারণা তার চরিত্রে দৃঢ়তা আছে বলে কেউ তার কাছে বেশী ঘেঁষতে সাহস পায় না।

অমিতা সুন্দরী এবং উচ্চ শিক্ষিতা। অনেক ছেলে তার কাছে এসেছিল কিন্তু কেউ শেষ পর্য্যন্ত টেকেনি। এখানেও ভুল করে তার সৌজন্যহীন ব্যবহারকে তার চরিত্রের দৃঢ়তা বলে ধারণা করত। ক্রমে আঘাত না দিয়ে বা স্নেহ না মিশিয়ে ছেলেদের সঙ্গে কথাই বলতে পারত না।

তার বাবা এ নিয়ে খুবই বিব্রত ছিলেন। সেকথা স্বীকার না করলেও আমরা বুঝতে পারতাম। তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন অমিতার বিয়ের জন্য ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কাজ অসমাপ্ত রেখেই তিনি গত হয়েছেন।

আমার শ্বশুর মশাই, মা আর বাবা মারা গেলেন অল্প ব্যবধানে। শ্বশুরমশাই মারা যাওয়াতে আমাদের দুই পরিবার বিশেষ করে আমার বাবা শোকে বড় কাতর হয়ে ছিলেন। কোর্টের কাজকর্মে আর তেমন উৎসাহ পেতেন না। শ্বশুর মশাইকে তিনি খুব পছন্দ করতেন। তাদের মধ্যে একটা সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

তার বছর খানেক পরে মা মারা গেলে বাবা কোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে আমিষ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সুমিতা বার কয়েক অনুরোধ করেছিল। তিনি শোনেন নি। বলতেন :

—আমি আগে মারা গেলে তোমার শাশুড়ী নিরামিষ খেতেন কিনা ?

—সেটা সমাজের রীতি। আপনার তো কোন বাধা নেই।

—সামাজিক বাধা নেই ঠিকই কিন্তু ন্যায়ত বাধা থাকা উচিত। নয় তো কোন পক্ষেই বাধা থাকা উচিত নয়। একতরফা বাধা আমার পছন্দ হয় না।

এরপর তিনিও আর বেশীদিন বাঁচেন নি।

আমার শাশুড়ীঠাকরুণ এখনও বেঁচে আছেন এবং বেশ শক্ত সমর্থ রয়েছেন। চারজনের মধ্যে একমাত্র তিনি বেঁচে আছেন বলে আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব নিবিড়। প্রায়ই আসেন আমাদের বাড়ী।

আমাকে খুব স্নেহ করেন। নিজের দুই মেয়ের থেকেও বেশী স্নেহ করেন। সুমিতা সে জন্য বেশী খুশী। মাঝে মাঝে অবশ্য এ নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। তাদের মধ্যে সম্পর্ক এখন অনেকটা বন্ধুর মত হয়ে গেছে। আমার প্রতি তার স্নেহাধিক্য নিয়ে সুমিতার ঠাট্টার উত্তরে তিনি বলতেন :

—কি করব ? বাসুদেব আমার থেকে বয়সে এত ছোট ছিল, না হলে তোর বাবাকে ডাইভোর্স করে ওকেই বিয়ে করতাম।

এইরকম ছিল তাদের বন্ধুত্ব। সুমিতা এই ধরনের ঠাট্টা উপভোগ করলেও অমিতা জ্বলে উঠত।

—তোমাদের মত বাড়াবাড়ি। দেবদাকে এত ফোলাবার আমি কোন অর্থ দেখিনা। দিদি বলে মানিয়ে নিচ্ছে। অন্য মেয়ে হলে মুরোদ দুদিনেই বেরিয়ে যেত।

এর উত্তরে আমি হয়ত শ্যালিকাকে নিয়ে রসালাপ করতে পারতাম ; কিন্তু অমিতাকে আমি বোধ হয় আজকাল ভয় পাই। তার আবার চরিত্রের দৃঢ়তা নিয়ে বড় বেশী বিলাসিতা।

সুমিতাকে নিয়ে বেশ সুখে ঘর করছি। সুমিতা আমার ব্যবসার উন্নতিতে কোনদিন বাদ সাধেনি। ব্যবসা যত বেড়েছে আমি তত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। বাবা ও মা দুজন গত হবার পর আমাদের বাড়ীর নিচতলার পুরোটাই ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। জন কয়েক ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাফ্টম্যান, একাউন্টেন্ট, কেরাণী ও টেনো টাইপিষ্ট নিয়ে এখন আমার রীতিমত অফিস। আমার আলাদা অফিস ঘর হয়েছে—সেখানে সবার যাবার সম্মতি নেই। আমার শাঁসালো ক্লায়েন্টদের নিয়ে আমি নিচতলার ড্রইংরুমে কথা বলি—এতে তারা আপ্যায়িত বোধ করেন।

এছাড়াও ব্যবসার খাতিরে তাদের আরও বেশী আপ্যায়নও করতে হয়। বড় বড় হোটেলে বা ক্যালকাটা ক্লাবে পার্টি দিই মাঝে মাঝে। যেদিন ককটেল পার্টি দিই সেদিন অনেক রাত হয়ে যায়। খুব বেশী রাত হলে আর বাড়ী ফিরি না। হোটেলেই রাতটা কাটিয়ে দিই।

এইরকম একটা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে অনিমেষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। অনিমেষ আমার থেকে বয়সে কিছুটা ছোট। সে ও ব্যবসা করে। ব্যবসা তার বেশ ফলফলাও। প্রায়ই হিল্লী দিল্লী করে বেড়ায়। অনিমেষ ব্যবসায়ী হলেও বেশ সরল। দেখতে বেশ সুখী সুখী। মোটা মন্দ নয়, একটু ছুটোছুটি করলে দরদর করে ঘাম বেরোয়। তার স্ত্রী খুব সুন্দরী, আমুদে, একটু গলেপড়া ভাব। নিজের ফিগার সম্বন্ধে সচেতন—মোটা হবার ভয়। যত্ন করে প্রসাধন করে। আর তার চোখের দৃষ্টি আকর্ষণীয়। পার্বতীর সব চেয়ে আকর্ষণীয় তার নরম মসৃণ ত্বক—অনাবৃত অঙ্গ মাখনের মত।

পার্বতীর সঙ্গে সুমিতার বন্ধুত্ব হয়েছে। দুজনে দুজনকে পছন্দ করে। সুমিতা ছাড়া পার্বতীর কেনাকাটা একেবারে চলে না। দিন দিন তাদের বন্ধুত্ব বেড়ে চলেছে। সুমিতার এখনকার বন্ধুদের মধ্যে পার্বতীর স্থান সবার উপরে।

পার্বতী প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসে। অনিমেষ বাইরে গেলে সারাটা দিন আমাদের বাড়ীতে কাটিয়ে যায়। রাত্রিতে কখনও অবশ্য নিজের বাড়ীর বাইরে থাকে না। পার্বতী আমাদের বাড়ীতে এত আসে বলে আমার সঙ্গেও তার ভাব হয়েছে।

শ্রীপর্ণা ও পার্বতী এ দুজনই এখন সুমিতার বন্ধু। শ্রীপর্ণা তার দোকান নিয়ে

ব্যস্ত থাকে বলে বেশী আসতে পারে না। শ্রীপর্ণা ও পার্বতীর চরিত্র গত পার্থক্য থাকলেও সুমিতার সঙ্গে দুজনেরই ভাব। শ্রীপর্ণার সঙ্গে সুমিতার চরিত্রগত মিল অনেকটা। পার্বতীর সঙ্গে মিল খুঁজে বের করতে হয়। তৎসত্ত্বেও তার সঙ্গেই আজকাল সুমিতার বেশী বন্ধুত্ব।

অমিতা পার্বতীকে একেবারে পছন্দ করে না—পছন্দ করে না বললে কমই বলা হল। প্রকৃতপক্ষে পার্বতীকে সে সহ্যই করতে পারে না। মাঝে মাঝে পার্বতীর প্রতি তার ব্যবহার সৌজন্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু সুমিতার জন্য তার ব্যবহার এখনও সীমাবদ্ধ রয়েছে।

পার্বতীকে হেনস্থা করতে দেখে আমার ভাল লাগত না। পার্বতীকে আমি পছন্দ করি। একদিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন পার্বতী সিনেমায় যাবার প্রস্তাব করল। সুমিতাও উৎসাহিত হয়ে উঠল। নিচে নেমে আমার অফিসে বলে এলাম—আজ আমার কারো সঙ্গে আর দেখা হবে না। কেহ এলে অন্য কোনদিন আসতে বলে এলাম।

সে দিন সিনেমায় যাবার দরুন আমার ব্যবসায় কিছু ক্ষতি হয়েছে এবং হবে সেকথা সিনেমায় যাবার আগেও জানতাম। তবু সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ব্যবসায়ে যে ক্ষতি হল সেজন্য আমার একটুও অনুশোচনা হয়নি। আজ মনে পড়ছে ব্যবসায় ক্ষতি করে শুধু সুমিতাকে নিয়ে সিনেমায় যাইনি বহু দিন।

আমরা দুজনে মিলে বেড়াতেও যাইনি বহু দিন সিনেমাতেও না। ছুটির দিনে অবশ্য কোথাও বেড়াতে যাওয়া নিয়ে মাঝে মাঝে কথা হয়েছে কিন্তু যাওয়া হয় নি। সকালবেলা এ আলোচনা শুরু হত। আলোচনা করতে করতে সকালটি কেটে যেত। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দিবানিদ্রা বেশী লোভনীয় মনে হত। বিকেলে আবার একই আলোচনা কিছুক্ষণ চলবার পর সব উৎসাহ চলে যেত।

সেদিন পার্বতী সিনেমার কথা তুলতে আমরা দুজনেই উৎসাহের সঙ্গে গিয়েছিলাম। এরপরেও বার কয়েক আমরা তিনজনে বেড়াতে এবং সিনেমা দেখতে গিয়েছি।

বছর খানেক হল পার্বতীকে নিয়েও আমরা একসঙ্গে সিনেমাতে বা বেড়াতে যাইনি। সুমিতা প্রায়ই পার্বতীর সঙ্গে মার্কেটিং এ যায়। বেশীর ভাগই নিউ-মার্কেটে। আমি সুমিতার সঙ্গে কদাচিত মার্কেটিং এ যাই। বিশেষ কোন উপহার কিনতে আমাদের কখনো সখনো এক সঙ্গে যেতে হয়। মার্কেটিংএ বেরোলে আমরা শ্রীপর্ণার দোকানেও যাই। সেখানে দু'একটা টুকিটাকি জিনিষও

কিনি। ইদানিং শ্রীপর্ণার দোকানে গিয়ে তার সঙ্গে প্রায় কথা বলা যায় না। দোকানে খুব ভীড় লেগে থাকে এবং ক্রেতাদের নিয়ে শ্রীপর্ণা খুব ব্যস্ত থাকে। আমাদের সঙ্গে বেশী কথা বললে তার ব্যবসায়ের ক্ষতি। সে কথা ভেবে আর বিশেষ যাই না।

কিছুদিন আগে শ্রীপর্ণা আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। সেদিন নানা কথার মধ্যে তার দোকান নিয়ে কথা হল বেশী :

—সুমি, আজকাল আর পেরে উঠি না। এত ভীড় লেগে থাকে।

—ভীড় লেগে থাকা তো তোর ব্যবসায় উন্নতির লক্ষণ।

—তা ঠিক। কিন্তু আমি একা পারব কেন? সন্ধ্যার সময় আমার যা অবস্থা হয়।

—সে আমি দেখেছি। দেখে ভাল লেগেছে।

—তোর কাছে আজ একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

—প্রস্তাব? কি প্রস্তাব?

—তুই আমার দোকানে যোগ দে না কেন।

—চাকরি দিবি বলছিস?

—না। চাকরীর কথা হচ্ছে না। পার্টনার হিসাবে তুই যোগ দিলে ভাল হয়। তোর হাতের কাজ কত ভাল। আমি আর সত্যিই একা সামলাতে পারছিনা।

—না বাবা, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

—তোর নিজের কথাও ভাব। একটা কাজ নিয়েও থাকা হবে। সময়ও কাটবে, কিছু পয়সাও আসবে। আর মন্দ হয় না রে।

—আমি বেশ আছি বাবা।

সুমিতার সঙ্গে শ্রীপর্ণার এসব কথা হয়েছে তাও মাসখানেক হল। শ্রীপর্ণা ইতিমধ্যে আরও একবার একথা তুলেছিল কিন্তু সুমিতা রাজী হয়নি। আজ সে নিজে থেকে শ্রীপর্ণার সঙ্গে ব্যবসায় যোগ দিল। কেন যোগ দিল জানিনা। আমি তার কোন অভাব রাখিনি। আমার উপর কি সে নির্ভর করতে পারছে না? কি জানি? হবেও বা।

সুমিতার এই সিদ্ধান্ত আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে—সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। কারণটা জানতে পারলে সুমিতাকে বুঝতে সুবিধা হত। সুমিতা নিজে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্য কেউ তাকে প্রভাবিত করেছে

বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সুমিতা সে রকম মেয়ে নয়। সব ব্যাপারে সুমিতা নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কথা শুনে যায় অবশ্য সবারই ; কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় কারো উপদেশ অনুরোধের ধার ধারে না।

কদিন ধরে আমাদের বাড়ীতে কয়েকজনের যাতায়াত একটু বেড়ে গিয়েছিল। শাশুড়ী ঠাকরুণ, অমিতা ও শ্রীপর্ণা হালে ঘন ঘন আসছে। আমার নজরে এসেছিল কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। এখন বুঝতে পারছি অমিতা কোন কথা একান্তে সুমিতাকে বলতে এসেছিল। শ্রীপর্ণাও নিছক ব্যবসায় খাতিরে সুমিতাকে অংশীদার করতে চায়নি।

এ সব দেখেও আমি কিছু মনে করিনি। মনে করিনি বললে হয়ত ঠিক বলা হবে না। আমার তখন এ সব দেখবার ফুরসৎ ছিল না। আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম আমার ব্যবসা নিয়ে। অধুনা আমার পার্টি প্রায়ই লেগে থাকত।

পার্টির কথাতে আবার পার্বতীর কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু এসব কথা বলে লাভ কি ? আমি চাইছি আমাদের আজকের সমস্যা বুঝতে—আজ রাতের মধ্যেই আমাকে বুঝতে হবে। সে কথা বুঝতে হলে ঘটনাগুলি পর পর সাজিয়ে লিখতে হবে। লিখতে বসেছি অনেকক্ষণ ; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এক ছত্রও লেখা হয়নি। লিখতে বসে এলোমেলো চিন্তা মাথায় আসছে আর ভাবছি। ভাবতে ভাবতে আবার কখন ব্যালকনিতে চলে এসেছি জানতে পারিনি।

আকাশে সেই ঝুলে থাকা চাঁদ এবং পেঁজা তুলোর মত মেঘে রঙিন দৃশ্য আর খুঁজে পেলাম না।

আকাশের চাঁদ এখন পশ্চিম দিকে হেলেছে। খুঁজে বের করতে না হলেও প্রথমেই নজরে আসে না। তাকে এখন আর ঝুলন্ত বলেও মনে হচ্ছে না। ঈষৎ কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করছে অথবা বলা যায় মুখ লুকোবার চেষ্টা করছে। মেঘেও আর পেঁজা তুলার মত নরম ভাব নেই। আকাশে চাঁদের প্রভাবে যে মেঘ রাঙ্গা হয়েছিল এখন আর তা নেই। এখন তাকে চিমনির ধোঁয়া অনেকটা ছড়িয়ে পড়লে যেমন হয় তেমন মনে হচ্ছে। চাঁদকে এখন সে সামনে এগিয়ে দিয়ে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ হবার সুযোগ দিয়ে নিজেও আনন্দে মেতে থাকছে না। বরং চাঁদকে আড়াল করে দুজনেই নিশ্চুপ হয়েছে।

মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। আজ রাতে আকাশ আমার সঙ্গে এ কি খেলা খেলছে ? আমার অপরাধ আকাশ ক্ষমা করছে না। স্পষ্ট আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে।

রাত অনেক হল। কত হল না জানলেও বুঝতে পারছি রাত শেষ হতে এখনও অনেক দেরী আছে। আমার আর সময় নষ্ট করা চলে না। ঘটনাগুলি পর পর সাজাতে চেষ্টা করতেই হবে। আজ রাতের মধ্যেই তা করতে হবে। সমস্যা বুঝতে হবে তার সমাধানও খুঁজতে হবে। সমাধান হবে বলে সন্দেহ আছে কিন্তু সমস্যা তো বুঝতে পারব।

সম্বল নিয়ে ঘরে এসে লিখতে বসে আবার সমস্যা। কোথা থেকে শুরু করি। কোন কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করব আর কোনটাই বা ছাড়ব তা ঠিক করতে পারছি না। কোন একটা দিন থেকে শুরু করব কি? দিনক্ষণ দিয়ে কি ঘটনা সাজান যায়। ঘটনা কি দিনক্ষণের অপেক্ষা রাখে? তাছাড়া ডাইরিও রাখিনি।

পার্বতী থেকে শুরু করব কি? কিন্তু পার্বতী তো আমার সমস্যা নয়। পার্বতী উপলক্ষ্য হতে পারে কিন্তু সমস্যা তো সেখানে নয়। একেবারে হালের দুতিন দিনের ঘটনাগুলি পরপর সাজালে সমস্যার মূলে না যেতে পারলেও চেষ্টা করতে পারি।

সাজাব সব ঘটনা—কোন ঘটনাই বাদ দেব না। কিন্তু সেসব ঘটনাতে যে আমি জড়িত। নিজের কোন-ঘটনা অকপটে লিপিবদ্ধ করা যায় কি? নিজেকে ভাল সাজাতে কার না ইচ্ছা হয়।

অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে একটা সাধারণ মানুষ,সমাজের একটি জীব—আমার মত অনেক মানুষের মধ্যে একজন বলে মনে করলে অকপটে সব কথা বলা সম্ভব হবে। আজ যে ঘটনা ঘটল বা বলা যায় কাহিনী যে পর্য্যন্ত গড়াল সে কি শুধু আমার কাহিনী? আমার মত আর কেউ নেই? হতে পারে না। এ শুধু একা আমার কাহিনী হতে পারে না। তাই যদি হয় তাহলে অকপটে সব কথা কেন বলব না? বাসুদেব না হয়ে আমি অচিন্ত্য বা সুভাষ হতে পারতাম। অথবা হতে পারতাম উইলিয়াম বা ইউসুস।

বাসুদেব, এবার সাজিয়ে যাও। তোমার সমস্যা বুঝতে হলে সাজিয়ে যাও অকপটে। তাহলে দেখবে সুমিতাকে বা সুমিতাদের বুঝতে পারবে। এই প্রকৃষ্ট সময়। আর সময় নষ্ট না করে সাজিয়ে যাও গত কয়েক দিনের কথা।

সেদিন সুমিতা বাড়ী ছিল না। আমি আমার একজন শাঁসালো ক্লায়েন্টের

সঙ্গে জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত। এমন সময় এলেন শাশুড়ী ঠাকরুণ। আমি নিচ থেকে এক মিনিটের জন্য উপরে গিয়ে শাশুড়ী ঠাকরুণকে বসতে বলে আবার ফিরে এলাম।

তিনি একাই বসে রইলেন। শাশুড়ী ঠাকরুণ ইদানিং আরও বেশী স্নেহপরায়না হয়েছেন—প্রায়-ই আমাদের খোঁজ খবর নেন। আমাদের বাড়ীতে এসে প্রায় বসে থাকেন। তিনি নিজে কথা কদাচিৎ বললেও আমাদের কথাবার্ত্তা বেশ উপভোগ করেন। সুমিতা খুব খুসী হয় তার মাকে দেখে। তারা পরস্পরের মধ্যে খুব কম কথা বললেও মনে হয় যেন কত কথা কত আলোচনা তাদের মধ্যে হয়ে যায়। তাদের এই মধুর সম্পর্ক আমাকে আনন্দ দেয়।

আমার সঙ্গে অবশ্য তার অনেক কথা হয়। বলতে গেলে আমাদের বাড়ীতে আমার সঙ্গেই শুধু শাশুড়ী ঠাকরুণের কথাবার্ত্তা হয়। সুমিতা আমাদের কথায় বিশেষ কিছু না বলেও যোগ দেয়।

একটু পরে অমিতা এল। অমিতা তার মাকে দেখে অবাক হল।

—মা, তুমি এখানে?

—এলাম।

—আমাকে তো বলে আসনি।

—না, তোকে আর বলা হয় নি। আসতামও না; কিন্তু তুই এখানে আসবি জেনে চলে এলাম।

—আমি এখানে আসব সে কথা তো তোমাকে বলিনি।

—তা বলিসনি।

—তাহলে তুমি জানলে কি করে যে আমি এখানে আসব।

—আমি যে তোদের মা।

অমিতা ভাবতে লাগল তার আসার কথা কি ভাবে মা সঠিক আঁচ করলেন। সাধারণত সে বুড়োবুড়িদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। তাদের সে স্থবির ছাড়া আর কিছু ভাবে না। অন্যান্য বুড়ীদের তুলনায় তার মাকে বেশী বুদ্ধিমতী বলে মনে করলেও তার মনের কথা বুঝতে পারবেন এ বিশ্বাস তার নেই। তার সন্দেহ হল হয়ত তার আসার কারণও মা আঁচ করতে পেরেছেন। নিশ্চিত হবার জন্য মাকে জিজ্ঞেস করল:

—মা, দিদির আসতে হয়ত দেরী হবে। তুমি কি ততক্ষণ বসবে?

—তুই কি করবি? যাবি নাকি এখন?

—না, দিদির সঙ্গে আমার দরকার আছে একটু।

—এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে এখন।

মা-এর কথাতে ঠিক বোঝা গেল না। সন্দেহ রয়েই গেল। তাহলেও আজ ও দিদির সঙ্গে কথা না বলে বাড়ী ফিরবে না বলে মনস্থির করল।

সুমিতার ড্রইংরুমে আজ কয়েকটা নতুন জিনিষ অমিতা দেখতে পেল। একটা নতুন অয়েল পেন্টিং ছবিটা খুব সুন্দর লাগল। একটি মেয়ে প্রায়-কোমর নদীর জলে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে গা রগড়াচ্ছে। ভেজা শাড়ীর ভিতর দিয়ে অপূর্ব স্নিগ্ধ নয়ন ভুলানো সুন্দর রংএর সংমিশ্রণে তার শরীরের রেখাগুলি ফুটে বেরিয়েছে : মুখের ভঙ্গীটিও খুব সুন্দর। আনমনে কিছু একটা ভাবছে এবং মুখে সেই সুখস্মৃতি ও তৃপ্তির অভিব্যক্তি দেখে তাকে আর ছবি বলে মনে হয় না। স্নান করতে এসেও সে কোথায় আছে বা কি করছে সে সম্বন্ধে তার কোন খেয়ালই নেই।

ড্রইংরুমের অন্যান্য সব ছবি, কিউরিও এবং আসবাবপত্র সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সুমিতার ড্রইংরুম খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ আগে কোনদিন হয়নি। সবসময়ই কেউ না কেউ উপস্থিত থাকে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এ সব আর তার দেখা হয়নি। আজ মা থাকলেও সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। সব মিলিয়ে সুমিতার ড্রইংরুম তার ভাল লাগল। একটা স্নিগ্ধভাব সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই ড্রইংরুমকে এত সুন্দর লাগলেও তার মনে দুঃখও হল। এই স্নিগ্ধ সুন্দর ড্রইংরুমে সুমিতার কি কোন প্রয়োজন আছে? কিন্তু আর কিছু ভাববার আগে সুমিতা বাড়ী ফিরল—সঙ্গে পার্বতী। অমিতার মনে যে একটা স্নিগ্ধভাব এসেছিল পার্বতীকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে তা উবে গেল। তার রাগ হল।

সুমিতা মা ও ছোট বোনকে দেখে খুশীহল।

—মা কতক্ষণ এসেছো? অমিতা, খুব ভাল হয়েছে তুই এসেছিস।

অমিতা কোন জবাব দিল না। পার্বতীকে দেখে সে তার দিদির উপরও রাগ করেছে। সুমিতা সেদিকে খেয়াল না করে পার্বতীকে বলল।

—জানিস পার্বতী, আমার প্রয়োজনের সময় মাকে ঠিক এখানে পাওয়া যায়। আমাকে এখনও ছোট মেয়ের মত আগলে বেড়ান।

মা সুমিতার কথার উচ্চবাচ্য না করে পার্বতীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। অমিতা পার্বতীর দিকে একবারও ফিরে তাকাল না। তার উপস্থিতি অস্বীকার

করবার ভঙ্গী বজায় রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তা হল না—পার্বতী তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল :

—অমিতা, কেমন আছ ভাই! তোমাকে একটু রোগা দেখাচ্ছে যেন।

—কি জানি বাপু তোমরা কখন কি দেখতে পাও। দিদি আমি তোর জন্য অনেকক্ষণ বসে আছি।

—তাই নাকি? নিশ্চয়ই আমার উপর রেগে আছিস।

—আমি রাগ করলে তোমার তাতে বয়েই যায়।

পার্বতী এবার বলল : যার বয়ে যেতে পারে তাকে জোটালেই পার।

সুমিতা প্রমাদ গুণল। পার্বতীর কথা শেষ হবার আগেই বলল : নারে, আমি বুঝিনি যে তুই আসবি। না হলে তাড়াতাড়ি চলে আসতাম। হয়েছে কি জানিস—নিউমার্কেটে কেনাকাটি করতে করতে একটা লকেট পার্বতীর খুব পছন্দ হয়ে যায়। কি সুন্দর না! একেবারে নতুন ধরনের ডিজাইন।

এরপর লকেটের ডিজাইন, লকেট থেকে অন্যান্য গহনা—গহনার সঙ্গে মানানসই শাড়ী ইত্যাদি করে শাড়ী ও গহনার কথায় সবাই মেতে উঠল। মেয়েদের এ ব্যাপারে সুবিধা আছে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে হলে শাড়ী গহনার মত আর কোন বিষয় নেই। শাড়ী ও গহনার কথা একবার তুলে দিলে আর দেখতে হবে না। এই শাড়ী ও গহনার কথায় নিজে খুব একটা মেতে না উঠলেও সুমিতা মন দিয়ে সবার কথা শুনছিল—এমন কি পার্বতীর কথায়, তার দিকে একটুও না তাকিয়ে।

কিছুক্ষণ ও আলোচনা চলার পর নিজের সঙ্কল্পের কথা মনে পড়ল অমিতার। মা ও সুমিতাকে শাড়ী গহনা নিয়ে এত মেতে উঠতে দেখে আবার মনে মনে সে রেগে গেল। খানিক অপেক্ষা করে 'চলি আজ' বলে বেরিয়ে গেল। মাও উঠে পড়লেন :

—দাঁড়া অমিতা। আমিও যাচ্ছি। সুমি, চলি আজ, পার্বতী একদিন এসো আমাদের বাড়ী।

মাওড়ীঠাকরুণও অমিতাকে বেরিয়ে যেতে আমি অফিস ঘর থেকে দেখতে পেয়েছি। একটু পরে আমি সুমিতার ড্রইং রুমে এলাম। পার্বতীকে দেখে অবাক হবার ভান করলাম।

—আরে পার্বতী যে। কতক্ষণ এসেছো? অনিমেষের কি খবর? তার যে দেখাই পাওয়া যায় না।

—আপনিও তো কতদিন যান না।

—যাব নিশ্চয়ই, তবে কি জান সময় পাইনা। এই ব্যবসা নিয়ে পড়াতে আর সময় করতে পারি না। এক এক সময় সব ছেড়ে ছুড়ে দিতে ইচ্ছা করে।

সুমিতা তখন বলল—ও কর্মটি করো না। ব্যবসা ছাড়ার কথা মনেও এনো না।

—অনিমেষের কি খবর ?

—আর অনিমেষের খবর। সেও তার ব্যবসা নিয়ে মেতে আছে। জানিস সুমিতা, আমাকে এখনই উঠতে হবে। অনিমেষ আজ আবার বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লী যাচ্ছে।

কথাটা শুনে মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে ফেললাম,—সুমি, তোমাকে বলা হয় নি। আজ রাতে গ্র্যাণ্ডে একটা পার্টি আছে। ফিরতে বেশ রাত হবে। একটা দুটোও বেজে যেতে পারে।

—অত রাতে বাড়ী ফিরবে ? একা এত রাতে আসা হয়ত ঠিক হবে না। দিনকাল যেরকম খারাপ। রাতটা বরং হোটেলেই থেকে এস।

কথাগুলি সুমিতা আন্তরিকতারসঙ্গে বলল। শুনে সুমিতার উপর বড় মায়া হল ; আর নিজেকে মুহূর্তের জন্য অপরাধী বলে মনে হল। তবুও বললাম—সেই ভাল হবে। অতরাতে তোমাকে কেন অনর্থক বিরক্ত করা।

—দেবদা, আপনারা পারেনও বাবা। খালি কাজ আর কাজ।

সুমিতার বাড়ী থেকে বেরিয়ে অমিত্র মাকে বাড়ী ফিরতে বলে বাসে উঠে পড়ল। বাস থেকে যথাস্থানে নেমে শ্রীপর্ণার বাড়ীতে এল।

—জান শ্রীপর্ণাদি, দেবদা পার্বতীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছে।

—তুমি আবার একথা সুমিতাকে বলেছ নাকি ?

—বলতেই তো চেয়েছিলাম।

—যাক, বলনি তাহলে। শোন অমিতা, ঘুণাক্ষরেও একথা সুমিতাকে বলো না।

—ও···, তাহলে তুমিও জান।

—আমি জানি কি না জানি সেকথা হচ্ছে না। বলো না কিন্তু প্লিজ। আমার অনুরোধ।

—আমি ওসব অনুরোধ টনুরোধ রাখতে পারব না। একথা বলা দরকার।

দিদির জানা উচিত তার স্বামীর কীর্ত্তিকাহিনী।

শ্রীপর্ণা অনেক চেষ্টা করল। অমিতা তো শুনলই না, শেষে রাগ করে বাড়ী চলে গেল।

বাড়ীতে মাকে বলতে গিয়েও থেমে গেল। কি ভেবে মাকে আর বিব্রত করতে চাইল না। কিন্তু সে আশ্চর্য্য হল যখন মা সে প্রসঙ্গ তুললেন।

—যা জেনেছ তা নিজের কাছেই রেখ।

—কি জেনেছি?

—সকাল থেকে ছটফট করে বেড়াচ্ছ সুমিতাকে বলবার জন্ত। সেটা আজ আমি হতে দিইনি; কিন্তু কি করে তুমি সে কথা শ্রীপর্ণাকে বললে?

যা রেগে গেলে তুমি সম্বোধন করেন। সে আশ্চর্য্য হল ভেবে যে মা সঠিক আন্দাজ করেছেন। দু'বারই।

—শোন, তোমাকে একটা কথা বলি। সুমিতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘটনাটা না জানতে পারছে ততক্ষণ কারো কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সুমিতা জানতে পারলে তার ক্ষতি বেশী।

—তুমি না মা? কোন মা তার জামাইয়ের এরকম ব্যবহারের পরও যে নির্বিকার থাকতে পারে তা আমি ভাবতেও পারি না।

—সে তুমি ভাবতে পারবে না জানি কিন্তু কথাটা মনে রেখ।

পরদিন অমিতাকে ঠেকান গেল কিন্তু তার পরদিন আর পারা গেল না। আজ সকালবেলা অমিতা আমাদের বাড়ীতে চলে এল। এসব কথা আমার জানার কথা নয় কিন্তু অমিতা আজই সকালে এক সময় সব গড়গড় করে বলে গেল রিপোর্টারের ভাষায়।

আজ সকালে যে সব ঘটনা ঘটে গেল তা ভাবতেও আমার ভয় হচ্ছে। সকাল সকাল পার্বতী এল। সুমিতা তখন বাথরুমে। পার্বতীকে খুব ভীত ও নার্ভাস মনে হল।

—কি ব্যাপার পারু? কি হয়েছে?

প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে পার্বতী জবাব দিল—অনিমেষ ··

—কি হয়েছে অনিমেষের?

—অনিমেষ সন্দেহ করেছে।

—কি করে বুঝলে?

—কাল সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর থেকে সে অদ্ভুত ব্যবহার করছে। সব সময়

গম্ভীর থাকছে। দায়সারা গোছের দু'একটা কথা ছাড়া আর কিছু বলছে না। একবার জিজ্ঞেস করলো যে সে চলে যাবার পর আমি কোথাও গিয়েছিলাম কিনা। আর এক সময় জানতে চাইল কেউ আমাদের বাড়ীতে এসেছিল কিনা।

—তুমি কি বললে?

—আমি আবার বলে ফেললাম যে সে রাত্তিরে আমি সুমিতার বাড়ী খেয়েছি—তারপর এসে শুয়ে পড়েছি। আজ সকালে আমাকে কিছু না বলেই অনিমেষ বেরিয়ে গেছে।

—হয়ত কোন জরুরী কাজ আছে।

—না, না, শত জরুরী হলেও আমাকে না বলে আজ পর্যন্ত সে কখনও বেরোয় নি।

—তুমি অযথা মন খারাপ করছ। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—অনিমেষের জন্য অত ভাবি না। তাকে যা হোক করে—একটু বেশী আদর সোহাগ দিয়ে সামলাতে পারব।

—সে আমি জানি। তুমি যাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে ওস্তাদ।

পার্বতী আমার কথায় কান দিল না। নিজের কথাই বলতে লাগল।

—সুমিতা জানতে পারলে আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। জান, সে আমার প্রাণের বন্ধু।

—সুমিতার জানবার আশংকা থাকলে আর কেউ জানাবার আগে আমি নিজে তাকে সব খুলে বলব। সুমিতা রেগে যাবে—সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু তবু···

—তোমার কথা শুনে সুমিতাকে হিংসে করতে ইচ্ছা করে।

এমন সময় বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। আমি একটু গলা তুলে পার্বতীকে বললাম:

—অনিমেষকে নিয়ে এলে না কেন? গল্প করা যেত। কতদিন তার সঙ্গে গল্প করা হয় না।

তারপর ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম:

—সুমি, দেখ তোমার জন্য পার্বতী সেই তখন থেকে বসে আছে।

সুমিতা তার ঘর থেকে উচ্চৈস্বরে বলল:

—পার্বতী, তুই তোর দেবদার সঙ্গে একটু গল্প কর; আমি এখনই আসছি।

একটু পরে সুমিতা এল। পার্বতী কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বলল:

—এই দেখ না. সকাল সকাল অনিমেষ বেরিয়ে গেল। আমাকে বলে পর্য্যন্ত যায় নি। আমার মন খারাপ হল আর চলে এলাম।

সুমিতা চকিতে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পার্বতীকে বলল :

—খুব ভাল করেছিস। মন খারাপ হলে বন্ধুর কাছে আসবি না তো কার কাছে যাবি? কিছু তো খেয়ে আসিস নি। মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। চল আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট সেরে নে।

—এক কাপ কফি ছাড়া সকালে আমি কিছু খাই না। ডায়াটিং করছি।

-- এমনিতেই তোর ফিগার কি সুন্দর—আবার ডায়াটিং?

—তোর যত বাড়াবাড়ি।

—বাড়াবাড়ি? আমারই তোর গাল টিপে দিতে ইচ্ছে করে। পুরুষরা যেন কি করে? কি গো, তোমার ইচ্ছা করে না পার্বতীর গাল দুটো টিপে দিতে?

—কি পার্বতী, দেব নাকি গাল টিপে?

—কি যে তোরা ঠাট্টা করিস জানি না। চল, তোদের সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট করা যাক।

আমার হাতটা নিসপিস করছিল। হাতের তালু ঘেমে উঠল। পকেটে হাত দিয়ে খেয়াল হল গতকাল থেকে সেই রুমালটা পাচ্ছি না।

—সুমি, আমার সেই রুমালটা কোথায় গেল বল তো। কাল থেকে পাচ্ছি না।

—কোন রুমালটা?

—ওই যে সেটা। যেটা আমার সবচেয়ে শৌখীন রুমাল।

—শ্রীপর্ণার দোকান থেকে যেটা শখ করে কিনেছিলাম?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা।

—আছে কোথায়, আমি পরে খুঁজে রাখব।

ব্রেকফাষ্ট শেষ হতে এল অমিতা। পার্বতীকে দেখে বেশ অসুখী হল। সেটা প্রকাশও করল :

—পার্বতী, এ বাড়ীটা কিনে নিয়েছ নাকি?

সুমিতা আশ্চর্য্য হবার ভান করে বলল—তুই জানিস না বুঝি! তবে পার্বতী ভাল মেয়ে। আমাকে উঠিয়ে দেবে না।

—না দিলেই ভাল।

আর কথা এগোবার আগেই এলেন শাশুড়ীঠাকরুণ। সুমিতা খুব খুশী হল মাকে দেখে। বলল—

—তোমরা সবাই আজ সারাদিন এখানেই কাটিয়ে যাও না। বেশ মজা হবে। কি গো, তুমি কাজ কর্ম্ম ভুলে থাকনা সারাদিন বাড়ীতে।

আমি রাজী হয়ে গেলাম। সুমিতার এরকম একটা অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। ইচ্ছা হল অমিতাকে একটু রাগিয়ে দিই কিন্তু হল না। তখনই শ্রীপর্ণা এল। সুমিতা শ্রীপর্ণাকেও অনুরোধ করল। শ্রীপর্ণা সকালটা থাকতে রাজী হল, কিন্তু বিকেলে তাকে দোকান খুলতেই হবে।

প্রায় সারা সকাল বাড়ীতে একটা আনন্দের হাট বসে গেল। সুমিতা ও শাশুড়ী ঠাকরুণ আসর জমিয়ে রাখলেন। ওরই মধ্যে সুমিতা মাঝে মাঝে রান্নার দিকটা দেখে এল।

অমিতার বর কেমন হবে এ প্রশ্ন সুমিতা তুলে দিল। শাশুড়ীঠাকরুণ বললেন—সাত চড়ে রা নেই।

শুনে শ্রীপর্ণা বলল :

—তাহলেই হয়েছে ? বেচারার চড় খেতে খেতেই জীবনটা যাবে।

আমি সমর্থন করলাম এবং বললাম—একটা গুণ্ডা দরকার।

পার্বতী জুড়ে দিল—তার থেকেও ভাল হয় একটা 'মাস্তান' জোটালে।

অমিতা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল—সেটা তোমারই দরকার, বুঝলে পার্বতী।

সুমিতা সবাইকে থামিয়ে বলল—তোমরা কেউ পারলে না। অমিতার বর হবে সুপুরুষ, বাসুদেবের থেকেও স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান কিন্তু প্রথম রাত্তিরেই বিড়াল কাটবে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এমন কি অমিতাও। এমন সময় ঘন্টির আওয়াজ হল। উঠে দরজা খুলতে খুলতে আবার ঘন্টির আওয়াজ। দরজা খুলতেই প্রবেশ করল অনিমেষ। নাটকীয় প্রবেশ বলাই বোধ হয় ঠিক হবে।

অনিমেষকে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেল। একটু আগে যে লঘু ও আনন্দের পরিবেশ ছিল তা দপ করে নিভে গেল। প্রথমতঃ অধৈর্য্য ঘন্টির আওয়াজ দ্বিতীয়ত অনিমেষের আসা অপ্রত্যাশিত। তৃতীয়ত অনিমেষের রক্তশূন্য ঘেমো মুখে দুঃখ-রাগ-জ্বালার অভিব্যক্তি। আমি মনে প্রমাদ গুণলাম—মুহূর্ত্তের জন্য। পার্বতী লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল—সুমিতা শক্ত হাতে তাকে তার পাশে ধরে রাখল। আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম :

—অনিমেষ এসেছ, ভালই হয়েছে। আমরা তোমার কথাই ভাবছিলাম। আজ সবাই···

কথা শেষ করলাম না। সেই পরিবেশে আমার কথাগুলি এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল যে আমার নিজের কানেও তা বেখাপ্পা ঠেকল। আমি থেমে গেলাম। কেউ আমার কথা কানেও তুলল না। অনিমেষ তো নয়ই।

সুমিতা গম্ভীর অথচ সুন্দর করে বলল—এসো অনিমেষ, বোস। তুমি আসাতে আমি খুশী হয়েছি।

অনিমেষ একটু মোটা হলেও সুপুরুষই বলা যায়। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। সে একবার সবার মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে সুমিতাকে বলল :

—দেখছি তোমরা বেশ উৎসব করছ। কিন্তু জান সুমিতা, আমার স্ত্রী তোমার স্বামীর মিষ্ট্রেস—

সুমিতা একটুও বিচলিত হল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল—

—তাই বুঝি ? জানতে পারি কি তুমি কি করে জানলে ?

অনিমেষ পকেট থেকে একটি রুমাল বের করল। আমার সেই হারিয়ে যাওয়া রুমাল। চকিতে মনে পড়ল পরশু রাতে এই রুমাল নিয়েই আমি পার্বতীর বাড়ী গিয়েছিলাম। রুমালটা এক সময় পার্বতীর বালিশের নিচে রেখে দিয়েছিলাম। আসবার সময় মনে পড়েনি। কি যে বোকামী করেছি।

রুমালের কোণ ধরে নাচাতে নাচাতে অনিমেষ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল :

—চিনতে পার এ রুমালটা ? এটা আমার স্ত্রীর বালিশের তলায় গতকাল আমি পেয়েছি।

পার্বতী ভয়ে কুঁকড়ে গেল। সুমিতা সেই যে পার্বতীর হাত ধরেছিল এক মুহূর্তের জন্যও আর ছাড়েনি। পার্বতীকে আরও একটু কাছে টেনে বলল :

—অনিমেষ, তুমি আমায় বাঁচালে। এই রুমালটা যে আমি কোথায় ফেলেছিলাম কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। খুব শখ করে শ্রীপর্ণার দোকান থেকে এই রুমালটা কিনেছিলাম।

এই বলে রুমালটা অনিমেষের হাত থেকে নিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

—কিন্তু এ রুমাল তো তোমার নয়।

—নিশ্চয়ই আমার।

—তাহলে পার্বতীর বালিশের তলায় গেল কি করে ?

পরশু রাতে খাওয়া দাওয়ার পর পার্বতীকে এখানে থেকে যেতে বলেছিলাম

কিন্তু পার্বতী থাকল না। আমি পৌঁছে দিতে গিয়ে ওর বিছানায় কিছুক্ষণ বসে গল্প করেছিলাম। তখন মনের ভুলে রুমালটা ফেলে রেখে এসেছি।

—আমি বিশ্বাস করি না। এ রুমালে বাসুদেবের নাম স্পষ্ট লেখা রয়েছে।

—সেটা আমিই লিখেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম, ওকেই দেব কিন্তু ভেবে দেখলাম পুরুষদের অত শৌখীন রুমালে মানায় না। আমিই ওটা ব্যবহার করি।

—আমি খবর পেয়েছি ওরা একসঙ্গে গ্র্যাণ্ডে ডিনার খেয়েছে।

এবার সুমিতা ধমকের সুরে বলল :

—আমি বললাম যে এখানেই পার্বতী রান্তিরে খেয়েছে।

—সে কথা বিশ্বাস করতে বল?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

—হ্যাঁ হচ্ছে।

—তোমাকে মিথ্যা কথা বলে আমার লাভ?

—সে তুমি জান।

—ঠিক আছে। চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর—আমার কথা তো তুমি বিশ্বাস করবে না।

একটুক্ষণের জন্য অনিমেষ চুপ করে রইল। অন্য সবাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে একটা বিপর্যয়ের আশংকায় বসেছিল। সুমিতা এবার আমাকে বলল :

—অনিমেষ আমার বা তোমার কথা বিশ্বাস করবে না, দেব। ডাকতো চাকরকে। অনিমেষ তার কাছ থেকেই জেনে নিক।

আমি বসে রইলাম। যেন শুনতে পাইনি এমন ভাব করলাম। সুমিতা এবার আদেশের সুরে বলল :

—দেব, ডাক চাকরকে। অনিমেষের জানা দরকার।

এবার অনিমেষ বলল

—থাক। চাকরকে ডেকে দরকার নেই। তুমি যখন বলছ…

—চাকরের কাছে যাচাই করে যে আমাকে অপমান করলে না এজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এবারে আমি একটা কথা জানতে চাই। অনিমেষ, রাগে আমার গা জ্বলছে। আমার স্বামী ও পার্বতীর নামে তুমি গুরুতর অভিযোগ এনেছ। এখন বল তোমার কি প্রমাণ আছে?

—প্রমান? কি বলছ সুমিতা? আমি যখন পারুল বালিশের তলায়

বাসুদেবের রুমাল পেলাম তখন আর কোন প্রমাণের দরকার থাকে কি? দুয়ে দুয়ে চার!

এবারে সুমিতা কঠোর স্বরে বলল :

—দুয়ে দুয়ে চার হয় সে আমি জানি। কিন্তু তুমি দুয়ে দুয়ে পাঁচ করলে কেন বলবে কি?

—তুমি বলতে চাও আমি ভুল করেছি।

—নিশ্চয়ই। এতে কোন সন্দেহ আছে?

—আমি—আমি ওই রুমালটা দেখে কি যে আঘাত পেয়েছিলাম তোমাকে বোঝাতে পারব না। কাল থেকে ঘুমাতে পারিনি—কোন কাজ করতে পারিনি। শুধু ওই কথাই ভেবেছি। পারুকে আমি ভালবাসি, বিশ্বাস করি—তার এই ব্যবহার আমাকে পাগল করে দিয়েছিল।

—তুমি বলতে চাও ওই রুমালটা দেখে তোমার ভালবাসা, বিশ্বাস এক নিমেষে উবে গেল? একবার যাচাই পর্যন্ত না করে? তোমার কাছে এটা আশা করিনি। তুমি বুদ্ধিমান, ব্যবসা কর, হিন্দী দিল্লী কর, কত লোকের সঙ্গে মেশ—তার পরেও এরকম একটা তুচ্ছ ঘটনায় বিচলিত হও?

অনিমেষ কোন জবাব দিল না। একটু চুপ করে থাকার পর সুমিতা আবার বলল :

—এই তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এভাবে ছুটে এসে তুমি এত গুরুতর অভিযোগ আনবে আমার বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই আরও কোন ঘটনা আছে। তোমার কাছ থেকে সব কথা না শুনে আমি আর কোন কথা বলব না।

অনিমেষ এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এবার সে ধপ করে একটা কৌচে বসে পড়ল। তাকে বোকা দেখাতে লাগল। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। একবার সবার মুখের দিকে করুণভাবে চাইল; বোধ হয় সহানুভূতি পাবার আশায়। আমরা সবাই চুপ করে বসে রইলাম। তার অবস্থা এতই কাহিল হল যে দেখে মায়া হয়। একটু পরে মরিয়া হয়ে অনিমেষ বলল :

—আমি—আমি—আমি গাধামী করেছি।

—আমারও তাই মনে হয়।

—আমাকে ক্ষমা কর সুমিতা।

—থাকগে, যা হবার তা হয়েছে কিন্তু তুমি আমাকে বড় বিপদে ফেললে। আমার আর বাসুদেবের মাঝে একটা সন্দেহের বীজ বপন করে গেলে। এ

সন্দেহ হয়ত কোন দিনই যাবে না।

পার্বতী এতক্ষণ সুমিতার কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। এবারে সে মুখ তুলে তাকাল। তার দিকে দৃষ্টি পড়তে অনিমেষ অনুনয় করে বলল :

—আমাকে ক্ষমা করো পার্থ। আমি অন্যায় করেছি।

— সবার সামনে তুমি আমাকে এভাবে অপমান করলে ?

তুমি জান, সুমিতা আমার প্রাণের বন্ধু। তুমি তার স্বামীর সঙ্গে জড়িয়ে আমাকে সন্দেহ করলে।

সুমিতা এত গম্ভীর পরিবেশেও না হেসে পারল না।

—তুমি একটা রাস্তার লোকের সঙ্গে জড়িয়ে সন্দেহ করলে পার্বতী এত ক্ষেপত না। তার প্রাণের বন্ধুর স্বামীর সঙ্গে জড়িয়ে তুমি তাকে সন্দেহ করতে পার না।

পার্বতী আবার ফুঁপিয়ে উঠল :

—কি নিষ্ঠুর। কত নীচ।

—আমাকে ক্ষমা কর পার্থ। চল, বাড়ী চল।

—আমি তোমাকে যত ভালবেসেছি কোন মেয়ে তার স্বামীকে এত ভালবাসেনি।

—আমি অন্যায় করেছি। চল, আমার সঙ্গে চল।

—না, আমি যাব না। কিছুতেই যাব না।

পার্বতী ঝামটা দিয়ে একথা বলে আবার সুমিতার কাঁধে মাথা রাখল। সুমিতা তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অনিমেষকে বলল :

—বুঝতেই পারছ ও এখন আপসেট হয়ে আছে। তুমি বরং এখন এস। আমি ওকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—আমাকে ও ক্ষমা করবে তো ?

—তা করবে তবে—

বলে ইসারায় সুমিতা নিজের লকেটটা দেখাল। অনিমেষ প্রথমে বুঝতে পারল না। একটু পরে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর পার্বতীকে আর একবার অনুরোধ করে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে অনিমেষ আমার কাছেও ক্ষমা চাইল। আমি এমন ভাব করলাম যেন তার অপরাধ হয়েছে এবং আমি তাকে ক্ষমা করলাম। অনিমেষ হল অপরাধী ও ক্ষমাপ্রার্থী আর আমি মহান,

ক্ষমা করাই যেন আমার ধর্ম।

অনিমেষ বেরিয়ে যাবার সঙ্গে পার্বতী সুমিতার বুকে মুখ রেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। অন্য সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি হতবাক হয়ে বসেছিলাম। সুমিতার উপস্থিত বুদ্ধি, অসামান্য ধৈর্য্য ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি একটা বিপর্যয় থেকে সবাইকে বাঁচিয়ে দিল। একসময় সে আমার কাছে জানতে চাইল পার্বতীর বাড়ীতে বা ঘরে ঢুকবার সময় তোমাকে কেউ দেখেছে। আমি অকপটে সত্যকথা বললাম—পার্বতীর বাড়ীর ঘরের একসেট চাবি আমার কাছে আছে। সেটা ব্যবহার করে সেখানে যেতাম বলে কেউ আমাকে কখনও দেখেনি।

অমিও একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

—তুমি আমাদের কথা জানতে?

—শুরু থেকেই আমি জানি।

একথা শুনে পার্বতী অঝোরে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল:

—তুই আমার সম্বন্ধে কি না ভাবছিস।

—ঠিক আগের মতই ভাবছি। তুই একটা মিষ্টি মেয়ে।

—আমার উপর রাগ করবার তোর যথেষ্ট কারণ আছে।

—তা আছে কিন্তু আমার রাগ হচ্ছে না।

—কিন্তু রাগ হওয়া স্বাভাবিক।

—কেন? দেবের সঙ্গে প্রেম করার জন্য? না ধরা পড়ার জন্য?

—সুমিতা, তুই আমাকে শাস্তি দে, পা থেকে চটী খুলে আমাকে বরং মার কিন্তু বিদ্রূপ করিস না, প্লিজ।

—না রে বিদ্রূপ করছি না। আজ এখানে এমন কোন কথা হয়নি যা আমি না জানতাম। গত কয়েকদিন ধরে আমার কাছে একথা প্রকাশ করা থেকে বিরত করতে মাকে বেগ পেতে হয়েছে। অমিতা তো সেদিন তোর সামনেই বলতে চেয়েছিল। মা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন বলে রক্ষা।

—আমার মাথা ঘুরছে।

—যা লক্ষীটি, আমার ঘরে শুয়ে একটু বিশ্রাম নে। ধকল তো কম গেল না।

—ভাবছি, অনিমেষ কোথায় গেল?

—ভাবতে হবে না। তোর জন্য উপহার কিনতে গেছে। হয়ত তোর পছন্দ করা জকেটটাই কিনে আনবে। তোকে একটা কথা বলি শোন। তোর

জন্ত অনিমেষ একটা দামী উপহার আনবেই। তুই সেটা দেখে যেন গলে পড়িস না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা শুনতে চাইবি না। তারপর লকেট ছাড়াও কাশ্মীরে অন্তত পনের দিনের জন্ত বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলে তবে আদর করতে দিবি। বোকার মত উপহারটা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যাসনি কিন্তু। উপহারটা নিবি এমন ভাবে যেন তাকেই কৃতার্থ করছিস। সব মনে থাকবে তো?

—আমি এখন বাড়ী যাই?

—আচ্ছা যা। যা বললাম মনে রাখিস।

পার্বতী চলে গেল। যাবার আগে এক মুহূর্তের জন্য একটু দাঁড়াল। তারপর চট করে সুমিতার গালে একটা চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল।

পার্বতী চলে যাবার পর সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি আবার ফিরে এল। আমার কাছে তো বটেই। সবাই চুপচাপ। আমি সুমিতার দিকে তাকাতে পারিনি। অনিমেষ চলে যাবার পর সবাই যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল সেই আবহাওয়া আর রইল না। সবাই যেন একটা ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে। আমার দিকে না তাকিয়েও সবাই আমাকে লক্ষ্য করছে বুঝতে পারছিলাম। নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন ফাঁসীর হুকুমের অপেক্ষায় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম পরিস্থিতিতে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। ভাবলাম যা হবার হবে। তার আগে আমার কৌতূহল মিটিয়ে নিই। সুমিতাকে জিজ্ঞেস করলাম:

—তুমি জানলে কি করে যে পার্বতী পরশু রাত্তিরে এখানে খেয়ে যাবার কথা তার স্বামীকে বলেছে!

—তোমাদের দুজনের কথাবার্তা কিছুটা আমার কানে গেছে। পার্বতী ভেবেছিল একথার উপর অনিমেষ আর কোন কথা তুলবে না। রুমালের ব্যাপারটা সে জানত না।

—অনিমেষ যদি সত্যি সত্যি চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করত?

—কোন ভদ্রলোক তা করে না। আমি অনিমেষকে ভদ্রলোক বলেই মনে করি। আমাকে একটা ঝুঁকি নিতেই হল। তা না হলে তার সন্দেহ যেত না।

অমিতা আর পারল না। প্রায় ফেঁসে গেল।

—লজ্জাও করে না। ছি: ছি:। সবার সামনে নির্লজ্জের মত বসে তো রয়েছেনই আবার দিদির সঙ্গে কথাও বলছেন। যেন আর কারও কোন্ছায় কথা হচ্ছে। আর দিদিকেও বলিহারি যাই। ওই পাঁজী নচ্ছার মেয়েটাকে এত

কাণ্ডের পরও সোহাগ দেখান হল! স্বামীর সঙ্গে গল্পও শুরু হয়েছে। অমন স্বামীর মুখে আগুন।

তারপর গড় গড় করে অনেক কিছু বলে গেল। সুমিতা কোন বাধা দিল না। কিছুক্ষণ ছোটবোনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

—অমিতার অবশ্য বলবার অধিকার আছে। কদিন এই ধরণের কিছু না বলতে পেয়ে ওর পেট ফেটে যাচ্ছিল।

অমিতা আবার কিছু বলবার আগে তার মা তাকে থামিয়ে দিলেন। এবং বললেন —তোমাদের ব্যাপার তোমরা বুঝবে কিন্তু তার আগে আমি আমার মেয়েকে একটা কথা বলব। সুমি, মা. চট করে কিছু মনস্থির করিস না। বাসুদেবের সব কথা না শুনে নিজে থেকে কোন সিদ্ধান্ত নিস না। এই আমার অনুরোধ, হ্যাঁ একান্ত অনুরোধ।

—একথা বলছ কেন?

—তোর চোখ দেখে মনে হচ্ছে মনে মনে তুই কিছু স্থির করেছিস। বাসুদেবের কথা শুনবার আগে কিছু স্থির করিস না।

অমিতা আবার জ্বলে উঠল—দেবদার আবার কি বলবার আছে? তোমাদের আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনা।

আমি একবার শাশুড়ীঠাকরুণের দিকে তাকালাম। তিনি আমার চোখে চোখ রেখে সহানুভূতির সঙ্গে ভর্ৎসনা করলেন। দুষ্ট ছেলেকে যেন দুষ্টুমি করতে বারণ করলেন।

শ্রীপর্ণা ও অমিতার চোখে ঘৃণার অভিব্যক্তি।

সুমিতার মুখ দেখে তার মনের অবস্থা বুঝবার উপায় নেই। আমি সবাইকে দেখে নিয়ে অনেকক্ষণ পর সুমিতাকে ডাকলাম।

—সুমি, সত্যিই আমার কিছু বলবার নেই—বলবার মত মুখও নেই। যে কোন শাস্তি বা পরিণতি বা যা কিছু বল না কেন আমি মেনে নেব। মেনে নেব কেন, মাথা পেতে নেব।

সুমিতা কাউকে উদ্দেশ্য না করে যেন নিজের মনেই বলে উঠল:

—এত সুন্দর কথা সব পুরুষরা বলে না।

—সুমি, তুমি আমার তুলনায় কত ভাল। যে কোন মেয়ে এ অবস্থায় একটা 'সীন' করে ফেলত। সেটাই স্বাভাবিক। আমি তোমার কাছে যা অপরাধ করেছি সে কথা ভেবে মাটির সঙ্গের মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি—আমি

কি বলব। আমি এত নীচ হলাম কি করে? কিছু বল। চুপ করে থেক না, প্লীজ।

—আমাকে বলবার মুরসৎ দিচ্ছ কোথায়? নিজেই অন্যায়, অপরাধ নীচ ইত্যাদি বলে যাচ্ছ।

—দিদি, তুই যখন জানতিস তখন প্রথম থেকেই এসব বন্ধ করলি না কেন?

—আমি বন্ধ করবার কে? এ তো দেব আর পার্বতীর ব্যাপার। তা ছাড়া 'বেচে মান আর কেঁদে সোহাগ আদায়' করা আমার শিক্ষা ও রুচিতে বাধে।

—কি বলতে চাস তুই? তুই দেবদার স্ত্রী নস্।

—নিশ্চয়ই আমি তার স্ত্রী।

—তবে?

—দেব আর আমি সুখী স্বামী স্ত্রী।

—এ ঘটনার পরেও?

— ঘটনাটা তো নতুন নয়। দেব এর উপর আমার একটাই নালিশ। সে এত বোকা কেন? ধরা পড়ল কেন? আমাকে যে কি কষ্ট করে এ ঘটনার কথা গোপন রাখতে হয়েছে সে আমিই জানি। অমিতা, তুই ছাড়াও আমার আরও অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী আমাকে বলবার চেষ্টা করেছে। আমি তাদের ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। দেব এর বোকামীর জন্যই আজ একথা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

শ্রীপর্ণা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। সে আমার মাসতুতো বোন কাজেই আমার কার্য্যকলাপে নিজে লজ্জিত ছিল। সেও অবাক হল।

—কি বলছিস তুমি? তোর আর কোন অভিযোগ নেই? তোর স্বামী তোর বন্ধুর সঙ্গে গোপন প্রেম করে তোর ভালবাসাকে ধূলায় মিশিয়ে দিল। আর তুই বলছিস তোর আর কোন নালিশ নেই?

—দেব আমার ভালবাসা ধূলায় লুটায় নি।

—এত সব কাণ্ডের পর ও?

—ঠিক তাই। আমাদের ভালবাসা অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে।

—এসব কি বলছিস মাথামুণ্ডু? ভালবাসা শেষ হয়েছে তবু ঘর করছিস?

—তাই কি স্বাভাবিক নয়? কত স্বামী স্ত্রী পুরানো হবার পর প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও না বলে ঘর করে যাচ্ছে। ওরই মধ্যে অনেকে সুখে আছে। এ দৃষ্টান্ত কি ঘরে ঘরে নেই? এ দৃষ্টান্ত কি বিরল? সে তুলনায় আমি ভাগ্যবতী।

আবার অমিতা নাক গলাল।—দিদি, দেবদা একটার পর একটা প্রেম করে গেলেও তোর কিছু এসে যায় না একথা কি তুই আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস? মার সামনে তুই এসব কথা বলিস? মার অবস্থা একবার ভেবে দেখ তো।

—মার জন্য আমার চিন্তা নয়। মা ঠিকই বুঝবে।

—তোর এসব উদ্ভট সব কথা মা বুঝবে? না আমরা কেউ বিশ্বাস করব?

—না বিশ্বাস করলে আমি নাচার। কিন্তু সত্যিই আমি ভাগ্যবতী। শুধু আমি একা নই—আমি এবং দেব দুজনেই।

অমিতা ও শ্রীপর্ণা একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করল:

– কি বলতে চাস তুই?

সুমিতা তার মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মাও তাকিয়ে রইলেন। দুজনের মধ্যে যেন নীরব কিছু কথা হল। তারপর সুমিতা মুখ ঘুরিয়ে বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে জানাল:

—ভালবাসায় মেয়াদ বেশী হলে পাঁচ বছর।

—পাঁচ বছর?

—হ্যাঁ। পাঁচ বছর। ব্যস্।

—তুই বলতে চাস বিয়ে পাঁচ বছরের জন্য?

—না। আমি তা বলতে চাই না এবং বলিও না। বিয়ে সারা জীবনের জন্যও হতে পারে।

—এই বলছিস পাঁচ বছর, আবার বলছিস সারা জীবন। সঙ্গতি রেখে কথা বলবি তো?

—ভালবাসা আর বিবাহকে তোরা এক করে ফেলছিস বলে তোদের সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। ভালবেসে বিয়ে হতে পারে, আবার না ভালবেসেও বিয়ে হতে পারে। বিয়ে করে ভালবাসা হতে পারে; আবার নাও হতে পারে। কিন্তু সব অবস্থাতেই ঘর করা যায়।

সুমিতার একথার পর শ্রীপর্ণা চুপ করে গেল কিন্তু অমিতা ছাড়ল না।

—এই যদি তোর মত হয় তাহলে যে কোন অবস্থাতেই ঘর করা যায়।

—হ্যাঁ যায় এবং করেও।

—তোর নিজের কথা বলা। এর পরেও তুই দেবদার সঙ্গে ঘর করবি?

—কেন করব না।

—কেন করবি সেটা বল।

—তাহলে শোন। দেব আর আমার বিয়ে হয়েছে আজ পনের বছর। পুরো পাঁচ বছর আমরা ভালবেসে খুব আনন্দে ছিলাম। আমাদের মত আনন্দ খুব কম দম্পতিই উপভোগ করেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে একই সঙ্গে আমাদের ভালবাসা চলে যায়।

আমি প্রতিবাদ না করে পারলাম না।

—আমি মানতে রাজী নই। তোমাকে আমি এখনও ভালবাসি।

—দেব, আমি এখনও বলছি - তোমার সঙ্গে আমি সুখে ঘর করছি। তুমি আমাকে স্নেহ কর, আমি অসুস্থ হলে তুমি অস্থির হয়ে পড়, আমার সঙ্গে কত গল্প কর, আমার দুঃখে দুঃখী হও, আমি হাসলে তুমিও হাস—এক কথায় আমাকে সুখী রাখতে তুমি সর্বদাই ব্যস্ত। আমিও তোমার বেলায় একই রকম ব্যবহার করি। কিন্তু আর যাই বলা যাক একে ভালবাসা বলা যায় না। বন্ধুত্ব বলতে পার হয়ত। তবে ভালবাসার চেয়ে এদের দাম এক কানা কড়িও কম নয়।

আমি একথাও মানলাম না। আবার প্রতিবাদ করলাম। সুমিতা তার উত্তরে পাল্টা আমার কাছে জানতে চাইল :

—আচ্ছা বলতো, আমি তোমার ঘরে গেলে তোমার বুক ধড়ফড় করে? কিংবা বাইরে থেকে ফিরে প্রথমে আমাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে? বা কতক্ষণে জড়িয়ে ধরব বলে হাঁস ফাঁস কর?

—বিয়ের পনের বছর পর এরকম ছেলেমানুষী আমার কাছে আশা করতে পার না।

—এই ছেলেমানুষীকেই আমি ভালবাসা বলি। এ বড় মধুর। এর প্রয়োজন আছে জীবনে। যে কোন অবস্থাতে।

—আগে তুমি কখনও একথা আমাকে বলনি।

—আমার মনে হয় বেশীর ভাগ স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে বড় বেশী সাবধান করে বড় বেশী উপদেশ দেয়—এক কথায় যা মনে আসে তাই বলে। কতগুলি কথা বা ঘটনা আছে যে গুলি জানা থাকা সত্ত্বেও স্বামী বা স্ত্রী না জানার চেষ্টা বা ভান করলে জটিলতার সৃষ্টি হয় না। তোমার বোকামীর জন্ত এ ঘটনা আজ প্রকাশ হয়ে না পড়লে এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত না।

সুমিতা থেমে গেলেও আর কেউ কোন কথা বলল না। সুমিতা এবার আমাকে বলল :

—অনেক অপ্রিয় কথা বলে ফেললাম। রাগ করলে না তো দেব?

—না, আমি রাগ করিনি কিন্তু ভাবছি তুমি সব কিছু জেনেও না জানার ভান করে আমাকে কি বোকাই না বানালে। এতদিন আমাদের ব্যাপার দেখে মনে মনে নিশ্চয়ই হেসেছ।

—না দেব তা নয়। প্রথমে বিচলিত হইনি বললে সত্যকে অস্বীকার করা হবে। পরে ভেবে দেখলাম তোমার কি দোষ। তুমি আমাকে সুখে রেখেই ক্ষান্ত হওনি; আমাকে আরও সুখে রাখার কাজে সর্বদা ব্যাপৃত। যা আমি তোমাকে দিতে পারি না অন্য কেউ যদি তোমাকে সে জিনিষ দিয়ে খুসী রাখতে পারে তবে আমার কি বলার থাকতে পারে? তোমার জীবনটাকে একঘেঁয়ে না করে দিয়ে আমার উপকারই করেছে।

—একঘেঁয়ে কেন বলছ? তোমার সঙ্গ আমার কখনো একঘেঁয়ে মনে হয়নি।

—সেজন্যই তো বলছি—আমরা দুজনে ভাগ্যবান। গরীব ঘরের কথা জানিনা। আদিবাসী রমনীরা বা সাধারণ ঘরের স্ত্রীরা সংসারের সবরকম কাজ ছাড়াও অনেক অর্থকরী কাজ করে। তাদের সংসারে সাশ্রয় আনবার চেষ্টা করে। তারা স্বামীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বিবাদও করে। সেখানে তাদের অধিকার আছে। কিন্তু আমরা সমাজের উচুতলার স্ত্রীরা তো বলতে গেলে পরগাছা। বিয়ের প্রথম পাঁচ বছরের পর আমাদের কোন প্রয়োজন থাকে না।

—সংসার চালান কি চাট্টিখানি কথা? অনেক মনীষীরাও সংসারীকে ভাল সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

—সেটুকুও না করলে তো আমরা বেশ্যারও অধম হতাম। আমরা সমাজের উচুস্তরের আধুনিক স্ত্রীরা কতটুকুই বা সংসারের কাজ করি? ভাল করে ভেবে দেখ তো আমরা না থাকলে সংসারের কোন কাজ অসমাপ্ত থাকত কি?

—অসমাপ্ত থাকত না? এ সংসার দেখত কে?

—আমাদের কাজ কতটুকু। রান্নাবান্না চাকর করে। ঘর ধোয়ামোছার জন্য ঝি আছে। বাচ্চার জন্য আয়া আছে—বাচ্চারা বড় হলে আমরা তাদের হোষ্টেলে চালান করে দিই। তাহলে আমাদের মত স্ত্রীদের সত্যিকারের কাজ থাকল কি? ঝি চাকরদের উপর খবরদারী করা, সব করে ঘর সাজান, আর ফ্যাসান করে উল বোনা। স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের পরিবর্তে এটুকু করতেই হয়। বেশ্যারাও টাকার পরিবর্তে কিছু প্রতিদান দেয়।

অমিতা আবারও নাক গলাল বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই—একটা কথা স্পষ্ট করে

বল দেখি। তুই কি দেবদাকে ডাইভোর্স করবি না?

—পাগল। আমার এত সুখের জীবন ছেড়ে যাব? দেব একটু কষ্টি-নষ্টি করেছে বলে? তোর দেবদা একটা পুতুল কিনেছে অনেক খরচ করে—সেই পুতুলের সঙ্গে খেলবে বলে। সে পুতুল নিয়ে খেলতে খেলতে একসময় আর ভাল লাগল না—খেলা ছেড়ে দিল। অপরাধটা কোথায়? সে তার ইচ্ছা। পয়সা খরচ করেই তো কিনেছে।

—এভাবে যে কোন মেয়ে তার জীবনকে পুতুলের সঙ্গে তুলনা করতে পারে আমি ধারণা করতে পারি না।

—তবে হ্যাঁ, আমি শ্রীপর্ণার ব্যবসায়ে যোগ দিতে ইচ্ছুক। শ্রীপর্ণা, এখনও আমাকে নিতে রাজী তো?

—শ্রীপর্ণার দোকানে যোগ দিয়ে তোর লাভ?

—মাসে হাজার দুহাজার টাকা।

আমি তখন জানতে চাইলাম—টাকার কথাই যদি হয় তাহলে আমার রোজগার কি যথেষ্ট নয়?

সুমিতা কোন জবাব দিল না। মা এবার তার হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলেন। তার উত্তরে সুমিতা শুধু একটা কথাই বলেছিল:

—আর আধুনিকা স্ত্রী হয়ে থাকতে পারবনা বলে।

তারপর আর বিশেষ কোন কথা হয়নি। সুমিতা ও শ্রীপর্ণা তাদের ব্যবসায়ের খুঁটিনাটি—কার কি অংশ, কার কি কাজ হবে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত রইল। মা ও অমিতা একসময় চলে গেলেন। আজ যে আমাদের বাড়ীতে দুপুরে সবার খাওয়া ও সারাদিন কাটাবার কথা হয়েছিল সে কথা সবাই ভুলে গেল।

আমিও একসময় উঠে চলে এসেছিলাম। শ্রীপর্ণাকে অবশ্য সুমিতা না খাইয়ে ছাড়ল না। খাবার সময় সাধারণ দুচারটা কথা ছাড়া আর কোন কথা হয়নি—আমাদের যুগল ভবিষ্যৎ নিয়ে তো নয়ই।

খাবার পর শ্রীপর্ণার সঙ্গে সুমিতা বেরিয়ে গেল। ব্যবসায়ে আজ থেকেই যোগ দিতে। তখন থেকে আমি ভাবছি আর ভাবছি। রাত শেষ হতে এখনও দেরী আছে।

আবার কখন ব্যালকনিতে চলে এসেছি। কোথা থেকে শুরু করি একথা

ভাবতে ভাবতে কত কথা মনে পড়ছিল। আরও কত কথা কত ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সুমিত্রা ও আমার মধ্যে কোনদিনই ব্যবধান গড়ে ওঠেনি—আজই সে ব্যবধান আমি দেখতে পাচ্ছি। এই ব্যবধান কি শেষ হবে না? আমি যে সুমিতাকে ভালবাসি—ভালবাসা কথার সুমিতার আপত্তি আছে। না তবে সুমিতা আমার বন্ধুই হল। বন্ধু হলে আমাদের আর ব্যবধান কোথায়? আমার তবুও ভয় করছে। শাশুড়ী ঠাকরুণ ওর চোখে কিসের সন্ধান দেখতে পেলেন? আমি সে চোখে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ছাড়া আর কিছু তো দেখতে পেলাম না।

আবার আকাশের দিকে দৃষ্টি গেল। চাঁদকে আকাশে খুঁজে পেলাম না। তার বদলে অনেকগুলি তারা আর ছড়ান ছিটানো ছোট বড় কালো মেঘ দেখতে পেলাম। ঝড় বৃষ্টি আসবার লক্ষণ। ঝড়কে ভীষণ আমি কাব্য করতে পারি না—আমার ভয়ই লাগে। আমি আবার ভিতরে চলে এলাম।

ঘরে এসে কাগজ কলম নিয়ে তাড়াতাড়ি লিখলাম:

আমি নিজেকে বা সুমিতাকে আজও চিনলাম না। আমার ও সুমিতার কি সম্পর্ক, বা বলা যায় সুমিতাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক আজও আমি তার থই পাইনি।

*With best compliments from :*

# NARAYAN BAJORIA

## M/s. BANDANA ENTERPRISES

**173, Mahatma Gandhi Road,**
**Calcutta-7**

মলিন দত্ত কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩০/১এ কলেজ রো কলি-৯ থেকে প্রকাশিত।

KRISHANU — Vol. IX No. 1 — Regd. No.
Quarterly — Rs 3·00 — RN 16533/68

with compliments of
British Paints

শানুকশানুক
শানুকশানুক

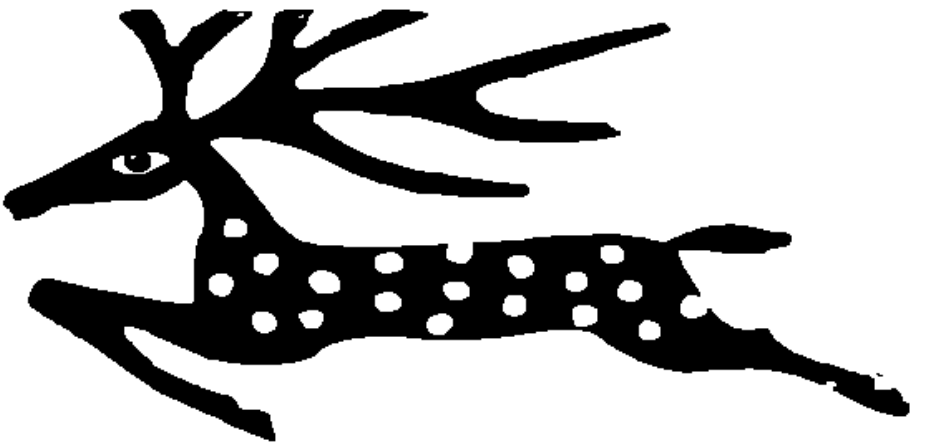

# ছুটন্ত কলকাতা

কলকাতা ছুটতে চায়।
বনের হরিণ যেমন করে ছোটে বনে
বাঘ এবং বাধাহীন। কিন্তু পারে না।
শহরের এলাকার তুলনায় বাড়ন্ত
জনসংখ্যা, জনসংখ্যার তুলনায় স্বল্প
যান-বাহন, যান-বাহনের তুলনায়
সংকীর্ণ সড়ক স্বভাবতই তার অগ্রগতির
পথে বাধা। আমরা জানি, কলকাতার
মানুষ আজ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে আছে
সেই গতিময় যানটির দিকে, যার নাম
ভূগর্ভ রেল।

কারণ, ভূগর্ভ রেলের হাতেই সেই
ভবিষ্যৎ, যখন ছুটন্ত কলকাতা এক
দৌড়ে পৌঁছে যাবে তার সিদ্ধি এবং
সমৃদ্ধির লক্ষ্যস্থলে; বাঘ এবং বাধাহীন।

MJ

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

# দিকে দিকে দৃঢ় সংকল্প.....

## জাতির কর্মযজ্ঞে নূতন প্রভাত

দেশের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির যথার্থ রূপায়ণের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতীইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত ২০ দফা অর্থনীতি কর্মসূচীর রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেছেন :

- পশ্চিমবঙ্গ ঋণভার লাঘব ব্যবস্থা
- ৬ কোটি টাকার এক সুসম, গ্রাম উন্নয়নের উৎপাদন কর্মসূচী
- ৩ কোটি টাকার এক বিশেষ কর্ম সংস্থানের উদ্যোগ
- ভূমিহীন কৃষকদের চাষের জমি এবং ক্ষেতমজুরদের জন্য বাস্তু জমি দ্রুত বিতরণ
- নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র-বিক্রয়ের ব্যবস্থা
- বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বাইরে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ।

**আরও অনেক কর্মসূচী রূপায়িত হতে চলেছে**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

# মধ্যমাসে অমাবস্যা

আমরা যারা নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ তাদের অনেকের প্রায় প্রত্যেক মাসের একই সমস্যা। প্রথমে দরাজ হাতে খরচ যা কিছু বাড়তি চাপ, তারপর মাস যেন আর শেষ হতে চায় না। তখন দু'হিনটে বিয়ের নেমন্তন্ন পেলেও মুস্কিল। কিন্তু যায়। পুজোপার্বণ, উৎসব, অভিথিঅভ্যাগত আর সৌকিকতার দায় কখনো মাসের প্রথম বা শেষ বিচার করে আসে না।

সেভিংস ইউনিভার্সাই-তে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা ভালো। মাসের প্রথমে টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে তারপর দরকারমতো তুলে খরচ করুন। এতে লাভ হবে, ধীরে ধীরে কিছু টাকা জমেও যাবে। তখন বাড়তি খরচের জন্য নিজের সঞ্চয় থেকেই মেটাতে পারবেন। অসুবিধের পড়তে হবে না। টাকা ইউনিভার্সাই-তে রাখুন, আলমারিতে রাখলে টাকাগুলো কপূরের মতো উবে যেতে থাকে।

**ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া**

(তোমার সঞ্চয়ের একটি অংশ)


## কৃশানু

একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এককালীন চাঁদা ছয় টাকা। সডাক আট টাকা।

বিশেষ সংখ্যার বর্ধিত মূল্য গ্রাহকদের দিতে হয় না।

নমুনা সংখ্যার জন্য দুই টাকার ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টরা ২৫% কমিশন পাবেন।

কৃশানু মুখ্যত নবীন লেখকদের মুখপত্র। কৃশানু'তে রচনা প্রকাশের জন্য তদ্বির করতে হয় না। উন্নতমানের যে কোন মৌলিক রচনা প্রকাশের জন্য সাদরে গৃহীত হবে। প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ সম্ভব নয়।

# স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী / প্রভাস ভদ্র

বিমল কর এর নেতৃত্বে বাংলা ছোট গল্পের মোড় ফেরার ঘণ্টা বেজেছিল এক দশক আগে। গত এক দশকে ছোটগল্পের ফর্ম ও চারিত্র্য নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ভাঙাগড়া হয়েছে। অনেক বিদ্রোহ বাণী ও শপথ বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। অনেক শাস্ত্র বিরোধী তরুণ গল্প লেখক বড়ো কাগজের এস্টাব্লিশ-মেণ্টের বিরুদ্ধে চড়া গলায় কড়া কথা বলেছেন; এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই বিদ্রোহ বিসর্জন দিয়ে ঐ বহু নিন্দিত এস্টাব্লিশমেণ্টের স্বর্গে ঢুকেছেন।

ছোট গল্পে গল্প বলে কিছু থাকবে না, থাকবে বক্তব্য; আর জীবন সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টি: এইসব শপথ হালে পানি পায়নি। অনেক সময়ে মনে হয়েছে, সাম্প্রতিক শাস্ত্র বিরোধী ছোট গল্প আন্দোলনে কোথায় যেন একটা কারচুপি আছে। চড়া কথার পেছনে কোথায় ফাঁকি আছে।

শ্রীপ্রভাস ভদ্র এর 'স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্প সংকলন সেদিক থেকে ব্যতিক্রম—অভিনন্দনীয় ব্যতিক্রম। এখানে কোন ফাঁকি নেই, কারচুপি নেই, কনসিট্ নেই. চাতুরি নেই। জীবনের কিছু সত্য-উপলব্ধি তাঁর আছে। কিছু নির্দিষ্ট বক্তব্য আছে। গল্পের পাঠকের প্রতি সহমর্মিতা আছে।...তাঁর গল্পে রাঙ্গী ছোকরা আর বিরোধী পরিবেশ আছে; কিন্তু মানবিক মূল্যবোধগুলি ভাঙবার নেশা নেই।...মনে হয় লেখকের সঙ্গে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির ব্যর্থতা অহমিকাকে ছুঁতে পারি। এটাই আমার কাছে যথেষ্ট প্রাপ্তি।

—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

# স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী / প্রভাস ভদ্র

# এই উৎকণ্ঠার দাম কি অনেক বেশী নয় ?

পাকস্থলীর এই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি, এই অপরাধ-বোধ এবং এখন ওখন ধরা পড়ার দুশ্চিন্তা— অথচ এই সুযোগ কেন ? শুধুমাত্র একটি টিকিট কেটে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে ভ্রমণ করতে পারেন। বিনা টিকিটে ধরা পড়লে জরিমানা—পুরো ভাড়াতো দিতেই হবে এবং সেই সঙ্গে কমপক্ষে দশ টাকা জরিমানা। আর, ট্রেন ছেড়ার পর, তা'হলে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা তিনমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড।

**টিকিট কিনে নিরুদ্বেগে ভ্রমণ করুন**

পূর্ব রেলওয়ে

# কৃশানু

সাহিত্য-ত্রৈমাসিক
নবম বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৮৩

লেখক সূচী

কবিতা

নারায়ণ বসু । ১৭৭। প্রভাস ভদ্র । ১৭৭। প্রভাতকুমার মিশ্র। ১৭৮। প্রদীপচন্দ্র বসু। ১৭৯। প্রদীপ চক্রবর্তী। ১৮০। অনিরুদ্ধ গুপ্ত। ১৮০। প্রণব মজুমদার। ১৮১। সলিল চক্রবর্তী। ১৮১। মন্মথনাথ সামন্ত । ১৮২। পান্নালাল সরকার । ১৮২। সমরজিৎ সিংহ । ১৮৩। অশোক পোদ্দার। ১৮৩। কৃষ্ণেন্দু বসু । ১৮৪। নীতীশ চৌধুরী । ১৮৪। অভিজিৎ ঘোষ । ১৮৫। সলিল পাল । ১৮৫। প্রদীপ রায়চৌধুরী । ১৮৬। সোমনাথ মুখোপাধ্যায় । ১৮৭। সুজাতা প্রিয়ংবদা। ১৮৮। যোগব্রত চক্রবর্তী। ১৮৯। নির্মল বসাক । ১৯০। মণীন্দ্র গুপ্ত । ১৯১। প্রফুল্ল মিশ্র। ১৯২

প্রবন্ধ

নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্রের শেষ দিনগুলি। নকুল চন্দ্র পতি। ১৯৩

অনুবাদ গল্প

পটেম্‌কিনের রথযাত্রা। রাইনহার্ট লেটাও (অনুঃ কমল মুখোপাধ্যায়)। ২০১

গল্প

সুনীলেন্দু কোনার। দাদুর হাত। ২০৭। শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। সাধনা। ২১৫। অমিয় চৌধুরী। মুমুক্ষা। ২২৩

নিয়মিত

পুস্তকের কথা — একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। পিনাকীরঞ্জন গুহ। ২৩০। কবিতার বই। দেবাশিস বসু। ২৩৩। দীনেশচন্দ্র সিংহ। কবি-কাহিনী। ২৪১

প্রচ্ছদ
শ্রীপ্রভাস

সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র সিংহ

প্রকাশের অপেক্ষায়

# কবিয়াল কবিগান

**দীনেশচন্দ্র সিংহ**

দাম বিশ টাকা

কবিগান বাঙ্গালী কৃষ্টির অন্যতম অঙ্গ। পূর্ববঙ্গের কবিগানের শেষ সার্থক প্রতিনিধি কবিয়াল শ্রীনকুলেশ্বর সরকারের ( নকুল দত্ত ) ৭০ বছর ব্যাপী কবি-জীবনের অনবদ্য আলেখ্য। কবি-সম্রাট হরিচরণ আচার্য, ত্রিপুরার হরকুমার পাল, নোয়াখালীর কাশীনাথ নট্ট, ঢাকার দেবেন্দ্র দাস, তারিণী সরকার, বরিশালের কুঞ্জ দত্ত, শরৎ বৈরাগী, উমেশ পাল, প্রসন্ন নন্দী, নিবারণ সরকার, কুসুম কুমারী, ফরিদপুরের মনোহর সরকার, খুলনার রাজেন্দ্র সরকার, ময়মনসিংহের হরিহর আচার্য প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিয়ালদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চমকপ্রদ বিবরণ। তা ছাড়া রয়েছে শেখ সরলা, মানদা, রাঙা যামিনী, কালা যামিনী, মনমোহিনী প্রভৃতি খ্যাতনামা গায়িকাদের কথা; নামকরা ঢুলীদের বিবরণ। আগরতলা রাজবাড়ী, নোয়াখালী দালালবাজার, ঢাকা সোনার গাঁ পানাম, রিকাবীবাজার, খুলনার করাপাড়া, নগাঁও পীরজং, ফরিদপুরের গোলাবাড়ী, ঢাকা কালীবাড়ী, নরসিংদী বাজার, শ্রীহট্টে করিমগঞ্জ, ত্রিপুরার গৌরীপুর বাজার প্রভৃতি পূজা প্রাঙ্গণ, কবির আসর ও অনুষ্ঠাতাদের অম্লান স্মৃতি। 'পাষণ্ড উদ্ধার,' ত্রিশের বসন্ত সাধুর 'মা দাদা' সম্প্রদায়ের কথা। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থের কাব্যিক আলোচনা। টপ্পা, জবাব, সখী-সংবাদ রংফুকারের বিচিত্র সমাবেশ। পূর্ববঙ্গের সরস মাটি ও রসিক মানুষের সাবলীল পরিচয়। পাঁচ শত পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষের অনবদ্য চিত্র।

---

## জ্যোৎস্নাময় বসুর

নতুন স্বাদের প্রথম উপন্যাস

## সিকিদিরি

দাম সাত টাকা

হাতিয়া—ধুক্‌ধাতে টাকা উড়ছে।
কায়দা জানলে সে টাকা ধরাও যায়···।
প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে
প্রকৃতি যে হেরে যাচ্ছে তার প্রমাণ···
সুবর্ণরেখার জল এবং
বিদ্যুৎ উৎপাদন একত্রকে কেন্দ্র করে

---

**লিপিকা** ৩০/১এ-কলেজ রো কলিকাতা—৯

## সম্পাদকীয়

সাহিত্যিকদের জন্মশতবার্ষিকীতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'চেয়ার' স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। যেমন কারো কারো নামে রাস্তার নাম পরিবর্তন করে সস্তায় কিস্তিমাতের মানসিকতা দেখা যায় পৌর সভাসমূহে। কিন্তু রাস্তা আর চেয়ার-এর নামকরণে যে অনেকখানি ফারাক্ তা অনেকেই ভুলে যান। 'অমুক সরণি' নামে ক'খানা নেমপ্লেট রাস্তার দুই পাশের বাড়ীর দেয়ালে ঠুকে দিলেই রাস্তার নামকরণ পর্ব খতম ; কিন্তু 'চেয়ার'-এর সঙ্গে দু'জন 'ম্যানের'—একজন গত, আরেকজন আগত—মানমর্য্যাদা জড়িত। যাঁর নামে 'চেয়ার,' আর যিনি সে চেয়ার দখল করবেন—কেউই ফেল্না নন। রবীন্দ্রনাথের নামে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু রবীন্দ্র 'চেয়ার' স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রসদন-ভবন-মণ্ডপ-মন্দির আলয়-নিলয়ের সংখ্যাও অজস্রাধিক। উদ্দেশ্য—রবীন্দ্র ভাব ভাবনা সাধনার প্রচার ও প্রসার। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলি যাত্রা নাটক নাচনা গাওনা জাতীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বুক্নিবাজীর আড়তে পরিণত।

স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে জানাই সহজ উপায়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে জানতে হলে তাঁদের সৃষ্টিকে আগে জানা প্রয়োজন। সে সৃষ্টিকে জানতে গেলে তা সহজলভ্য তথা সুলভসভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবে ঠিক বিপরীত রীতিই দেখি। অপরিমিত অর্থ 'রবীন্দ্র কুর্সি' স্থাপনে এবং চিরদিন ছাতিমতলা ও ভামলী'র অনুরাগী রবীন্দ্রনাথকে লোহা সিমেণ্ট কংক্রীটের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ রাখার জন্য ব্যয় হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রয়ানা ও রবীন্দ্রচর্চার প্রসারে তা বিন্দুমাত্র কার্যকরী হয় নি।

রবীন্দ্র সাহিত্য সুলভে প্রচারের যে ব্যবস্থা শতবার্ষিকী উপলক্ষে পঃ বঙ্গ সরকার করেছিলেন তা সুদ ও চক্রবৃদ্ধি হারে বিশ্বভারতীর বর্তমান কর্তৃপক্ষ তুলে নিচ্ছেন। একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুযোগে বিশ্বভারতী মূল্য বৃদ্ধির বিশ্বরেকর্ড স্থাপনে প্রয়াসী। ছ'টাকা আট টাকার সঞ্চয়িতা এখন ছত্রিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের ভাগ্যেও পৃথক ফল ফলবেনা। সস্তায় শরৎ রচনাবলী পাবার আশায় যারা দু' বছর আগে এক শ' টাকা জমা দিয়েছেন, তারা আজো

সমগ্র রচনাবলী পান নি ; অথচ শতবার্ষিকী দ্বিশতবার্ষিকীতে পা দিয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্র বা শরৎ রচনাবলীর জন্য মোট গ্রাহক সংখ্যার সঙ্গে দেশের জন-সংখ্যার শতকরা হারটা যদি সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌গণ কষে দেখান তা হলে মূঢ়-ম্লান-মূক মুখের প্রবক্তাদের সৃষ্টি ক'জন দেশবাসীর হাতে পৌঁচেছে তার উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যেত।

এরই পাশাপাশি দেখি—প্রচারোদ্দেশেই হোক আর অনুগত অনুরাগী সৃষ্টির জন্যই হোক—সোভিয়েট রাশিয়া থেকে প্রকাশিত গোর্কি, টলস্টয়, ডস্টয়ভস্কির অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রায় ফেলে-দেওয়া দামে বিক্রি হচ্ছে। আর শিশুদের জন্য ছবি-ছড়ার বইগুলি ত পোষ্টকার্ড ইন্‌ভেলাপের দামে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের সুকুমার রায়, দক্ষিণা মিত্র মজুমদার প্রমুখের বইগুলি শিশুদের হাতে আকাশের চাঁদ ধরে দেওয়ার মতোই ক্ষমতাতীত। পশ্চিমী জগতেও যে কোন গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সুলভ সংস্করণ হিসেবে পেঙ্গুইন, পেলিকান, ফন্‌টানা ইত্যাদি সিরিজ প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু আমরা।

আসল কথায় ফিরে যাই। রবীন্দ্র-শরৎ-বঙ্কিম চেয়ারাদি স্থাপনের উৎকট উৎসাহ যে সব মহাজনদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তারা একবারও কি ভেবে দেখেছেন যে উক্ত চেয়ারে বসার মতো ব্যক্তি এদেশে এখন ক'জন আছেন। এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—কারণ এগুলি মিউজিক্যাল চেয়ার নয় যে বাজনা থামলেই যে কেউ একজন এসে বসে পড়লো। অথচ ব্যাপারটা আসলে তাই দাঁড়াচ্ছে। চার নম্বর একসারসাইজ বুকের নোট সম্বল করে যারা ওয়ারিশান ক্রমে এম. এ, পাশ এবং বাজারে 'তোলা' তোলার মতো এখান ওখান থেকে শব্দ ও বাক্য সংযোজন করে ডি. ফিল. ডি. লিট বাগাচ্ছেন তাদের হিল্লে করার জন্য অন্ততঃ রবীন্দ্র-শরৎ-বঙ্কিমদের নাম না জড়ানই শোভন। চতুষ্পদ কাষ্ঠাসনে একটা দ্বিপদ কাঠকে বসানো অর্থ হীন।

সারা ভারতে যে পরিমাণ অর্থ রবীন্দ্রনাথাদির নামে অপরিকল্পিতভাবে ব্যয় হচ্ছে তা বন্ধ করে তাঁদের রচনাসম্ভার চিরস্থায়ী ভাবে সহজ ও সুলভ লভ্য করা হলে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ প্রভৃতি লেখকগণ অধিক ব্যাপক ও দৃঢ়ভাবে স্ব-জ্যোতিতে ভাস্বর হবেন—তাদের চিনিয়ে দেওয়ার জন্য টীকাকার, ব্যাখ্যাকার, ভাষ্যকার জাতীয় নোট-বেকারদের খান ইঁটের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। জাত-সাহিত্যিকদের রচনা দুর্লভ ও দুর্মূল্য বলেই না অ-জাত সাহিত্য ঘরে ঘরে ঢুকে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র ধ্বংসে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

## প্রথম তোমার দৃপ্ত আবির্ভাব/নারায়ণ বসু

কী ভয়ংকর সেই সব নষ্টদিন নিবিড় অন্ধকার
ছিল না কেউ পথ-প্রদর্শক মহাপুরুষ
অকস্মাৎ যেন রণস্থলে চকিত তোমার আবির্ভাব
পদক্ষেপে রণভেরী, হাতে স্থির জয়ধ্বজা
লেখনীতে দৃঢ় সত্যের স্বাগত ঘোষণা এবং
দুচোখের কণিয়ায় হাজার জিজ্ঞাসা নিয়ে
তুমি সেই অর্জুন প্রয়োজনে সব্যসাচী হলে
কখনো কেবল চিরকান্তিময় সুকান্ত
অথবা তুমি " যেন সেই বাতিওয়ালা

কাব্যে, বোধে, মননে এনেছিলে প্রবল জোয়ার
তোমার কাব্য যেন এক ঋজু সৈনিকের পদাবলী

হে কবি, প্রথম তোমার দৃপ্ত আবির্ভাব।

## প্রতিটি মুহূর্তই এখন স্বর্ণময়/প্রভাস ভদ্র

সোনালি মুহূর্তরা বড় অবিশ্বাসী
বেলা যায় স্বজনেরা চলে যায়
মিছিলে পরিচয় জনস্রোতে ভেসে যায়
মার্জিত রুচির গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ
বৃথা, বন্ধ কপাট বন্দী ভালবাসা
সকালে সূর্য আলোক অথচ, সন্ধ্যার ধূসরতা

নিঃশেষিত প্রায় জলন্ত সলতে সময় এখন
অন্যমনস্কতায় ফুর্তিটুর্তিতে

যেন কোন শস্যবীজ নষ্ট নয়
প্রতিটি মুহূর্তই এখন স্বর্ণময়।

## বেদনার চেয়ে স্বপ্ন ভালো/প্রভাত কুমার মিত্র

বেদনার চেয়ে—
স্বপ্ন ভালো,
অন্ধকার নিশীথের দেহ ছুঁয়ে আলো তাপ মাপা,
তার চেয়ে—
চোখের পাতায় মেখে তন্দ্রার আলস
মিছে মিছে রমণীর স্বপ্ন দেখা ভালো।
রোগীর বিবর্ণ রাত একটু আলোক যদি পায়
বেদনার পলি ঘেঁটে
পদ্মবীজ খুঁজে এনে
প্রেমে এঁটে কমলের দল
সুরভিতে ভরে দেবে অন্ধকার রাত।

সত্যি তো অনেক থাকে
দেখা যায় ছোঁয়া যায় দুটি হাত দিয়ে
না ছুঁলেও মন জুড়ে ভিজে ওঠে রামধনু
দেহ থেকে ঝির্ ঝির্ গুঁড়ি গুঁড়ি জল।

## একজন কবির মৃত্যু/প্রদীপচন্দ্র বসু

ফিরিয়ে দিয়েছে সব উপহার ; মানুষের কাছে পাওয়া দীর্ঘ ব্যবহারে
কোন ক্ষোভ নেই আজ
পরস্পর বসে আছে মুখোমুখি, স্থিরচোখে, প্রতীক্ষার ম্রিয়মান ছায়া—
এখন সমাপ্তি খুব দূরের ঘটনা নয়
যে কোন মুহূর্তে হ'য়ে যাবে।

নিজস্ব মহিমা নিয়ে শিল্প ও প্রণয় এক জীবনেই এসেছিল কাছে
জরার রিক্ততা যাকে হারিয়ে ফেলেছে শুধু প্রচ্ছন্ন তন্দ্রার মনে পড়ে
সমগ্র জীবন ধরে তার প্রজ্ঞা জেনেছিল সৃষ্টির ঐতিহ্য, সুখ
চলে যাবে জেনে ওই চাপা শব্দে বেজে ওঠে ঘরের দেয়াল।

জানিনা কেন সে এতো উদাসীন ছিল তার পার্থিব প্রয়াসে !
নিয়মমাফিক ভ্রমে নিজেকে গুটিয়ে নিল যেন
এই মাটি, গাছপালা, আলো, নারীর সোহাগ—
সফল সৃষ্টির শেষে আর ব্যবহারে প্রয়োজন নেই, তবু
এক অনন্ত শূন্যতা নিয়ে প্রেরণায় তাকে চলে যেতে হবে
যেতে হবে, যেরকম অনুভবে দাহ আর স্বপ্নে নীরবতা রেখে সকলেই যায়।

## কবি ৫৪/প্রদীপ চক্রবর্তী

সবাই চলে গেলে সব গন্ধ মিলেমিশে
সব ধর্ম বিকিয়ে দিয়ে একদিন শুধু একদিন
প্রার্থনায় বসতে হবে যাবতীয় প্রার্থনা (!)
হাটের মাঝখানে ঢোলক বাজিয়ে আমি শপথ
নেবো সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে আমার
কুঁজো পিঠটা আরো পিচ্ছিল হয়ে যাবে—
আমি আমার ক্রোধ কবিতার বেশ্যাবৃত্তি
সব ছেড়ে চলে আসব সঙ্গমশ্রান্ত পথিকের দলে

অর্থাৎ শুধুমাত্র বাঁও মেপে কাকচিল উড়ে আসবে
ভাগাড়ের দিকে একগাল মাছি নিয়ে একটা কবির
মৃত্যু হল।

## হলুদ গোলা জলে ধুয়ে অনুমতি দাও/অনিরুদ্ধ গুপ্ত

হলুদ গোলা জলে ধুয়ে দাও
আমার ব্যথার ভিতরের ক্ষতগুলি
যা আমার বদ্ধজীবনের নিত্যকার গেরস্থালি।
দেয়ালের পর দেয়াল
মিথ্যা পৃথিবীর ভালোবাসাগুলি আক্ষেপ করে
শুধু তোমাকে ঈশ্বর, তোমাকেই ঘিরে
শোক সান্ত্বনা সুখের ওপারে সিংহদ্বারে
সেই সিংহদ্বারে যাবো এখন
ঈশ্বর, হলুদ গোলা পবিত্র জলে সিক্ত করে
অনুমতি দাও—।

## একা সে/প্রণব মজুমদার

সেই প্রিয় শব্দ তার বাহুমূল ধরে নাড়া তার
কাছে থেকে ভয়ঙ্কর দূরবর্তী হয় চেনাস্বর
জলের গভীরে নেমে ছায়াছায়া বৃক্ষ হোয়ে যায়
মাটির মতোই গন্ধ তুলে আনে আমূল শিকড়
শিকড়ে কি আছে অনুভূতি ? নাকি নীল বিষাক্ত জর্জর—
নিশুতি রাতের মতো—একাকী নিঃশব্দে জ্বলে দারুণ দহনে
জ্বলে যায় ধূম্ররাত, বন্ধুহীন বিতথ যৌবন
বিরূপ করেছে তাকে সবুজ ঘাসের স্তর আর ছায়াপথ
অলক্ষ্য কেঁচোর মতো ডুবে যায় মাটির অন্তিমে।

## কার জন্যে ? /সলিল চক্রবর্তী

কার জন্যে ফোটাবো চাঁপা, নলেনগুড়ের সকাল—
শ্মশানরাতে একলা জেগে, বুনতে যাবো বীজ !
আসবো বলে বাওড়-বনে,—গেছি মেঘের ফাঁকে !

সবাই যখন তেরুচা আলোয় করছে মাতামাতি
আমি কেনো—দুঃখী হয়ে, ঘুরছি পথে পথে !
কে শেখালো, অমন করে মাখতে সাপের বিষ
এবং শীষের—মৃত্যু হ'লে, ভাসতে হৃদয়জুড়ে !

আমার ভরত পাখির রক্ত দেখবো ব'লে কেবল।

## সে/মন্মথনাথ সামন্ত

অনেক ঠকে নিজেকে
পরিমাপ করে নিতে বুঝেছে সে,
অনেক আঘাত খেয়ে
ক্ষতজায়গা আড়াল দিতে শিখেছে।

বয়সের ভাঁজ পড়ে চামড়ায়
স্তরে স্তরে
সেইমত পরিণত বয়সে
কাঁচা কাজের সংখ্যা পরিমিত হয়ে আসে।

সে এখন সহস্র কান্না বুকে রেখে
পথ চলে সন্তর্পণে।

## আমাকে জাগিয়ে দাও/পান্নালাল সরকার

একবার কাছে এসো
সলাজ হাসিতে তুমি সুদূরের শুকতারা
মাটিতে নেমে এসো, জীবন জাগাও।

আমিতো কম্পিত হাতে প্রতিদিন সৃষ্টিসুখে
কত ছবি এঁকে যাই।
সে ছবি কখনো যদি তোমার সীমানা ছুঁয়ে
যেতে চায় আরও বহুদূরে
বাতাসের মতো হ'য়ে ধরে রাখো সবটুকু
চোখের আলোতে।

আমার যা ছিল কিছু দিয়ে গেছি সহজ খুশীতে
নিজের কাছেই রেখে দাও,
শুধু, মাটিতে এসো নেমে, জীবন ছোঁয়াও।

## ভেতরে ভেতরে/সমরজিৎ সিংহ

ভেতরে ভেতরে আমূল দিয়েছো টান, শিকড়-বাকড় সহ
উঠে আসে তোমার পায়ের নিচে, বৃক্ষ
তার ছায়া মেলে আছে ওই চরণযুগলে, সখি, সে তোমার
প্রাপিত মহিমা, চন্দ্রতাপিত জ্যোৎস্না
মনে পড়ে, আমাদের ব্যবহার্য শব্দ আজ পুরাণো হয়েছে
তার ক্ষিপ্র তেজ নেই, ধার নেই, আমাদের বুক ফালা ফালা করে ওই
সহসা ছুরির ফলা ঢুকে যাবে, তার চেষ্টা নেই
ছায়া আছে, ম্লান, হতাশাগ্রস্ত যুবক, তার কোনো
আশ্রয়, চাকরি নেই, ভেতরে ভেতরে, তবু, আমূল দিয়েছো টান, তার
শিকড়-বাকড় সহ উঠে আসে বৃক্ষ

## আলোক চিত্র/অশোক পোদ্দার

তাকে বলেছিলাম, সূর্যদেব, আলো নয় দুঃখ দাও।
ভীষণ দুঃখ হতে যেন আমি সাতরাও্ তুলে নিতে পারি এরকম
সহ্য-শক্তি দাও।

তাকে বলেছিলাম, অগ্নিবর্ণ, জ্বালামুখ হতে যন্ত্রণা ছুঁড়ে দাও
আমার এ সুখের শরীরে যাতে আমি তিলে তিলে নিজেকে জ্বালিয়ে
আলোর পাহাড় হতে পারি।

দধিচীর মতো সে কেবল নিজেকে উৎসর্গ করে
পৃথিবীর কল্যাণে ছড়িয়ে দিয়েছে পথে ঘাটে
সোনালী রৌদ্রের আকারে।

## তিনটি রক্তবাজ যুবক/কৃষ্ণেন্দু বসু

ঠা-ঠা রোদ্দুরে
তিনটি রক্তবাজ যুবক বসে থাকে ঠায়
রকের আড্ডায়
প্রত্যহ সকাল দশটায়
যখন একদঙ্গল মেয়ে স্কুলে যায়
কিম্বা বাড়ী ফেরে বিকেল পাঁচটায়
যখন মুমূর্ষু বাপ ছট্‌ফট্‌ করে হাসপাতালের বিছানায়
কিম্বা মায়ের হাঁপানির টানটা বেড়ে যায়
তিনটি রক্তবাজ যুবক রকে বসে বসে গুল্‌তানি করে বুলি কপ চায়
মৌজ করে, সিগারেট খায়, আলোচনা করে 'জন-অরণ্য' ও 'সত্যজিত রায়'

## দুঃখ/নীতীশ চৌধুরী

নদীর গর্ভে জলের গভীর ছায়ায়
জলের দুঃখ কথা বলে,
উপরে জল কাঁপে,
শুধু জল বয়ে যায়।

নারীর গর্ভে প্রেমের ক্লান্ত ছায়ায়
প্রেমের দুঃখ কথা বলে,
বাইরে বুক কাঁপে
বিরহিণীর দিন বয়ে যায়।

দিন গেলে
বিরহিণী একা বসে সময় হারায়।

## জীবনযাপন/অভিজিৎ ঘোষ

পূজার নৈবেদ্য নিয়ে আমার মন্দিরে
সন্ধ্যার বেন কে এসেছে, নির্জনে
শান্ত অন্ধকারে। আমি ভাবি
একাকী অন্য মনে বুঝি তুমিই রয়েছো···

ভাবি যাই, একবার যাই, দেখে আসি
স্বজনবৎসলা সেই নারীর মিনতি
পুনর্বার সমর্পণ করে কিনা নয়নের জলে···
গোত্রান্তর করে কিনা যথাযোগ্য আগ্রাসী ক্ষুধায়

বারান্দা পেরোতেই দেখি সমস্ত সংসার
মঙ্গল বিদায় মন্ত্রে বন্ধ করেছে তার দ্বার...
কাঙাল ভিখারী আমি পথে বসে থাকি
অবতলে পড়ে থাকি একা...

## আত্মহত্যা বেড়ে চলেছে নিষিদ্ধ অসুখের মত/সলিল পাল

ক্রমশঃ আত্মহত্যা বেড়ে চলেছে নিষিদ্ধ অসুখের মত
নিজস্ব এবং ভারতীয় কারণে প্রতিভাধররা লোকান্তরে যাচ্ছে একে একে
যদিও সংখ্যা কমে যায় মূর্খের অথবা অপ্রকাশিত প্রতিভার
তবু আত্মহত্যা বেড়ে চলেছে নিষিদ্ধ অসুখের মত

একজন নিজের নামে পৃথিবীর নাম কলঙ্কিত করে
বলে দিল, তোমরা মর
আমাদের সমস্ত ওষুধ বাঁধরা করে
সেই নারায়ণী বাণ চলে গ্যাছে নারায়ণের নিশ্চিত আঘাতে
অতএব ক্রমশঃ আত্মহত্যা বেড়ে চলেছে নিষিদ্ধ অসুখের মত।

## প্রিয় অভিমান/প্রদীপ রায়চৌধুরী

ঘুম ভাঙা পাখির মতো মাঝরাতে জেগে ওঠে বিদায়ী ডিঙির শোক
শিশু হয়ে কাঁদে রাত
গোপন চোখের জলে ভেসে যায় ধানের আলপথ
'সময় হলেই ফিরে আসব'—সে বলেছিল
অথচ ফিরে এলেও কিছু মুখ অচেনা হয়ে যায়
ভুলে যায় ছদ্মবেশী ছৌ-নাচের আড়ালে কে থাকে
শীতের রাস্তায় মোড়ে নিষ্প্রদীপ কৃষ্ণচূড়া একা
বিধবা মেয়ের মতো উদাসীন দাঁড়িয়ে থাকে স্থির
বুকের আকাশ জুড়ে আলপনা আশা
ধুয়ে যায় শিশিরের নৈশ অভিমান
রাতের নক্ষত্র বড় ধীরে ধীরে পদক্ষেপ রাখে
অন্ধকার চোখ খোলে সকালের আলোর ডানায়
ঝরে-পড়া সতৃষ্ণ শিউলি
নড়ে চড়ে যেন কিছু প্রিয় অভিমান

## পাথর ও রমণী/সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

রোদে পুড়ে পাথরের জ্বর হয়, মাথা গুঁজে পড়ে থাকে রাস্তার ধারে
আর কাতর কামনা করে বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হোক,
মেঘরাজ সাড়া দেয় তার ডাকে, সমর্থন করে তাকে মৌসমী বায়ু
বহুদিন যে গাছটি আছে অনাহারে, গরীব শেকড় ছুঁড়ে পায়নিকো জল
সেও ঘাড় নাড়ে সমর্থনসূচক, ভিক্ষে নয়, দাবী শুধু জোরদার অক্ষোর বর্ষায়

আয়নার সামনে এক রমণী তিল আঁকে, ধরে থাকে কাজল-কাঠি
সেকি জানে কেন বৃষ্টি হয় ?
বরং বিরক্তি জাগে প্রেমিকের বিলম্বজনিত বিড়ম্বনা ভেবে
অভিশাপ দেয়, মেঘ নিপাত যাক—

হো হো হাসে, হাততালি দেয় জড়বস্তু, যা প্রকৃত নিশ্চেতন নয়
রমণী বোঝেনা, শুধু জানালার শার্সি বন্ধ করে রাখে

একটি দিনের তরে চন্দ্র ও সূর্যকে
হৃদয়ের চোখ দিয়ে
দেখিনি আমরা,
চেনা তো দূরের কথা

পৃথিবীর বুকে তবুও চলেছে
আমাদের অহংকার-যাত্রা
বুক টেনে টেনে
শুধু কেঁচোর মতন।

আমরা জানব কেমন :
কত রঙ
কত রূপ
কত রস
কত আলো
প্রতিটি মুহূর্তে
ঝরছে আকাশ থেকে
বৃষ্টির ধারার মতন…

ধরার ওপর।

## মৃত্যু/যোগব্রত চক্রবর্তী

কে কে ছিল সভাস্থলে
কেউ কেউ কেন বা আসেনি
এই নিয়ে কোলাহল সভামঞ্চ ঘিরে
তুমি একা গিয়েছিলে
পেয়েছিলে মৃত্যুর ইশারা
কেউ কেউ দিয়েছিল সাড়া?

বহুপথ হেঁটে হেঁটে শহরের শেষে
এইখানে থাকি আমি স্মৃতি নিয়ে
স্মৃতির সৌরভ যারে গন্ধ ম্লান হয়ে গেছে
কেউ এসে বলেনি যাকে ভালবাসি কিছুটা এগিয়ে।

এই ভালবাসাহীন দেয়া নেওয়া
তোমার উজ্জ্বল হাসি চোখের কৌতুক
এ জীবনে এই ছিল নিজস্ব যৌতুক
সব ফেলে চলে গেলে মৃত্যুর গভীর ইশারাতে।

## লোড শেডিং/নির্মল বসাক

সমুদ্রের প্রতিভূর মতো পুরুষেরা মাটি দিয়ে ঘেরা
নরম মেঘ বিদ্যুতের নভোতলে আসে  বলে
তোমার ঐশ্বর্য থেকে কতটুকু দিলে  আরো দাও
অভিমানের শূন্যতায় আরো আন গভীর কৃতজ্ঞ
আমন্ত্রণে প্রত্যাখ্যানে অতৃপ্তি সম্ভোগে মাটিকে কে হত্যা করে
পরিপাটি মেলে দেয় এলানো শরীর তার পূর্ণ এক নারী
তবু তারই মৃতদেহ দ'লে সংহত করে না চাওয়া পুরুষ প্রতিভূ

প্রজাপতি যায় উড়ে বিচিত্র মালার মতো প্রাণ
এই দেহ চেনো এ অরণ্যের অন্বয় মহল
জ্যোৎস্না ছড়াবার ছলে কে বলে ওঠে কোথায় শিকড়
পড়ে থাকে মৃত ঝিনুকেরা সমুদ্র বেলায়  অরণ্য মুষল অন্ধকারে
হলুদ বর্ণের চাঁদ ধূমল আকাশে আজ ঢেউএ ভেঙে যায়
মেঘের চারণভূমি শুধু জ্যোৎস্না ও আঁধারে ষড়যন্ত্র করে
সূর্যস্নাতা রমণীর পাশে প্রতিরাতে অপরাধ জমে

বুকের শহরে জ্বলে এ লোড শেডিং সিঁদুরের মতো লাল

## নিষ্ক্রমণের দিন/মণীন্দ্র গুপ্ত

অনেকদিন আগে
রহস্য এবং ভীরুতা দুটি হরিণীসখীর মতো
তোমার দু-পাশে হেঁটে হেঁটে আসত আমাদের সাঁকো পর্যন্ত।
ক্ষীণ জলধারার এপারে
আমরা যখন গাছের আড়ালে চলে যেতাম
ওরা পিছন ফিরে সূর্যাস্তের ঘাসে মুখ নামাত।

এপারে আমাদের ঘর হয়েছে,
খামার বাড়িতে দুপুরে ঘোড়ার ডেকা শোনা যায়—
মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের উচ্চহাসি।

কষাটবক্ষ পুরদেবতার বিশাল দারুমূর্তির পায়ের নিচ দিয়ে
আজ
কপর্দকহীন আমরা সেই সাঁকো পেরিয়ে চলে যাচ্ছি—

যেতে যেতে, বুনো জামগাছের মতো
তোমার শরীরের ছায়া ক্রমশ
আমার গায়ে ডালপালা নামাচ্ছে।
গুব গুব করে শব্দ উঠছে বাতাসে—যেন
কলসী ভরছে কেউ।
চাঁদের আলোয় আমাদের আর চেনা যায় না:
গন্ধর্বদম্পতির মতো সাদা মেঘের দুখানি ক্ষীণ রেখা।

## ফিরেই আসতে হয়/প্রফুল্ল মিশ্র

যাবো বলে পা বাড়াই, তবু যাওয়া হয়না আজকাল
ফিরেই আসতে হয় মাঝপথ থেকে
শেষ বাস মিস হয়ে গেলে
কিংবা, বেসুরো ঝালায় ঝালাপালা হলে কান
অথচ তবুও খোঁজ বুকের সোরেন্দাদের।

যতো বলি ইতস্তত: ক্ষয় ক্ষতি যন্ত্রণা বুদ্বুদ :
মৃত দৃশ্য দেহ নিয়ে মরুভূমি···
খেজুর বাগান ঘিরে প্রকাণ্ড ধুলোঝড়
তবু দূরে, কাছে-দূরে, অন্বেষায়
ধুলোর পাহাড় ছুঁড়ে মাথা তোলে ছায়া ছায়া উট
আর ঝুর ঝুর পাড়ঝরা-পাড়ভরা
মধুমিতা নদী
বুকের মধ্যিখানে

নিয়ত নিবিড় স্বনে ডেকে যায়।

ফিরেই আসতে হয় মাঝপথ থেকে।

# নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্রের শেষ দিনগুলি

সকুলচন্দ্র পতি

বরেণ্য ও স্মরেণ্য ব্যক্তিদের জন্ম-শতবার্ষিকীতে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যের অনেক দাবীদার জোটে। তারা মনীষীদের সম্পর্কে অনেক রঙচঙে বোলচাল ঝেড়ে ভক্ত ও অনুরাগী বলে পরিচিত হন। মৃত মনীষীর পক্ষে সেসব তাল-বেতাল উক্তির সমর্থন বা প্রতিবাদ করার উপায় নেই। শরৎচন্দ্রও এরকম স্ব-নিযুক্ত ভক্ত ও অনুরাগীদের প্রতাপরণিতা ও অন্তরঙ্গতার আতিশয্য থেকে রেহাই পান নি। যেমন প্রথম জীবন সম্পর্কে তেমনি তাঁর মৃত্যুকালীন ঘটনাবলী নিয়েও মনগড়া নানা কাহিনী চালু হয়েছে। শরৎচন্দ্রের শেষ দিনগুলিতে যে সব ব্যক্তি তাঁর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসকুলচন্দ্র পতি অন্যতম। ৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রচিত শরৎ-পরিচয় গ্রন্থে এবং উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের মৃত্যু প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে (দেশ—শরৎ-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬) তাঁদের বক্তব্য বলেছেন। শ্রীসকুলচন্দ্র পতি সামতাবেড়ে গ্রামে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী পুত্র, শেষ বারো বছরের অন্যতম সহচর এবং অপারেশনের পরে শরৎচন্দ্রকে শেষ রক্তদাতা। শরৎচন্দ্রের ইল, অপারেশন এবং অন্তিমকাল সম্পর্কে তাঁর ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য মিলিয়ে পড়লে একথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে সুরেন গাঙ্গুলী মশাই'র প্রদত্ত বিবরণ অনেকটাই জলমিশ্রিত। শরৎচন্দ্রের অপারেশনোত্তর স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিল; আফিং-এর জল খেয়ে আত্মহত্যা নয়—স।

মিল রিয়রডান-এর ইউরোপীয়ান নার্সিং হোমের বাঁধাধরা নিয়মকানুনের মধ্যে পড়ে শরৎচন্দ্র অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে (সম্পর্কীয় মামা) বললেন, "দেখ সুরেন, এঁদের অনুশাসনে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার আমায় কোন বাঙ্গালীর নার্সিং হোমে সরাবার ব্যবস্থা কর। আমি এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজী নই।"

সুরেন মামা শরৎচন্দ্রকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ভাল নার্সিং হোম খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগবে; একটু ধৈর্য ধরে থাক। আমি যখনই সন্ধান পাব তখুনি সরিয়ে নিয়ে যাব।"

শরৎচন্দ্র ব্যাকুল স্বরে বললেন, "না সুরেন, আমি আর পাচ্ছি না, তুমি খোঁজ কর।"

প্রায় বারোটি ঘন্টা কোন ক্রমে কাটবার পর বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত পার্ক

নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্রকে স্থানান্তরিত করা হল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওটি সুরেন মামার আত্মীয় ডাঃ সুশীলচন্দ্র চ্যাটার্জির নার্সিং হোম।

শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাইরে থেকে ফিরে এসেই শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে আসেন। সেখানে হিরণ্ময়ীদেবীর (শরৎচন্দ্রের স্ত্রী) কাছে শুনলেন দিনকতক হল নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছেন। নার্সিং হোমের ঠিকানা নিয়ে সোজা সেখানে এসে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে জানিয়ে দিলেন, প্রত্যহ রাত্রি আটটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত তিনি নার্সিং হোমে তাঁর কাছে থাকবেন। আর, দিনের বেলায় আমি থাকব। উমাপ্রসাদবাবু রাত্রিতে থাকলেও দিনের বেলায় সময় পেলেই দেখা করে যেতেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে।

এদিকে মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্স শেষ করে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কলকাতায়। বাড়ী ফিরেই ছুটলেন শরৎচন্দ্রের খোঁজ নিতে। হিরণ্ময়ীদেবীর কাছে সংবাদ পেয়েই হাজির হোলেন নার্সিং হোমে। শরৎচন্দ্র কুমুদবাবুকে বলতে লাগলেন নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনা। কুমুদবাবু শুনতে শুনতে তাঁকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আগামীকাল সকালেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলকাতায় ফিরছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার পর অপারেশনের ব্যবস্থা করব। চিন্তার কোন কারণ নেই। এ সামান্য অপারেশন।"

পরের দিন সন্ধ্যের সময় কুমুদবাবু ও ডাঃ বিধান রায় এসে শরৎচন্দ্রকে পরীক্ষা করলেন। ডাঃ চ্যাটার্জিকে ডাকিয়ে ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করে গেলেন। শরৎচন্দ্রকে কুমুদবাবু বললেন, "দাদা, অপারেশনের জন্য ডাঃ ললিতমোহন ব্যানার্জিকে ঠিক করি?"

শরৎচন্দ্র বললেন, "ললিত কত টাকা চায় সেটা আগে দেখ।"

পরের দিন শরৎচন্দ্রকে দেখতে এসে কুমুদবাবু বললেন, "ডাঃ ব্যানার্জি ৮০০ টাকা চান অপারেশন করতে।"

শরৎচন্দ্র বললেন, "কুমুদ, আমার অত টাকা নেই। তুমি অন্য সার্জেন ডাক্তার দেখ।"

পরের দিন রাত্রে ডাঃ বিধান রায় ও কুমুদবাবু একত্রে এসে হাজির হোলেন। শরৎচন্দ্রকে পরীক্ষা করলেন। কুমুদবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন, "দাদা, ডাঃ সুবোধ দত্তের সঙ্গে কথা কইলাম। সুবোধ ৫০০ টাকা হাতে নিয়ে তবে ছুরি ধরবে বলছে।"

এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি ওকে দিয়ে কোন দিনই অপারেশন করাব না।"

ডাঃ রায় বললেন, "দাদা! আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমি দেখছি কাকে দিয়ে করান যায়।"

যতদিন যাচ্ছে শরৎচন্দ্র ততই দুর্বল হোয়ে পড়ছিলেন। মনের জোরও কমে আসছিল। রাত্রে কুমুদবাবু এসে শরৎচন্দ্রকে পরীক্ষা করে বললেন, "দাদা! নার্সিং হোমে থেকে খরচ বাড়িয়ে লাভ নেই। তার থেকে বাড়ীতেই চিকিৎসা হোক। কাল সকালে আমি এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।"

শরৎচন্দ্র সুরেনমামাকে বললেন, "কুমুদের মতামত তো শুনলে। সেইমত সদর ঘরে থাকার ব্যবস্থা করগে। আমি কালই সকালে চলে যাব।"

সুরেনমামা শরৎচন্দ্রকে বললেন, "তাই হবে।"

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ রায় এসে হাজির হলেন ও শরৎচন্দ্রকে পরীক্ষা করলেন। তখনও কুমুদবাবু উপস্থিত ছিলেন। উভয়ে তাঁর অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। ফেরার সময় 'করিডোরে' ডাঃ রায় তাঁর গুরু-গম্ভীর গলায় কুমুদবাবুকে বলতে বলতে গেলেন, "অপারেশন করলে বাঁচার ওয়ান পারসেন্ট্ চান্স্।"

আমি তখন শরৎচন্দ্রের খাটের পাশে দাঁড়িয়ে।

রাত্রি আটটার সময় উমাপ্রসাদবাবু আসার পর সুরেনমামা ও আমি বাড়ী ফিরে বড়দাদুর থাকার জন্যে সদর ঘরে ব্যবস্থা করে রাখি।

পরেরদিন যথারীতি সুরেনমামা ও আমি নার্সিং হোমে বড়দাদুকে নিয়ে আসার জন্যে গেলাম। বড়দাদু সুরেনমামাকে দেখে বললেন, "সুরেন! আজ আমি বাড়ী যাব জান তো?"

সুরেনমামা বললেন, "হ্যাঁ। সেই মত সমস্ত ব্যবস্থা করে এসেছি। কুমুদ এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলেই নিয়ে যাব।"

শরৎচন্দ্র বললেন. "না সুরেন, আমি বাড়ী ত যাব না। গতকাল রাত্রে বিধান আমায় দেখে যখন ফিরে যায় তখন কুমুদকে বলতে বলতে গেল অপারেশন করলে আমার বাঁচার ওয়ান্ পারসেন্ট্ চান্স। আমি ঐ ওয়ান্ পারসেন্ট্ চান্সেই অপারেশন করাতে চাই।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে কুমুদবাবুও এলেন।

শরৎচন্দ্র কুমুদবাবুকে বললেন, "কুমুদ! আমি বাড়ী যাব না।"

কুমুদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন দাদা।"

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, "গতকাল 'বিধানের' কথা আমি শুনেছি কুমুদ। আমি ওয়ান পারসেন্ট চান্স নিয়েই অপারেশন করাতে চাই। আর সে অপারেশন তোমাকেই করতে হবে।"

কুমুদবাবু বললেন, "আমি তো সার্জেন্ নই দাদা।"

শরৎচন্দ্র বললেন, "আমি ও কথা শুনব না কুমুদ। তোমাকেই অপারেশন করতে হবে। মরি যদি তোমার হাতেই মরব। অন্য কারুর হাতে মরতে চাই না।"

রাত্রে ডাঃ রায় ও কুমুদবাবু এসে শরৎচন্দ্রকে পরীক্ষা করে স্থির করলেন, মাঝে একদিন বাদ দিয়ে পরের দিন অপারেশন করা হবে। ঐ মাঝের দিন শরৎচন্দ্রের শরীরে রক্ত দেওয়া দরকার। ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র রক্ত দেবেন ঠিক হল।

অপারেশন তো হবে—কিন্তু টাকা। টাকা কোথায়? ঐ সময় শরৎচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বলতে কিছুই ছিল না বলে হয়। সুরেনমামা ও অবিনাশ ঘোষাল মশায় ছুটলেন শ্রীযুক্ত হরিদাস চ্যাটার্জির কাছে। সুরেনমামা হরিদাসবাবুর কাছে এক হাজার টাকা চাইলেন হরিদাসবাবু সুরেনমামাকে বললেন, "আপনার প্রস্তাব শুনলাম কিন্তু টাকা তো এখন দিতে পাচ্ছি না। পুজোর সময় টাকা দিয়েছি। এখন অত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া বাজার মন্দা চলছে। এখন দিতে পাচ্ছি না।"

সুরেনমামা ও অবিনাশবাবু ফিরে এসে প্রকাশচন্দ্রকে সব কথা বললেন। প্রকাশচন্দ্র সমস্ত কথা শুনে বললেন. "একবার নিউ থিয়েটার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীবীরেন সরকার মশায়ের কাছে চেষ্টা করে দেখুন—দাদার যে কোন একটা বই এর সিনেমা-right-এর বদলে যদি টাকা দেন। সেই মত চেষ্টাও করলেন সুরেনমামা ও অবিনাশবাবু। কিন্তু সেখান থেকেও রিক্ত হস্তে ফিরতে হল।

পরেরদিন একাই নার্সিং হোমে সকালে চলে যাই। সুরেনমামা ও ছোট দাদু (প্রকাশচন্দ্র) টাকার জোগাড়ে বেরুলেন। পরে জানলাম বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে হরিদাসবাবুর কাছ থেকে হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

এখানে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায় কি প্রকৃতির লোক ছিলেন তা একটু বলে রাখি। তিনি আমাকে সবিশেষ চিনতেন। আমি বহুবার তাঁর বাড়ীতে ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের দোকানে গিয়েছি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক সময় আমি একটি গরীব ছেলের জন্যে শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' বইয়ের এক কপি চাই। ছোকরা

হরিদাসবাবু আমায় বলেছিলেন, "নকুল, তুমি বই চাচ্ছ বটে তবে তোমার দিদিমার হিসাব থেকে ওর দাম কাটা যাবে।"

এই কথা শুনে আমি বলেছিলাম, "দাদু। থাক, তা হলে দিতে হবে না।"

এহেন হরিদাসবাবু মৃত্যুপথযাত্রী শরৎচন্দ্রের জন্যে হাজার টাকা কি সহজে বের করতে চান? আর ঐ শরৎচন্দ্রের বই বিক্রী করেই তিনি ফেঁপে উঠেছিলেন।

অপারেশনের পূর্বেই রোগ শয্যায় শুয়ে থেকে শরৎচন্দ্র তাঁর সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবীর নামে 'উইল' করে দিয়েছিলেন। এই 'উইল' অতি অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী হয়েছিল। উইলের সাক্ষী ছিলেন শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মশায়।

এই 'উইল' সম্বন্ধে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী যে কাহিনী বিবৃত করেছেন, সেটি তাঁর মন-গড়া। বাস্তবতা বর্জিত। তিনি লিখেছেন—শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ সম্বন্ধে গোপন আলোচনার জন্যে রাধারাণী দেবীর বাড়ীর দোতলায় তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত নরেন দেবের সমক্ষে পরামর্শ করেন। সে সময় রাধারাণী দেবী অসুস্থ থাকায় তিনি তেতালায় শয্যাশায়ী ছিলেন। 'উইল' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত তিনি পরে তাঁর স্বামীর মুখে শুনেন।

আমি শরৎচন্দ্রের শেষ বারো বছরের সঙ্গী ও সেবক। তাই রাধারানী দেবীর উক্ত কাহিনীটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সেটাই প্রমাণ করব।

উইলটি তৈরী হয়েছিল বৈকালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে। এই সময়টুকুর মধ্যে নির্মলবাবুর সুযোগ ছিল না যে তিনি কারুর সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ সলিসিটর ও শরৎচন্দ্রের প্রায় সমবয়সী। ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। কি সমাজে, কি রাজনীতিতে তিনি ছিলেন একজন দেশের প্রথম শ্রেণীর কৃতী মানুষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও তাঁকে যোগ্য সম্মান দিতেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায় একজন বড় প্রকাশকই ছিলেন। তাছাড়া হরিদাস বাবুর বাড়ীর নিচে বড় বৈঠকখানা ছিল। এঁদের দুজনেরই দুই: রুম থাকা সত্ত্বেও তাঁরা রাধারাণী দেবীর ঘরে গিয়ে আলোচনা করলেন? তাছাড়া নির্মলবাবুর মত কর্মব্যস্ত বহুগুণী মানী ব্যক্তি রাধারানী দেবীর বাড়ীতে পরামর্শ করতে যাবেন এ হতেই পারে না। আর একটি বড় কথা—হরিদাসবাবুর সঙ্গে 'উইল' ও হিরন্ময়ী দেবীকে আইন দিয়ে Protection দেওয়ার আলোচনা একেবারে অবাস্তব। শরৎচন্দ্রের শেষ সময়ে চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারে টাকার অত্যন্ত

প্রয়োজন ছিল। পাছে হরিদাসবাবুকে অগ্রিম টাকা দিতে হয়, তাই তিনি এ সময় একরকম আত্মগোপন করেছিলেন। রাধারানী দেবী এ সংবাদ জানেন না। নার্সিংহোমে হরিদাসবাবুকে একদিনের জন্যেও দেখা যায় নি।

এ 'উইল' ব্যাপারে যিনি সমস্ত কিছু জানেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনিই 'উইলের' সাক্ষী।

শরৎচন্দ্রের 'উইল' হচ্ছে, সেখানে তাঁর সলিসিটর শরৎচন্দ্রের সঙ্গেই আলোচনা করবেন। হরিদাসবাবুর সঙ্গেই বা পরামর্শ করবেন কেন? আর রাধারানী দেবীর বাড়ীতেই বা সে বৈঠক বসবে কেন?

শরৎচন্দ্র উইল করেছেন ঝটিতি, অতি গোপনে। এমন কি সলিসিটরের অফিসের লোকেদের কাছেও এটা গোপনীয় ব্যাপার।

পরবর্তীকালে ঐ 'উইলের' Probate নেওয়ার সময় আমি নানান তথ্য দিয়ে নির্মলবাবুকে সাহায্য করেছিলাম। এ জন্য নির্মলবাবুর বাড়ীতে আমায় প্রায়ই যেতে হোত।

যেদিন প্রকাশচন্দ্র রক্ত দিলেন তার পরের দিন কুমুদবাবু এসে শরৎচন্দ্রকে বললেন, "দাদা! একটু লিখে দিতে হবে যে আপনি নিজ দায়িত্বে অপারেশন করাচ্ছেন।"

শরৎচন্দ্র বললেন, "লিখে নিয়ে এস আমি সই করে দিচ্ছি।"

কুমুদবাবু যেটি লিখে স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন সেটি নিম্নরূপ :

I take on myself all risks of operation and request Dr. K. S. Ray to operate on me.

Park Nursing Home — Sarat Chandra Chatterj

12. 1. 38 — 12.1.38

with all my senseses & courage in tact.

দুটি জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেছে, কারণ শরৎচন্দ্রের চোখে তখন চশমা ছিল না। হাতের টানে ঐরূপ হয়েছে।

এইখানেই অমর কথাশিল্পীর অমর লেখনী স্তব্ধ হয়ে গেল চিরতরে।

পূর্ব-ব্যবস্থা মত অপারেশন হয়ে গেল। অপারেশন করলেন ডাঃ ললিত-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়। শরৎচন্দ্র কিছুই জানতে পারলেন না।

অপারেশনের পর মুখ দিয়ে খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। টিউবের সাহায্যে তরল পানীয় খাওয়ান হতে লাগল। দিন দুই পরে আবার রক্তের প্রয়োজন

হল। এবার ডাক পড়ল আমার। শরৎচন্দ্র আমাকে বললেন, "নকুড, রক্ত দিতে পারবি ?"

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম, "কেন পারব না দাদু ?"

শরৎচন্দ্র বললেন, "অনেকটা রক্ত দিতে হবে রে ?"

আমি বললাম, "যতটা দরকার আমি দিতে পারব।"

শরৎচন্দ্র আমার কথা শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

সেদিন সকালে ডাঃ বিধান রায় ও কুমুদবাবু উভয়েই এলেন। সহকারী ডাক্তারগণ রক্ত নেবার ব্যবস্থা করছেন। শরৎচন্দ্রের বেডের পাশে অপর একটি বেডে আমি শুয়ে আছি। কুমুদবাবু বললেন, "নকুলের চোখ তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দাও।'

আমি বললাম, "না না, আমি ভয় পাব না। আমি দেখতে চাই। আপনারা যতটা পারেন রক্ত নিন।"

শরৎচন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "থাক কুমুদ ! ওর সাহস আছে। সত্যিই ও ভয় পাবে না। ও দেখুক ওর দাদুর জন্যে কতটা রক্ত দেয়।"

আমি সমস্তই দেখছি। দু পাউণ্ড রক্ত নেওয়া হল।

শরৎচন্দ্রের শরীরে বেড় পাউণ্ডের মত পুস করতে পারল। বাকীটা আর পারল না। এরপর আমায় দক্ষিণের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়ে দিল।

ডাঃ রায় "কুমুদবাবুকে বললেন, "কুমুদ ! নকুলকে একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে দাও।"

আমি বললাম, "ও সব কিছুই খেতে লাগবে না।"

ডাঃ রায় আমার কাঁধ চাপড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এরকম শরীর হোল কি করে ?"

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, "রূপনারায়ণের জলহাওয়ায় আপনেই এরকম গড়ে উঠেছে।"

আমার রক্ত দেবার পর যতদূর মনে পড়ে শরৎচন্দ্র দিন তিনেক বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর আগের দিন সকালে আমায় বললেন, "নকুড, ডাক্তারকে ডাক দেখি। মরফিয়া ইন্‌জেক্‌সন্ দেবে।"

আমি সুশীলবাবুকে ডাকলাম। তিনি এলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন, "নকুল, এ্যাম্‌পিউলটা পড়ে বলত কতটা আছে ?"

ডাক্তারের নিষেধ ছিল আমি যেন না বলি। তাই এ্যাম্পিউলটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি—কিছুই বলছি না। শরৎচন্দ্র বিরক্তির স্বরে ধীরে ধীরে বললেন. "কিরে পড়তে পাচ্ছিস না?"

আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে শরৎচন্দ্র বললেন, "ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসটা নিয়ে আয়

আমি ম্যাগ নিফাইং গ্লাস নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে দিলাম। বড়দাদু এ্যাম্পিউলটা পড়ে ডাক্তারকে উদ্দেশ করে বললেন, "ডাক্তার, এর বেশী যখন তোমরা দেবে না, এই দাও "

এ্যাম্পিউলটায় লেখা ছিল ওয়ান কোরথ্‌ গ্রাম। বড় দাদুর সঙ্গে এই আমার শেষ কথোপকথন।

পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি দাদুর অবস্থা খারাপ। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। উমাপ্রসাদবাবু আমায় অক্সিজেনের ক্যানেলটি হাতে দিয়ে বললেন, "আমি যাচ্ছি বৌদিদের নিয়ে আসতে।"

নার্সিং হোমের মালিক ডাঃ সুশীল চ্যাটার্জী আপত্তি জানালেন, "বাড়ীর মেয়েদের আনবেন না। কারণ বাঙ্গালী মেয়েরা ভীষণ কান্নাকাটি করে। এতে নার্সিংহোমের অন্যান্য রোগীদের ক্ষতি হতে পারে।"

উমাপ্রসাদবাবু তাঁকে জানালেন যাতে মেয়েরা কান্নাকাটি না করে সেদিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। বাড়ীর মেয়েরা এসে দেখে গেলেন।

আমি অক্সিজেনের ক্যানেলটি দাদুর মুখের সামনে ধরে আছি। সকাল তখন প্রায় দশটা। কুমুদবাবু আমায় বললেন, "নকুল, ক্যানেলটা সরিয়ে নাও— Expired".

কুমুদবাবুর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারার জল গড়াতে লাগল।

আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে শরৎচন্দ্র চির-শান্তিধামে চলে গেলেন।

এখানে উল্লেখ না করে পাচ্ছি না—সুরেনমামা শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে অপপ্রচার করে গেছেন। তাঁর বর্ণনা যে সম্পূর্ণ অসত্য তা আমি আর উমাপ্রসাদবাবু ছাড়া এখন আর কেহই জানেন না। যাঁরা জানতেন তাঁরা প্রায় সকলেই গত হোয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিল। কোনরূপ মাদক দ্রব্য বা আফিং গোলা জল খেয়ে নয়।

# পটেম্‌কিনের রথযাত্রা

রাইন হার্ট লেটাও

অনুবাদ—কমল মুখোপাধ্যায়

[ রাইন হার্ট লেটাও পশ্চিম জার্মানীর এরফুর্ট-এ ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং Schloss Bieberstein, Heidelberg ও Harvard University-তে শিক্ষালাভ করেন। তিনি সাহিত্যে Harvard University থেকে ডক্টরেট পান। তাঁর প্রবন্ধ ও গল্প জার্মান পত্র পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দুটিগল্পসংগ্রহের মধ্যে একটি-Schwierickeiten Beim Hauserbauen বই থেকে অনুদিত গল্পটি নেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে তিনি হামবুর্গ-এ বসবাস করেন।

বর্ত্তমান গল্পটির পটভূমিকা ঐতিহাসিক। রুশিয়ান সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ গ্রিগরী পটেম্‌কিনকে 'নব-রুশিয়া'র প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করেছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিণ দক্ষিণ রুশদেশ তথা 'ইউক্রেন' পরিদর্শনের জন্য পটেমকিনকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন, উদ্দেশ্য ঐ সব অঞ্চলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসা। ক্যাথারিণকে সন্তুষ্ট করার জন্যে পটেমকিন ঐ সময় আদেশ দেন সাম্রাজ্ঞীর যাত্রাপথের দুধারে অসংখ্য নকল গ্রাম যেন সাজিয়ে রাখা হয় যা দেখে সম্রাজ্ঞীর ধারণা হবে দেশের সব কৃষক অতি সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। তাঁর যে অর্থ এ ব্যাপারে বরাদ্দ ছিল তা যথাযথ ভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে এই ভেবে ক্যাথারিণ সন্তুষ্ট হন। ]

১১ই এপ্রিল ১৭৮৭

সেবাষ্টপোল থেকে আদেশ এসে গেছে। আমাদের এখন এখানেই থেকে যেতে হবে, মানে যতক্ষণ না অন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে আমাদের ব্যাপারে। মোদ্দাকথা জুড়ীগাড়ী চলে যাবার পরও আমাদের এখানেই থেকে যেতে হচ্ছে। মানে পরিষ্কার, দেশের ঘরবাড়ী ছেড়ে এখন এখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসতে হলে ভুয়োমার্কিক গ্রাম গড়ার কাজ হাতে নেবার আগে নিজেদের বসবাসের ব্যবস্থাটাই আগেভাগে ঠিক করে ফেলা দরকার, কয়েকখানা থাকার মতন কুঁড়ে

ঘর না তুললেই নয়। তাই সবচেয়ে আগে কয়েকখানা সাদামাটা কুঁড়ে ঘরই বানিয়ে নিয়েছি। হুকুমমাফিক গ্রাম বানানোর সরকারী মালমসলা যা মজুত ছিল সে সব থেকেই এই ব্যবস্থাটা করে ফেলা হয়েছে। সদর রাস্তার দু'পাশের একটু পেছনে আমাদের কুঁড়েঘরগুলোর সামনের দিকে হুকুমমাফিক কোঠা-গুলোর কাঠামোগুলোও ইতিমধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। এই যে স্বয়ং আমার কুঁড়েঘরটার সামনেই যে কাঠামোটা খাড়া করা হয়েছে, সদর রাস্তা থেকে দেখলে সেটাকে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের হলই মনে হবে। হলটার সদর দরজা খুলেছ কি যে কেউ সোজা আমার ঘরেই ঢুকে আসবে। এ ঘরেই এখন দিনরাত শুয়ে-বসে আমার দিন কাটছে, ফোরম্যানরা মাঝে মাঝে এসে কাজের রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে অবশ্য।—'বাবু এখন আর কি কি করা হবে?' ওদের নিবেদন শুনে যাচ্ছি আর ধারসারা গোছের উপদেশ ছুঁড়ে দিচ্ছি।

সরল কথায় ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, ছাদ-ছাওয়ানদার যারা তারা আসলে রঙের মিস্ত্রি, আবার দরজা-জানালার কাঁচ পয়ানোর কারিগর যারা তারাও সবাই আসলে রঙেরই মিস্ত্রি। ওদের নিপুণ তুলির টানে সুন্দর সুন্দর রঙ বেরঙের জানালা গজিয়ে উঠছে। এমন কি রাজমিস্ত্রি যারা আর চিমনীগড়ার মিস্ত্রিরাও রঙের মিস্ত্রি ছাড়া আর কিছুই না। বাদবাকী আর যে ক'জন রইল,কাজের কাজ যারা করছে তারা হল গিয়ে ভারা বাঁধিয়ের দল। ওরা ভারাও বাঁধে আর সময় সময় আমাদের কুঁড়েঘরগুলোর কাজেও হাত লাগায়। কয়েকদিন হ'ল ওদেরও কোন কাজে কর্মে পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। রিপোর্ট পেয়েছি ওরা সব কয়েকদিন হল বড় কাঠামোটার পেছনে ইদানিং যে শুঁড়ীখানাটা গজিয়ে উঠেছে, ওখানেই জড় হয়ে পিপে পিপে তাড়া গিলে শুয়ে-বসে দিনরাত্রি মাছি তাড়িয়ে যাচ্ছে। একজনের মাথায় কেমন ধরনের পোকা ধরেছে সে নাকি একটা বেশ বড় রকমের রঙ করা জানালা কেটে ছিঁড়ে একটা সত্যিকারের জানালা বসিয়ে দিয়েছে। এ তো মহা ফ্যাসাদ দেখছি, এ ধরনের কীর্তিকলাপ যদি বাড়তে থাকে তাহলে যে দায়িত্ব দিয়ে আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে তার তো দফা-রফা হয়ে যাবে।

১২ই এপ্রিল, ১৭৮৭

গতকাল বিপদের যে কল্পনা ডায়রির শেষ পাতায় লিখেছিলাম, আজ তা সত্যি সত্যি বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রঙ করা জানালার সদ্গতি হয়ে গেছে, আসল জানালা বসে গেছে সে সব জায়গায়। 'কাঁচ-মিস্ত্রি'র

লোকটার নাম 'নিকোলায়েভ গ্রামের পপভ', আসলে রক্তেরই মিস্ত্রি, তাগাদায় এসে নালিশ জানিয়ে গেছে, "অত সাধের কাজ আমাদের। বাচ্ছেতাই করে নষ্ট করে দিল। রঙের তুলি হাত থেকে নামাতে না নামাতেই বোম্বেটেগুলো জানালাগুলোকে কেটে ফর্দাফাই করে দিল, এখন সত্যিকারের জানালা বসিয়ে দিয়েছে!"

একটা ধারণা ক্রমাগত মনের মধ্যে গেড়ে বসছে, আমরা কী একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটো গ্রাম গড়ার কাজে হাত লাগিয়েছি? একটা নকল আর অন্যটা আসল? মজার কথা আসলটা যেন আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই নকলটার ভেতর থেকেই গজিয়ে উঠছে, যেন কোন কিছুর চাপে আপনা থেকেই এমনটা হয়ে চলেছে।

১৩ই এপ্রিল, ১৭৮৭

দুপুরে তন্দ্রার আমেজটা বেশ জমে উঠেছিল, ঘোর কেটে গেল দুঃস্বপ্নে, লাফিয়ে উঠে বসলাম। স্বপ্নে দেখছিলাম জুড়ীগাড়ী গ্রামের পথে এসে ঢুকলো, মহারানী অঘোরে ঘুমে অচেতন, এমন ঘুম স্বয়ং অমন দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজপুরুষটিও ভাঙাতে সাহস পাচ্ছেন না। আমার মনে দুর্দান্ত ভাবনা জুড়ীগাড়ীটা গ্রামের রাস্তায় বরাবর এগিয়ে চলেছে, হয়ত বা ঠিক এই সময়টাতেই মনের মানুষটার কোলে (মনের মানুষ স্বয়ং পটেমকিন) মাথা রেখে সম্রাজ্ঞী ঘুমে ঢুলছেন। হরি হরি! পলকের জন্যে মহারানী চোখ খুলে বাইরে একটু তাকিয়ে দেখলেন। এই যে পলকের দেখা, অদ্ভুতভাবে পরিষ্কার বলে ফেললাম, এই পলকটুকুর জন্যেই আমরা এখানে এসে হাজির হয়েছি। প্রাক্তদিনকে এই কারণেই উপদেশ দিয়ে রেখেছি এই পলকের দর্শন ব্যাপারটা স্মরণে রেখেই সে যেন আর একবার ছাদের ওপর দিকগুলো ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখাশোনা করে নেয়।

মনের যখন এই থতমত অবস্থা, পেট্রভ ছুটে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে সংবাদ দিল ওর সব ক'টা চিমনী থেকে আসল ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। সব ব্যাপারেই নিজেকে গিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে এমন সময় আমার হাতে নেই, ওকেই ফিরে যেতে বললাম, বলে দিলাম সব ক'টা চিমনীগুলোকে ও যেন পেছন দিক থেকে ভালভাবে লক্ষ্য করে আসে। ফিরে এসে দরজাগোড়ায় হাজির হবার আগেই দূর থেকেই ওর গলা কানে এল, চিৎকার করে বলছে, আঁকা চিমনী-

গুলোর পেছনেই সত্যিকারের চিমনী গড়ে উঠেছে আসল সব বাড়ীর মতন কী সব বস্তু থেকে। হায় ভগবান! যা অবস্থা অবাক হবার কিছু নেই, কাল সাত সকালেই যদি কানে আসে, পাদ্রীসাহেব বিশেষ উপাসনার জন্যে গীর্জার ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছেন তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

১৭ই এপ্রিল, ১৭৮৭

কয়েকদিন আগের স্বপ্নটা বাস্তবে কী বিচিত্র রূপই না নিতে শুরু করেছে! তুলনা করা যাক কী প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা তখন, খবরটা যখন কানে এল প্রথম, এই কাজের দায়িত্ব আমারই কাঁধে চাপানো হয়েছে। তখনকার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হঠাৎ যদি আমারই জায়গায় মহারানী ক্যাথারিণ নেমে দেখে যেতে চান, মাথায় বাজ পড়তে কী তখন বাকী থাকবে? খোলামেলা সাজানো রঙ-করা বাড়ীর ছবিগুলোর ভেতর দিয়ে সোজাসুজি তাঁকে যদি আমারই এই ছোট্ট কুঠরিটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়?

গতকাল কী? না বোধ হয়, তার আগের দিন দুপুরবেলা, একটুখানি গড়িয়ে নেব মনস্থ করছি, এসে হাজির হলেন আমাদের লেফটেনান্ট সকটাট্‌স্কী মশায়। কয়েকদিন হ'ল ক্রাইমিয়া থেকে বদলী হয়ে এসেছেন। এসেই প্রশ্ন, "বলি ছোট খুড়ো, আপনার আঁকাজোকা গ্রামটা গড়ে উঠছে কোথায়?" ভয়ে-সয়ে গিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করেছিলাম, যদিও জানতাম ভদ্রলোক একটু চ্যাঙড়া ধরনেরই বটে। বেশ কয়েকদিন ধরেই এমন ধরনের ভাবনাই মনটাকে বেশ দমিয়ে রেখেছে, হতে পারে তো স্বয়ং দোর্দণ্ড-প্রতাপশালী ঐ রাজপুরুষটিই এমন প্রশ্ন করে বসতে পারেন। আজ আবার সত্যি সত্যিই গীর্জার ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। পেট্রভ্‌ খবর দিয়ে গেল এখন আবার প্রত্যেকটি নকল চিমনী থেকেই ধোঁয়া উঠছে; অগুন্তি নকল জানালার বদলে সত্যিকারের ঝকঝকে জানালায় শুধু নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি না, জানালার পেছনে রাখা ঝকঝকে ফুলদানীতে ফুল সাজানো রয়েছে, তা-ও দেখা যাচ্ছে। কাঠ-মিস্ত্রি, কাঁচ-মিস্ত্রি, ছাদ-ছাওয়ানদার, চিমনী-মিস্ত্রি কেউই বাদ নেই সবারই এখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক, রঙের ছিটেফোঁটাটিও কোথায় কারোরই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমার কুঠরির লাগোয়া কোন জায়গাতেই কাজ চলছে, কানে শব্দ ঢুকছে। আশ্চর্য হব না হঠাৎ যদি এক সকালে উঠে দেখি আমার কুঠরিটাই গ্রাম পঞ্চায়েতের হলের লাগোয়া একটি কামরাতে পরিণত হয়েছে।

১৯-এ এপ্রিল, ১৯৮৭

ছাদের ওপর থেকে যবে থেকেই আওয়াজ আসছে কারা যেন লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে, তবে থেকেই যেন ঐ উদ্ভট ধারণাটা মনের মধ্যে আঁকড়ে বসেছে ব্যাপারটা কি—চিন্তাটা মনে এলেই গায়ে জ্বর আসে, খাটুনির ধকলটা ভেবে। বিপদের ঝুঁকি কিন্তু সব সময়েই থাকছে, উনি মানে জেনারেল পটেমকিন যদি এটাকে আসল গ্রামই ভেবে বসেন। তখনই তো প্রশ্ন করে বসবেন যেমন আদেশটি দিয়েছিলেন সেই নকল গ্রাম গড়া হল কোথায়। নির্ঘাত সন্দেহ করে বসবেন, মালমসলা যা সব আমাকে দেয়া হয়েছে সরকার থেকে সবই বিক্রি করে বসেছি। যা থাকে কপালে হুকুম দিয়ে রেখেছি রাস্তার ধার বরাবর কোঠাগুলোর কাঠামোর স্টেজে বসানো সিনগুলোর মতন করে রঙ ধরিয়ে দেয়া হয় যেন খুব তাড়াতাড়ি। আমি লিখে চলেছি, ওদিকে দিঁপড়ের মত অধ্যবসায় নিয়ে কাঠ-মিস্ত্রি, রঙ-মিস্ত্রি, ছাদ-ছাওয়ানদার, চিমনী-মিস্ত্রি সবাই যে যার নিজের কাজগুলোয় রঙের প্রলেপ লাগিয়ে চলেছে তো চলেছে।

২১-এ এপ্রিল, ১৯৮৭

মোদ্দা কথা কাজের নামে যা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভাল ভাবেই তা নিষ্পন্ন হোক আমার মনের তাই আসল ইচ্ছে। ইচ্ছেটা আসার কারণ, গতকালই আমার খবরটা পৌঁছে দেয়া হয়েছে, আমাকে নাকি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রাম-পঞ্চায়েতের মোড়ল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। খুব শীগগিরই আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাকে মোড়লের গদিতে বসানো হবে, কেননা গ্রাম-পঞ্চায়েতের হল-ঘরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার কুঠরির দরজা ভেঙে ফেলা হবে, এর সোজা মানে খুপরিটা থেকে বেরিয়ে হল ঘর বরাবর হেঁটে গেলেই সোজাসুজি হল ঘরের লাগোয়া আমার খাসকামরায় গিয়ে হাজির হতে পারবো। খাসকামরা আমার জন্যে ঢেলে সাজানো হবে, প্রস্তাবটা নাকি নেয়াই আছে। এখনকার মত এখানেই ইতি করা যাক, খবর এইমাত্র এল, মহারানীর জুড়ীগাড়ী গ্রামের কাছ বরাবর এসে গেছে।

২২-এ এপ্রিল, ১৯৮৭

হুড়মুড় করে মাঝের দেয়ালটাকে ধসিয়ে ফেলা হল বিকট শব্দে। এখন সোজাসুজি হল ঘরের লাগোয়া আমার খাসকামরা। আগেই আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল সরে গিয়ে যেন ওপাশের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াই, কানে এখনও

তালা লেগে আছে। লোকমুখে শুনেছি এ সব ব্যাপারের পর আত্মস্থ হয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। সুস্থ হবার একমাত্র ওষুধ এই ধরনের ব্যামোয় কেবল চূড়ান্ত বিশ্রাম, আর সব চেয়ে বড় প্রয়োজন চোখ কান বুজে ঘুমিয়ে যাওয়া। আমার সহকারী কর্মচারীটি এসে হাজির। যার জন্যে এতদিন ধরে অপেক্ষা—মহারানীর জুড়ীগাড়ী, পাশে মহারানীর ফলক লাগানো, সবে মাত্র গ্রামের রাস্তা পার হয়ে গেল। খবর এল ফুলবাড়ীর কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে।

[রাইনহার্ট লেটাওর মূল জার্মান গল্প Beim Vorbeifahren der Potemkinschen Kutsche"র অনুবাদ]

# দাদুর হাত

সুনীলেন্দু কোনার

দাদু মারা যাওয়ার পর আমারই বেশী কাঁদার কথা ছিল, অথচ আমি নাকি কাঁদিনি মোটে। আমার মনে পড়ে, কেন কাঁদিনি তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। মৃত দাদুর শবদেহটা যখন বিছানায় পড়ে ছিল, তখন আমার নজর ছিল দাদুর মুঠো করা শক্ত হাত দুটোর দিকে। আমার মনে হয়েছিল, দাদু তাঁর শক্ত মুঠোয় তাঁর এতদিনের মাছ-ধরা অভ্যস্ত হাতে জালের রশিটা আঁকড়ে ধরে জালসুদ্ধ আমাদের মাছের মত বন্দী করে নিয়ে পরপারে যাত্রা করেছেন। তিনি যখন বাবাসহ অন্যান্যদের কাঁধে চড়ে শ্মশানে যাচ্ছিলেন। তখনও আমার মনে হয়েছিল, তিনি যেন জালের ভেতর আমাদের গোটা পরিবারটা, বাবা, মা, আমি ও কাঁদুনিকে বন্দী করে শ্মশানপানে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

বস্তুতঃ দাদু মারা যাওয়ার পর থেকেই আমাদের গোটা সংসারটার যেন কী হয়ে গেল। গাঁয়ের পাট চুকিয়ে আমরা শহরে চলে এলাম। বাবা সরকারী অফিসের ছোট কেরানী, অল্প তার আয়। তাই বাবা থাকতো শহরে, সপ্তাহান্তে বাড়ী যেতো আর আমরা সবাই গাঁয়ে থাকতাম, দাদু দেখাশোনা করতেন। দেখাশুনা বলতে, জমি জায়গা ছিল না, একটা ছোট আম বাগান ছিল বাস্তুর লাগোয়া, আর একটা বাঁশ বন। আর ছিল দাদুর দুটো জাল। জালে যেমন জেলে, তাঁর জালেরও তেমনি ছিল খ্যাতি। লোকেদের পুকুরে মাছ ধরতে হলে, কারো ছেলেমেয়ের বিয়ে থাকলে, দাদুর ডাক পড়তো অনিবার্য। দাদু অমনি তাঁর জাল দুটো কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। বুড়ো হাড়ে অমন নির্ভাজ জাল ফেলা দেখলে অবাক হতে হয়। যতো মাছই পড়ুক, গোটা জাল তিনি তুলে আনতেন নিপুণ হাতে। আর আমি ছিলাম দাদুর নিত্যসঙ্গী, প্যান্ট খুলে ছেঁড়া গামছা পরে, খাড়ুই হাতে দাদুর পেছনে পেছনে লেপ্টে থাকতাম।

সেই দাদু যখন মারা গেলেন, গাঁয়ে আমাদের অভিভাবক আর কেউ থাকলনা, বাবা বাধ্য হয়ে আমাদের শহরে নিয়ে এল। আম বাগান, বাঁশ ঝাড় পড়ে রইল। বাড়ীটাও পড়ে রইলো সুরেশ জ্যাঠার হেফাজতে। বাড়ীর কিছু জিনিষ আমরা সঙ্গে নিয়ে এলাম, কিন্তু দাদুর বিখ্যাত জাল দুটো আনা হল না।

শহরের ছোট ভাড়া ঘরে অত স্থান নেই। পরিত্যক্ত অনেক জিনিষের সঙ্গে দাদুর অমন জাল দুটোও রয়ে গেল।

শহরে এসে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বাবা রাস্তায় বেরুতে দেয় না, গাড়ী চাপা পড়ার ভয়। গাঁইয়া আনাড়ী ছেলে আমি। কিছুদিন খুব মন খারাপ করে, ঘাড় গুঁজে, ঘরের কোণে পড়ে থাকলাম। শহরের একটা পাড়ার একদম ভেতরে একটা বিরাট ঘেরা জায়গায় গোটা কতক টিনের ছাওয়া ছোট ছোট খুপড়ি ঘর। তার দুটো নিয়ে আমাদের সংসার। সেখানে আরো কয়েকটা পরিবার বাস করে। বেশ বোঝা যায়, সবাই আমার বাবার মত অন্য গাঁয়ের মানুষ, কিন্তু আমাদের মত গাঁইয়া নয়। ফলে আমাদের সঙ্গে তেমন ভাব জমে ওঠেনি। না আমার সংগে না কাঁদুনির সঙ্গে। বাবা এখানে আসার আগে বারবার বলে দিয়েছে। আমি যেন আর কাঁদুনিকে কাঁদুনি না বলি। আসলে ওর নাম কণি, কণিকা। আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট। আরো ছেলেবেলায় ও কথায়-কথায় কাঁদতো বলে পাড়ার ছেলেমেয়েরা ওকে কাঁদুনি বলে ক্ষ্যাপাতো। সেই থেকে আমিও কাদুনিই বলে আসছিলাম। শহরে এসে, এখন ওকে আমি কণি বলেই ডাকি। কেননা, কেন যেন আমার মনকে খোঁচা দিত যে, আমরা এখন শহরে বাস করছি। শহর আর গাঁয়ে অনেক তফাত। এখানে সবাই সভ্যভব্য, ছিমছাম। ঝকমকে পোষাক পরা, আরো ঝকঝকে ছেলেমেয়েদের মাঝে আমরা যেন আবর্জনা।

কাঁদুনিকে 'কণি' বলায় তার সুখী হবার কারণ ছিল। কিন্তু আমি যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করি। কাঁদুনি ডাকের মধ্যে যে অন্তরের স্পর্শ ছিল, আনন্দ ছিল, 'কণি' ডাকার মধ্যে তা যেন নেই। কেমন যেন কৃত্রিম, বানানো মনে হয়। আসলে কাঁদুনির নাম বদলের সঙ্গে তার চেহারা, অবস্থান, তার সঙ্গে আমার এতদিনকার সম্পর্কটাই যেন বদলে গেল। মায়ের মুখে আর সেই আগেরমত হাসি-হাসি ভাবটা নেই। আমারও নেই। কোন বন্ধুবান্ধবও নেই। রাস্তায় ধুলো পায়ে ছুটে বেড়ানো, দাদুর সঙ্গে খাড়ুই হাতে পুকুরের পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ নেই, বস্তাছেঁড়া পাকানো বলে লাথি মারা নিয়ে হুড়োহুড়ি নেই। মনে হল, দাদু যেমন এক পুকুর মাছ জাল দিয়ে টেনে তুলে, অন্য পুকুরে ছেড়ে দিত, তেমনি আমরাও কারো জালে জড়িয়ে গাঁয়ের মাটি ফেলে এই শহরে উঠেছি। দিন দিন আমি যেন কেমন শুকিয়ে উঠছি। গায়ের রংটা যতটা কালো ছিল তার চেয়েও কালো হতে লাগল। মুখটা শুকিয়ে আমসি।

বাবা বোধহয় বিষয়টা নজর করেছিল। মাকে একদিন বকুনি দিল। ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল। বাবা মাঝে মাঝেই মাকে এমনি বকুনি দেয়, আমার খারাপ লাগে। আর, মা সেটা ঝালিয়ে নেয় হয় কাঁদুনির ওপর না হয় আমার ওপর। মায়ের এই উত্তল করে নেওয়ার হাতের পাঁচ আমরা, ফলে মায়ের রাগ আমাদেরই ওপর পড়ে। সেজন্যে বাবা যখন মাকে বকে আমি শংকিত হই, রেগে উঠি বাবার ওপরে। মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীর মাত্র একটি মানুষও যদি না রাগে তাহলে আরো অনেকেই রাগবে না, আমরাও অক্ষত থেকে যাবো। এই ঘরেই, বাবা যদি না রাগে, মায়ের রাগার তাহলে বিশেষ কারণ থাকে না। মা না রাগলে আমিও রাগি না, কাঁদুনিও যায় যায় না। শুধু আমার আর কাঁদুনির মতো ছেলেমেয়েদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে পিতাপিতামহদের না রেগে দিন কাটানো উচিত।

গাঁয়ে বৃত্তি পরীক্ষা পাশ করে কোথায় ভর্তি হব, এ সমস্যার সমাধান করতে না পারায় এক বছর বসেই ছিলাম। বাবা তখন আমাকে শহরে আনতে চেয়েছিল, মা এবং দাদু রাজী হয়নি। এখন আবার বাবা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবে বলল। ভর্তির সময় আসতে দেরী আছে বলে একটা মাস্টার ঠিক করা হল। স্কুলে ঢোকার আগে স্কুলে যাওয়া জিনিষগুলো ঝালিয়ে নিতে। বাবা এই মাষ্টারকে বেছেছিল এজন্যে যে এখানে আসতে হলে আমাকে বড় রাস্তায় উঠতে হয় না। ফলে গাড়ী চাপা পড়ার ভয় নেই।

আমার মাষ্টারমশায়ের এক ঘর পোস্ত। গোটা দুয়েক বড় বড় বেকার ভাই, গোটাকতক বাচ্ছাকাচ্ছা ছেলে। কারো সঙ্গে আমার তেমন বনিবনা নেই। আমার মাষ্টারও আমাকে পড়াবার সময় পায় না। কোথায় যেন ঘুরে বেড়ায়। কোথায় বুঝি একটা চাকরীও করে। মাষ্টার যার বাড়ীতে ভাড়া থাকতো সেই বুড়িটাকে কেউ সহ্য করতে পারে না। অথচ আমার সঙ্গে তার খুব বনিবনা। খুব ভালবাসে আমাকে, মাঝে মাঝে এটা-ওটা খেতে দেয়। নির্বাসনে আসা এ শহরে এমন একটা সাথী পেয়ে আমার আনন্দের সীমা রইল না। বুড়ি আমাকে বলে, 'কেন আসিস বাবা ওদের ঘরে। ওখানে পড়াশুনো হবে না তোর। তার চেয়ে মাঝে-মধ্যে আমার কাছেই আসিস।'

বস্তুত এই বুড়ির টানেই আমি যাই সে বাড়ী। বুড়ি একদিন একটা খুব মজার কথা বলল, আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার মাষ্টারের ভাইকে পাশের ঘরের একটা মেয়ে নাকি দুতিন ঘন্টা আটকে রেখে কীসব করেছে। তারপর

মেয়েটার মা নাকি জোর করে দরজা খুলিয়েছিল। ব্যাপারটার মধ্যে অত রহস্যের কি আছে তা আমার মাথায় ঢোকেনি। আর তাই নিয়ে ঐ ফিসফিসানিও আমার ভালো লাগেনি। বুড়িকে আমি বললাম, 'তাতে অন্যায় কি হয়েছে? ওদিকে তোমরা এত ঝুঁকছ কেন?'

বুড়ি যেন অবাক হয়ে গেল। বলে, 'কী ছেলেরে বাবা তুই? অন্যায় নয়? তোরা বড় হয়ে যে কি করবি!'

বড় হয়ে কি করব, এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। তবু বুড়ি যেভাবে ঘটনার বর্ণনা করল, তাতে আমার মনে হল, বিষয়টা নিয়ে আমার ভাবা উচিত। দুদিন খুব ভাবলাম ব্যাপারটা নিয়ে। নানান চিন্তা মাথায় ভীড় করল বটে কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। বুড়ি একদিন সেই মেয়েটাকে দেখিয়ে দিল। কী যেন নাম মেয়েটার, বোধহয় জবা। মেয়েটার দিকে তাকাতেই আমার যেন কেমন চৈতন্যলোপ হবার মত অবস্থা হল। ওর হাতে বোধহয় দু-গাছা সরু চুড়ি ছিল। আশ্চর্য, সে হাত দুটোর সঙ্গে আমার দাদুর হাতের বেশ মিল দেখতে পেলাম। তার চুড়িগুলোকে দাদুর হাতে বাঁধা সেই জালের রশির ফাঁস মনে হল। বুড়িকে সেকথা বলতেই, সে তার ফোকলা দাঁতের মাড়ি বের করে কেমন বিচ্ছিরী করে হাসল। বলল, 'বারে বেটা, তোকে আমি বোকা-হাবা ভাবতাম। এখন দেখছি তুই যেমন বুদ্ধিমান তেমনি পাগলা। ঠিক বলেছিস, ঐ মেয়ে সব জায়গায় জাল ফেলে বেড়াচ্ছে।'

বোকা কি বুদ্ধিমান, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। তবে আমার এই ছোট্ট জীবনে জন্মাবধি যেটা সবচেয়ে বেশী দেখেছি সেটা ঐ দাদুর হাত। মাছ ধরার সময়ে দাদুর সঙ্গে আমি খাড়ই হাতে লেপ্টে থাকতামই। আর, দাদুর হাতে ফাঁস লাগানো জালের রশিটা দেখতাম, ঐটার দিকেই বেশী তাকাতাম। কেননা, দাদু প্রতিবার জাল ছোঁড়ার পরে ঐ রশির ফাঁস-বাঁধা হাতটা দিয়ে অনুভব করতেন জালে মাছ পড়েছে কিনা। আমি প্রতিবারই উত্তেজনায় অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, 'কী দাদু, নড়ছে?' দাদু হাসিমুখে জবাব দিতেন, 'হ্যাঁরে শালা, তোর খাড়ই এবার ভর্তি হয়ে যাবে এত মাছ পড়েছে।' আমি দাদুর ঐ রশির ফাঁস-বাঁধা হাতটার দিকে তাকিয়ে আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠতাম।

এর ফলে জালের রশি-বাঁধা দাদুর হাতটাকে আমি এত বেশী চিনেছিলাম যে সেটা সব সময় আমার মনে জীবন্ত হয়ে থাকত। সব কিছুর মধ্যেই আমি

দাদুর ঐ রশির কাঁসঅলা হাত দেখতে পাই। অমনি, মা যখন আমাকে বকে, তখন মায়ের হাতদুটো দাদুর হাত মনে হয়। আমি যখন সেই রাগে কাঁদুনিকে মারি, তখন আমার হাতে দাদুর হাতের আদল আসে।

বন্ধুহীন নিঃসঙ্গতা আমাকে যেন মেরে ফেলতে চাইছিল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। প্রতিদিন সকাল হবার আগে ভাবতাম, আর সকাল না হলে বেশ মজা হত।

আমাদের বাড়ীঅলার আমার বয়েসী একটা ছেলে আছে আর কাঁদুনির বয়েসী একটা মেয়ে। মাঝে মধ্যে ওদের দেখি আর ভাবি, ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে আমার আর কাঁদুনির বেশ সাথী জোটে। কিন্তু মনটা খচখচ করে। নিজেদের গা থেকে পাড়াগাঁয়ের সামনে যে ছোট পুকুরটা আর তার ধারে যে ফুলের বাগানটা আছে সেখানে ওরা রোজ বেড়াতে আসে। আমি কাছে ঘেঁসতে পারি না। জুল-জুল চোখে ওদের পানে তাকিয়ে থাকি। ওরাও আমাকে মোটে পাত্তা দেয় না। টকটকে ফরসা রং, সুন্দর জামা প্যাণ্ট পরা, পায়ে জুতো মোজা দেওয়া। এসব দেখে প্রথমটায় ওদের ওপর আমার রীতিমত সম্ভ্রম জেগে ওঠে।

তবু একদিন উৎসাহী হয়ে যেচে আলাপ করতে গেলাম ওদের সঙ্গে। কাঁদুনিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, যদি কিছুটা সুবিধা হয়। ভয়ে ভয়ে ভাইটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?'

ছেলেটা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে। তারপর কোন কিছু না বলে বোনটাকে ডেকে নিয়ে ওদের বাড়ীর দিকে চলে গেল। আমি বোকার মত ওদের চলে যাওয়ার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। লোহার গেট দেওয়া বাড়ীটার ভেতর ওরা ঢুকে যেতেই আমি কেমন হতাশ হয়ে গেলাম। লজ্জার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। কাঁদুনিকে বললাম, 'চল্, ঘরে যাই।' কাঁদুনি ওসব বোঝে না। সে বলল, 'দাদা, মেয়েটার চুলগুলো খুব সুন্দর না?' আমি তার কোন জবাব দিলাম না। আপন মনেই বললাম, 'বড্ড অহংকারী, চল্।'

ওদের ওপর এক অপরিসীম ঘৃণায় এর পর আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে থাকত। সুযোগ খুঁজতে আরম্ভ করলাম, কিভাবে এর শোধ নেওয়া যায়। এই সময় আমি একদিন আশ্চর্যজনক ভাবে আবিষ্কার করলাম। আমাদের বেড়া-দেওয়া বাগান বাড়ীটার বাইরে একটা বস্তি আছে। সেখানে আমাদের

বয়েসী অনেক ছেলে মেয়ে। আমাদের চেয়েও গরিব তারা। আমাদের চেয়েও অসহায়। কেমন বোকা বোকা চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর বস্তির রাস্তায় গুলি খেলে। আমি একদিন ওদের দলে সগর্বে ভীড়ে গেলাম। ওরাও আমাকে রাতারাতি গুরু করে নিল। আমার আদেশ তারা নতমস্তকে মেনে নেয়। আমিও ইচ্ছামত হুকুম করি, ওদের শাস্তি দিই। বাড়ীঅলার ছেলের কাছে পাওয়া অপমানটা ওদের ওপর পুষিয়ে নিই। আমার হাত একসময় দাদুর হাত হয়ে ওঠে।

একদিন বাবার কাছে খুব বকুনি খেলাম বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মেশার জন্ত। ওদের কাছে আমার যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। আবার আমি একা হয়ে গেলাম। রোজ সেই বুড়ির কাছে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই। বাড়িঅলার ছেলে মেয়েরা রোজ বাগানে বেড়াতে আসে, আর আমি ও কাঁদুনি চুপচাপ বাওয়ার দাঁড়িয়ে দেখি।

এই সময়ে একদিন ঘটনাটা ঘটল। ঘটল কাঁদুনির বোকামির জন্তেই। বাড়ীঅলার লোক সামনের পুকুরটায় মাছ ধরতে এসেছে। ছেলেমেয়ে দুটোও এসেছে। দু-চারটে যা মাছ ওঠে, ছেলেটার হাতে-ধরা থলেতে তা ভরে দেয়। লোকটা ঘুরতে ঘুরতে আমাদের দিকটায় এলো। ছেলেমেয়ে দুটোও এলো। আমরা খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। কাঁদুনি হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমার দাদুর এত বড় বড় দুটো জাল আছে।' বলতেই ওরা আমাদের দিকে এক চোখ অবজ্ঞা নিয়ে তাকাল এতে আমার রাগ হয়ে গেল আরো। বলে ফেললাম, 'ধুৎ, এরা জাল ফেলতেই জানে না। আমি এর চেয়ে আরো ভালো ফেলতে পারবো বোধহয়।'

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন হো-হো শব্দ করে হেসে উঠল যে আমি মাটিতে যেন মিশে গেলাম। অমন ঠাট্টার হাসি বোধহয় শয়তানেও হাসতে পারে না। আমার মনে হল, যেন ওরা ওদের জালটা আমাদের দু-ভাইবোনের ওপরে ফেলল। তারপর টেনে গুটিয়ে নিয়ে থলেতে ভরে ফেলল। হয়ত অন্যসব মাছের সঙ্গে ভেজে খাবে।

মাথা নিচু করে ওখান থেকে চলে এলাম। রাগে অভিমানে কান্না পেতে থাকল। দাদুর ওপর ভীষণ রাগ হল। আজ যদি থাকত।

সন্ধ্যেবেলা বাবা অফিস থেকে ফিরলে, ঘটনাটা সাহস করে বাবাকে বলে ফেললাম। বাবা সব হজম করে নিয়ে বলল, 'বলুক গে, ওদের কাছে আর

যাস না।'

—'দাদুর জাল দুটো আনলে বেশ হত, না বাবা? দেখিয়ে দিতাম আমরাও জাল ফেলতে পারি।'

—'ওদের পুকুরে কেন ওরা জাল ফেলতে দেবে বাবা?' বাবা বলল।

আমারও হঠাৎ খেয়াল হল তাও তো বটে। ওদের পুকুরে ওরা জাল ফেলতে দেবে কেন। কিন্তু আমি আর হারতে চাইছিলাম না। আন্‌তাবড়ি বলে ফেললাম, 'হুঁ, নাইবা দিল। জাল ফেলার আবার জায়গার অভাব!' হঠাৎ, কেন জানিনা, পাশের বস্তির ছেলেগুলোর কথা মনে পড়ল আমার।

কিন্তু সত্যি সত্যি-ই আমি একদিন বাড়িঅলার অহংকারী ছেলেটার ওপর জাল ফেললাম। আমাদের ভাড়াঘরের সামনে দুটো বাঁশ টাঙিয়ে দড়ি বেঁধে আমরা কাপড়চোপড় রোদে দিতাম। একদিন বাড়িঅলার ছেলেটা একটা বাঁশ ধরে নাড়তে নাড়তে বাঁশটা আলগা করে দিল। আর, ভিজে কাপড়ের ভারে বাঁশটা পড়ে গেল। অমনি আমার প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল। এতদিনের অপমানের শোধ নেওয়ার একটা সুযোগ এসে গেল। আমি ছুটে গিয়ে ছেলেটার গালে ঘাড়ে আচ্ছা করে চড় মারতে শুরু করে দিলাম। তার ফরসা গাল টকটকে হয়ে গেল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছেলেটা উচ্চস্বরে কান্না জুড়ে দিল। তারপর ছুটতে ছুটতে লোহার ফটক দেওয়া বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

আমার মা শহরে এসে খুব ভীতু হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি আমাকে গিয়ে ধরল। কান মলে দিয়ে, খুব বকুনি দিল। দাদুর হাতটা আচমকা আমার হাত ঘুরে মায়ের হাতে চলে গেল। সব খুপরি থেকেই মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে এই ঘটনায় তাদের মুখ থমথমে, যেন একটা ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ্য করছে তারা।

ঝড় সত্যি সত্যিই উঠল। সেদিনই সন্ধ্যেবেলা বাবা অফিস থেকে ফেরার একটু পরেই বাড়িঅলা এসে বাবাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিল। আমার নামে যা-তা বলল। এবং অবশেষে বাড়ি ছাঁড়ার নোটিশটা এগিয়ে দিল, 'বলল, একমাসের মধ্যে আমার ঘর আপনি ছেড়ে দিন। নইলে কোনদিন আমার ছেলেকে ঐ গুণ্ডাটা মেরেই ফেলবে।'

আমি গুণ্ডা কিনা জানিনা। ওকথা শুনে আমার কোন প্রতিক্রিয়া হবার আগে বাড়িঅলার নোটিশ এগিয়ে দেওয়া হাতটার দিকে তাকাতেই, আমি যেন একটু শিউরে উঠলাম। অবিকল দাদুর হাত!

এমন ঘটনার পর যা প্রত্যাশিত তাই ঘটল। বাড়িঅলা চলে যাবার পর বাবার হাতে খুব মার খেলাম। বহুনি খেলাম। কাঁদতেই হল। আমার কান্না দেখে কাঁদুনিও কাঁদতে শুরু করে দিল। সব মিলিয়ে বাবা ঘরটাকে একটা ছোট ডোবা বানিয়ে দিল, যেমন আমার দাদু করত। ছোট কোন ডোবায় দাদু জাল ফেলে ফেলে সেখানকার মাছগুলোকে অস্থির করে তুলত। ঠিক তেমনি।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, বাবা এখন রোজ বাড়ি খুঁজে হয়রাণ হচ্ছে এবং পাচ্ছে না। অথচ আর নাকি কটা দিন বাকী আছে এ ঘর ছেড়ে দিতে। এর মধ্যে একটা হিল্লে না হলে, আমরা যে কোথায় যাবো তা খুব চিন্তার কথা। রোজই বাবার দীর্ঘশ্বাস শুনি, আর আমার অনুতাপ হতে থাকে। কেন যে আমি এ বোকামিটা করতে গেলাম! আমি একটু শান্ত থাকতে পারলে হয়ত বাবাকে এমন দুশ্চিন্তায় পড়তে হত না। ইতিমধ্যে আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছি। এখনো সেই মাষ্টারের কাছে পড়তে যাই। কিন্তু কিছুই আমার ভালো লাগেনা। পড়তে ইচ্ছে করে না, ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করেনা, আবার ঘরে বসে থাকতেও ইচ্ছে করে না। বাবা মায়ের মুখের দিকে তাকালে কেমন ভয়ভয় করে। খুব ইচ্ছে করে আবার আমাদের সেই পুরনো গাঁয়ে ফিরে যাই।

এর মধ্যে বাবা একদিন অফিস থেকে খুশী-খুশী মন নিয়ে ফিরে এল। আমি বাবার মুখ দেখেই বুঝলাম, আজ বাবা ঘর ঠিক করে এসেছে। তাই বাবার কাছে সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'বাবা, আজ ঘর পেয়েছ, না? আমারও আর একদম এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

বাবা গলায় বেশ উল্লাস ফুটিয়ে বলল, 'আর ঘর খুজতে হবে না বাবা। এক-মোক্ষম অস্ত্র পেয়েছি, এই ভাখ।' বলে বাবা হাতে করে-আনা দুতিনটে ফাইলের একখানা বের করে দেখাল। আমি কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে থাকলাম। মা বলল, 'অস্ত্রটা কি তাই বল।'—বাড়িঅলার নামের এই ফাইলটা আমার টেবিলে এসেছে। আমি ইচ্ছে করলে এখন···

বাবা ইচ্ছে করলে কি হবে সেটা না বললেও আমি বুঝতে পারি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি বাবার মুখে দাদুর মুখের আদল দেখতে থাকি। এই মুহূর্তে বাবার হাত যেন দাদুর হাত। সে হাতে জালের রশির ফাঁস আটকানো। জালের ভেতর বাড়িঅলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে।

আশ্চর্য, পৃথিবীর সব মানুষের হাত কেন যে এমন নিপুণভাবে যখন তখন দাদুর হাত হয়ে ওঠে।

# সান্ত্বনা

শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য

পাশে শুয়ে সান্ত্বনা কেতকীদির কথা বলছিল। ইদানীং কেতকীদির কথাটা প্রায়ই শুভেন্দু শোনে সান্ত্বনার মুখে।

কেতকীদির বয়েস সান্ত্বনার মতোই। বড়জোর দু একবছর বড় হতে পারে। পাশের ফ্ল্যাটেই থাকেন। সান্ত্বনার সঙ্গে ওর আলাপ বেশীদিনের নয়। গতবছর পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পথে ওই-ই প্রথম হেসে কথা বলেছিল সান্ত্বনার সঙ্গে। পাশাপাশি ফ্ল্যাট, অথচ পরস্পরের সঙ্গে কোনদিন কথাবার্ত্তা নেই। এ ভারী অন্যায়—কেতকী অনুযোগ করেছিল। তারপর থেকেই সান্ত্বনার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে। সমবয়সী হলেও ওরা দুজন দুজনকে ডাকার সময় নামের সঙ্গে একটা অহেতুক 'দি' যোগ করে নিয়েছে। তাই শুভেন্দুও ওকে কেতকীদি বলতে অভ্যস্ত। কেতকীর স্বামীর সঙ্গে শুভেন্দুর কোন আলাপ হয় নি আজ পর্য্যন্ত। ভদ্রলোক যে কি করেন, শুভেন্দু আজও তা জানে না। ছুটির দিন ছাড়া তাকে দেখাই যায় না। সব ছুটির দিন বাড়ীতে থাকেন না। ভোর হতেই বেরিয়ে পড়েন মোটর বাইক নিয়ে। পেছনে বসে কেতকীদি তার ডান হাতে স্বামীকে জড়িয়ে থাকে। মোটর বাইকটা সারা পাড়া কাঁপিয়ে চলে যায়। দৃশ্যটা সান্ত্বনা আর শুভেন্দু প্রায়ই দেখে।

আজ ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই শুভেন্দুর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। পাশে সান্ত্বনা তখনও ঘুমিয়ে। সান্ত্বনার বাঁদিকে শুভেন্দু আর ডানদিকে দীপা এবং পলু। সবাই তখনও ঘুমোচ্ছে। আলতো করে কাছে টেনে নিতেই আচমকা সান্ত্বনার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ঘুমচোখে একবার শুভেন্দুর দিকে তাকালো। তারপর শুভেন্দুর বুকে মাথা রেখে চুপ করে পড়ে রইল।

হঠাৎ মোটরবাইকের বিশ্রী আওয়াজটা কানে এলো। শুভেন্দুর বুক থেকে একটু মাথা তুলে সান্ত্বনা বললো—কেতকীদিরা বেড়াতে চললো। ওদের আজ বিয়ের তারিখ। ডায়মণ্ডহারবার যাবে। কোন হোটেলে থাকবে। খাওয়াদাওয়া করবে। আর মোটরবাইকে চড়ে সারা দিন ঘুরে বেড়াবে। গতকাল কেতকীদিই

এসব খবর সান্ত্বনাকে দিয়েছে।

শুভেন্দু চুপ করে শোনে। সান্ত্বনার মনের আকাশটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ওদের দশবছরের বিবাহিত জীবনে এমন বিয়ের তারিখ কয়েকবারই এসেছে। কিন্তু বেড়ানো তো দূরের কথা, একটা সামান্য উপহার পর্যন্ত সান্ত্বনার হাতে সে তুলে দিতে পারে নি। তাই সাতসকালে কেতকীদির কথা শুনে অসহায় মনটা ব্যথায় একটু ভারী হয়ে উঠলো।

শুভেন্দু ভাবে, কেতকীদিরা এতক্ষণে অনেকদূর চলে গেছে। মোটরবাইকে ওদের দুজনের বসার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসে। প্রায়ই পথে ঘাটে ছুটির দিন শুভেন্দু ওদের দেখেছে। কেতকীদির বয়েস হয়েছে, তবু কি নিটোল স্বাস্থ্য। যৌবন যেন উপচে পড়ে। তার ওপর যে ভাবে জামাকাপড় পড়ে, সাজে গোজে তাতে ওকে আরও আকর্ষণীয় মনে হয়। পয়সার স্বচ্ছলতা নিশ্চয়ই আছে, ওদের দেখলেই সেটা বোঝা যায়। চিন্তাভাবনা নেই—তাই এই বয়সেও নিজেকে অমন সুন্দর অটুট রাখতে পেরেছে।

'অনেক বেলা হল, এবার ওঠো'—সান্ত্বনার কথায় শুভেন্দুর সম্বিত ফিরে এল। দীপা পলু এখনও ঘুমোচ্ছে। শুভেন্দু ইচ্ছে করেই ওদের ডাকলো না। আজ ছুটির দিন। যতটা পারে ওরা ঘুমোক।

পুবদিকের জানালাটা খুলে দিতেই মিষ্টি রোদের ঝলক সমস্ত ঘরটা আলোয় ভরিয়ে তুললো। শীত এখনও বেশ জাঁকিয়ে বসেনি। সবে উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। হিমেল হাওয়ায় শীতের আমেজ। পাশের বাগানটায় শিউলি গাছে সবে কুঁড়ি ফুটতে শুরু করেছে। শুভেন্দু গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে চেয়ারটা নিয়ে জানালার ধারে বসলো।

কেতকীদির ফ্ল্যাটটার দিকে তাকালো শুভেন্দু। জানালাদরজা সব বন্ধ। সারা দিনটাই আজ এই ভাবে বন্ধ থাকবে। তারপর হয়তো গভীর রাতে ওদের মোটর বাইক আবার রাতের স্তব্ধতা ভেঙে বাড়ীর দরজায় এসে স্তব্ধ হয়ে যাবে। একদিন ছিল, যখন শুভেন্দুও স্বপ্ন দেখতো—ঠিক ওদের মতোই আনন্দে ঘুরে বেরিয়ে জীবন কাটাবে। তখন স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগতো। এখন ওর ভয় করে। ওসব চিন্তা সযত্নে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। সান্ত্বনার কথা মনে আসতেই নিজেকে কেমন দুঃখী, অপরাধী মনে হয়। সান্ত্বনাকে ও কিইবা দিতে পেরেছে। তবু শুভেন্দুকে বিয়ে করে ভুল করেছে একথা সান্ত্বনা একবারও ভাবে না। ভাবতে পারে না। পুরনো জীবনটার কথা যখন ভাবে তখন কেমন যেন হাসি

পায়। সংসারে অভাব জিনিষটা কি তার পরিচয় সান্ত্বনা আগে কখনও পায়নি। বড়লোকের মেয়ে। বাবা কাষ্টমসের অফিসার। দাদা ডাক্তার। সুতরাং স্বচ্ছলতার মধ্যেই সে মানুষ হয়েছে। স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে ভর্তি হবার পরই জীবনের চাকাটা গেল ঘুরে। শুভেন্দু ছিল সান্ত্বনার এক বন্ধুর গৃহ-শিক্ষক তখনও চাকরী পায় নি শুভেন্দু। বি. কম পাশ করে নানা জায়গায় চাকরীর দরখাস্ত আর টিউশনি করেই কাটছিল। শুভেন্দুর বাবা-মা অনেক আগেই মারা গেছেন। দাদা বৌদির সংসারে টিউশনির টাকাটা খোরাকি হিসাবে তুলে দিতে হোত। সেই অবস্থায় বন্ধুর বাড়ীতেই শুভেন্দুর সঙ্গে সান্ত্বনার আলাপ। তারপর কোথা থেকে কি যেন হ'য়ে গেল। আস্তে আস্তে ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়লো ওরা। দুজনের বাড়ী থেকেই আপত্তি এসেছিল। কিন্তু ততদিনে ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ওরা বিয়ে করলো। বিয়ের ঠিক পরেই শুভেন্দু সরকারী অফিসে চাকরীটা পেয়েছে। সান্ত্বনার বরাতেই শুভেন্দুর চাকরী—একথা শুভেন্দু আজও বলে থাকে।

সেই থেকে কালের স্রোতে ভেসে চলেছে ওদের জীবন। সংসার বড় হয়েছে। দীপা এবং পলুকে নিয়ে এখন ওরা সংসারে চারটি প্রাণী। দীপার বয়েস আট আর পলু অর্থাৎ পল্লব পাঁচ পেরিয়ে সবে ছ'য়ে পড়েছে। এদের নিয়ে সান্ত্বনা সুখেই আছে। অভাব অনটন যতই থাক্ শুভেন্দুকে পেয়ে সান্ত্বনা নিজেকে সুখীই মনে করে।

অথচ, নিজেকে শুভেন্দুর কেমন যেন অপরাধী মনে হয়। যখন কেতকীদির কথা শোনে তখনই ভাবে, সান্ত্বনাকে নিয়ে ঠিক ওইভাবে রোজ না হোক্ মাঝে মাঝেও তো বেরিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সামান্য কেরানীর কাজ করে এই দুর্দিনে সংসার চালিয়ে কিছুতেই সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাড়ী আর অফিস অফিস আর বাড়ী—জীবনটা এই ভাবেই কেটে চলেছে।

সেই শুভেন্দু একদিন সকাল সকাল অফিস থেকে বাড়ী ফিরে সান্ত্বনাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলো। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল সান্ত্বনার। বিয়ের পর প্রথম কয়েকবছর অফিস যাবার আগে এবং অফিস থেকে ফিরেই ঠিক এই-ভাবে পাগল হয়ে উঠতো। বুকে জড়িয়ে চুম্বনে চুম্বনে সারা মুখ ভরিয়ে তুলতো। কি একটা নেশায় যেন নিজেদেরকে সাময়িক ভাবে ভুলে যেত। তারপর ছেলেমেয়ে সংসারে আসার পর শুভেন্দুর সেই পাগলামিটা অনেক কমে গেছে।

হয়তো ছেলে মেয়ে দেখে ফেলবে এই লজ্জায়। সান্ত্বনা আজ একটু আশ্চর্যই হয়ে গেল। ভাগ্যিস্ দীপা পলু নেই। ওরা সামনের বাগানটায় এখনও খেলছে।

সান্ত্বনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শুভেন্দু ঠিক সেই আগের মতোই চুমু খেল। বহুদিন পর সান্ত্বনার সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। নিজেকে সামলে নিল। মুখে চোখে কপট রাগ মেখিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো—'কি ব্যাপার বলতো? সাতসকালে অফিস থেকে এসে পাগলামী শুরু করলে কেন?' শুভেন্দু হাসতে থাকে।

এবারের বিয়ের তারিখটা শুভেন্দু বৃথা চলে যেতে দেবে না। বিধাতার কৃপায় সান্ত্বনার দৌলতে বেশ কিছু টাকা যখন হাতে পাওয়া গেছে তখন আর সকলের মতো শুভেন্দুও অন্ততঃ বিয়ের তারিখটায় সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সংসারের চার দেয়ালের এই বদ্ধ গণ্ডী থেকে। টাকা পাওয়ার কথাটা শুভেন্দু এখনও সান্ত্বনাকে বলেনি। শুভেন্দুর ইচ্ছে, অতোগুলো টাকা সান্ত্বনার হাতে হঠাৎ দিয়ে ওকে চমক লাগিয়ে দেবে।

সান্ত্বনারও মনে পড়ে গেল, কাল ওদের বিয়ের তারিখ। কত বিয়ের তারিখই তো ওদের হেলায়ফেলায় চলে গেছে। তাই বিশেষ করে বিয়ের তারিখটা এখন আর ওর মনে পড়ে না।

'কাল আমরাও বিয়ের তারিখটা ঘরে বসে কাটাব না—বাইরে ঘুরে বেরিয়েই কাটাবো, বুঝলে রাণী?' শুভেন্দুর কথায় সান্ত্বনার চোখ দুটো কেমন খুশীতে ভরে উঠলো।

'কোথায় আর যাবে? যেতে গেলেই তো আবার অনেক খরচ। মাসের শেষে.....' কথাটা শেষ করতে দিল না শুভেন্দু। সান্ত্বনার কথাগুলো ঠিক এই মুহূর্তে বড় বেশী রূঢ় মনে হোল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো, না সান্ত্বনার কোন দোষ নেই। টাকাগুলো না পেলে শুভেন্দুও কি মাসের শেষে এইভাবে বিয়ের তারিখটাকে স্মরণ করতে পারতো?

সান্ত্বনাকে খরচের কথা বলতে দেয়নি শুভেন্দু। পকেট থেকে কড়কড়ে দশখানা একশ টাকার নোট বার করে সান্ত্বনার চোখের সামনে বিছানার উপর ফেলে দিয়েছে। সান্ত্বনা বিহ্বল হয়ে শুধু শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

পরে অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বললো শুভেন্দু।

গত মাসে অফিসের এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একটা লটারীর টিকিট কিনতে

হয়েছিল শুভেন্দুকে। এর আগেও মাঝে মধ্যে দু একখানা টিকিট কিনতো। কিন্তু সান্ত্বনার কথা শুনে ইদানীং আর কিনতো না। সান্ত্বনার দৃঢ় বিশ্বাস, ওদের কপালে টিকিট কোনদিনই লাগবে না। বরং সেই টাকায় কিছু খেলে শরীরের কাজ হবে। তাই শুভেন্দু ওপথে আর যেত না। কিন্তু সেদিন এক রকম বাধ্য হয়েই টিকিটটা ওকে কিনতে হয়েছিল। অফিসের মধ্যে এক মহিলা টিকিট বিক্রী করতে এসেছিলেন। অন্যান্য বন্ধুরা কিনেছিল। জোর করে ওরাই শুভেন্দুর ঘাড়ে একটা টিকিট চাপিয়ে দিয়েছিল। নানা কাজের মধ্যে সান্ত্বনাকে সে কথা বলতে শুভেন্দু একেবারে ভুলেই গেসলো। আজ সকালে অফিসে যেতেই হৈ-হৈ করে বন্ধুরা ধরলো শুভেন্দুকে। ওর নাম্বারে প্রাইজ উঠেছে। প্রথমে বিশ্বাস করেনি শুভেন্দু। শেষে লিষ্ট দেখে সত্যিই ও আশ্চর্য হ'য়ে গেল। একটুর জন্যে প্রথম পুরস্কারটা ওর হাতছাড়া হ'য়ে গেছে। শুধু সিরিজের পার্থক্য। তাই এক হাজার টাকার সান্ত্বনা পুরস্কার' শুভেন্দু পাবে। টিকিটটা ওর ছোট্ট পার্সের মধ্যেই ছিল। তাড়াতাড়ি বার করে বেশ কয়েকবার নাম্বারটা লিষ্টের সঙ্গে মেলাল শুভেন্দু। অফিসের কাজ ছেড়ে বন্ধুরাই ওকে হেড অফিসে নিয়ে গিয়ে কড়কড়ে দশখানা একশ টাকার নোট ওর হাতে তুলে দিল। টাকা-গুলো পেয়েই শুভেন্দু আর অফিসে না ফিরে সোজা বাড়ী চলে এসেছে। আজ আর অফিস করার মতো ওর মনের অবস্থা নেই। সান্ত্বনাকে খবরটা না দেওয়া পর্যন্ত শুভেন্দুর মনটা ছটফট করছিল।

শুভেন্দু ভাবে, সান্ত্বনার বরাতে যেমন ওর চাকরী হয়েছে, তেমনি আজকের এই পুরস্কারও সান্ত্বনার জন্যেই পেয়েছে। নামের কি অদ্ভুত মিল। সান্ত্বনার জন্যেই 'সান্ত্বনা পুরস্কার'।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে শুভেন্দু যেন কিছুক্ষণ জেগে রইল। চোখে যেন আজ আর ঘুম আসছে না। অতোগুলো টাকা নিয়ে শুভেন্দু যেন মহাচিন্তায় পড়েছে। যে কটা টাকা ধার হয়ে গেছে সেগুলো আগে মেটাবার কথা সান্ত্বনা ওকে বলে দিয়েছে বার বার। দীপা পলুর তেমন কোন ভাল জামা-প্যান্ট নেই। তাই ওদের দু একটা জামা প্যান্ট ক'রে দিতেই হবে। আর যার জন্যে টাকাটা পাওয়া সেই সান্ত্বনাকে বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এবারে বিয়ের তারিখে ওর মনের মতো একটা ভাল শাড়ী কিনে দেবে শুভেন্দু। নিজের কথা শুভেন্দু এখন আর চিন্তা করে না। সখ-আহ্লাদ সব ধুয়ে মুছে শেষ হ'য়ে গেছে অনেক-দিন। বিয়ের প্রথম প্রথম একটা ভাল স্যুট করাবার ইচ্ছে ওর মনকে বার বার

নাড়া দিত। তা আর এ পর্যন্ত করা ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখন সেই ইচ্ছে মন থেকে অনেকদিন চলে গেছে শুভেন্দুর। এমন যা কিছু চিন্তা সব দীপা পলু আর সান্ত্বনাকে ঘিরে।

শেষে সব চিন্তা ভাবনা ঝেড়ে ফেলে শুভেন্দু ঠিক করে ফেললো, সকাল হলেই সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরবে। দীপা পলু এখন আর খুব ছোট নেই। ওদের কোথাও কোনদিন নিয়ে যেতে পারেনি শুভেন্দু। ছুটির দিন রাস্তায় কতদিন শুভেন্দু দেখেছে, ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে কত মানুষ সারাটা দিন নানা জায়গায় বেড়িয়ে কেমন আনন্দ করে বাড়ী ফিরছে। ওদের চিরদিন শুভেন্দু দেখেই এসেছে। নিজের জীবনে সে রকম দিন কখনো আসেনি।

পরের দিন খুব ভোর-ভোর শুভেন্দু বেরিয়ে পড়লো সকলকে নিয়ে। দীপা পলুর জীবনে এই প্রথম। ওদের খুশী-খুশী মুখটা দেখে শুভেন্দুর মন এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে উঠলো। বহুদিন পর সংসারের গণ্ডী থেকে বাইরে একটু বেরোতে পেরে সান্ত্বনাও খুশী।

সেদিন সারাটা সকাল ছুপুর ছু গার্ডেনের চারিদিক ঘুরে বেরিয়ে কাটিয়ে দিল। ছুপুর গড়িয়ে বিকেল পড়তেই শুভেন্দু সেখান থেকে বেরিয়ে যাদুঘরটা দেখিয়ে ঠিক সন্ধ্যের মুখোমুখি এসে বসলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের নরম সবুজ ঘাসের বুকে। সারাটা দিন এমন ভাবে কোনদিন কাটায়নি সান্ত্বনা। বেশ ক্লান্ত হয়েই পড়েছিল। নরম ঘাসের বুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো সান্ত্বনা। দীপা পলু তখন ঘাসের বুকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সান্ত্বনা শুয়ে সামনের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল—প্রকাণ্ড আকাশটা একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে রয়েছে সান্ত্বনার চোখের সামনে। ঘরের বাইরে এসে সান্ত্বনা এই প্রথম উপভোগ করলো—আকাশটা কি বিরাট, কি সুন্দর মিষ্টি হাওয়া। চারদিকে এমন প্রাণ খোলা পরিবেশ। শুভেন্দু তাকিয়ে দেখছে সান্ত্বনাকে। ভারী সুন্দর লাগছে। স্যাম্পু করা চুলগুলো হাওয়ায় উড়ে বার বার সান্ত্বনার টানা টানা চোখ ছুটোকে ঢেকে ফেলছে। সান্ত্বনাও আজ কেতকীদির মতো সাদা স্লিভলেস ব্লাউজ পরেছে। কালো সিল্কন জর্জেট শাড়ীর সঙ্গে সাদা ব্লাউজ—ভারী সুন্দর মানিয়েছে। ছুটো সন্তানের মা হয়েও ওর চেহারা এতটুকু টস্‌কায়নি। সে তুলনায় সন্তানহীনা কেতকীদির চেয়ে সান্ত্বনা অনেক বেশী সুন্দরী।

পলু আর দীপার ঘুমের সময় হ'য়ে আসছে। সান্ত্বনা উঠে পড়লো।

খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ী ফিরতে হবে।

অনেক ভেবে চিন্তে শুভেন্দু চৌরঙ্গীর মেট্রোর পেছনে একটা বড় রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলো। ছোট্ট একটা কেবিনে বসে সকলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবে। কিন্তু রেস্তোরাঁর ভেতরে খালি কেবিন পেল না। লাইন দেওয়া সারি সারি ছোট খুপরিগুলোতেও পর্দা ঝুলছে। কতক্ষণ সময় আর অপেক্ষা করবে। শেষে বাধ্য হ'য়েই কেবিনের বাইরেই বসতে হল। চারটে চেয়ার চারপাশে সাজিয়ে ওরা একটা টেবিলে বসলো।

খেতে খেতে হঠাৎ সান্ত্বনা যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। ওকে কিছু অন্যমনস্ক মনে হোল শুভেন্দুর, খাবার ফেলে বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে অসম্ভব ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। শুভেন্দু ভীষণ অবাক হয়ে গেল। এর মধ্যে এমন কি ঘটলো যাতে সান্ত্বনার এই মানসিক পরিবর্তন। শুভেন্দুকে ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুললো। শুভেন্দু জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, সারাদিন ঘুরে তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? সান্ত্বনা ঘাড় নাড়লো—'না না, তা নয়। অনেক রাত হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী চলো।' শুভেন্দু বিল পেমেন্ট করে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল।

ভিড় বাসে ট্রামে উঠতে ইচ্ছে করছিল না শুভেন্দুর। সারাদিনের আনন্দটা যেন কেমন ক্যাকাসে হ'য়ে গেল। ইচ্ছে ছিল যাবার সময় সান্ত্বনার জন্যে একখানা শাড়ী কিনবে। কিন্তু সান্ত্বনা কিনতে দিল না। বললো—'লক্ষ্মীটি তুমি বরং কাল অফিস থেকে আসার সময় তোমার মনের মতো একখানা শাড়ী কিনে এনো। এখন আর নয়। বাড়ী চলো।'

ট্যাক্সিতে বসেই সান্ত্বনা যেন কেঁদে উঠলো। শুভেন্দুর কাছে মুখটা নিয়ে বললো, 'কোন মানুষের বাইরেটা দেখে ঠিক চেনা যায় না, তাই না?' শুভেন্দু চুপ ক'রে ছিল। মনটা আজ ওর ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে সান্ত্বনার শেষের কাণ্ডকারখানায়। সান্ত্বনা হয়তো শুভেন্দুর মনের সেই ভাবটায় ছোঁয়াচ পেল। বললো, 'তুমি হয়তো রাগ করছো আমার ওপর, এত তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম বলে। কিন্তু কেন এসেছি জানলে আর একটুও রাগ করতে না।' শুভেন্দুকে এবার কথা বলতেই হোল। জিজ্ঞেস করলো 'কি কারণ বলো?' সান্ত্বনা বললো, 'কেতকীদিকে দেখলাম। তাই ভয়ে চলে এলাম।' খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো শুভেন্দু 'ভয়? কেন? কোথায় দেখলে কেতকীদিকে? দেখলেই যখন তখন ডাকতে পারতে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠে সান্ত্বনা

বললো, 'কখনো না। ওর সঙ্গে কোনদিন আর কথা বলব না। তুমিও না।'

রাত্রের বিছানায় শুয়ে সান্ত্বনা শুভেন্দুকে বললো, 'কেতকীদির চরিত্র ভাল নয়।' শুভেন্দুর তন্দ্রাটা হঠাৎ কেটে গেল। রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো. 'কেমন করে বুঝলে?' সান্ত্বনা বললো—'আমাদের সামনের কেবিনেই কেতকীদি ছিল। বেয়ারা যখন খাবার দিতে ঢুকছিল পর্দাটা একটু সরে গেললো। আর সেই ফাঁকেই আমার চোখ পড়লো ভেতরে। কেতকীদির সঙ্গে কেতকীদির স্বামী নয় একজন লোক ডান হাত দিয়ে কেতকীদিকে জড়িয়ে ধরে আছে। কেতকীদির শাড়ীটা বুক থেকে খসে পড়েছে। কথাগুলো বলে সান্ত্বনা চুপ ক'রে গেল। শুভেন্দুর চোখের সামনে কেতকীর মুখটা ভেসে উঠলো।

'তাই তুমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলে ওখান থেকে?' শুভেন্দু জিজ্ঞেস করলো। 'ঠিক তাই। পাছে দীপা পলু ওই দৃশ্য দেখে ফেলে।' সান্ত্বনা বলে উঠলো।

শুভেন্দু মনে মনে ভাবলো, শুধু কি দীপা পলু, না তার সঙ্গে সে নিজেও?

# মুমুক্ষা

অমিয় চৌধুরী

মুহূর্ত কয়েক আগেও কিছু আলো ছিল। সেই বিবর্ণ আলোতেও আমি বাইরের দিকে একটু তাকিয়ে কিছু কিছু দৃশ্যাবলী দর্শনার্থে ঈষৎ উন্মুখ হয়েছিলাম, সন্দেহ নেই। আমি দেখেছিলাম, আকাশে কোন মেঘ লালচে ডানায় ভর দিয়ে উড়ে যায়নি। অথবা আমার দেখায় কোথাও ভুল ছিল। এমনও হতে পারে, ঈশান কোণে, দূরে, অনেক দূরে যেখানে আকাশ ও পৃথিবীর সীমারেখা লুপ্ত প্রায়, বা অন্তভাবে আকাশের নরম ঠোঁট গভীর আশ্লেষে মাটির বুকে চুম্বন এঁকে দেয়, সেই মিথুন-অবসন্ন কোন মুহূর্তে কিছু ধূম্র মেঘ কৃষ্ণ উত্তরীয় গায়ে জড়িয়ে শিকারী বেড়ালের মত অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিল। আমি দেখতে পাইনি।

আমি তাকিয়েছিলাম অবেলার ম্লান আলোর দিকে। বাইরে, আমার কাঠের জানলার ওপারে, ডুমুর গাছের বড় বড় পাতায় সে আলো হলুদ হাসিতে মর্মান্তিক ভাবে করুণ মনে হচ্ছিল। অথচ আমি যেন তা বুঝতে পারছিলাম না। সামনের মাঠে ছোট ছোট ঘাস আমার ভাল লাগছিল। সামনের বাড়ীর এক চিলতে বাগানে রকমারি ফুলের দুর্বোধ্য সংলাপ আমাকে আনন্দ দিচ্ছিল। আমার বাসা থেকে কয়েক ফার্লং দূরে চৌকোণা মাঠে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শব্দময় ক্রীড়া, বলা বাহুল্য, আমাকে যুগপৎ পুলকিত ও কৌতূহলী করে তুলছিল। এই সময় সুখস্পর্শ মন্দ-মন্দ সমীরে এদিকে ওদিকে খেয়াল খুশিমত বেরিয়ে-টেরিয়ে আসার কথাও আমি দিব্যি ভাবতে পারছিলাম।

অথচ এই মুহূর্তে আমি এক গভীর অন্ধকারে বসে আছি। নিঃশব্দে নয়, দারুণ এক শব্দ করে, বলা যায়, আঁকাশ কাঁপিয়ে, বাতাস নাড়িয়ে, খটখটে মাটির বুকে ভয়ের শিহরণ ছড়িয়ে, শব্দময় অন্ধকার হুড়মুড় করে আমার ঘরে ঢুকল। যেমন করে হঠাৎ কোন বাঁধ ভেঙে গেল, না জানিয়ে, না শুনিয়ে, কাউকে না সতর্ক করে, ঘরে ঘরে বান ঢোকে, তেমনি করে। এখন এই ঘন অন্ধকারে পরিপূর্ণ একোষ্ঠে বসে আমার মনে হচ্ছে, আমার অস্তিত্ব শূন্যে ভাসমান। আমার রক্তে রক্তে ভাসমান, ক্ষত-বিক্ষত, বিপন্ন অস্তিত্ব প্রবল বেগে আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে,

আমি আহত দুঃসহ ও দুর্বিনীত হিমশীতলতায় ক্রমশঃ পাথর হয়ে আসছি। আমার মনে হচ্ছে, এই স্পর্শযোগ্য অন্ধকারে গুলিয়ে যেতে যেতে দুরন্ত বিনষ্টির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি এক কসিলে রূপান্তরিত হয়ে গেছি। সর্বাত্মক অন্ধকারে আমি এখন হারিয়ে যেতে বসেছি। আমার ইচ্ছার শরীরে এই স্থবিরত্বের চিহ্ন-গুলো একটি একটি করে উৎকট হয়ে উঠেছে।

আমি এই অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে কোনও এক সুরম্য ঘুমের স্বপ্নিল দেশে সেই শ্বেত প্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। অন্ধকার বনস্থলীতে নিঃসঙ্গ সেই শ্বেত পাথর নির্মিত প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ব। কড়া নাড়তেই আপনা আপনি দরজা খুলে যাবে। আমি ভেতরে ঢুকে দেখব আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদাভ্যন্তরে সব ঘর খোলা, যেখানে যেটি দরকার সেখানে সেটি থাকবে। দরজায় সিংহের মূর্তি থাকবে। দরজা পেরিয়ে ঝক্‌ঝকে উঠোনটুকু পার হয়ে দেখব, সেই ঝরনাটিকে। উলঙ্গ কোমর-ভাঁজ-করে দাঁড়িয়ে থাকা সিমেন্টের নারীমূর্তির মাথার ওপর গোল চাকতি বসান। চাকতির চার পাশ থেকে ফোয়ারার মত পরিশ্রুত জল ফিন্‌কি দিয়ে বেরুচ্ছে; সেই জল শরীরে মেখে গাছপালা-ফুল ফল ঝলমল করছে। হাসছে। ঘাড় নাড়ছে। বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যাবো। তারপর সেই কক্ষে প্রবেশ করে মহার্ঘ পালঙ্কে শয়ান যুবতীর রূপময় দিকে চোখ-ভর্তি বিমুগ্ধতা ও বিস্ময় নিয়ে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকব। ধীর পায়ে গিয়ে বসব তার পাশে। তারপর সোনার কাঠিটা তার বালিশের কাছ থেকে নিয়ে তার ঘুমন্ত মুখের ছোট্ট কপালে গভীর ভালবাসায় আলতো করে ছুঁইয়ে দেব। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ মেলে তাকাবে। আহা গো, কী অপরূপ দুটি চোখ। যেন অনেক যত্নে তৈরী চিলের ডানার মত দুটি ভ্রূর নীচে, দু-আঁজলা যমুনার জল, টল্‌টল্ করছে স্বপ্নের মত।

কিন্তু তেমন ঘুম আমার এলো না। স্বপ্নের মত যুবতী অঙ্গের ঘ্রাণ আমি বুক ভরে নিতে পারলাম না। অন্ধকারের তুমুল শব্দ আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে বিকার সৃষ্টি করল। আমার শিরায়-শিরায় এখন ছোট ছোট অগ্নি স্ফুলিঙ্গ মিশে যাওয়ার আমি বুঝতে পারছি না, কাঠ সাজিয়ে আগুন জেলে আমাকে কেউ চিতার ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিয়েছে কি না।

কাল রাত্রে সেই কালো বেড়ালটা এসেছিল। অতর্কিতে তাকে দেখে আমি

ভয়ে আঁৎকে উঠেছিলাম। এক বুক দুরু-দুরু ভয় নিয়ে আমার বিছানায় উঠে বসেছিলাম। আমার সমস্ত শরীর কল্-কল্ করে ঘামছিল। আমি দেখছিলাম, জানলার গরাদের ফাঁকে দু'টুকরো অঙ্গার যেন ধিকিধিকি জ্বলছে। গভীর অন্ধকারে সিগারেটের আগুনের মত। ভুরু কুঁচকে দেখতে দেখতে আমার শরীর শক্ত, অনড় হয়ে আসছিল। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। আমার কাছে এক নায়কীয় রহস্য বলে মনে হচ্ছিল। তারপর একটু একটু করে বুঝলাম। জানলার গরাদ বেয়ে যখন ঘরের ভেতরে ঢুকল। তার রেঁায়া-ফোলা ল্যাজের ইতস্তত: সঞ্চালনে বুঝলাম, চোখ দু'টো যার দু'টুকরো আগুনের মত ধিকধিক জ্বলছিল, সে একটা বেড়াল ছাড়া আর কিছু না।

বেড়ালটা ঘরে ঢুকে ঘাড় নেড়ে এদিক-ওদিক তাকাল। সম্ভবত: শিকারের প্রত্যাশায়। আমি যে একটা মানুষ, নি:শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা ওঠা নামা করছে এই মুহূর্তে আমি যে উঠে দাঁড়াতে পারি; উঠে দাঁড়িয়ে আমার তক্তপোষের তলা থেকে লোহার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে তাকে তাড়া করতে পারি. নাগালের মধ্যে পেলে লোহার ডাণ্ডার একটি আঘাতে তার কয়োটি ছাতু-ফুটো করে দিতে পারি, এমন ভয় বোধ হয় তার ছিল না। থাকলেও হয়ত সে আমার ঘাড়ের ওপর তার ধারাল নখর সমেত থাবার মুহুর্মুহু আঘাতে আমাকে সারা জীবনের জন্যে ধরাতলশায়ী করে দিতে পারে, সে সম্পর্কে সে নিশ্চিত ছিল।

দেখতে দেখতে সে তাই আমার দিকে এগিয়ে এল। প্রথমে আমার কোলের ওপর সামনের পায়ের একটা থাবা রাখল, আমার স্থবিরত্বে আসীন শরীরের এখানে ওখানে নাক লাগিয়ে শুঁকতে লাগল। আমার তখন সেই লোকটিকে মনে পড়ছিল! সেই লোকটি, যে একদিন এক অরণ্য পথে, এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এক হিংস্র ভল্লুকের সামনে পড়ে গেছিল। তার বন্ধু চট্পট্ উঠে পড়েছিল একটা গাছে। আর উপায়ান্তর না দেখে তাকে শুয়ে পড়তে হয়েছিল নিষ্প্রাণ শবদেহের মত, চীৎপাত হয়ে। কিন্তু কালো বেড়াল ভালুক নয়। সেই কথা ভাবতে গিয়ে আমি রীতিমত মরিয়া হয়ে ভাবছিলাম, গ্যাক করে আমি কালো বেড়ালটার গলাটা ধরে ফেলি।

কিন্তু তার আগেই খট্ করে শব্দ হল। সুইচ্ টিপে তৃপ্তি আলো জ্বাললো। প্রথম রাতে আমাকে এমন ভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে তৃপ্তি একটু অবাক হল। আমার অনন্তা তৃপ্তি।

'কি ব্যাপার, এই অন্ধকারে শুয়ে আছো যে।'

'এমনি শুয়ে আছি।'

'ক্লাবে যাওনি আজ তুমি?'

'না।'

'কেন?'

'মানসবাবু মারা গেছেন।'

'মানসবাবু, সে আবার কে?'

'মানসবাবুকে চেন না? সেই যে বেশ ভাল ফুটবল খেলেন।'

'কি হয়েছিল তার?'

'কিছুই হয়নি।'

'তাহলে?'

'খুন হয়েছে। আজ সকালে হঠাৎ ব্রীজের ধারে দেখা গেল, তাঁর রক্তাক্ত প্রাণহীন শরীরটা পড়ে আছে।'

কথাগুলো বলতে বলতে আমি যেন মানস নাথের রক্তাপ্লুত শরীরটা চোখের সামনে দেখতে পেলাম। পঁয়ত্রিশ বছরের একটা পুরুষ শরীর চোখে মুখে গলায় পেটে আর পিঠে সাতাশ-আঠাশটি ক্ষত চিহ্ন নিয়ে বীভৎস হয়ে উঠেছে। ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের মত। থকথক্ রক্ত মাখা মুখটা মনে পড়তে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দারুণ এক কম্পন সুরু হল। আমার চোখ মুখ নীল হয়ে গেল। আমার ঠোঁট দুটো থর্ থর্ করে একবার কেঁপে উঠে আবার থেমে গেল।

তৃপ্তি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি অমন করে কাঁপছ কেন?'

'আমার ভয় করছে তিপু।'

'ভয়! কিসের ভয়!'

'একটু আগে একটা কালো বেড়াল এসেছিল।'

'কালো বেড়াল!' কালো বেড়ালের নাম শুনে তৃপ্তি খিল-খিল করে হেসে উঠল। কানায় কানায় টল্-টল্ যৌবনময় তৃপ্তির শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন তরঙ্গ খেলা করতে লাগল। অন্যসময় হলে সে তরঙ্গ আমার বুকের উপকূলেও এসে ঠোক্কর খেত। আমি চন্‌মনে হয়ে উঠতাম। আমি খপ্ করে তৃপ্তির হাতটা ধরে ফেলতাম। ঝট্ করে একটা টান দিলেই হাসিতে লুটি লুটি তৃপ্তি বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ত।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, আমার মনে হচ্ছে, তৃপ্তির চারপাশ জুড়ে একটা ছায়া জমে উঠেছে। কালো জমাট বাঁধা ছায়া। তৃপ্তি যেন হাসতে হাসতে বীভৎস হয়ে উঠছে। তৃপ্তির হাত পাগুলো যেন আগুনের আঁচে পুড়ে পোড়াকাঠের মত হয়ে আসছে। তৃপ্তি হঠাৎ পাথরের মূর্তি হয়ে আসছে। সেই স্বর্ণলোভী মিদাসের কন্যার মত। কিন্তু আমি তো সোনার কারবারী নই। আমি—

আমি চীৎকার করে উঠলাম, তিপু।

সাড়া পাচ্ছি না। তৃপ্তি পাথর হয়ে গেছে। তৃপ্তির শরীর এখন কালো পাথরের শালগ্রাম শিলার মত অনুভূতিহীন জড় হয়ে গেছে।

আমি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তৃপ্তির কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'তিপু!' আমার কাঁকুনিটা সহ্য করে তৃপ্তি বিস্ময় ভরা চোখে আমার দিকে তাকাল। আমার বুকের ওপর একটা হাত রেখে বলল, 'তুমি অমন করছো কেন! তোমার কি হয়েছে!'

'তোমার হাত দুটোকে দেখে আমার ভয় করছে তিপু'।

'আমার হাত দুটোকে ভয়! সে আবার কি কথা!'

'আমার কেবলি মনে হচ্ছে, ঐ হাত দুটো এসে আমার গলাটা চেপে ধরবে। আমাকে গলা টিপে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলবে।'

'তুমি যে কী বলো!' তৃপ্তি ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'একী! তোমার গায়ে এত তাপ কীসের? জ্বর এসেছে নাকি?'

তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে খুব। আমার কণ্ঠনালীর স্বরগ্রাম গুলিকে কেউ যেন এনিস্থেটিক দিয়ে অবশ করে দিয়েছে। আমার জিব শুকিয়ে আসছে।

আমার হাত ধরে নিয়ে সে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। মুখের দিকে চেয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে কিছু যেন লক্ষ্য করছে। আমার পা থেকে বুক পর্যন্ত চাদর ঢেকে দিয়েছে। আমার তক্তপোশের হাত সাতেক ওপরে ঝুলন্ত সিলিং ফ্যানটা চালিয়ে দিয়েছে অল্প স্পীডে। আমার এখন আরাম পাওয়া উচিত। আমার এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোনো উচিত।

কিন্তু আমার ঘুম আসছে না। যথারীতি তৃপ্তি আমার ঘরের বইপত্তর জিনিষ-টিনিষ গুছিয়ে রেখে গেছে। মশারী টানিয়ে দিয়ে গেছে। পাছে মাঝ রাতে আমার তেষ্টা পায়, আর সেই তেষ্টা মেটাবার জন্তে একটু জলের আশায় হা-পিত্যেশ করে মরি, সেই কথা ভেবে সে কাঁচের কুঁজোটায় এক কুঁজো জল

আর একটা গ্রাস রেখে গেছে আমার তক্তপোষের ঠিক মাথার কাছে গোল টেবিলটার ওপর। এমন কি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মশারীর ধারগুলো ভাল করে গুঁজে দিয়ে গেছে। আমার ঘরের লাইটটা পর্যন্ত নিভিয়ে দিয়ে গেছে।

কাল তৃপ্তি এসেছিল। আজ আসেনি। আজ তাকে কারা যেন কোথায় নিয়ে গেছে ট্যাক্সিতে চাপিয়ে। ফেরৎ দিয়ে যাবে কিনা জানি না। অনেকে ফেরৎ আসে না। অনেকে কর্পূরের মত উবে যায়। আমি তাদের সবাইকে জানি। কেননা আমার সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগ আছে। কেননা, আমার প্রণয় অস্তিত্বে তারা সম্যক্ ক্রিয়মানা কেননা, ভয়ের অরণ্যে তারা আজ বিদিশা নাথিকের মত শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত।

কিন্তু এখন, আজ রাতে, আমার কি জ্বর এসেছে? আমার শরীরের অভ্যন্তরে কি কোন উৎপাৎ সুরু হয়েছে! আমি ধরতে পারছি না। অথচ এতক্ষণ ধরে মটকা মেরে শুয়ে থাকার পরও আমার মনে হচ্ছে, আর আমার ঘুম আসবে না। আর একটি অস্থির রাত্রি মুখ হা করে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

না, ঘুম আসবে না। কোথায় যেন দারুণ কোলাহল উঠছে। সেই কোলাহল গায়ে মেখে অন্ধকার ঘরে ঢুকেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার ঘরের জানলায় আজ আবার সেই কালো বেড়ালটা এসে দাঁড়িয়েছে। আজ তার আকার-প্রকার যেন অনেক বেড়ে গেছে। আফ্রিকার জঙ্গলের কালো বাঘের মত। রোঁয়া ফোলাচ্ছে। গোঁফ নাড়ছে। সামনে শিকার দেখলে যেমন করে, আমাকে দেখে তেমনি করে গর্‌র্ গর্‌র্ শব্দ করছে। খাড়া খাড়া লোম, হিংস্র থাবার নখগুলো বেরিয়ে এসেছে ভয়ানক উত্তেজনায়। ছোট ছোট কান দুটো খাড়া হয়ে উঠেছে।

একী! এ আমি কী দেখছি! কালো বাঘের মুখে একটা মাংসহীন নরকঙ্কাল! ভয়াল কঙ্কালটা নড়ছে, হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে খটাখট্ শব্দ হচ্ছে। আর ওপাশে ওরা কারা? ওরা কি মানুষ? ওদের গলাগুলো অমন দড়ি দিয়ে বাঁধা কেন। ওষ্ঠাগত-প্রাণ মানুষেরা চেষ্টা করছে তারস্বরে চিৎকার করে উঠতে। পারছে না। আঁকু পাঁকু করছে। চোখগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ঠিক্‌রে গিয়ে বুঝি ছিট্‌কে পড়বে চতুর্দিকে। মানুষেরা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে।

হঁ, এতক্ষণ পরে আমি বুঝতে পারছি, আমি শুয়ে আছি নির্জন ঠাণ্ডা এক পাথরের কবরের ওপর। এখানে শব্দ নেই। এখানে পাতা নড়ে না বাতাসে। এখানে ধুলো ওড়ে না ঝড়ে। এখানে ফুল ফোটে না। এখানে ঝরণা থেকে জল ঝরে নিঃশব্দে। এখানে গরু ছাগল ঘাস খায়, তার কোন শব্দ নেই। শব্দহীন শূন্যতায় পাখিও ওড়ে এখানে। তবে কলরব করে নয়, ভয়ে ভয়ে—পাছে শব্দ হয়।

আমি বুঝতে পারছি, চুঁয়ে চুঁয়ে বয়স আর মৃত্যু গভীর সংগোপনে গভীর নিঃশব্দতায় মুহূর্তে মুহূর্তে, দিনে দিনে. মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে আমাদের অস্তিত্বের ছিদ্রপথে ঢুকে পড়ে কালো বেড়ালটার মত।

'তিপু, তুমি এসেছো?'

'এসেছি।'

'আমার হাতটা একবার তোমার বুকে চেপে ধরো তো।'

'ধরলাম—'

'আমাকে নিয়ে চলো।'

'কোথায়?'

'ঐ যে ঐ ব্রীজটা দেখতে পাচ্ছো না, তার ওপারে মানুষেরা কেমন সহজভাবে চলাফেরা করে। গাছেরা কেমন সকালের আলোয় শরীর ধুয়ে ঝলমল করে। পাখিরা কেমন গলা ছেড়ে গান গায়—ওইখানে আমাকে নিয়ে চলো।'

আমি অনেক নির্ভরতায় তৃপ্তির মিষ্টি মুখখানার ওপর চোখ রাখলাম। আর সেই অলৌকিক মুহূর্তে লক্ষ্য করলাম, আমার ঘরের মধ্যিখানে নরকঙ্কাল মুখে নিয়ে যে বেড়ালটা এতক্ষণ খুশিতে ডগমগ ছিল, সেই কুৎসিত বেড়ালটা তড়াক্ করে এক লাফে জানলায় উঠল; এবং সটান বেরিয়ে গেল জানলার গরাদ বেয়ে। আমার বুকে ঘনিষ্ঠ তৃপ্তি সৃষ্টির আদি মানবী ঈভ্ হয়ে গেল।

## পুস্তকের কথা

### একটি বিশিষ্ট উপন্যাস : 'ন হন্যতে'

এই সেদিন জনৈক পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে বই নিয়ে ব'সে থাকতে দেখে শুধোলেন—'কি পড়ছেন?' একটু সম্বোধ নিয়ে উত্তর দিলাম—'এবারের এ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ড-পাওয়া' বইখানা একটু দেখছি।' আজকাল জায়গা বুঝে এসব কথাবার্তা বেশ রপ্ত ক'রেই ফেলেছি বলা যায়। এতসব বিপত্তিকর এটিকেট বজায় রেখেও আমি উপন্যাস পড়ি এবং তার সংখ্যাও নিদেনপক্ষে খুব কম নয়।

বন্ধুটি এসেছিলেন আমার পঠিত সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা নাগাদ। যেখানে উত্তম-পুরুষে অমৃতা লিখছেন—"এতদিন আমি জানতামই না যে একটা বিয়োগান্ত উপন্যাস আমার সারা জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য কালিতে, অব্যক্ত ভাষায়, অশ্রুত স্পন্দনে লেখা হচ্ছিল।" বস্তুতপক্ষে অমৃতা নাম্নী মহিলার এই অদৃশ্য—অব্যক্ত—অশ্রুত জীবনেতিহাস নিয়েই মৈত্রেয়ী দেবীর উপন্যাস 'ন হন্যতে'। সেই প্রখ্যাত লেখিকা যাঁকে আমরা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' এবং Tagore by fireside' বইয়ের জন্যই বিশেষভাবে চিনি। রাবীন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা এবং চরিত্রের যিনি মূর্তিমতী উত্তরসাধিকা। তিনি যে এই অপরাহ্ণ বেলায় উপন্যাস লিখবেন, এমনটি ধারণা ছিল না। যদিও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির চেষ্টায় তিনি 'নবজাতক' নামক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর কথাসাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। মনে পড়ছে, উনিশশো ছেষট্টি সালের এক সকালে অধুনা লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক প্রকাশন-সংস্থার পক্ষ থেকে একটি চিঠি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি পাম এ্যাভেনিউতে —মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে। চিঠিতে লেখা আছে একটি পুস্তকের জন্য সবিনয় প্রস্তাব। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর তেতলার ঘরে আমাকে বসিয়ে পুত্রবৎ স্নেহে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে আপন ক'রে নিলেন। মানুষের চিরন্তন সম্পর্ক, সাহিত্য এবং জীবনবোধ আর আমাদের কালের লেখালেখি নিয়ে মৃদু শব্দ ব্যঞ্জনায় বিস্তর কথাবার্তা হোল। কিন্তু আশ্চর্য, আমি যে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলাম, তা তিনি স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যেই নাকচ ক'রে দিলেন—'এখন হাল্কা লেখার মুড আর নেই, উপন্যাস ঠিক-ঠিক আসবে না।'

অথচ সেই ঘটনার দশ বছর পরে, এই ছিয়াত্তর সালে যখন তিনি আরো অনেক হাল্‌কা মুডের উর্দ্ধে উঠে এসেছেন—তখনই উপন্যাস লিখে বসলেন। বেশ দীর্ঘ উপন্যাস —'ন হন্যতে'। কিন্তু ভেবে পাই না, তাঁর মতো বুদ্ধিবাদিনী এবং মানবিক মনোবৃত্তির পরমা প্রতিভূ এমন একটি বিষয়বস্তু নির্বাচন করলেন কেন! এই বিষয়ের জন্য বাংলা সাহিত্যে আরো অনেকে ছিলেন। এবং নামকরণের জন্যও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে প্রবল। চিন্তা করতে বাধ্য হই—এমন নামই বা কেন রাখলেন তিনি।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা গ্রন্থের সাংখ্যযোগের কুড়ি সংখ্যক শ্লোকে পাচ্ছি—শ্রীকৃষ্ণ বিশদ ব্যাখ্যা ক'রছেন তাঁর প্রিয় সখা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের কাছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এখানে তো অজর-অমর-অক্ষয়-অব্যয় সেই আত্মার কথা ব্যক্ত হয়েছে। পৃথিবীর পুরনো সত্যগুলির মধ্যে বিশিষ্ট সত্য এই ভালবাসা—একথা অবিসংবাদিত। কিন্তু যে ব্যবহারিক জগতে আমরা মানুষেরা বসবাস করি, অধুনা সেখানে এর ছিঁটেফোঁটা কদরও নেই। সমস্যাকীর্ণ জীবনচর্যায় হৃদয় নামক অনিবার্য বস্তুটির কথা এবং তার অনুভূতিসাপেক্ষ প্রবৃত্তির কথা এখন আর মনেই থাকে না। সুতরাং সেই অ্যাডাপ্টেড মানুষের লোকনীতি এবং সমাজনীতি নির্ভর জীবনের কাছ থেকে যদি তিনি রচনার প্রতিপাদ্য নির্বাচন করতেন, তবে সাধারণ পাঠক উপকৃত হোত। তিনি যা করেছেন, তা একান্ত-ভাবেই আত্মজীবনীমূলক কাহিনী—Autobiographical novel এবং যা লেখিকার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এইসব ব্যক্তিগত বিষয়কে সকলের উপভোগ্য ক'রে তুলতে গেলে যে ব্যাপক নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়, লেখিকা এক্ষেত্রে তা করেন নি। নিজের পারিবারিক পরিবেশ—শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি এবং সম্পর্কিত পরিজনের কথা আর সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই তিনি কাহিনী বুনে গেছেন। যে অভিজ্ঞতা তাঁর রক্তে—হৃদয়ে—মেধায় এবং মননে সঞ্চারিত ছিল, তিনি তারই শিল্পিত আলেখ্য রচনা করেছেন। সেই আজন্ম-পরিচিত পরিবেশের বাইরে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয় নি। আমাদের বাংলা ভাষার উপন্যাসে confessional কাহিনী নেহাৎ কম নেই। একজন স্রষ্টার কাছে আমরা

নিশ্চিতভাবেই নৈর্ব্যক্তিক ধ্যান-ধারণার সার্বজনীন তাৎপর্য সন্ধান করি এবং পাঠক হিসাবে সেটুকু আমাদের মৌলিক অধিকার। মৈত্রেয়ী দেবী সেই অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছেন। তাঁর 'অমৃতা' কখনোই নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার অবকাশ লাভ করেনি। মির্চা ইউক্লিড ছাড়া তাঁর জীবনে আর কিছু নেই, শুধু অনিবার্য অন্তরতম সত্তা হিসাবে আছেন রবীন্দ্রনাথ। যিনি আলোচ্য ভালোবাসার পরম নিবৃতি এবং ঈশ্বরীয় নির্জনতার নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল।

উপন্যাসের উত্তমপুরুষ প্রৌঢ় বয়স্কা নারী, তিনি সুসজ্জিত সংসারের কেন্দ্র-বিন্দুতে থেকেও একান্ত গোপনে সেই মর্ম চিন্তার ঢাকনা খুলেছেন। ফিরে গেছেন বিয়াল্লিশ বছর পিছনে, যেখানে—"আমি মহাকালে অনুপ্রবিষ্ট—আমার সামনে পিছনে নেই—আমি স্থির ধ্রুব দাঁড়িয়ে আছি এই ১৯৭২-এ পা রেখেও ১৯৩০ সালে।" উনিশ শো তিরিশ সালের যে ব্যবহারিক ভারতবর্ষ, এখানে তার চিত্র অনুপস্থিত। কাহিনীতে আমরা 'অমৃতা'-র সংসার পরিজন এবং তার দলিত হৃদয়-সংবাদী কবিতার কুহকেই দেখতে পাই। আর দেখতে পাই অমৃতার 'ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, তমসি মম ভবজলধিরত্নং' সেই বিদেশী প্রণয়ী যুবক মির্চা ইউক্লিডকে। মৈত্রেয়ী দেবী উচ্চ মানের আর্ট সৃষ্টি করেছেন অ্যাভারেজ মানুষের বাস্তব জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে। খুব সন্তর্পণে তিনি তথাকথিত কালচার্ড আবহাওয়ার শিক্ষিত এবং দীক্ষিত জীবনের প্রতিচিত্র এঁকেছেন এই উপন্যাসে। অধিকাংশ মানুষের ধূলিধূসরিত জীবনযাত্রার ক্লেদ এবং গ্লানির যেখানে প্রবেশের পথ পায় না।

এই সুদীর্ঘ রচনাটিতে যে বৈশিষ্ট্য সব চাইতে উজ্জ্বল, তা হচ্ছে গদ্যভঙ্গির আশ্চর্য রূপময়তা। দীর্ঘদীন গদ্যে তিনি গোটা বইখানা লিখে গেছেন। কোথাও তাঁর কলম একটুও টাল খায় নি। কিছু কিছু বর্ণনা, আত্মবিশ্লেষণ, কবিতার উদ্ধৃতি মাঝে মাঝে যদিও বেশ ভারাবহ এবং ক্লান্তিকর মনে হয়। উপন্যাস রচনায় এ ধরনের দুরূহতা খুব একটা সহজপাচ্য নয়। তবুও তাঁর উপস্থাপনা সাহিত্যের বিরল সম্পদ—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদি তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার দ্রুত প্রবহমান জীবনধারা নিয়ে অথবা বর্তমান মূল্য-বোধ সম্পর্কে মানবজীবনের কথা লিখতেন, তবে তাঁর রচনা কালজয়ী হোত। ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের আধার যে মানবিকতা তাকেই যদি তিনি 'ন হন্যতে' ছাপ দিয়ে এই বইখানি লিখতেন তবে আমাদের পরমপ্রাপ্তি ঘটত। একাডেমী তাঁকে পুরস্কৃত করায় বাংলা ভাষাই পুরস্কৃত হয়েছে, কিন্তু আমরা যারা তাঁর কলমের প্রতি অতিমাত্রায় আস্থাবান, তারা খুব একটা পরিতৃপ্ত হতে পারি নি। তাঁর সুগভীর মননশীলতা এমন একটি ব্যক্তিগত রোমান্টিক কাহিনী লিখবার জন্য ব্যয়িত হোক, এটা আমরা কখনোই চাই নি।

—পিনাকীরঞ্জন গুহ

## কবিতার নির্মাণ

কবিতার নির্মাণের একটা ব্যাপার আছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই এর প্রকরণ-গত দিকটির কথাও মনে প'ড়ে যায়। একটি মিনার নির্মাণের মতোই কবিতা রচনাও যথেষ্ট শ্রমসাধ্য কাজ এবং উভয়ক্ষেত্রেই দক্ষতার আদর সর্বাগ্রে। বাংলা কবিতায় দিব্যেন্দু পালিতের স্বাতন্ত্র্য মনস্ক পাঠকমাত্রেই দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেবেন। তাঁর কবিতায় মেটাফিজিক্যাল আবহটি চমৎকার, এবং একই সঙ্গে ঈর্ষনীয় এ-কারণে যে তিনি তা কোথাও প্রকট হ'তে দেন না। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'কিছু স্মৃতি কিছু অপমান' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই এই কথাগুলো মনে এলো। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মাত্র দু'খানি কবিতার বই, যেগুলির নাম 'আহত অর্জুন' এবং 'রাজার বাড়ি অনেক দূরে'।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থে চৌষট্টি পাতায় যে উনপঞ্চাশটি কবিতার সংকুলান হয়েছে তার অধিকাংশের আদর বিষাদেরই দিকে। তবে, শুরুতেই যা আমাকে শেকড়-সুদ্ধ নাড়া দেয় তাহ'লো' বইটির নামকরণ। যদিও তাঁর পূর্ব প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থগুলির নামকরণের সঙ্গে এই গ্রন্থের নামকরণের সূক্ষ্ম একটা সাদৃশ্য আমি খুঁজে পেয়েছি, তবু এবারে আমি এতোটাই উত্তেজিত হ'য়ে উঠি যে এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ঐ কবির সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনের পরিবেশ পর্যন্ত সৃষ্টি ক'রে ফেলি। আমার নিজেরই ছাজার সমস্যা, স্মৃতি যা তার অনেকটাই অপমানের। অবসর সময়ে শুধু কবিতায় সান্ত্বনা খুঁজি। সেখানেও যদি প্রতিহত হই, দাঁড়াবো কোথায়? আমার অনেক কথার জবাবে তিনি স্মিত হেসে ছোট্ট ক'রে আমাকে যা বলেন, তা হ'লো :

> 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান—এই নিয়ে আমি ; আমার লেখাও ।···লেখকসত্তার ওপরেও কাজ করে লেখকের ব্যক্তিসত্তা, তার কৌমার্য ও অহঙ্কারবোধ, কিঞ্চিৎ অভিমানও ।···লেখক প্রজামাত্র। স্বপ্নই এই একটি প্রজা নিয়েই ব্যক্তির রাজ্যপাট, তার শাসন-অনুশাসন, তার গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ভূমিকা। স্মৃতিকে সে আড়াল করতে পারে বিস্মরণ সাজিয়ে। তার অর্থ ভুলে যাওয়া নয়। আমিও ভুলিনি।'
> ( দেশ, সাহিত্যসংখ্যা — ১৩৮০ )

তাঁর কাছ থেকে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই।

## ২। অভিমান ও অঞ্জলি

এই কাব্য গ্রন্থে স্মৃতি ও অপমানের পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে কবির অভিমানও, যে অভিমান তাঁকে কোনো কোনো মুহূর্তে নিয়ে গেছে প্রেম থেকে প্রেমহীনতার দিকে :

'লাগামে রেখেছে হাত কে তোমার, এই অন্ধকারে।
ভূয়োদর্শিতাও এক নারীর গুহার মতো জড়ানো লতায়—
সবুজে শাসানো ; শুধু যাওয়া চলে একার বিষাদে
অক্ষরে চুম্বন রেখে, একা একা, ক্রমশ ও দূরে।'

( একা )

কিংবা,

'নতুন নকশায় ভ'রে ওঠে তোমার হাতের আঙুল—
আমি তাকিয়ে থাকি, দেখি,
হাওয়া উড়ে যায় ক্রমশ দুঃখের দিকে।

( হাওয়া উড়ে যায় )

একার বিষাদে এই দূরে চ'লে যাবার ইচ্ছে যেমন তীব্র, তেমনি তীব্রভাবে ফিরে আসবার সম্ভাবনাও সুতরাং থেকেই যায়। অভিমান তখন অঞ্জলি হ'য়ে উথ্‌লে পড়ে :

'তেমন ক'রে দেখা হ'লে আজও আমি চাইবো—
দূরে তোমার পায়ের রেখা, দূরে তোমার শুদ্ধ অকিঞ্চন,
... ...
কাজ কি অভিমানে
তেমন ক'রে দেখা হলে নেমে আসবো, নেমে আসবো, দেখো'

( ঝুলন )

কখনো অভিমানে দূরে চ'লে যাবার ত্বরা, আবার কখনো সমর্পিত হবার বাসনা—এছাড়াও দিব্যেন্দু পালিতের কবিতার তৃতীয় একটি দিক আছে, তাকে যদি দিক না ব'লে বলি তৃতীয় নেত্র ; তাহ'লে সেই চোখের দৃষ্টি ভয়ানকরকম তির্যক এবং ঐ দৃষ্টি থেকে বিনির্গত আলোকরশ্মি চাবুকের মতো আছড়ে আছড়ে পড়ে আমাদেরই সৃষ্ট এই সমাজশরীরের নানা কাটা ঘায়ের ওপর :

'তখনই সময় ছিল.যখন ব্যর্থতার বেত জুড়ে ছিলের উপমা—
স্বামীরা পেতেন পূজা. আর পুরুষেরা পেত শরীরের স্বাদ ;

লুকোচুরি হ'তো খুব, এমনকি আগুনে পুড়েও
অদগ্ধ সতীরা পুনঃ নতুন প্রেমের খোঁজে দাঁড়াতো লাইনে !'
( তখনই সময় ছিল )

কিংবা,

'এমন মজার দিনে হাসি পায় যে-কোনো কথায়—
হঠাৎ ঘাসের থেকে মুখ তুলে গাধা ছোঁড়ে লাথি ;
ধোপা চেয়ে নেয় ক্ষমা, রজকিনী সম্ভ্রম বাঁচাতে
মাথায় কাপড় তুলে টেনে আনে লম্পটের ভিড় !'
( এমন মজার দিনে )

আরো ধরা যাক,

'শান্তি কি ভালো ততো ? এই প্রশ্নে জমে প্রয়োচনা —;'
( আসলে একটিই দিন )

বস্তুত, প্রতিটি কবিতাই যেন পাঠককে ভিন্ন থেকে ভিন্নতর উপলব্ধির দোর-গোড়ায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই কাব্যগ্রন্থে দীর্ঘ কবিতার সংখ্যা বেশি নয় গুণতিতে মাত্র তিনটি। এবং আলাদা ক'রে প্রায় সব কবিতাই ভালো লাগে. কিছুটা ব্যবধানে পুনর্বার স্বাদ নিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কোন্ কবিতাটি আমাকে নাড়া দিয়েছে সবচেয়ে বেশি. উত্তরে আমি সবচেয়ে ছোটো কবিতাটির কথাই বলবো :

'বসন্ত হাওয়ার বুকে উড়ে আসে শ্বেতপদ্ম সন্ধি কতোদূর !
আরো ঘুরে কোলাহল, শিশুরা করছে খেলা যেখানে প্রীহীন
মাটিতে তন্ময় মুখ গুঁজে রেখে জননীরা মুছেছিল ধর্ষণের ক্লেদ —

এখানে অনেক দেশ, এখানে স্টেশন নেই কোনো'
( এখানে স্টেশন নেই কোনো )

দিব্যেন্দু পালিতের কবিতায় যে মেটাফিজিক্যাল আবহর কথা আলোচনায় একেবারে শুরুতে বলেছিলাম. তা সম্পূর্ণই কবির বুদ্ধি ও মননের সংমিশ্রণজাত। এবং তার যথাযথ প্রয়োগে তিনি যত্নবান ব'লেই প্রতিটি কবিতায় তাঁর নিজস্ব মেজাজটিকে চিনে নিতে ভুল হয় না। 'কিছু স্মৃতি কিছু অপমান' সেই হিসেবে সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা কাব্যগ্রন্থের তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

—দেবাশিস বসু

---

কিছু স্মৃতি কিছু অপমান। দিব্যেন্দু পালিত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল-৯। দাম : পাঁচ টাকা।

আমাদের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকাশন

**মদন দাশ, প্রভাসকান্তি ভদ্র, রত্নেশ্বর বর্মণ ॥ গল্প**

তিন তরুণ গল্পকারের বারোটি বলিষ্ঠ ও সমাজ সচেতন গল্পের সংকলন। সমালোচক মহলে বিশেষ আলোচিত। মূল্য ৫·০০

**সুরদাস ॥ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে**

ভারতবর্ষের বিরাট রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্র সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য বাংলা গ্রন্থ। বাণিজ্যমন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য ৮·০০

**মদন দাশ, শান্ত রায় ॥ এক সূত্রে**

নতুন আর পুরনো বাট জন কবির কবিতার একটি বিশিষ্ট সংকলন। মূল্য ৩·০০

**মনোজ মিত্র ॥ চাক ভাঙা মধু**

প্রখ্যাত নাট্যকারের সফলতম ও জনসমাদৃত নাটক। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৪·০০

**জ্যোৎস্নাময় বসু ॥ রং বদলায়**

নতুন রীতিতে লেখা চিরায়ত নাটক। বিভিন্ন নাট্যসংস্থা কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ। মূল্য ৩·৫০

**লিপিকা** ৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

# কবি-কাহিনী

## নীলেশচন্দ্র সিংহ

### আচার্য সন্নিধানে

ঢাকার ক্রিয়া শেষ করে কুঞ্জবাবু দল নিয়ে বাসকাঠি এলেন। একদিন নকুলেশ্বরসহ তার বাড়ী গিয়ে তার মা কামিনীসুন্দরীকে বললেন—আপনাকে একটা শুভ সংবাদ দিতে এসেছি। আপনার ছেলেটি দু'বছর আমার সঙ্গে থেকে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাতে আমার মনে হয় ভবিষ্যতে ও একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিচিত হবে। ঢাকা জিলার নরসিংহদীবাসী কবি-সম্রাট শ্রীহরিচরণ আচার্য মহাশয় নকুলের গানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর দলে ওকে নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আগামী দুর্গাপূজার পূর্বেই নকুলেশ্বরকে তাঁর দলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। এখন আপনার অনুমতি পেলেই আমি আমার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারি।

কামিনীসুন্দরী—আমি ওকে আপনার হাতে সমর্পণ করেছি। ও ছেলে এখন আপনার। ওর যাতে ভাল হয়, মানুষের মতো মানুষ হয়ে আপনার সুনাম রক্ষা করতে পারে, সে দায়িত্বও আপনার। সেজন্য আমার অনুমতির অপেক্ষা করার প্রয়োজন করে না। আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করবেন। তবে কি জানেন, বিদেশ বিভূঁয়ে অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে গিয়ে কি ওর মন টিকবে?

কুঞ্জবাবু—তা আপনার ছেলের কাছেই জিজ্ঞাসা করুন, ওর কি মত।

নকুলেশ্বর মাকে বললেন—মা, এমন শুভ যোগে তুমি আপত্তি করো না। কত শত ছেলে ছাত্র-শিষ্য হয়ে তাঁর দলে থাকার এবং সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না, আমি আমার গুরুর কৃপায় সেই সুবর্ণ সুযোগ লাভ করতে চলেছি। গুরুদেব আমার মঙ্গলের জন্যই—তাঁর নিজের একটু অসুবিধা সত্ত্বেও, উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আমাকে আচার্য মহাশয়ের দলে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। তুমি আশীর্বাদ কর যেন গুরুদেবের সে ইচ্ছা সফল হয়। আমি যেন গুরু কৃপায় সেই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর অগাধ কাব্য-সিন্ধুর দু'

এক বিন্দু অনুকরণ করে ধন্য হতে পারি।—এই বলে আগে গুরু ও পরে মাতৃ-পদে প্রণাম করলেন। মা বললেন—তোমার গুরুদেবের প্রতিশ্রুতি পালন করে কবি সমাজে চির-স্মরণীয় বরণীয় হও— এই আশীর্বাদ করি।

বঙ্গাব্দ ১৩২১ সালের ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহেই কুঞ্জবাবুর কাছে আচার্য কর্তার চিঠি ও মনিঅর্ডার যোগে দুই শত টাকা এসে পৌঁছল—নকুলেশ্বরকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য। কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—যাও, এই টাকা তোমার মায়ের কাছে দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এসো। আমি তোমাকে নরসিংহদী পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

হাতে টাকা পেয়ে নকুলেশ্বরের মনে আজ এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর সঙ্গে কবিগান শিখতে এসেছেন দু'বছর। এযাবত একটি পয়সাও কুঞ্জবাবু তাঁকে দেন নি। আর নকুলেশ্বরও একটি পয়সা তাঁর কাছে চান নি। আসরের শ্রোতারা সন্তুষ্ট হয়ে যৎসামান্য যা ইনাম বখ্‌শিস দিত তা দিয়ে তিনি কোন প্রকারে হাত খরচ চালাতেন। আজ হাতে দু'শত টাকা পেয়ে বাড়ী গিয়ে মাতা ঠাকুরাণীর পায়ে টাকাগুলি রেখে প্রণাম করলেন।

মা বললেন—এত টাকা কোথায় পেলি?

নকুল—ঢাকায় যাঁর দলে যাব বলে স্থির হয়েছে তিনি এই টাকা পাঠিয়েছেন। আগামী দিনই আমার রওনা হতে হবে।

মা—তুই একা কি করে যাবি?

নকুল—গুরুদেব বলেছেন তিনিই সে ব্যবস্থা করবেন।

মা—তিনি যদি সে ভার নিয়ে থাকেন তবে আর ভাবনা কি?

নকুল—( আনমনে ) তাই তো মা, ভাবনা কি! এই বলে নকুলেশ্বর তৎক্ষণাৎ একটি গান রচনা করে গেয়ে মাকে শোনালেন এবং মা'র আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন—

গুরু নামের সারি গেয়ে,
ভাসাইয়েছি দেহ-তরী,
শ্রীগুরু কাণ্ডারী আছে,
ঝড় তুফানের কি ধার ধারি॥
অনুরাগের বাদাম তুলে,
দিয়েছি মোর জ্ঞান-মাস্তুলে,

জয় গুরু জয় গুরু বলে—
কাব্য-সিন্ধু ধরব পাড়ি ॥
ঢেউ আসিলে শত শত,
জ্ঞান করব বুদ্বুদের মত,
জপ করিব অবিরত—
শ্রীগুরু কুঞ্জবিহারী ॥
অমূল্য ধন লাভের তরে,
চলেছি আজ দেশান্তরে,
আশীর্বাদ কর আমারে—
আরাধ্য ধন পেতে পারি ॥
নকুলের এই ক্ষুদ্র দেহ,
জয় করতে পারবে না কেহ,
গুরুকৃপা মাতৃস্নেহ—
থাকবে এ দেহের প্রহরী ॥

মা বললেন – বাবা, তোমার এই উপস্থিত রচনা-শক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আশীর্বাদ করি গুরু কৃপায় তুমি অদ্বিতীয় হও, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হোক।

পরের দিন নকুলেশ্বর ঝালকাঠি এসে কুঞ্জবাবুকে বললেন—বাবা, আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। এখন আমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

ঝালকাঠি কালী বাড়ীতে রামাচরণ শীল নামে একজন কবিরাজ ছিলেন। তাঁর বাড়ী ঢাকা জিলায় ভৈরব বাজারের কাছে। দুর্গা পূজা উপলক্ষে তিনি দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কুঞ্জবাবু তাঁকে বললেন—আপনি তো বাড়ী যাবেন, এই ছেলেটাকে যদি আপনি নরসিংহদী হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের কাছে পৌঁছে দেন তাহলে আমার বড় উপকার হয়। ছেলেমানুষ পথঘাট চেনে না।

কবিরাজ মহাশয়—আপনি সেজন্য কোন চিন্তা করবেন না। আমি ওকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে তার পরে বাড়ী যাব। আমরা আগামী দিন সন্ধ্যায় বরিশাল গিয়ে ঢাকা মেইল-ষ্টীমার ধরব। ওকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলবেন।

কুঞ্জবাবু—ও প্রস্তুত হয়েই আছে।

পরদিন যথাসময়ে রামাচরণ কবিরাজের সঙ্গে নকুলেশ্বর রওনা হলেন। যাবার

সময় কৃষ্ণবাবুর পদধূলি নিতে তিনি বললেন—আচার্য কর্তার কাছে পৌঁছেই পত্র লিখবে। আর আচার্য কর্তাকে দেবতার মতো ভক্তি করবে। মনে রেখো, তিনি তোমার গুরুর গুরু পরম গুরু।

পরের দিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টীমার গিয়ে নারায়ণগঞ্জ ঘাটে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে নরসিংহদীর টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বেলা দশটা নাগাদ আচার্য কর্তার নরসিংহদী শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রমে পৌঁছলেন। আশ্রমের সেবাইত বললেন যে, কর্তা নদীর ঘাটে তাঁর পাল্কীতে আছেন।

রামাচরণ বাবু নকুলেশ্বরকে নিয়ে পাল্কীতে যাওয়া মাত্র আচার্য কর্তা খুব আনন্দ সহকারে 'এসেছিস? আয় আয়'' বলে নকুলেশ্বরকে কোলের কাছে টেনে নিলেন। নকুলেশ্বর প্রণাম করে পদধূলি নিয়ে বসতেই আচার্য কর্তা দলের পরিচালিকা তরঙ্গিনীকে ডেকে বললেন—'তরঙ্গ, সমস্ত রাত ওদের খাওয়া হয়নি। পাকের ঠাকুরকে বল ওদের আহারের ভাল ব্যবস্থা করতে।'

তরঙ্গিনী বর্ষিয়সী মহিলা; বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। দেখে স্নেহশীলা ভক্তিমতী বলেই মনে হয়। নকুলেশ্বর তাঁকেও প্রণাম করলেন। তিনি খুব তাড়াতাড়ি তাদের স্নানাহারের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

স্নানাহার সেরে রামাচরণবাবু বললেন—এখন তো আর তোমার চিন্তা নেই। জায়গা মতো পৌঁছে দিয়ে গেলাম। এখন আমি চলি।

রামাচরণবাবু চলে গেলে তরঙ্গিনী নকুলেশ্বরকে বললেন—কর্তার জ্ঞাতি-ভাই মনোমোহন আচার্যদলের ধরতা দোহার; খুব ভাল লোক। তুমি তার পাশেই বিছানা করে নেও; ওর কাছেই থাকবে।

মনোমোহন নকুলেশ্বরকে আদর করে নিজের পাশেই জায়গা করে দিলেন, আর বললেন – যদি কোন অসুবিধা হয় আমাকে বলবে। তুমি আমার ছোট ভাইটির মতো।

মনোমোহন আচার্য যে শুধু দলের ধরতা তাই নয়—তার উপরে অনেকগুলো কাজের ভার ন্যস্ত ছিল। দলের হাট-বাজার, কেনাকাটা এবং আচার্য কর্তার জন্য আলাদা রান্না— এসব কাজ তাকে করতে হতো। আচার্য কর্তা ছিলেন নিরামিষভোজী। তিনি মাছ মাংস পিঁয়াজ রসুন স্পর্শ করতেন না। সেজন্য দুবেলা তাঁর জন্য আলাদা রান্না হতো।

সন্ধ্যার পরে সন্ধ্যা বন্দনাদি ও গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার কীর্তন সেরে আচার্য কর্তা নকুলেশ্বরকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি দলের সরকারী রান্না খাবে,

না আমার সঙ্গে নিরামিষ খাবে !'

নকুল—আপনি যা বলবেন, তাই করবো।

কর্তা—তুমি ছেলে মানুষ ; মাছমাংসে প্রবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক। নিরামিষ খেতে তোমার কষ্ট হবে না ?

নকুল—চিরদিন নিজের প্রবৃত্তি নিয়ে চলতে গেলে এ জীবনে কখনো নিবৃত্তি আসতে পারেনা। আপনাদের মতো মহাপুরুষরাই তো বলেন—

ন যাতুঃ কাম কামানামুপভোগেন শাম্যতি—

হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে। ( অর্থাৎ যজ্ঞে ঘৃতের হবি যত দেয়, ততই অগ্নি বৃদ্ধি পায়, বাড়ে ছাড়া কমে না। তেমনি কামকামনা ভোগবাসনা আহারবিহার ভোগের দ্বারা শেষ হয়না। যত ভোগ করে ততই বৃদ্ধি পায়। ) অতএব প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি মার্গে নিতে হলে মহতের মহৎবাক্য অনুসরণ করে চলতে হয়।

কর্তা—বেশ, বেশ তোমার সৎসাহস দেখে আমি সুখী হলাম। ত্রিবিধ আহারের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্ত্বিক আহারকেই শ্রেষ্ঠ বলে গীতায় প্রতিপন্ন করেছেন, যথা—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥

( অর্থাৎ যাহা আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচি—এ সকলের বর্দ্ধনকারী, এবং সরস স্নেহযুক্ত সারবান এবং প্রীতিকর এইরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। )

আচার্য কর্তার কথা শুনে নকুলেশ্বর তাঁর সঙ্গে নিরামিষ খেতেই স্বীকার করলেন। তিনি মনোমোহনকে ডেকে বললেন—আজ হতে নকুলেশ্বর আমার পাকেই খাবে। দুই জনার মতো ব্যবস্থা করে রান্না করবে।

মনোমোহন নকুলেশ্বরকে বললেন—ভাল করেছ ভাইটি। এ দলে আমিষ খাওয়ার চেয়ে নিরামিষ খাওয়া শত গুণে ভাল।

নকুল—কেন দাদা ?

মনোমোহন – এ দলে মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, নাম উচ্চারণ করারও সাধ্য নেই। তারপর মাছ, মরা মাছ ছাড়া জ্যান্ত মাছ কেহ কিনে আনলে তাকে বরখাস্ত করা হবে। মরা মাছ খেলে তো আর প্রাণী হিংসা হবেনা—এই হল কর্তার আদেশ। তোমার ভাগ্য ভাল তাই তুমি নিরামিষ খেতে রাজী

হয়েছে। দেখবে, নিরামিষ তো নয় রাজ ভোগ। দুধ, দই, মাখন, মুগডাইল, ঘি- এই সব হল কর্তার নিরামিষ-ভোজন। তবে দলের লোকগুলিও নাছোড়বান্দা। কর্তার চোখে ধুলি দিয়ে জ্যান্ত মাছ কিনে মেরে আনে। কর্তা তো আর সে খোঁজ রাখেন না। তিনি তো ভাবেন তাঁর অহিংসাব্রত দোহারপত্রেরা পুরো-পুরি পালন করছেন।

নকুল –সে কি! এমন মহাপুরুষের সঙ্গে থেকে তাঁর বাক্যের অবমাননা! তাঁর সঙ্গে চাতুরী! এই বলে নকুলেশ্বর একটা কবিতা লিখে মনোমোহনকে দেখালেন—

সঙ্গগুণে রঙ্গ ধরে
লোকে বলে এ সংসারে।
আত্মশুদ্ধি না হলে তার
সঙ্গে কি করিতে পারে।
থাকিলে চন্দনের ধারে,
সার বৃক্ষকে চন্দন করে,
চন্দন কি বানাইতে পারে—
ভিতর ফাঁপা বাঁশের ঝাড়ে॥
হাজার কুম্ভীর কোন কালে,
শুদ্ধ হয়না গঙ্গা জলে,
তুলসী বনে বাঘ থাকিলে—
সে কি কভু হিংসা ছাড়ে॥
থাকলে চন্দনের কোটরে,
কাল সাপের বিষ যায়না দূরে,
উচ্চাকাশে শকুন ওড়ে—
দৃষ্টি থাকে গো ভাগাড়ে॥

মনোমোহন আচার্য কবিতাটি দেখে হাসতে হাসতে বললেন—হ্যাঁ, বুঝেছি কবিতাটি আমাদের উদ্দেশ্য করেই লিখেছ। তবু তোমার কাব্য শক্তির প্রশংসা না করে পারলাম না। তুলনাগুলি বেশ সুন্দর হয়েছে।

নকুলেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা, দলের অন্যান্য লোক কবে আসবে?

মনোমোহন—এই মাসের শেষ ভাগেই সব এসে যাবে। তুমি কর্তার কাছ

থেকে গানের খাতাটি এনে গানগুলি মুখস্থ করে রাখ। দোহারপত্র এলেই গান তালিম আরম্ভ হবে।

নকুলেশ্বর গানের খাতা এনে গান মুখস্থ করতে লাগলেন।

হঠাৎ একজন নূতন আগন্তুক এসে উপস্থিত হলেন। খুব উঁচু লম্বা চেহারা, শ্যাম বর্ণ। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁক্‌ড়া বাবরী চুল। চোখ দুটি কেমন চকল—দেখতে যেন ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপা বলেই মনে হয়। তিনি নৌকায় উঠেই আচার্য কর্তার খাস কামরায় গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

নকুলেশ্বর মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা, ইনি কে?

মনোমোহন—তুমি একে চিনবেনা, এর নাম ক্ষ্যাপা রাজেন্দ্র। খুলনা জেলায় বাড়ী; কর্তার ছাত্র। তিন-চার বছর যাবত পূজার সময় এসে কিছু দিন দলে থেকে চলে যায়। সবাই তাকে 'পাগলদা' বলে ডাকে; তুমিও তাই ডাকবে।

নকুল - ওঁকে দেখে আমার ভয় করে।

মনোমোহন—ভয় করবে কেন? ওর সঙ্গে আলাপ করলে বুঝতে পারবে, খুব ভাল লোক। কর্তার ছাত্রদের মধ্যে ওর জানাশোনা জ্ঞানগরিমা যথেষ্ট। শুনেছি খুলনা ফরিদপুরে ইতিমধ্যেই নাকি খুব যশ-প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

নকুল—আচ্ছা মনোমোহনদা, আচার্য কর্তা তবে ওনাকে বাঁধাবাঁধি ভাবে দলে না রেখে আবার অন্য ডাক-সরকার রাখেন কেন?

মনোমোহন—ও লোকটা একটু খামখেয়ালী। নিজে যা ভাল মনে করে তাই করে, তাই বলে। সাধু গুরু বৈষ্ণব দেখলে ভেকধারী বণ্ডা বলে বিদ্রুপ করে, দেবদেবীর উপাসনাকে বাতুলের পুতুল পূজা বলে ব্যাখ্যা করে। এসব কারণে আচার্য কর্তা ওকে একটা গোঁড়া নাস্তিক বলে মনে করেন। কেননা আচার্য কর্তা হলেন পরম বৈষ্ণব, ভগবত ভক্ত, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক। তাই ওর সঙ্গে তাঁর মনের মিল হয়না। তুমিও কিন্তু খুব সতর্ক হয়ে চলবে, যাতে আচার্য কর্তার মনের মতো হতে পার তাই করবে। রসাল আম্রবৃক্ষের তলে আশ্রয় নিয়েছ, পাকা আমের রস খেয়ে পেট ভরে নাও; ওর মতো পাতা গুণে সময় নষ্ট করো না।

এদিকে ভাদ্রমাস শেষ না হতেই দলের মুবল, বিহারী, গোবিন্দ সাহা, রাধাচরণ ইত্যাদি সব দোহারপত্র এসে গেল। দল এখন বেশ জমজমাট। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই দুর্গাপূজা। এবছর আচার্য কর্তার বায়না হয়েছে বৈদ্যের বাজারের কাছে সোনারগাঁ পানাম। বিপক্ষে কালকাঠির উমেশ-যামিনীর

দল এ বৎসর জোটে থাকবে।

নকুলেশ্বরের আনন্দ আর ধরে না। একটা নৌকার মধ্যে এতগুলি গুণী লোকের সমাবেশ। চব্বিশ ঘণ্টা গান বাজনা, ঐ সম্বন্ধে আলোচনা বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া তাঁদের আর অন্য কাজ নেই। তার মধ্যে ঐ ক্যাপা রাজেন্দ্রই প্রধান। কারণ লোকটা সত্যিই গুণী। হারমোনিয়াম, বেহালা সানাই, ঢোল সব যন্ত্রেই তার বেশ অধিকার আছে। বিবিধ তাল রাগ রাগিনীতেও জ্ঞান আছে। এই সব দেখে শুনে সেই ক্যাপা রাজেন্দ্রের উপর নকুলেশ্বরের একটা অপরিসীম ভক্তির উদ্রেক হলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন—মনোমোহন দা যে বলেছেন কথাটা মিথ্যা নয়। ক্যাপাই হোক নাস্তিকই হোক লোকটা যে অনেক গুণের অধিকারী এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর কাছে আমার জানবার শিখবার অনেক কিছু আছে। আমি তার দোষ অন্বেষণ না করে যদি গুণরাশির কিয়দংশ আয়ত্ত করতে পারি তবে নিজেকে নিজে ধন্য মনে করবো। কারণ শাস্ত্রে বলে—

সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি, দোষমিচ্ছন্তি বর্বরা।
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি, মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদা॥

(অর্থাৎ গুণী বা গুণগ্রাহী মানুষ যারা তারা লোকের দোষ দেখে না, শুধু গুণেরই অন্বেষণ করে। আর বর্বর যারা তারা লোকের শত গুণ থাকলেও তা দেখে না শুধু তার দোষ খুঁজে বেড়ায়। যেমন মক্ষিকা অর্থাৎ মাছিরা শুধু পচা ঘা অন্বেষণ করে আর ষট্‌পদ অর্থাৎ ভ্রমর সে ঘায়ের কাছে যায় না—ফুলে ফুলে কেবল মধু অন্বেষণ করে।)

এই ভেবে নকুলেশ্বর রাজেন্দ্র সরকারকে দাদা বলে প্রণাম করে ভাব করবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে নানাবিধ তাল রাগিণী কিছু কিছু আয়ত্ত করে ফেললেন।

আশ্বিনের প্রথম ভাগেই আচার্য কর্তা আদেশ করলেন—নৌকা খুলে পূজা-বাড়ী ঘাটে রওনা হও। মাঝি মাল্লারা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ধ্বনি দিয়ে নৌকা খুলে দিল। যথাসময় নৌকা গিয়ে পূজাবাড়ীর ঘাটে পৌঁছল।

আচার্য কর্তা কাশী নট্ট, রাজেন্দ্র সরকার ও নকুলেশ্বরকে ডেকে আসরের কাজ ভাগ করে দিলেন। কাশী নট্টকে বললেন—কাশী, তুমি শুধু গানের জবাব করবে। রাজেন্দ্রকে বললেন—তুমি টপ্পার সহর করে ডাক-ছড়া বলবে। নকুলেশ্বরকে বললেন—তুমি গানগুলি বলে দেবে; আর রাজেন্দ্র যে টপ্পা করে

ডাক ছড়া বলবে সেই বিষয়বস্তুটার ভিত্তিতে সুরে ছন্দে পাঁচালী বলবে। আমাকে সব সময় বিরক্ত করবে না, আমার কাজ আমি বুঝে করবো।

কালকাঠির উমেশ-যামিনীর দল অনেক পূর্বেই ঘাটে পৌঁছেছিল। আচার্য কর্তার নৌকা ঘাটে লাগামাত্র উমেশ সরকার এসে আচার্য কর্তাকে প্রণাম করে বললেন—কর্তা আপনার সঙ্গে গান করতে আসা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। তবে এ বছর আপনি অনুগ্রহ করে জোটে রাখবার জন্য বায়না দিয়েছেন তাই এসেছি। আমার জাত-মান সব আপনার হাতে, কোন প্রকারে চালিয়ে নেবেন।

আচার্য কর্তা—আমি চালাবার কে? গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া চালাবেন।

উমেশ সরকার চলে গেলে আচার্য কর্তা রাজেন সরকারকে ডেকে বললেন—দেখ রাজেন, উমেশ সরকার সরল সোজা মানুষ, কুটিল কাটিল্য বোঝে না। ওর সঙ্গে সরলতা নিয়েই আসরে আলোচনা করবে। খামখেয়ালী করে একটা উদ্ভট কিছু করে ওকে অপমান করবে না—মনে থাকে যেন।

## সোনার গাঁ পালাগানে কবিগান

যথা সময়ে গান আরম্ভ হল। যষ্ঠী-সপ্তমী দুই পালা শুধু গান আর জবাবে কেটে গেল টপ্পা পাঁচালী হল না। কাশী নট্টই সেই দুই দিনের ঠেকা দিলেন। অষ্টমীর রাত্রে উমেশ সরকার টপ্পা করলেন—তার বিষয়বস্তু হল—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ: শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিভীষণের প্রশ্ন। উমেশ সরকার বিভীষণের ভূমিকা নিয়ে আচার্য কর্তার দলকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করলেন—

আমি কল্পনার রাজা বিভীষণ, তুমি বাঁকা শ্যাম।
করেন রাজসূয় যজ্ঞ যুধিষ্ঠির,
নিমন্ত্রণ দিল পার্থ বীর,
তাইতে যজ্ঞ দেখা করে স্থির, এই যজ্ঞে এলাম॥
দেখি লক্ষ শালগ্রামের পরে
উচ্চাসন দিয়ে যুধিষ্ঠির রাজার।
ব্রাহ্মণের পাও ধোয়াতে,
তোমার হাতে সুবর্ণ ঝারার।
আমি নিমন্ত্রিত অতিথি,
না রেখে আমার প্রীতি,
আজ তোমার একি ব্যবহার॥

রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম দিতে
আমাকে বল কেন বারংবার ?

টপ্পার লহর শেষ করে উমেশ সরকার ডাক-ছড়া ধরে বললেন—

বিভীষণ নামটি ধরি লঙ্কাপুরে বসত করি
লঙ্কেশ্বর রাবণ রাজার ভাই।
দেব দানব গন্ধর্ব নরে সবাই আমায় শঙ্কা করে
সবার কাছে আমি মান্য পাই ॥
যুধিষ্ঠিরে যজ্ঞ করে যজ্ঞ দেখিতে আমারে
সমাদরে করলে নিমন্ত্রণ।
ডেকে এনে যজ্ঞাগারে নিমন্ত্রিত অতিথিরে
কেন তুমি কর নির্যাতন ॥
লক্ষ বেদীর উপরে বসাইয়ে যুধিষ্ঠিরে
নিজে ধোয়াও ব্রাহ্মণের চরণ।
যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করতে বল আমার কি নিমিত্তে
কোন্ কার্য করিতে সাধন ॥

ইত্যাদি বলার পর ধুয়া ধরে অনেকক্ষণ নিজ বক্তব্য বিস্তৃতভাবে পেশ করে উমেশ সরকার চলে গেলেন।

আচার্য কর্তার দল নিয়ে রাজেন্দ্র সরকার আসরে গেলেন। আচার্য কর্তার আদেশ আছে টপ্পার লহরের জবাব দেওয়া এবং ডাক-ছড়া বলা রাজেন্দ্রের উপরেই ন্যস্ত। তাই তিনি আসরে গিয়ে টপ্পার লহরের জবাব দিতে লাগলেন—

তুমি বীরকুলের পবিত্র পাত্র, মিত্র বিভীষণ।
পেয়ে যজ্ঞের পত্র স্বহস্তে,
এই যজ্ঞ দেখার মনস্থে,
আজ এসে ইন্দ্রপ্রস্থে, দিলে দরশন ॥
আছে রাজসূয় যজ্ঞে রাজার প্রণাম
রাজনীতি ভঙ্গ করতে চাও নাকি।
এসো মিতা, দুই মিতায়
ভক্তরাজ ধর্মের মান রাখি
উন লক্ষ রাজা যারা,

প্রণাম করেছে তারা,
একমাত্র তুমি রও বাকা।
দেখ আমি যারে প্রণাম করি
মিতা গো তোমার করতে বাধা কি ?
রামরূপে ডাকলে মিতা—
সেকথা ভুলেছ নাকি ?

টপ্পার লহরের জবাব দিয়ে রাজেন্দ্র সরকার ডাক-ছড়া সুরু করলেন—

বিভীষণ মহামতি তুমি নাকি লঙ্কাপতি
গর্ব করে পরিচয় দাও।
যে তোমাকে দিল রাজ্য তাঁরে করে অগ্রাহ্য
ছোট মুখে বড় কথা কও ॥
রাবণ রাজার লাথি খেয়ে যার চরণে শরণ লয়ে
মিতা বলে করলে আলিঙ্গন।
আমি হই সেই রাম পাণ্ডব-সখা নিলেম নাম
ধর্ম-রাজ্য করিতে স্থাপন ॥
ধর্ম রাজা যুধিষ্ঠিরে বসায়ে বেদীর উপরে
দেশবিদেশে দিলেম নিমন্ত্রণ।
লক্ষ রাজার প্রণাম দিবে বশ্যতা স্বীকার করিবে
তবে হবে যজ্ঞ সম্পূরণ ॥
ঊন লক্ষ রাজা যারা প্রণাম করিবে তারা
করেছে যাঁর বশ্যতা স্বীকার।
তুমি একা থেকে বাকী যজ্ঞ পণ্ড করবে নাকি
কেন তোমার হেন অহঙ্কার ॥
আমি যাঁরে দাদা বলে প্রণাম দিয়ে চরণ তলে
ভৃত্যের মত করতেছি সেবন।
তুমি তারে প্রণাম দিলে জাত যাবেনা কোন কালে
প্রণাম কর রাজা বিভীষণ ॥

এইভাবে অনেকক্ষণ ত্রিপদী ছন্দে ডাক-ছড়া বলে রাজেন্দ্র সরকার তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন। এবার নকুলেশ্বরের পালা। ধুয়া দিয়ে সুরে ছন্দে

পাঁচালী বলতে হবে। নকুলেশ্বর উঠেই ধুয়া দিলেন—

মিতাগো বর্বরের ন্যায় গর্ব করোনা —
পাণ্ডবের বিরুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে মরো না।
এল যত রাজগণ, সবে বন্দিল চরণ,
সম্রাট বলে যুধিষ্ঠিরকে করেছেন বরণ।
তুমি করে তার বিরুদ্ধাচরণ—
মরণ বরণ করোনা॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যাঁর ভয়েতে অস্থির,
রাজসূয় যজ্ঞ করেন সেই যুধিষ্ঠির।
দেখে যাঁদের পরাক্রম,
পালায় ইন্দ্র চন্দ্র যম,
তুমি তো অধমের অধম—
তাঁদের চেয়ে বড়না॥
গাণ্ডীব নিয়ে দাঁড়ায় যদি একা ধনঞ্জয়,
স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল সে করতে পারে জয়।
ভীমের গদার ঘায়,
কত রাক্ষস প্রাণ হারায়,
অকালে মরিবার আশায়—
কাল সাপের লেজ ধরো না॥

এভাবে নকুলেশ্বর কিছু সময় বলার পরে সুর পরিবর্তন করে ত্রেতাযুগে বিভীষণের আনুগত্য, রামপদে আত্ম সমর্পণ, নিজপুত্র তরণী সেনকে রামপদে উৎসর্গ—এই বিষয়গুলি কীর্তন সুরে এমন রসালভাবে বর্ণনা করলেন যে আসরের শ্রোতৃমণ্ডলী, এমন কি স্বয়ং আচার্য কর্তাও খুব সন্তুষ্ট হলেন।

এর আগে নকুলেশ্বর আর কখনো কীর্তন সুরে পাঁচালী বলেননি। গত বছর নরসিংহদী বাজারে গানের সময় হরি আচার্য মহাশয় যে কীর্তন সুরে পাঁচালী বলেছিলেন, তাই নকুলেশ্বর এত দিন ধরে মনে মনে আবৃত্তি এবং অনুশীলন করছিলেন এবং আজকের আসরেই তার প্রথম প্রয়োগ। গান ছেড়ে নৌকায় গেলে আচার্য কর্তা তাঁর অনুকরণ শক্তির প্রশংসা করে অজস্র আশীর্বাদ করলেন।

রাজেন্দ্র সরকার নকুলেশ্বরের পাঁচালী আর কখনো শোনেননি। আজ পাঁচালী শুনে বললেন—ভাইটি নকুল, তোর পাঁচালী শুনে আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম। যেমন বাচনভঙ্গী তেমনি সুরসঞ্চার—সবই ঠিক আছে। এই সঙ্গে দু'চারখানা ভালো শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারলেই তো সোনায় সোহাগা।

নকুলেশ্বর বললেন—দাদা, কি শাস্ত্র পড়লে ভাল হয়, আপনি আমাকে একটু বলে দিন।

রাজেন সরকার একখানা চিঠি লিখে নকুলেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন—এই চিঠিতে আমি তোর জন্য একখানা ভাল পুরাণ-শাস্ত্র পাঠাবার জন্য কলিকাতা গুরুদাস লাইব্রেরীতে লিখে দিলাম, ডাকে দিয়ে আয়।

নকুলেশ্বরের হাতে পত্র দেখে আচার্য কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কিসের চিঠিরে?

নকুল—রাজেন দা আমার জন্য একখানা ভালো শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠাবার জন্য কলিকাতায় চিঠি পাঠাচ্ছেন।

কর্তা—দেখি দেখি কি শাস্ত্র?

আচার্যকর্তা পত্র পাঠ করে দেখেন, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পাঠাবার জন্য লিখেছে। তিনি নকুলেশ্বরকে বললেন—এটা পড়ে কি হবে?

নকুল—দাদা বলেছেন এর মধ্যে অসংখ্য জটিল বিষয় আছে যা অনেক সরকার জানেন না।

কর্তা—আর তুমি বুঝি তাই জেনে নিয়ে অন্যান্য কবিকে আসরে জব্দ করে যশপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে! ছিঃ ছিঃ। ঐ গোঁড়া গোবিন্দের পাল্লায় পড়ে তুইও দেখছি দিন দিন নাস্তিক হয়ে যাবি।

এই বলে তিনি চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজে একখানা চিঠি লিখে ডাকে পাঠিয়ে দিলেন। দশ বারো দিন পরে ভি. পি. এসে পৌঁছল। প্যাকেট খুলে আচার্য কর্তা দু'খানি বই বের করে নকুলেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন—নাও, এই দু'খানি বই বেশ করে মুখস্থ করগে।

নকুলেশ্বর পড়ে দেখেন, একখানি চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, আর একখানি কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী। নকুলেশ্বর আচার্য কর্তাকে বললেন—কর্তা, একটা কথা বলবো?

কর্তা—বল কি বলতে চাও।

নকুল—এ দুইখানিই তো কীর্তন পদাবলী, কীর্তনীয়াদের অমূল্য সম্পদ,

কিন্তু আমাদের কবিয়ালদের প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে এ গ্রন্থ পড়ে কি লাভ হবে ?

কর্তা—লাভালাভের হিসাব পরে পাবে। এখন এই দু'খানি গ্রন্থে যে সব বড় বড় মহাজনের পদ সংগ্রহ আছে, সেইগুলি মুখস্থ করে পাঁচালী বলার সময় স্থান বিশেষে দু'চারটি সমভাবাপন্ন পদ যোজনা করলে পদের গুণে আসরে বাহবা পড়ে যাবে। মানীলোকের মান মেরে, কুতর্কে হারিয়ে বাহবা নেওয়া কবির ধর্ম নয়। রসাল ভাব-ভাষায় মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বক্তব্য পরিবেশন করে যশ-প্রতিষ্ঠা লাভ করাই কবির কাব্য প্রতিভার পরিচয়। যদিও আমাদের কবিগানে জয় পরাজয়ের প্রশ্ন বর্তমান, তবে সেটা বস্তুগত হবার চেয়ে ভাবগত হওয়াই শ্রেয়ঃ। কালী উলঙ্গিনী কেন, স্বামীর বুকে দণ্ডায়মান কেন—এসব প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তরও দেওয়া যায় আর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও করা যায়। গোপিনীদের বস্ত্র হরণ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে লাম্পট্যের অভিযোগ এনে আসরে রঙ্গ-রস ঠাট্টা ইয়ারকী করা সহজ, বৈষ্ণবদের ফোঁটা-তিলক-চৈতন নিয়ে হাসি মস্করা করে সস্তা হাততালি লাভও ঘটে। কিন্তু তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কয় জনে জানে। আমার মতে তথ্যের চেয়ে তত্ত্বের মূল্য বেশী। আর যে জন উভয়ের সমন্বয় সাধন করতে পারে সে তো আরো প্রশংসনীয়। গানে জয় পরাজয়েরও একটা রকমফের আছে। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুর-বাক্য স্মরণ কর—

ন চাপি বৈরং বৈরেণ কেশবঽপ শাম্যতি।
অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং, অসাধুং সাধুনা জয়েৎ ॥
ন পাপে প্রতিপাপংস্যাদ্ সাধুরেব সদা ভবেৎ।
ধর্মেন নিধনং শ্রেয়ঃ, ন জয় পাপ কর্মনা ॥

অর্থাৎ বিদুর বললেন—যে যুধিষ্ঠির ! শত্রুকে প্রীতির দ্বারা, ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা, হিংস্রুককে অহিংসা দ্বারা জয় করাই ধর্ম। অতএব যদি চিরস্থায়ী যশ-প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাও কখনো কারো প্রাণে দুঃখ দেবে না। মানী লোককে অপমান করবে না; কুটিলতা ছেড়ে সরলতা নিয়ে কাজ করে যাবে। কারো অভিশাপ না কুড়িয়ে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা লাভ করে যদি যশস্বী হতে পার, তবে সে যশ তোমার অক্ষয় অব্যয় অম্লান হয়ে থাকবে। গানের আসরে প্রতিপক্ষকে যুক্তি তর্কে হারাবে বৈ কি। কিন্তু সে যেন পরাজয়ের গ্লানি অনুভব না করে, বরং হাসি মুখে পরাজয় স্বীকার ক'রে নিতে পারে তেমনি-ভাবে তোমার বক্তব্য রাখবে।

তিন বছর আগে আচার্য কর্তারই সমবয়সী খ্যাতনামা কবিয়াল হরকুমার শীলের মুখেও নকুলেশ্বর এমনি কথাই শুনেছিলেন। আজ আচার্য কর্তার মুখে এসব উপদেশ শুনে নকুলেশ্বর কোন প্রতিবাদ না করে প্রণাম করে বললেন, আপনার এই আদেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি।

কীর্তনের সুরে পাঁচালী বলার কৌশল আয়ত্ত করে নকুলেশ্বর এখন আচার্য কর্তার দেওয়া সেই চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, কবি জয়দেবের রচনা থেকে পদ উদ্ধৃত করে স্থান বিশেষে প্রয়োগ করে আসরে বেশ বাহবা পেতে লাগলেন।

লক্ষ্মী পূজার গান শেষ করে কালীর পূজার পূর্বেই রাজেন্দ্র সরকার দেশে চলে গেলেন। তাঁর নাকি কালী পূজার বার্ষিক গান আছে। যাবার সময় নকুলেশ্বরকে বললেন.—ভাইটি নকুল, আমি চল্লাম। আশা করি অচিরেই তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে। পাগল দাদার কথা ভুলে যাসনে যেন। আর একটি কথা—জোয়ার থাকতে মুখ ধুয়ে নিবি, তবে আর টান ভাটিতে কাদা মাড়াতে হবে না। রত্নাকরে আশ্রয় নিয়েছিস, হাঙ্গর কুম্ভীরের স্বভাব না নিয়ে, ডুবুরী জহুরী হয়ে তার মণিমুক্তা যত পারিস কুড়িয়ে নে, জীবনে আর তোর অভাব হবে না।

রাজেন্দ্র সরকার চলে যাওয়ার পর নকুলেশ্বরের খাটুনি বেড়ে গেল। এযাবত টপ্পার লহর ও ডাক-ছড়া বলার ভার রাজেন্দ্রের উপরে ছিল। এখন গান বলে দেওয়া, টপ্পা করা, ডাক-ছড়া ও পাঁচালী বলা সবই নকুলেশ্বরকে করতে হয়। গান আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্রাম নেই। স্বর্ণ যত দগ্ধ করে উজ্জ্বলতা তত বৃদ্ধি পায়। এখানে নকুলেশ্বরের অবস্থাও তাই হলো। খাটুনি যত বাড়ল তার উত্তম উৎসাহও দ্বিগুণ বেড়ে যেতে লাগল। কবির আসরে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার একটা সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল।

কথায় বলে, খুঁটীর জোরে মেড়া কোঁদে। কবি-সম্রাট হরি আচার্য যার পেছনে, কবির আসরে তার আর ভয় ভাবনা কি। দলের দোহারগণ সকলেই নকুলেশ্বরকে ভালবাসে এবং সমীহ করে চলে। আচার্য কর্তা এখন বেশ বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে আরামেই আছেন। দুই পালা গান হলে তিনি শেষের দিনের শেষ আসরে গিয়ে কিছু সময় পাঁচালী বলে গান ভেঙ্গে দিতেন।

পর পর গান চলতে লাগল। রাজেন্দ্র সরকার বলে গেছেন, রত্নাকর থেকে যত পারিস রত্ন কুড়িয়ে নিবি। তাই নকুলেশ্বর ভাবলেন—গুরুদেব কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের কাছে শুনেছি, বাঙ্গলাদেশে যত কবিয়ালই কবি গান করেন, কেউ

নিজে গান রচনা করতে পারেন না। আচার্য কর্তার বাঁধা গান নিয়েই সকল দলে গান করেন অথচ জবাব তৈরীতে তাঁদের রচনা ও মুন্সীয়ানার যথেষ্ট ছাপ আছে। কেন তারা গান তৈরী করেন না? তাহলে নিশ্চয়ই গান তৈরী করার মধ্যে বিশেষ কোন নিয়মকানুন আছে। সে নিয়মকানুনটা কি তা জানবার জন্য নকুলেশ্বরের মনে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা দিল।

একদিন গানের অবসরে নকুলেশ্বর আচার্য কর্তার খাস কামরায় গিয়ে এক কল্‌কে তামাক সেজে হুঁকাটি কর্তার হাতে দিয়ে কাছে বসামাত্র কর্তা বললেন—কিরে নকুল! কি যেন বলবি বলে মনে হচ্ছে।

নকুলেশ্বর ভয়বিজড়িত কণ্ঠে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা কথা জানতে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে; কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছি না।

কর্তা—সে কি রে! ভয় কি! নির্ভয়ে বল কি বলতে চাস।

নকুল—আজ্ঞে, গুরুদেব কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের কাছে শুনেছি অন্য কোন কবির সরকার গান রচনা করতে জানেন না। আপনার বাঁধা গান নিয়েই সব দলে গান করেন। কেন তাঁরা গান তৈরী করেন না বা পারেন না, জানতে আমার খুব আগ্রহ হয়।

কর্তা—ওটা তাঁদের উদ্যমের অভাব। যারা গানের জবাব দিতে পারে, ছড়া-পাঁচালী বলতে পারে, ভাষা ও সুর জ্ঞান আছে, তারা একটু চেষ্টা করলেই গান রচনা করতে পারে। তবে গান রচনা করার কতগুলি নিয়ম আছে, যেমন—দেশ, কাল, পাত্র ও বিষয়। এই সব বিবেচনা করে গান রচনা করতে হয়।

নকুল—দেশ-কাল-পাত্র কি ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলুন।

কর্তা—আমাদের কবিগানে প্রশ্নোত্তর বিষয়ক গানগুলি শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লীলা নিয়ে রচিত, যথা—পূর্বরাগ, বিরহ, মান, মাথুর, বিচ্ছেদ, বসন্ত ইত্যাদি। আগে নির্বাচন করবে দেশ; অর্থাৎ বৃন্দাবন, মথুরা দ্বারকা কোন্ লীলা নিয়ে গান রচনা করবে। তারপর কাল—অর্থাৎ কোন্ সময়ের গান, যেমন—কৃষ্ণ শ্রীরাধা কুঞ্জে মিলিত হবার আশা দিয়ে অন্য নায়িকার কুঞ্জে গমন করলেন; নিশি ভোরে বন্ধুর বিরহে নায়িকার যে আক্ষেপ তারই ভাব হচ্ছে মান। তারপর পাত্র—অর্থাৎ গানটি কার উক্তি, কার প্রতি। সব শেষে বিষয়—অর্থাৎ কি বলতে হবে। মাথুর অর্থে শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা, বিরহ অর্থে প্রিয়তমের অদর্শনে প্রিয়তমার মনের যে অবস্থা বা আক্ষেপ—ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করে গান রচনা করতে হয়।

তারপর কতগুলি গান প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনাত্মক, যেমন ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি। আর কতগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক সমস্যা-ভিত্তিক। তবে এসব গানে কোন প্রশ্নোত্তরের অবকাশ নেই। যা ঘটছে বা ঘটেছে তারই কাব্যিক ও সঙ্গীতিক বর্ণনা। এগুলি দেশ জাগরণ, সমাজ ও জন-শিক্ষার তাগিদে রচিত ও গীত হয়। কবিগানের মাধ্যমে জনজীবন ও সমাজ জীবনের ছবি তুলে ধরেছি এ কারণে যে, মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার ছায়া লোকশিল্প ও সঙ্গীতে না পড়লে, শুধুমাত্র শাস্ত্র গ্রন্থ ও দেব-দেবীর লীলা মাহাত্ম্যের আলোচনায় গণ্ডীবদ্ধ থাকলে, তা অচিরে নীরস হয়ে পড়বে, তাকে একঘেঁয়েমী পেয়ে বসবে। আমরা কবিগানের সরকারগণ সাধারণ ব্যক্তি। যারা আমাদের গান শুনতে আসেন তারাও সরল-সোজা সাধারণ ব্যক্তি। তারা দারিদ্র্য হতাশা অভাব অনটন অশিক্ষা কুশিক্ষার নিত্য শিকার। তাদের মূক মুখে ভাষা ফোটে না, নিজেদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা চুপচাপ সয়ে যায়। তাদের ব্যথা বেদনার ভাষা যদি আমাদের কণ্ঠে ফুটে ওঠে তাহলে কবিগানের প্রতি তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা ত আছেই তৎসহ দরদও জাগবে। পূর্ববঙ্গে মরা কবিগান এসব কারণেই আবার পুনর্জীবন লাভ করেছে।

তাছাড়া কবিগানের পালার মধ্যে 'কবি' নামেও এক অভিনব গান আছে। এই গান হাস্য ব্যঙ্গ রসাত্মকও হয়, আবার গুরু গম্ভীর ভাব নিয়েও রচিত হয়। দুটি পক্ষ খাড়া করে প্রশ্নোত্তর ভিত্তিতে এ গান তৈরী হয়। রচনা-পদ্ধতি ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে এসব গান সখী-সংবাদ জাতীয় গানেরই অনুরূপ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—কুম্ভ ও কঙ্কণের কবি, সত্য-মিথ্যার কবি, কাক-কোকিলের কবি, ব্যাঙ ও পদ্মিনীর কবি ইত্যাদি।

এ ছাড়া ভোর এবং গোষ্ঠ গান সম্পর্কেও আচার্য কর্তা আলোচনা করলেন এবং গান রচনা সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিলেন।

সেদিন থেকে নকুলেশ্বরের মনে একটা নতুন চিন্তার উন্মেষ হলো—কি করে গান রচনা করা যায়। হঠাৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামীর একটি পদ তাঁর মনে পড়ে গেল। পদটির ভাব হল—শ্রীকৃষ্ণ সখা সঙ্গে গোচারণে গিয়ে চম্পক ফুল দরশনে চম্পক বরণী রাধার কথা মনে করে অচৈতন্য হয়ে ভূতলে পতিত হলেন—

একদিন চম্পকেরি ফুল দেখিয়ে আকুল
হইল গোকুল শশী।
কোথা রাধা বলে পড়িল ভূতলে
সুবল ধরিল আসি॥

এই পদটি মনে হতেই নকুলেশ্বরের মনে একটা নতুন ভাবের উদয় হলো, সেটি এই—চম্পকের ফুল দেখে যদি চম্পক-বরণী রাধার কথা কৃষ্ণের মনে উদয় হতে পারে, তবে সেই চম্পক বরণী রাধাকে দেখেই বা চম্পক ফুলের কথা স্মরণ হতে পারবে না কেন? যা হোক আমি একটা উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় নিয়ে গান রচনা করবো এই ভেবে নকুলেশ্বর শ্রীগুরুর পদাব্জ স্মরণ করে লেখনী ধরলেন—

চিতেন—একদিন ধেনু সঙ্গে মনোরঙ্গে কানু করে গোচারণ।
পাড়েন—গোষ্ঠ অবসানে, সুবল সনে করে বন বিচরণ॥
১ম ফুকার—তখন কত দূরে গিয়ে, পথ পানে চেয়ে,
চমকি দাঁড়াল হরি;
দেখে তটিনীর তট আলো করি।
নব যৌবনা লাবন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,
জল নিয়ে যায় ভানু কন্যা, কক্ষে স্বর্ণ গাগরী॥
মিল—দেখে সঙ্গিনী বেষ্টিতা রাই,
বলে অধৈর্য্য কানাই, দেখরে সুবল ভাই—
অদূরে মধুর কুসুম উদ্যান।
মুখ—সুবল রে চম্পক কানন বলে,
মনে যেন হয় অনুমান॥
ডাইনা—মৃদুমন্দ হিন্দোলনে আন্দোলিত করে ফুল,
মকরন্দ গন্ধেছন্দে, ভ্রমে অন্ধ অলিকুল।
রক্তিম ভাস্কর আভা, পড়েছে ফুলের উপর,
হেরে যেন প্রতিবিম্ব, পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর।
ফুলের রূপ অযাচিত, কাঞ্চন খচিত,
কোন বিধির রচিত, এ ফুলের বাগান।
মুখ—সুবল রে চম্পক কানন বলে,
মনে যেন হয় অনুমান॥
২য় ফুকার—সুবল, সখা সঙ্গে মিশি, গোচারণে আসি,
দিবানিশি ভ্রমি বনে,
কভু এ বন দেখি নাই জীবনে।
ভানু চলে অস্তাচলে, ত্রস্ত মনে ব্যস্ত চ'লে
এসেছি কি রাস্তা ভুলে, ইন্দ্রের নন্দন কাননে॥

অন্তরা—আমার আঁখি যুগল, হয়েছে পাগল,
ফুলের বরণ হেরিয়া।
আমার মনপ্রাণ গিয়েছে ভুলে,
ফুলে নিয়েছে পরাণ হরিয়া॥
সুবল আমি মালী হব,
ঐ ফুলের বাগানে রব,
ঝরা ফুল কুড়ায়ে লব—
যতনে ডালা ভরিয়া।
শেষে মালা গেঁথে বিনা সুতে,
জ্বালা জুড়াব মালা পরিয়া॥
পরচিতান—জানি কত জন্মের কর্মফলে, গোকুলে জন্ম আমার।
পাড়ন—নইলে হেমসম প্রেমবনে, ভ্রমে এমন ভাগ্য কার॥
৩য় ঝুকার—ফুলে ছত্র ধরে ফণি; যেন কৃষ্ণ বেণী,
নারী পৃষ্ঠে আভরণ;
ফুলের বর্ণ স্বর্ণকুম্ভ যেমন।
শুভ্র বর্ণ কুচি কুচি, ফুল পরমাণু বুঝি,
সজ্জিত সুদন্ত রুচি, যেন রমণীর বদন॥

এই "ফুল সুবল" গানখানা লিখে নকুলেশ্বর বড় সমস্যায় পড়লেন। আচার্য কর্তাকে দেখাতেও সাহস হচ্ছেনা, আবার না দেখালেও চলবেনা। কারণ রচনার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে আচার্য কর্তা যতক্ষণ না অনুমোদন করেন, ততক্ষণ নকুলেশ্বরের মন শুদ্ধ হবে না। উভয় সঙ্কটে পড়ে নকুলেশ্বর মনোমোহন আচার্যের শরণাপন্ন হয়ে বললেন—মনোমোহনদা, আমি একখানা গান লিখেছি। আচার্য কর্তাকে দিয়ে গানখানা মঞ্জুর করিয়ে আনতে হবে। আমার সাহস হচ্ছে না। হয়তো তিনি মনে করবেন, বেটা বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়। অতএব আপনি একটু গানখানা আচার্য কর্তাকে দেখালে ভাল হয়।

মনোমোহন—কেন ভয়টা কিসের! গান তৈরী করেছ—চুরি ডাকাতি তো আর করোনি। যাঁর কাছে শিখতে এসেছ, যখন যা মনে হবে তাঁর কাছে বলবে। তিনি ভুল সংশোধন করে দেবেন। ভয় করে কাছে না গেলে শিখবে কি করে।

এই বলে মনোমোহন আচার্য নকুলেশ্বরের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে আচার্য কর্তার কামরায় গিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এই কাগজখানা দেখুন, নকুলেশ্বর একটা গান লিখেছে, আপনাকে দেখাতে সাহস হয়না বলে আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছে।

আচার্য কর্তা গানখানা পড়ে একটু হেসে বললেন, নকুলেশ্বরকে ডেকে দাও। মনোমোহন এসে নকুলেশ্বরকে পাঠিয়ে দিলেন। কর্তা বললেন—বসো, গান লিখেছ তা দেখাতে এত ভয় করলে চলবে কেন? কচু গাছ কেটে কেটেই তাকাত হয়—এই প্রবাদ কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। লিখতে লিখতেই শিখতে পারবে। গানখানার রচনা এবং কল্পনা বেশ ভালই হয়েছে; তবে একটু বিপ্রলিপ্সা ভাব হয়েছে।

নকুলেশ্বর—সেটা কি বুঝলাম না, বিপ্রলিপ্সা ভাব কাকে বলে?

কর্তা—বিপ্রলিপ্সা হল যা নয় তাই বলে লোক ঠকানোর কৌশল। এ গান খানার রচনার ভঙ্গিতে বিপক্ষ কবিকে ঠকানোর কৌশল-জাল বিস্তার করা হয়েছে

নকুলেশ্বর—একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলুন।

কর্তা—প্রথম কথা হল, এই গানখানার জবাবের জোর নষ্ট করে দিয়েছ, যেমন—তোমার গানের মধ্যে সঙ্গিনীগণসহ চম্পক বরণী রাইরঙ্গিনীকে দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ সুবলসখাকে বলছেন, দেখ দেখ সুবল, কেমন সুন্দর চম্পক ফুলের বাগান! এক ফুকারে বলেছ—

শুভ্র বর্ণ কুচিকুচি, ফুল পরমাণু বুঝি
সজ্জিত সু দন্তরুচি, যেমন রমণীর বদন।

শেষের ঐ "যেমন রমণীর বদন" পদটি না দিলে বিপক্ষ সরকারের জবাব হতো—শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে—

বললি শুভ্র বর্ণ কুচি কুচি. ফুল পরমাণু বুঝি,
মিথ্যা তোর এ অনুমান।
হাসি মুখে সব যুবতী জল নিয়ে যায় দ্রুতগতি
দেখে তাদের মুখের দন্ত পাঁতি
পরমাণু করলি জ্ঞান॥

কিন্তু তুমি 'যেন রমণীর বদন' পদটি দিয়ে বিপক্ষ কবির সেই জবাবের জোরটা

নষ্ট করে দিয়েছ। আর এক স্থানে বলেছ—

ফুলে ছত্র ধরে ফণি যেন কৃষ্ণ বেণী
নারী পৃষ্ঠে আভরণ।

এখানে যেন 'কৃষ্ণ বেণী' পদটি না থাকলে বিপক্ষ কবির জবাব হতো—

বললি, চেয়ে দেখ ঐ ফুলের পরে,
কাল ফণি ছত্র ধরে, কিবা শোভা হল তায়;
ও তুই ভুল বুঝেছিস শ্যাম রায়।
সঙ্গেতে নিয়ে সঙ্গিনী, চলেছেন ঐ রাইরঙ্গিনী,
তাদের কালো চুলের কালো বেণী,
ফণির মতো দেখা যায়॥

তুমি 'যেন কৃষ্ণ বেণী নারী পৃষ্ঠে আভরণ' পদটি দিয়ে বিপক্ষ কবির সেই পথটি বন্ধ করেছ; একেই বলে বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ লোক ঠকানো কৌশল।

তারপর রজ্জু দেখে সর্প-ভ্রম, তমাল দেখে কৃষ্ণ-ভ্রম অর্থাৎ নকল দেখে ভ্রম বশতঃ আসল মনে করে কবিরা রাধার প্রেমোন্মাদ অবস্থা অনেক স্থলে প্রকাশ করেছেন; যেমন চম্পকের ফুল দেখে চম্পক বরণী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়েছিল। তমাল দেখে মেঘ দেখে শ্রীকৃষ্ণকে মনে করে শ্রীরাধিকার উন্মাদাবস্থা প্রকাশ করে কবিরা অনেক পদ রচনা করে গিয়েছেন। আর তুমি চম্পক বরণী সঙ্গিনীগণ সঙ্গে আসল চম্পক বরণী শ্রীরাধাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণের মনে চম্পক ফুলের বাগান বলে ভ্রম দেখিয়েছ, সত্যকে মিথ্যা বলেছ—কল্পনাটি অভিনব নয় কি!

নকুলেশ্বর বললেন – আচ্ছা কর্তা! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার বাচালতা হলে ক্ষমা করবেন তো।

কর্তা—কি বলতে চাও বল; মনে সঙ্কোচ থাকলে শিখবে কি করে?

নকুলেশ্বর—আসলকে নকল ধারণা করাটা যদি অভিনব বা উদ্ভট কল্পনা হয় তবে চিন্তামণির প্রেমে উন্মত্ত হয়ে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর দুর্যোগের রাত্রে একটা আসল মরা মানুষকে কলাগাছ মনে করে তাই চেপে ধরে কৃষ্ণবেন্না নদী পার হয়েছিলেন। চিন্তামণির প্রাচীরের গর্তে মুখ দেওয়া লম্বমান একটা জলজ্যান্ত আসল অজগর সর্পকে রজ্জু মনে করে তাই ধরে প্রাচীর পার হয়েছিলেন। আপনার রচিত 'চিন্তামণির কবি' গানখানার মধ্যেই তো এসব দেখেছি। তাহলে আসল মরা মানুষকে কলা গাছ মনে করা, আসল অজগর সর্পকে রজ্জু মনে করা এটা কি অভিনব কল্পনা নয়?

নকুলেশ্বর এই কথা বলামাত্র হরি আচার্য মহাশয় নকুলেশ্বরের পিঠে চাপ দিয়ে বললেন—বেশ! বেশ! তুই আজ আমাকেও হার মানায়ে দিয়েছিস্। আশীর্বাদ করি নিত্য নূতন কল্পনা বিস্তার করে অল্প দিনের মধ্যেই কবি সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করবি।

আচার্য কর্তার আশীর্বাদ পেয়ে নকুলেশ্বরের উৎসাহ উদ্দীপনা শতগুণ বেড়ে গেল। নিত্যনূতন ভাবের গান রচনায় প্রবণতা দেখা দিল। ক্রমান্বয়ে মেঘের গান, মান, মাথুর, বিচ্ছেদ, বিরহ, ভূতের গান, রাসের গান ইত্যাদি কত গান যে তিনি রচনা করেছেন তা লিখে প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে আচার্য কর্তার দলেই নকুলেশ্বরের প্রথম গান রচনায় হাতে খড়ি।

দেখতে দেখতে বাসন্তী পূজা এসে গেল। আচার্য কর্তা প্রত্যেক বৎসর বাসন্তী পূজার গান শেষ করেই দল বন্ধ করেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। দল বন্ধ হয়ে গেল; নকুলেশ্বর দেশে যাবার জন্য আচার্য কর্তার কাছে বিদায় চাইতে গেলে তিনি বললেন—দেখ নকুল, আমার অনেক শিষ্য ছাত্র আছে।—তারা এক একজন ভাল যশ-প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছে। কিন্তু তোর মতো আমাকে শান্তিতে অবসর দিতে কেউ পারেনি। শান্তি দেওয়া তো দূরের কথা তাদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে আমি অভিশাপও দিয়েছি। শুনিসনি কি আমার একটা ডাক গানে আছে "মাগো অকালে নির্বংশ কর অ-কারাদি গোষ্ঠীগোত্র"—এর অর্থ কি জানিস? আমার প্রধান ছাত্র হয়েছিল দুইজন—অর্জুন দেবনাথ আর অম্বিকা পাটুনী। এরা ছাত্র হয়ে আমার সঙ্গে পুরা শত্রুতা করছে। এমন কি লোক সমাজে আমাকে অপমান করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। সেই দুঃখে লিখেছি, "মাগো অকালে নির্বংশ কর অ-কারাদি গোষ্ঠী গোত্র।" অর্থাৎ নামের আদিতে অ-কার ঐ অম্বিকা ও অর্জুন। যাক সে কথা। তোর ব্যবহারে এবং আগমের কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আগামী সন দুর্গাপূজার পূর্বে আমার কাছে চলে আসবি মনে থাকে যেন। এই বলে আচার্য কর্তা নকুলেশ্বরকে বিদায় দিলেন।

দেশে এসে নকুলেশ্বর আগেই ঝালকাঠী গিয়ে গুরু কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে আচার্য কর্তার দলের অবস্থা, কর্তার ব্যবহার, নিজের শিক্ষার অবস্থা—একে একে সব বর্ণনা করলেন। কৃষ্ণবাবু শুনে খুব সুখী হলেন। তিনি বললেন—আচার্য কর্তা যখন আগামী সনও তাঁর দলে থাকার কথা বলেছেন, মনে করবে এটা তোমার পরম সৌভাগ্য—তাঁর সে বাক্যের অন্যথা করবে না।

কুঞ্জবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে নকুলেশ্বর নিজ বাড়ীতে চলে এলেন। দেখতে দেখতে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে দু'তিন মাস কেটে গেল। শ্রাবণ মাসে নকুলেশ্বর একটা হাও বিলে দেখলেন—শ্রাবনী পূর্ণিমার দিন ঝালকাঠীর সংলগ্ন বাসণ্ডা জমিদার বাবুদের বাড়ী পাষণ্ড দলন আরম্ভ হবে।

**পাষণ্ড দলন**

পাষণ্ড দলনটা কি জানবার জন্য নকুলেশ্বর শ্রাবনী পূর্ণিমার পূর্বেই ঝালকাঠী এসে উপস্থিত হলেন। কুঞ্জবাবু দল বন্ধ করে দেশে চলে গেছেন বলে নকুলেশ্বর গিয়ে সরলার বাড়ীতে উঠলেন। নকুলেশ্বরকে পেয়ে সরলা খুব খুসী হলেন। নকুলেশ্বর বললেন—আপনাদের বাসণ্ডা জমিদার বাবুদের বাড়ী নাকি পাষণ্ড দলন আরম্ভ হবে, আপনি সে বিষয়ে কিছু জানেন কি?

সরলা—জানি বৈ কি। এ পাষণ্ড দলন কলি যুগের সেই জগা-মাধা পাষণ্ডকে যে গৌর-নিতাই দলন অর্থাৎ উদ্ধার করেছিলেন তার চেয়েও বিরাট পাষণ্ড দলন।

নকুলেশ্বর—বিষয়টা কি জানবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে। আপনি একটু বিস্তারিতভাবে বলুন।

সরলা—এ পাষণ্ড ছিল ঝালকাঠীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাসণ্ডার জমিদার গোষ্ঠী। এরা ছিলেন শক্তি উপাসক। বাড়ীতে কালী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালী প্রতিমা, প্রতি শনি মঙ্গলবার জাঁকজমকে কালী পূজা হতো। সেই উপলক্ষে মদ্যমাংসের আদ্য শ্রাদ্ধ। এবং ঝালকাঠীর সেরা বাইজী খেমটালিদের নাচগানে জমিদার বাড়ী দিন রাত মুখরিত থাকত। আমিও সেখানে নাচের মুজরায় গিয়ে স্বচক্ষে যা দেখেছি তা শোন—

বাড়ীর দরজার খালের ঘাটে থাকত পাঁঠা বেপারীদের নৌকা বাঁধা। যখন ইচ্ছা তখনই পাঁঠা নিয়ে কালী মায়ের দুয়ারে বলি দিত। বৈঠকখানার ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক পিঁপে ভরা মদ। ঐ পিঁপের গায়ে অনেকগুলি নল লাগান। জমিদার বাবুরা ইয়ার বন্ধু নিয়ে ঐ পিঁপের চারদিকে ঘিরে বসতেন। প্রত্যেকের হাতেই একটি নল থাকত—মুখে দিয়ে টান দিলেই মদ—বন্টন করার জন্য বেয়ারা ভাকার বালাই ছিল না। ঐ সঙ্গে বাবুটি এসে মাংস পরিবেশন করতো। মদের নেশায় বুঁদ হয়ে নর্তকীদের প্রতি হুকুম হতো—নাচ গাও আনন্দ কর। ইত্যাদি। সে যে কি এক বীভৎস কাণ্ড ভাষায় তার

বর্ণনা হয় না। পাষণ্ড দলন করবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেমন করুণা করে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এখানে তেমনি এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হল।

**মা-দাদা সম্প্রদায়**

ত্রিপুরা ( কুমিল্লা ) জিলার কোম্পানীগঞ্জ থানার অধীন ত্রিশ গ্রাম নিবাসী শ্রীশ্রীবসন্ত সাধু নামে এক মহামানব শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক। বসন্ত সাধু তাঁর স্ত্রীকে ( লৌকিক লীলায় ) ডাকতেন 'মা' আর তাদের শিষ্যমণ্ডলী সাধুকে ডাকতো 'দাদা' বলে। সে জন্য তাঁর সম্প্রদায়ের নাম ছিল 'মা—দাদা' সম্প্রদায়। নরসিংহদী নিবাসী কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য মহাশয়ও ঐ 'মা-দাদা' সম্প্রদায়ের প্রধান শিষ্য। প্রতি বছর বসন্ত সাধু খঞ্জনবলে দেশে দেশে 'নাম' প্রচারোদ্দেশে পাল্কী নৌকা নিয়ে পরিক্রমায় বের হতেন। প্রধান শিষ্য বলে হরি আচার্য মহাশয়ও ঐ সঙ্গে থাকেন।

এ বছর বরিশাল পরিক্রমার উদ্দেশে 'মা-দাদার' দল ঝালকাঠি আসার পথে ঐ বাসণ্ডা জমিদার বাড়ীর ঘাটে এসে বিরাট কালী মন্দির শিব মন্দির পঞ্চ রত্ন, নবরত্ন মঠ ইত্যাদি এ দেখে এক ভদ্রলোকের কাছে বসন্ত সাধু জিজ্ঞাসা করলেন—এটি কার বাড়ী ?

সে ভদ্রলোক বললেন – এটা হচ্ছে বাসণ্ডার প্রতাপশালী জমিদার হরেন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়ী।

বসন্ত সাধু মাঝিমাল্লাদের হুকুম ছিলেন—এই ঘাটেই নৌকা বাঁধ। সাধুর নৌকার উপর লাল কাপড়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—

**শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া জয়তি**
**মা – দাদা সম্প্রদায়**

উক্ত লেখা দেখে সেই ভদ্রলোক বসন্ত সাধুকে বললেন—আপনার নৌকার উপরে ঐ লেখাটা এবং আপনাদের বেশ ভূষণ দেখে মনে হচ্ছে আপনারা পরম বৈষ্ণব। এই গোঁড়া শাক্তের ঘাটে নৌকা বাঁধাটা কি উচিত হবে ?

বসন্ত সাধু সহাস্যে বললেন—কেন, তাতে দোষ কি ? শাক্ত কি ভক্ত হতে পারেনা ?

ভদ্রলোক—তা হয়তো পারে ; তবে একটা প্রবাদ কথা আছে 'শাক্ত আর বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব'। জমিদারবাবু ঘোর মাতাল। নেশার ঘোরে শেষে একটা হৈ-

হল্লা না বাধিয়ে বসেন। বলা তো যায়না মাতালের খেয়াল।

বসন্ত সাধু—আপনি সেজন্য চিন্তা করবেন না। আমিও চাই জমিদারবাবুর মনে সে দ্বন্দ্বের উদয় হোক্। তা হলেই তো ভালমন্দ বুঝবার মতি হবে। আর গৌর নিতাই যদি হরিনাম দিয়ে পাষণ্ড জগা-মাধাকে উদ্ধার করতে পারেন, তবে আমরা কেন পারবনা জমিদারবাবুকে উদ্ধার করতে? হরিনাম যে সর্বশক্তিমান।

এই বলে বসন্ত সাধু সঙ্গী ভক্তগণকে বললেন—তোমরা সবে মিলে নামগান কর। তখন ভক্তবৃন্দ খোল করতাল সহযোগে নাম আরম্ভ করলেন—

ভজ গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া, কহ গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া
লহ গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া নাম রে।
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভজে. সে যে আমার প্রাণ রে—

অকস্মাৎ নাম কীর্তনের ধ্বনি বৈঠকখানা ঘরে জমিদার বাবুর কর্ণে প্রবেশ করে তাকে আনমনা করে ফেলেছে। তিনি নায়েবকে ডেকে বললেন—দেখে আসুন তো আমাদের নদীর ঘাটে ও কিসের কোলাহল? কিসের শব্দ?

নায়েব মশাই ঘাটে গিয়ে সবিশেষ জেনে এসে জমিদার বাবুকে বললেন—ও কিছু নয়; কতগুলা বৈরাগী বৈষ্ণবের দল দেশ পরিক্রমায় বের হয়েছে। তারাই ঐ হৈ-হল্লা করছে।

জমিদার—আমি যাব, চলুন আমার সঙ্গে। নায়েব ও অন্যান্য ইয়ার বন্ধুরা আঁৎকে উঠে বললেন—সে কি! আপনি যাবেন কোথায়? ওরা বৈষ্ণব ভিখারীর দল কিছু পাওনার আশায় বেরিয়েছে। গণ্ডগোল ডেকে না এনে পাইকপেয়াদা পাঠান। ব্যাটাদের ঠেঙিয়ে বিদায় করুক। আর যদি কিছু দিতে চান লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ত মিটে যায়; আপদ তাড়াতাড়ি বিদায় হয়। আপনি যাবেন কেন?

জমিদার—না না! আমিই যাব, যা দিতে হয় আমিই দেবো—এই বলে জমিদার হরেনবাবু উন্মত্তের মতো ঘাটের দিকে ছুটলেন। পেছন পেছন ইয়ার বন্ধুর দলও টলতে টলতে ছুটলো।

বসন্ত সাধু দূর হতে দেখলেন—নীল রং এর লুঙ্গী পরা গেঞ্জী গায়, নেশার ঘোরে চোখ দু'টি ঢুলু ঢুলু জমিদারবাবু স্খলিত পদে নৌকার দিকে ছুটে আসছে। সাধুও পাল্কী হতে ডাঙ্গায় নেমে হাত দুটি বাড়িয়ে জমিদারবাবুর কাছে অগ্রসর হওয়ামাত্রই জমিদারবাবু ঝাতাহত কদলী বৃক্ষের মতো বসন্ত সাধুর

পদতলে পতিত হয়ে সাশ্রুলোচনে বললেন—বাবা, আমায় উদ্ধার কর, উদ্ধার কর।

বসন্ত সাধু অমনি তাকে তুলে সাগ্রহে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করে বললেন—ভয় কি! উদ্ধার করার মালিক যিনি তিনিই তোমায় উদ্ধার করেছেন। নতুবা তোমার এ অভাবনীয় পরিবর্তন হবে কেন? এখন এস আমরা সকলে মিলে সমস্বরে সেই পতিত পাবন গৌর হরির নামগুণ কীর্তন করি।

এই বলে জমিদার বাবুকে মধ্যস্থলে নিয়ে চৌদিকে সব বৈষ্ণব ভক্তগণ কীর্তন আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ কীর্তনের পর বসন্ত সাধু বললেন—আমরা তোমার বাড়ীতে চৌষট্টি প্রহর কীর্তন এবং মহামহোৎসব করতে চাই—যদি তুমি রাজী থাক।

জমিদার বললেন—প্রভু আমি ঘোর পাষণ্ড কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানহীন। আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করলাম। যা আপনার ইচ্ছা তাই করুন। আমি শুধু ভৃত্যের মতো আপনার আদেশ পালন করব।

হরিনামের কি ঐশী শক্তি। যে জমিদার ছিল পাষণ্ড উচ্ছৃঙ্খল মাতাল পূতি-গন্ধময় নরকের কীট; আর আজ হরিনামের প্রভাবে সেই জমিদার স্বর্গের নন্দন কাননের পারিজাত ফুলের পরমাণু। সেদিন থেকে বাসণ্ডার জমিদার বাড়ীতে কীর্তন মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে।

নকুলেশ্বর সরলাকে বললেন— চলুন, আগামী দিন গিয়ে এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে আসি।

পরদিন খুব ভোরে নকুলেশ্বর সরলার সঙ্গে বাসণ্ডার জমিদার বাড়ীর উদ্দেশ্যে চললেন। দূর থেকে নকুলেশ্বর শুনলেন—আকাশ বাতাস মুখরিত করে হরিনামের ধ্বনি উঠেছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

জমিদার বাড়ীর দরজার নদীর খেয়া পার হয়ে ওপারে উঠে দেখলেন—বিরাট নাম যজ্ঞের প্যাণ্ডেল করা হয়েছে, চতুর্দিকে ঐ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর লেখা, গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি স্থাপিত। অসংখ্য বৈষ্ণব সাধু মহান্তের সমাবেশ। অবিরত নাম-কীর্তন হচ্ছে। নকুলেশ্বর দেখলেন মধ্যস্থলে সেই মা-দাদা সম্প্রদায়ের বসন্ত সাধু আর তাঁর প্রধান শিষ্য হরি আচার্য ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করছেন—যেন স্বয়ং গৌর নিতাই দুই-ভাই পাষণ্ড দলনের জন্য পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন।

নকুলেশ্বর তিন চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন শুনলেন, কিন্তু আচার্য কর্তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেন না। ঐ মহাকীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশ করার সাহস হলনা। সরলাকে নিয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। যে জমিদারের নামে মানুষের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি হত যে ছিল ম-কারোপাসক, তার আজ এত পরিবর্তন। পরিধানে গৈরিকবসন, স্কন্ধে নামাবলী, সর্বাঙ্গে তিলক ফোঁটা, গলে তুলসীর মালা! ধন্য! ধন্য হরিনামের মহিমা। ভাগবতে লিখেছে—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা—
জাতানু রাগো দ্রুত চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি, রোদিতি, রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি—লোক বাহ্য॥

( ভাগবত ১১। ২। ৪০ শ্লোক )

অর্থাৎ এই প্রকার ব্রতধারী মনুষ্য নিজের প্রিয়নাম কীর্ত্তনের দ্বারা জাত-প্রেম হইয়া, বিগলিত চিত্তে বিবশ হয়ে তিনি উচ্চৈস্বরে কখনো হাসেন কখনো কাঁদেন, কখনো চেঁচান, কখনো গান করেন আর কখনো বা উন্মাদের মতো নৃত্য করেন ; কোন ঘৃণা লজ্জা ও লোকনিন্দার ভয় করেন না।

নকুলেশ্বর দেখলেন ভাগবতের সেই শুক মুনির বাণী শুধু কাল্পনিক নয় বর্ণে বর্ণে সত্য। হরিনামের উদ্দেশ্যে শত শত প্রণাম করে নকুলেশ্বর সরলাকে নিয়ে ঝালকাঠী চলে এলেন। শাস্ত্রে বলে—

শৈব শাক্ত গাণপত্য, সৌরশ্চ দেবপূজকঃ।
গোবিন্দ শরণঃ পশ্চাদ্ভবেদ যদি স বৈষ্ণব॥
শাক্তস্তু বৈষ্ণব ভূত্বা দুর্গতিং ত্রায়তে স্বয়ম্।

অর্থাৎ শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য ইত্যাদি সকল উপাসকই পরে কৃষ্ণমন্ত্র নিতে পারেন। শাক্ত যদি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করে তবে সে সকল দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পায়।

বাসন্তীর শাক্ত জমিদার গোষ্ঠীকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করে, তাদের সর্ববিধ দুর্গতির পথ হতে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করে, কীর্ত্তন মহোৎসব সেরে হরি আচার্য মহাশয় ঝালকাঠীর আড়তদার পট্টীর সোনারগাঁ পানামের গদীতে এসে নকুলেশ্বরকে ডেকে পাঠালেন।

নকুলেশ্বর গিয়ে আচার্য কর্তাকে প্রণাম করে বললেন—আপনার সঙ্গে দেখা

করবার জন্ত আমি বাসওা জমিদার বাড়ী গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনাদের ঐ মহা নামযজ্ঞে প্রবেশে সাহস না পেয়ে ফিরে এসেছি। এখন আদেশ করুন কি করতে হবে?

আচার্য কর্তা—গত বছর দল বন্ধের সময় যা বলে দিয়েছি স্মরণ আছে তো?

নকুলেশ্বর—আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে আছে।

আচার্য কর্তা—তবে এই নাও, এই দুই শত টাকা। এবার তোমাকে মাসিক একশত টাকা এবং খাওয়াপরা সব দেব। দুই মাসের মাহিনার টাকা দাদন দিলাম। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি নরসিংহদী আমার আশ্রমে যাবে। ভুল হয় না যেন।

নকুলেশ্বর টাকাগুলি হাতে নিয়ে প্রণাম করে বললেন—তবে এখন আসি।

আচার্য কর্তা—হ্যাঁ এসো। মনে থাকে যেন। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমলিন দত্ত কর্তৃক ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং ৩০/১এ কলেজ রো কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত।

KRISHANU
Quarterly

Vol. IX No. II
Rs. 1·50

Regd. No.
RN 16533/68

with compliments of

British Paints

(INDIA) LTD.

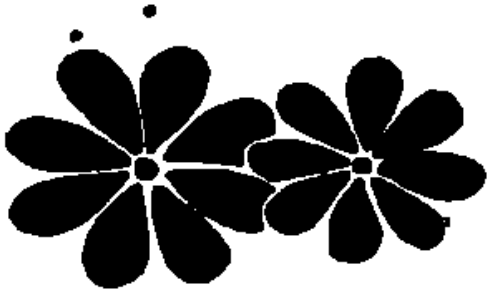

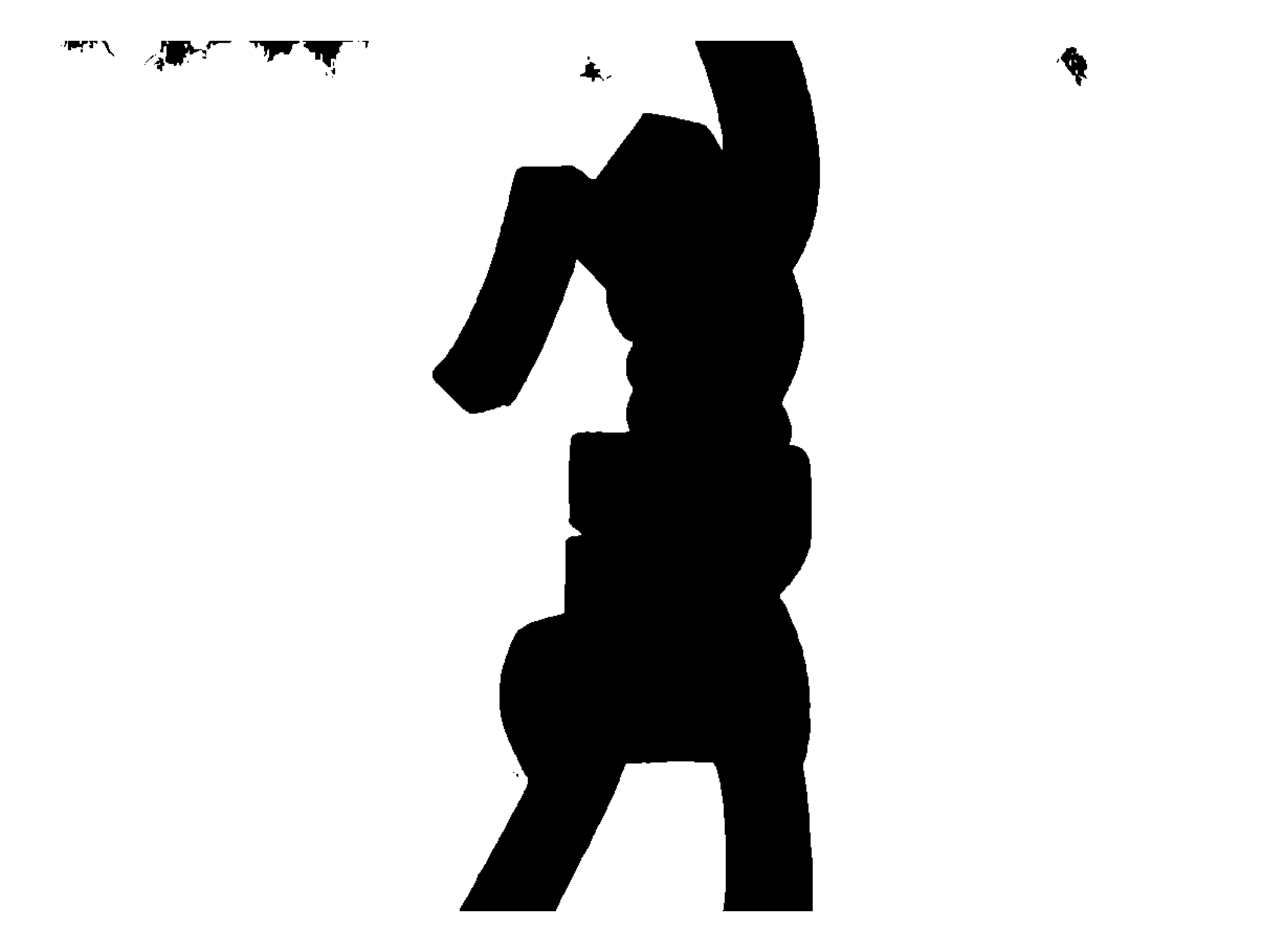

# কৃশানু

সাহিত্য ত্রৈমাসিক
নবম বর্ষ। তৃতীয় সংখ্যা
মাঘ—চৈত্র ১৩৮৩

লেখক সূচী

কবিতা

পূর্ণেন্দু পত্রী, ২৬১/শঙ্করজ্যোতি দেব, ২৬৯/রবীন্দু বিশ্বাস, ২৭০/মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, ২৭০/অমিতাভ দাশগুপ্ত, ২৭১/গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ২৭২/রঞ্জিতকুমার সরকার, ২৭২/মানসকুমার দত্ত, ২৭৩/স্বপন মালাকার, ২৭৪/বিপ্লব চন্দ, ২৭৫/কমলা সরকার, ২৭৬/দীপক হালদার, ২৭৭/অসিত চক্রবর্তী, ২৭৮/দীপঙ্কর সাহা, ২৭৮/ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়, ২৭৯/প্রবীর ঘোষ রায়, ২৭৯/সুভাষ মণ্ডল, ২৮০/শান্ত রায়, ২৮১/কার্তিক মোদক, ২৮২/প্রণব পাল, ২৮৩/রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৮৪/বাপিক রায়, ২৮৫/জীবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৬/

অনুবাদ গল্প

একটি বেদনাময় অধ্যায়/জেমস জয়েস ( অনুঃ—বলরাম দাস ), ২৮৭

প্রবন্ধ

ডাবলিনার্স জয়েসের প্রস্তুতি/প্রমথ সেনগুপ্ত, ২৯৯

বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে মুর্শিদাবাদ/সুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১২

গল্প

জানালা/নির্মলেন্দু রক্ষিত, ৩০৪

প্রগতি/জ্যোৎস্নাময় বসু, ৩১৭

বড় গল্প

গ্রাস/মদন দাশ, ৩২০

নিয়মিত

কবিয়াল কবিগান/দীনেশচন্দ্র সিংহ, ৩৪১

পুস্তক সমালোচনা/পিনাকীরঞ্জন গুহ, ৩৬৪

প্রকাশ
শ্রীপ্রভাস
সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র সিংহ

## আমাদের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকাশন

**মদন দাশ. প্রভাসকান্তি ভদ্র, রত্নেশ্বর বর্মণ ॥ গল্প**

তিন তরুণ গল্পকারের বারোটি বলিষ্ঠ ও সমাজ সচেতন গল্পের সংকলন। সমালোচক মহলে বিশেষ আলোচিত। মূল্য ৫·০০

**সুরদাস ॥ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে**

ভারতবর্ষের বিরাট রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্র সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য বাংলা গ্রন্থ। ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য ৮·০০

**মদন দাস, শান্ত রায় ॥ এক সূত্রে**

নতুন আর পুরনো ষাট জন কবির কবিতার একটি বিশিষ্ট সংকলন।

**মনোজ মিত্র ॥ চাক ভাঙ্গা মধু**

প্রখ্যাত নাট্যকারের মঞ্চসফল ও জনসমাদৃত নাটক। দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ৫·০০

**জ্যোৎস্নাময় বসু ॥ রং বদলায়**

নতুন রীতিতে লেখা চিরায়ত নাটক। বিভিন্ন নাট্যসংস্থা কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ। মূল্য ৩·৫০

**লিপিকা** ৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

# কবিয়াল কবিগান

## দীনেশচন্দ্র সিংহ

কবিগান বাঙ্গালী কৃষ্টির অন্যতম অঙ্গ। পূর্ববঙ্গের কবিগানের শেষ সার্থক প্রতিনিধি কবিয়াল শ্রীনকুলেশ্বর সরকারের (নকুল দত্ত) ৭০ বছর ব্যাপী কবি-জীবনের অনবদ্য আলেখ্য। কবি-সম্রাট হরিচরণ আচার্য, ত্রিপুরার হরকুমার শীল, নোয়াখালীর কাশীনাথ নট্ট, ঢাকার দেবেন্দ্র দাস, তারিণী সরকার, বরিশালের কুঞ্জ দত্ত, শরৎ বৈরাগী, উমেশ শীল, প্রসন্ন নন্দী, নিবারণ সরকার, কুসুমকুমারী, ফরিদপুরের মনোহর সরকার, খুলনার রাজেন্দ্র সরকার, ময়মনসিংহের হরিহর আচার্য প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিয়ালদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চমকপ্রদ বিবরণ। তা ছাড়া রয়েছে শেখ সরলা, মানদা, রাঙা যামিনী, কালা যামিনী, মনমোহিনী প্রভৃতি খ্যাতনামা গায়িকাদের কথা; নামকরা চুলীদের বিবরণ। আগরতলা রাজবাড়ী, নোয়াখালী দালালবাজার, ঢাকা সোনার গাঁ, পানাম, রিকাবিবাজার, খুলনার করাপাড়া, নগাও পীলজং, ফরিদপুরের গোলাবাড়ী, ঢাকা কালীবাড়ী, নরসিংদী বাজার, শ্রীহট্টে করিমগঞ্জ, ত্রিপুরার গৌরীপুর রাজার প্রভৃতি পূজা প্রাঙ্গন, কবির আসর ও অনুষ্ঠাতাদের অম্লান স্মৃতি। 'পাষণ্ড উদ্ধার' জিনের বসন্ত সাধুর মা-দাদা সম্প্রদায়ের কথা। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থের কাব্যিক আলোচনা। টপ্পা, জবাব, সখী সংবাদ, রংফুকারের বিচিত্র সমাবেশ। পূর্ববঙ্গের সরস মাটি ও রসিক মানুষের সাবলীল পরিচয়। পাঁচ শত পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষের অনবদ্য চিত্র।

---

# প্রভাস ভদ্র

নিটোল গল্প লিখনে অত্যন্ত সযত্ন।
কাহিনী নির্বাচনে সংযত।
চেনার মধ্যে অচেনার, চিরাচরিতের
মধ্যে চিরায়তের সন্ধানই তাঁর
সংকল্প। তাঁর কয়েকটি অসাধারণ
গল্পের সংকলন।

# স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

দাম : পাঁচ টাকা

---

লিপিকা ৩০।১এ কলেজ রো কলিকাতা—৯

## কৃশানু

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন ( কেন্দ্রীয় ) বিধির ৮নং ধারানুযায়ী বিজ্ঞপ্তি —

১। প্রকাশের স্থান – ৩০।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশের কাল—ত্রৈমাসিক।

৩। প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম—শ্রীমলিন দত্ত, জাতীয়তা—ভারতীয়, ঠিকানা— রামকৃষ্ণ পল্লী, পোঃ—বাটানগর, জিলা— ২৪ পরগণা সম্পাদকের নাম—শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহ, জাতীয়তা—ভারতীয়, ঠিকানা—গ্রাঃ + পোঃ—দৌলতপুর, জিলা – ২৪ পরগণা।

৪। মালিকগণের নাম ও ঠিকানা : (ক) মলিন দত্ত, রামকৃষ্ণ পল্লী, বাটানগর, ২৪ পরগণা। (খ) মদন দাস, ৬০।২, ব্যানার্জী বাগান লেন, হাওড়া-৬ (গ) হরিপ্রসাদ ভৌমিক, ই, এইচ ১।২১, বাটানগর, ২৪ পরগণা। (ঘ) দীনেশচন্দ্র সিংহ, দৌলতপুর, ২৪ পরগণা।

আমি, শ্রীমলিন দত্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ, ৫ই মে ১৯৭৯

স্বাক্ষর—মলিন দত্ত
প্রকাশক

---

## কৃশানু

একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এককালীন চাঁদা ছয় টাকা। সডাক আট টাকা।

বিশেষ সংখ্যার বর্ধিত মূল্য গ্রাহকদের দিতে হয় না।

নমুনা সংখ্যার জন্য দুই টাকার ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টরা ২৫%কমিশন পাবেন।

কৃশানু মুখ্যত নবীন লেখকদের মুখপত্র। কৃশানুতে রচনা প্রকাশের জন্য তদ্বির করতে হয় না। উত্তমানের যে কোন মৌলিক রচনা প্রকাশের জন্য সাদরে গৃহীত হবে। প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।

পৃথিবীর কোন কোন অংশে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে শিল্পী সাহিত্যিক আইনজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বা বিরোধী নেতৃবৃন্দ লেখায় রেখায় বক্তৃতায় একটু প্রতিবাদের সুর তুললেই বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী নামক সম্প্রদায় সে সুরে সুর মেলাতে গলা ঝাড়েন, যুক্ত বিবৃতি পত্রে ঢেঁড়া-সই দিতে কলমের ক্যাপ খুলে রাখেন। তারা ভিন্-দেশী বৈপ্লবিক কবিতার অক্ষম অনুবাদে, দুর্বোধ্য চিত্র দর্শনে, বিশ্বের প্রচলিত রক্তিম সূর্য, রক্ত বা আগুনের উল্লেখে মারহাব্বা বলে মুক্ত কণ্ঠ হন, ভিরমি যান। সেসব দেশের ঘটনাবলীর মনগড়া নাট্যরূপ দানে হাটে মাঠে লম্ফঝম্প মারেন। বিদেশে মৌলিক অধিকার দলন, বাক্ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণে লোটা লোটা লোনা অশ্রুপাত করেন। অথচ স্বদেশে মানব অধিকারগুলির নির্দয় হননে তারা শুধু নীরব দর্শকই ছিলেন না, কেউ ছুরিতে শান দিতে বালু-গৈচা এগিয়ে দিলেন, কেউ হাড়িকাঠ পুঁততে সাহায্য করলেন। কেউবা "ভারতেশ্বরী" যাতে প্রসন্ন মনে বলি গ্রহণ করেন তজ্জন্য করজোড়ে মুদ্রিত নয়নে উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ করলেন। বিপ্লবীরা সেজেগুজে বৌ-বাচ্চা-কাচ্চার হাত ধরে বলি দর্শন করলেন। গণতন্ত্র বলিদান যজ্ঞে বাঙ্গালী এবার পুরোহিত, অস্ত্র-ধারু, হতা, ধরতার ভূমিকা পালন করেছে, মিথ্যা মামলায় বশীভূত জজ, বিক্রিত উকিল, অনুগৃহীত পেশকারের এজলাসে সাফাই সাক্ষী সেজেছে। অথচ এদেশেই নাকি বিপ্লবী ছানা-পোনা খালেবিলে ব্যাঙাচির মতো কিলবিল করে।

জনতাকে (পার্টিকে নয়) ধন্যবাদ; তারা জননেতাদের সহস্র পদ পেছনে ফেলে হনুমানের বগলদাবা থেকে সূর্যকে মুক্তি দিয়ে দেশটাকে আবার আলোয় ভরে তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী ও বৈপ্লবিক সঙ-গঠনগুলি—যারা মিসা'র ভয়ে 'ওয়েট ক্যাট' হয়েছিলেন—পুরাতন লাল শালুগুলি ঝেড়েমুছে পতপতাতে এবং পঁচিশে বৈশাখ বিপ্লবী ও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গরম বুলি ঝাড়বার জন্য সা-রে-গা-মা সাধতে সুরু করেছেন। এমন ভীরু কাপুরুষ, চাটুকার প্রাণপ্রাণ জাতির রবীন্দ্রনাথের নামোচ্চারণের কোন অধিকার নেই!

কবিগুরুর পুণ্যময় জন্মতিথিতে প্রকাশিত হোল

জ্যোৎস্নাময় বসু-র

# যখন বৃষ্টি

হৃদয় বিনিময়—সংশয়—প্রেম-প্রীতি—বিরহ এবং বিষণ্ণতার আপাত-মধুর কাহিনী। মেজাজে রোমান্টিক লেখকের এই উপন্যাসটি বেশ তর-তাজা অথচ গভীর। রচনা-ভঙ্গি এবং ভাষার মাধুর্য যে কোনো পাঠকের মনে ধরবে। ঝলমলে মলাটে এবং ঝরঝরে ছাপায় শোভন-সুন্দর।

আট টাকা

লেখকের অন্য উপন্যাস

# সিকিদিরি

সাত টাকা

বহু প্রশংসিত এবং অভিনীত নাটক

# রং বদলায়

চার টাকা

লিপিকা/৩০/১-এ, কলেজ রো, কলকাতা ৯

## এসেছিল/পূর্ণেন্দু পত্রী

এসেছিল, এসে চলে গেছে।
গোধূলি দেখেছে তাকে চলে যেতে নদীর ওদিকে
নদীও দেখেছে তাকে গোধূলি রঙের শাড়ী পরা
বটের ঝুরির মত দীর্ঘতর বেণী
বটের পাতার মত চোখ
চোখের ভিতরে যেন চৌবাচ্চা-উপছোনো নীল জল
জলের ভিতরে
বিবিধ চিন্তার মাছ বিভ্রান্ত সংলাপে খেলা করে।
যাকে সে হারাবে তাকে পায় কেন?
কেন তার ভেজানো দুয়ার
প্রত্যেক ঘুমের রাতে ভেঙে যায় শুধু তারই নামে
যাকে সে পাবে না?

এসেছিল, এসে চলে গেছে।
এখনও রয়েছি শুয়ে তারই ঘ্রাণে, ঘাসে ও কাঁটায়।

## মানুষ/শঙ্করজ্যোতি দেব

মানুষ মানুষ বলে কি সুখে আছি
কতোদিন মরুভূমি এসে দুঃখ করে গেছে
কখনো কখনো রোদ্দুর
স্মৃতি সময় বিস্ময় কস্তোবার এসে ডাক দিয়েছে
বেঁচে আছো, বেঁচে আছো। ডাকতে ডাকতে
তবু কোন গভীরে গুহার পেছনে যাযাবর
যন্ত্রণায় হেসে ওঠে,
চোখ ছুটতে ছুটতে
জলতে জলতে বলসে থামে শয়ে
শাপদের নিশিযোর নয় উচ্চাশার শরীরে।

## জন্ম ক্লাউন আমি সার্কাসের ফুল এরিনায়/রবীন্দু বিশ্বাস

কিছুই আয়ত্তে নেই, এমন কি পৌরুষটুকুও, যা খেয়েছে জন্মের দোষ,
অঙ্গের বিকৃতিটুকু আবহচাপের মতো মাথার ওপর এই ভার
মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে গূঢ় চুক্তি করে বুদ্ধির ক্ষমতা কেড়েছে।
স্বাভাবিকতার চেয়ে অসম্ভব দূরে, জীবিকার একমাত্র পথ
বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি নয়, গতানুগতিক ক্লান্ত
তুচ্ছ কৌতুকের হিংসে ঘেরা
সার্কাসের দীর্ঘ খেলা, উত্তেজক ছুট, মধ্যে কমার মতো
হাপছাড়া, নিশ্বাস ত্যাগের পথ, বাটুলশরীর।
প্রত্যেক দুপুরে খড়ি, রঙ, স্বাভাবিকতার ক্ষীণ সামান্যতমশর্তটুকু
প্রলেপে আহত।

সম্মুখ সারিতে ফুল্ল নারী, হাসি ও কথার গন্ধ উচ্চারণের
মতো কাছে, ও হাসি প্রণয়ে নয় গৃহে তো কখনও নয়;
প্রবেশপত্রের মতো বিনিময় মূল্যে কেনা উজ্জ্বল রঙীন।
হাতল শিশুটি তুলে ধরে সামান্য আঙুল তার, যা মাত্র
পিঁপড়ে মেরেছে ক'টি, একটি বা দুটি কিংবা চার ততোধিক
হিংস্র মনে হয় ছোট্ট চিৎকার, যা—কখনো গৃহে নয়,
কোলেও আসে না, অবাধ্য বুকের মধ্যে দোলনায় দোলে।

## অন্ধকারে দুঃখসুখ/মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

কেউ অন্ধকারে সুখ ছড়িয়ে দেয়।
অন্ধকারে ধুলো দেখা যায় না;
অন্ধকারে অন্ধকার হিরন্ময় কারো চোখে!
কখনো সমুদ্র পারে অন্ধকারে মিশে গেছো
যখন দিগন্তরেখা পারাপারহীন?
কিংবা অরণ্য গভীরে, রুক্ষ ডেকে উঠলে
অন্ধকারে অন্ধকার ভয়ঙ্কর তবু স্মরণে নন্দিত
শৈশবের উচ্চারণ বুকে নিয়ে শুধু সুখ;
কেউ অন্ধকারে দুঃখ ছড়িয়ে দিলে
হাত রেখো স্ফটিক ভবকে॥

## কবে হবে খেলা/অমিতাভ দাশগুপ্ত

কথা ছিল
ফিরে দেবে, যা নিয়েছি তার বহুগুণ।
শালের পাতায় মুড়ে যদি দিই দীর্ঘশ্বাস,
হয়ে পোড়ামাটি দিয়ে গড়ে তোলা
সবাক-প্রতিমা,
একতিল আবেগপ্রবণ হলে
খল খল বহে যাবে নদী,
তর্জনির ঈষৎ হেলনে
তছনছ করে দেবে ঘরবাড়ি তোরঙ্গ জাজিম—
সেরকমই কথা ছিল
ফিরে দেবে ঢের, বহুগুণ।

এখনো প্রত্যাশা ঘোরে মাথার ভিতরে কানামাছি,
তিনসন-অজন্মার পরও বসে আছি,
ফুটিফাটা-খেত;
উদ্ভিদ ওঠে না ভেঙে, পোড়া মাঠে জাগে না সঙ্কেত,
ভিনদেশে ভেসে যায় ভেলা—
অথচ নির্দিষ্ট ছিল খেলা হবে। কবে হবে খেলা ?

## পেলুম না আর/গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ছিল আমার নেমন্তন্ন—
বিয়াল্লিশ না বাহাত্তর না বিরাশি সেই বাড়ির নম্বর
খুঁজে খুঁজে তন্ন তন্ন
পেলুম না আর পেলুম না আর পেলুম তো না।
বুক পকেটে চিঠি ছিল, চিঠির ভেতর তার ঠিকানা।
অথচ ঠিক তাকে চিনি, চিনি মানে চিনেছিলুম
অসম্ভব এক রাত্রিবেলায় স্বপ্ন দেখে,
তার ছবিটা এঁকেছিলুম
অতিকালের কাক-ডাকা-ভোর সুদূর থেকে।
হয়নি যখন স্বপ্নভঙ্গ
তখন আমার চেনা ছিল, ভীষণ চেনা, প্রতি অঙ্গ।
পেলুম না আর খুঁজে তাকে পেলুম তো না।
বুক পকেটে চিঠি ছিল, চিঠির ভেতর তার ঠিকানা।

## জলের ভেতরে/রঞ্জিতকুমার সরকার

কি এক সুখের শব্দ জলের ভেতরে খেলা করে।
জল ছুঁয়ে থাকে দেহ, সুখের উৎসমুখগুলি
মানুষের কাছে হাঁটুগাড়ে।
বর্ষার মেঘা ছোটে আকাশের নীল বুক চিরে
উঠোনে ধাতব ছায়া ক্লান্তিহীন নিশ্বাসের মত,
আমার নিজস্ব কোন প্রতিনিধি দুঃখ নেই
চারিদিকে শুধু জল স্থির বা বহতা উপমানে
গভীর সুখের শব্দ লুকে নেয় অবিরাম
ধুয়ে দিয়ে রক্ত ঘাম···দৃশ্যাবলী গন্ধের প্লাবন···

## বুধুয়ার পাখি/মানসকুমার দত্ত

বুধুয়াকে কেউ আর জিজ্ঞাসা করেনা সে
ভালো আছে কিনা ! বহুদিন বন্যা নেই, মাঠ চাষে
চাষে গর্ভবতী হওয়ার বদলে রুগ্ন দুটি হাতে
আকাশের দিকে তাকিয়ে জল প্রার্থনা করে, রাতে
বুধুয়াও মাঠঘাট প্রান্তর দিয়ে একাকী
হাঁটতে থাকে, ক্রমে সে নামনাজানা পাখি
এবং মেঘ ভাখে চোখের সামনে, কতোদিন
তার সেই সব পাখিরা স্বপ্নের কথা বলেনি,
সরোবরে স্বচ্ছ হোয়ে ভাসে স্বাধীন হাঁসেরা
বুধুয়া ভাখে হাঁসেরা কেমন সাবালক হোয়েছে
সেই দিনগুলোয় ফিরে যায় তার চকিত
মন, কৈশোরে কতো পাখি ছিলো, থাকে,
শীসের শব্দে সব হাঁস উড়ে যায়
বুধুয়া তবু একা দাঁড়িয়ে থাকে
জলের দিকে নয় পাখিদের দিকে, মাঠ
নয়, প্রান্তরে খরা থাক, পাখিরাই জানে তার
শুধু নত হওয়ার ইতিহাস

## দুয়ার খোলার শব্দ/স্বপন মালাকার

দুয়ার খোলার শব্দে অসম্ভব কষ্ট হয় বুকে
অনন্ত প্রতীক্ষা ভেঙে যায়,
যেন বা তালার জন্য চাবি,
কিংবা চাবির জন্য তালা।
কোথায় পালাবে তুমি, এই তাখো, আমার বাড়ানো হাত,
উত্তরে দক্ষিণে অকূল সমুদ্র পাহাড়ের সানুদেশ,
অনন্ত নীলিমা।
অদূরে ধাত্রীর বেশে পড়ে আছে সমস্ত পৃথিবী।
সবুজ শস্যক্ষেত জুড়ে, এই তাখো, আমার গ্রীবার ভঙ্গি,
আমার সন্নত উরু, নষ্টবীজগুলি॥
আমার নখের কোণে, এই তাখো, বারুদের গুঁড়ো
আমার হাতের রেখায় জাহ্নবী যমুনা,
পঞ্চমহাদেশ।
তবুও দুয়ার খোলার শব্দে
অসম্ভব কষ্ট হয় বুকে।
অনন্ত প্রতীক্ষা ভেঙে যায়, লুপ্ত পারাপার॥

## ভ্রমণ/বিপ্লব চন্দ

আমরা পাঁচজন বেড়াতে গেলাম—বীরভূম,
অথচ, একজন কোথায় যে হারিয়ে গেল। রাঙা মাটির দেশ দেখে
সে হ'লো উদাস, আত্মমগ্ন কুকুর।
ময়ূরাক্ষীর যৌবন যেখানে বেঁধে দিয়েছে সভ্যতা
সেখানে চিৎকার করে সে ব'লেছিলো --হায়রে!

এইভাবে কখন উরু প্রস্রবণ থেকে চলে এসেছি রামপুরহাট
অজয়নদীর পাশে বামাভূমি, তারামায়ের দেশ।
আশ্চর্য কুকুরের বিদগ্ধতায় আমরা বুঝেছি—
এই হ'ল পাপ নিবারণের মাটি;
হলুদ সন্ন্যাস জেগে উঠেছে বোধিদ্রুমে।
এই শালবন ঘেরা শ্মশানের মাটিতে, কেউ কেউ
আমাদের সেবন করালেন চা, সঙ্গে বিস্কুট, চারমিনার- সিগারেট।

কখন যে ভুলে গেছি অনাত্মীয় মানুষেরা বন্ধুতা করেছে আমাদের
রানীগঞ্জের নার্স, কামারহাটির মুকুষারী
অশোক, সুশীল, কপিল কিংবা বিষ্ণু—
ফিরে যাবার পথে বোঝা গেল কত বেশী দুঃখ পেয়েছি প্রত্যেকে
তাই দেখি সামান্য সখ্যতায়
এখনো কান্নাকাটি হয় মানুষের জন্য মানুষের।

যে হারিয়ে গিয়েছিলো তাঁর দেখা পেয়ে আমরা বলেছি সবাই
হে ভক্ত কুকুর! কোথায় গিয়েছিলো তোমার মমতা
সে শুধু নির্বাক, ছল্ ছল্ চোখে চেয়ে থাকে

একবার বলেছিলো শুধু—হায়, আমি, কি মানুষ না কুকুর!

## একটা প্রপাত কিছু বুনো ফুল ও এক স্থবির

### যাজক/কমলা সরকার

একটা জলপ্রপাত মনে পড়ে, পাশে
গালিচার মতো ফুলবন
হিমশিহরণে বেসামাল।

সেখানে—স্থবির যাজক এক
চিরন্তন স্বয়ংবৃত্ত যে সত্য
ইমারতী অবয়বে তার
স্নিগ্ধ দুহাত দিয়ে প্রপাত ঠেকায়।

একটা জলপ্রপাত মনে পড়ে
শুভ্র প্রমত্ত চালে
একহাঁটু ধুলোমাখা কিশোরীর মতো
দুরন্ত চঞ্চল।

এরা সব রাতদিন ঘুম কেড়ে নেয়
একটা প্রপাত কিছু বুনো ফুল
আর এক স্থবির যাজক
ইমারতী অবয়বে তার
স্নিগ্ধ বিবস্ত্রতা।

## থাকা/দীপক হালদার

আছ এই ভেবে ব্যস্ততাকে মুড়ে রাখি
সাজানো সংসারের মতন শ্রী দিয়ে
আগাগোড়া পদবী অবধি নিয়ে যাই
লাটাই থেকে যতদূর সুতো ছাড়া যায়
জীবনের যতগুলো দিন ক্ষণ ও সময়
ততগুলো তীর্থক্ষেত্র পাবো
সূর্যরশ্মির মতন
হরির লুঠে লুটোবো
এই জেনে বেশ আছি

যদি একে থাকা বলো
এই ছেঁড়া পোষাক তাপ্পি দেয়া চাল চুলো
মধ্যিখানে হৃৎপিণ্ডের মতন আমি
আর আমার মতন একজনকে ভেবে থাকো যদি জীবিত
অথবা মৃতের মতন সত্য
তাহ'লে ভেবে নিও পথ
মানে অঙ্কুরিত লতা অর্থ বেড়ে বেড়ে গেলে
আরো বেশী পাতা ছাড়ে ফুলে ও ফলে

## মৃত্যু/অমিত চক্রবর্ত্তী

ছবি টাঙিয়ে ঘর সাজাতেই সে চলে আসে
সে আসে হঠাৎ তার জানলার পর্দা নাড়িয়ে
আকাশে আলোর বন্যা বাজি হাতে বালক আশ্বিন
ভেতরের মেঘ কিন্তু নাড়া তার বটের শেকড়ে
ভীষণ তৃষ্ণা আসে তড়িঘড়ি বালতি ফেলে কূপে
হাত গলে দড়ি ছোটে হু হু করে বুকের পাতালে
সেখানে দাঁড়িয়ে হাসে উজ্জ্বল কলস
কোমরে ও ঘাড়ে শিরায় শিরায় ওঠে ব্যথা
অনেক কষ্টে ওঠে জল জল নয় পাপের রক্ত আসে উঠে
তখনি ঝাপসা হয় চোখ পারে না সে রুমাল নাড়াতে
সাপ আসে সমুদ্রের বাতি আর মানপত্র নিয়ে
যে পায়ে যাবার আগে রুমাল ওড়াতে
তার চোখে ফুল ঝুরি সোনার ঈগল নাড়ে ডানা
সাপ সেও ভয় পায় দুচোখের পদ্মমণি দেখে

## তবু বারবার সারাক্ষণ/দীপঙ্কর সাহা

যতক্ষণ কাছে আছো 'আমি আছি' বলো বারবার
অনবরত কাঁপে আমার দৃশ্যের বোধ,
বিশ্রী শব্দ করে কাক ডাকে সারারাত,
ঐ জোছনার মধ্যে
পাথর হয়ে কাছে থাকো,
লতাগুল্মের মতো জড়িয়ে থাকি তিমির বিলাসী
এই পোড়া মুখে।
বয়স বেড়ে গেছে বলে,
নীরোগ কোন অরণ্যে এলো যেখানে শুয়ে
কোন সম্রাট, ঐখানে আলো নিয়ে খেলা করে সারাক্ষণ,
তবু বারবার সারাক্ষণ 'আমি আছি' বলো বারবার ॥

## মূল্যবান স্মৃতি/ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

তোমার স্বামী কি জানে, আমার জীবনে তুমি মূল্যবান স্মৃতি
ইচ্ছার প্রদেশে আছো দীর্ঘ দিন ধরে ;

পুবের আকাশ থেকে সূর্যের ধার করা রোদ
প্রতিদিন তোমার উঠানে তোমারই আঁচল ধরে খেলা করে
এই ভাবে বড় হয় ইতিহাস, ধারাপাত ভুলে যায় তোমার সংসার ;
সুগভীর নাভী থেকে জটিল যৌবন, হিংস্র মানুষের স্বপ্নের দেশ
তোমার স্বামীর কাছে শিখেছো কি তুমি ?

আমি জানি, পৃথিবীর নারীর শরীর অনায়াসে মা হতে পারে
জীবনের চাকার তলায় প্রেমিক থাকেনা কেউ, ছিলো না কখনও ;
পুরুষ বুকের ভেতর ভেজা মাটি শুধু থেকে যায় ঋণের মতন
তোমার স্বামীর কাছে তুমি কি বলেছো কিছু জীবনের প্রথম চুম্বন।

## ভুল হতে ভুলের দিকে আমরা/প্রবীর ঘোষ রায়

তুমি আমায়
একটা ভুলের হাত থেকে বাঁচিয়েছ।
এখন তোমার হাত ধরে,
আমি আর একটা ভুলের দিকে
হেঁটে চলেছি।
তৃপ্তির সন্ধানে ঘুরে মরছিলাম।
তুমি আমায়, চোখে আঙুল দিয়ে,
অতৃপ্তির আনন্দ দেখিয়ে দিলে।
গণ্ডী ভেঙ্গে
তুমিই প্রথম বাইরে এসেছিলে।
আমায় নিয়ে, তুমি
আবার সেই গণ্ডীর দিকে চলেছ॥

## কি বা কাম্য/সুভাষ মণ্ডল

"এখনো রোপন করো নি কোনো গাছ ?"
জিজ্ঞাসা ক'রল হেঁকে যাবার সময়।
"সদাব্যস্ত আমি
এই আছি, এই নেই,
কোথায় যে চলে যাই
কোন অন্ধকারে, তার কোনো ঠিকানাও নেই।"
তবু ব'লে যাই—
"ধূসর রয়েছে কত জমি
আগাছায় ভরা অযত্নে পতিত কত মাটি ;
কাঁদে অবহেলায়।
তাদের মুখের দিকে চাও ;
এখনো রোপণ করো নি কোনো গাছ।
আর কবে লালন ক'রবে তাকে
কবে সেবা বড় হবে
নাকি আগাছার জঙ্গলে
মুখ গুঁজে মরে যেতে চাও
ইঁদুরের মত ; খেতে চাও কাকের ঠোকর।

নাকি ম'রে গিয়ে
ফুল হ'য়ে জন্ম নিতে চাও।"

## শীত/শান্ত রায়

আজ এই সন্ধ্যারাতে হিম সারা পৃথিবীতে
যেন গাঢ় প্রতিশোধ, কিন্তু কেন, বোধগম্য হয় না আমার ;
আলো-জ্বলা চিলেকোঠা কিংবা মাঠে, অনিশ্চিত ছাউনির ভেতরে
একটি হাত আর-একটি হাতের
একটি মুখ আর-একটি মুখের
উষ্ণতা প্রার্থনা করে,—হিম তা জানে না ?

বড়ো ঠাণ্ডা, এ-সময়ে দরোজা-জানালা বন্ধ পৃথিবীর অবস্থাপন্নের ঘরবাড়ি,
গরম খাবার কেনা প্রয়োজন হ'লে কিছু, রাস্তায় বেরোয় চাকরেরা।
পুকুরের পাশে জোড়া নেড়িকুকুরের শিরদাঁড়ায়
প্রতিহত হয় নাকি শীত ?

জাঁকজমক হোটেলের বুড়ো দরোয়ান একটু গুটিয়ে ভেতরে যায়, বলে,
আধ ঘণ্টা আগে থেকে অতিথির আগমন বিরল হয়েছে, বাইরে ফাঁকা ,
ভেতরে নাচের ফ্লোরে মিস্ ফায়্যারির কণ্ঠ আর
আ-ঢাকা শরীর থেকে অনর্গল আদিম বংকার
আবদ্ধ বাতাসে কাঁপে, ফুঁসে ওঠে হল-ভরা মানুষের
আভ্যন্তরীন উষ্ণ-স্রোতে···।

শিশুকে গরম জলে হাত-মুখ ধুইয়ে দিয়ে, খাবার-টেবিলে
নিয়ে যাওয়া, কিছু পরে স্বতন্ত্র ছোটো খাটে কম্বলের আরামে পাঠিয়ে
গাঁথা বা রঙিন গল্প বলে শান্ত, পৃথিবীর উজ্জ্বল মায়েরা।
উন্নয়নশীল দেশে একটি তাসের আড্ডা ভাঙে আজ তাড়াতাড়ি, নটা পঁয়তিরিশে
বাইরে এসে চায় বুড়ো জোর মুড়িসুড়ি মেরে হাঁটে গুটিগুটি,
একজন অন্যদের বলে, ভাখো, আজকাল শীতটাও বেয়াড়া···!

শীতের ক্ষমাহীনতা টের পায় এই রাতে শুধুমাত্র একজোড়া জীব,
পুকুরের পুব-পাড়ে চাতাল-বাগান-ঘেরা তিনতলা বাড়িটির গেট খোলা রেখে
একটু আগে কেউ যেন চ'লে গেছে—ভৃত্য ? ছিঁচ্‌কে চোর ?
ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে কুকুর যুগল, বায় বাঁধানো চত্বরে,
ওদের কি মনে পড়লো :
দু'জনের শরীরে রয়েছে
দু'জনের কাতরতা মেটার মতন ওষ্ !

## দেখা/কার্তিক মোদক

বহু দিন পরে তার সাথে দেখা হল, কুঁচ ফলের মতো চোখে
বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বহুক্ষণ,
স্মৃতির পাতায় বর্ণপরিচয় খুলে ফেলে শৈশব
কেমন আছেন ? কত দিন পরে দেখা হল ?
সোনালী পাটের মত চুল ঝরে পড়ে ঝুরু ঝুরু
চিবুকের পাশে,
নদীর ঢেউ-এর শব্দে ভাঙে ঘুম, দূরান্তের রব ;
কোথায়, কবে দেখেছিলেম দোল উৎসবে
ভাঙা দেউলের পাশে যুঁই মল্লিকা
ফুটে ছিল
একা,
এর পর স্রোতের মতো ভেসে গেছে খড় কুটো
নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকা ;
এখনো তাই বহুদিন পরে কুঁচ ফলের মতো চোখে
বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বহুক্ষণ ;

## এত দুঃখ কেন এ-শহরময় ? / প্রণব পাল

ফুটপাথের বাসি বিছানায়
স্বপ্ন ভেঙে গেলে
নিষ্পাপ বালকের প্রশ্ন জেগে বসে।
এত দুঃখ কেন এ শহরময় ।

গল্পে গাঁথা কলকাতা রাজকুমারীর
আস্বাদ এত তেঁতো
ঘুম চোখে চায়া গাছও বোঝে।

এখানে লেনিন ফেরে গোছা দাড়ি চুল সমৃদ্ধ ক'রে
প্রলাপ সঘনে।
আর গ্লা সেক্সপিয়ার ভিক্ষে করে ফুটপাথে প'ড়ে।
রবীন্দ্র স্ট্যাচুর নীচে অবিরত পেচ্ছাপ করে
আলফ্রেড্ নভেল
আর আমিতো শালা কোন্ হরিদাস পাল
ক্রমশ কফিবাড়ীর আড্ডা গাঢ় করি।

তাই এত সহজেই
নিষ্পাপ বালকের প্রশ্নে ভাঙে ঘুম
এত দুঃখ কেন এ শহরে ?
মন্দা কথা নিউটন একটাই ভাল।
একদল নিউটন হ'লে গোটা বিশ্বটা কোলকাতা হবে।
দয়ালু ঈশ্বর।
এত দয়া এখানেই কেন ?
দেখে শুনে কোলকাতাতেই
দু'হাত উজাড় ক'রে গুণীদের গুষ্টি তুলে দিলে।

অন্তত
আমার মত ছোটখাট কবিদের এখানে নাইবা দিতে
ধূর্ত বিধাতা।

কেননা
এখানে লেনিন ফেরে গোছা দাড়ি চুল সমৃদ্ধ ক'রে
প্রলাপ সঘনে।

বস্তিময় খিস্তি করে পিকাসোর ছবি।
ভিঁকির মোনালিসা অন্ধকারে দেহ ফেরি করে
নিষিদ্ধ গলিতে
আর আমিতো শালা কোন্ হরিদাস পাল
ক্রমশ কবিবাড়ীর আড্ডা গাঢ় করি।

## সরে এসে কথা বলো/রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়

সরে এসো, সরে এসে কথা বলো
শব্দের আয়ু কেন ছোটো হবে? কথাগুলো খেলুক-ধেলুক?
কথা মানে যন্ত্রণা, যন্ত্রণার আয়ু কেন ছোটো হবে?

কথা মানে যন্ত্রণা, সরে এসে কথা বলো
কথাগুলো খেলুক-ধেলুক। খেলে-ধেলে, উড়ো ধুলো
অন্ধকারে, চলে যাক তার দিকে
যার-দিকে ছুঁড়ে দেওয়া কথা, মানে যন্ত্রণা।

## হে আমার মৃত্যু/বার্ণিক রায়

হে আমার মৃত্যু, কখনো দেখিনি, জানি না কে তুমি ;
তোমার রূপের গন্ধ বাতাসে বেড়ায়, মৃগের তৃষ্ণার মতো
অন্ধকার রাত্রে স্বচ্ছ জলের পুকুর
হাতছানি দেয় ; বরফের মতো শীতলতা
আটকে ধরে গলা।

কোথাও বাইরে দূরে তুমি নেই,
আমার ভেতরে বসে ফুলের গুঞ্জন তোল
চির বিচ্ছেদের, তুমি আছো, তুমি নেই ;
আমার হৃদয় রক্তে শিরায় অসংখ্য স্রোতে
চলেছ অসীম প্রান্তে আলোবিহীন আলো
শুধু কাঁদে মিলনের প্রত্যাশায় ; সীমাহীন অন্ধকার
কি নরক কিংবা স্বর্গ তোমায় ; হে মৃত্যু
তুমি কি তৈরী করো স্বর্গের উদ্যান ?
ফুলের ভেতরে আলো চঞ্চল কাঁপাতে চাও
দিন রাত্রি ? বৃন্ত হ'তে খসে যাবো ; তারপর
রক্তের স্পন্দনে হ্যাঁ-না এক হয়ে মিশে যায়,
উতলা অতীত ভবিষ্যতে ডুবে যায় তোমায় চুম্বনে।
আমার ভেতরে তুমি গাছের পাতায় আলোয় ছায়ার মতো
নিবিড় সবুজ হয়ে ভরে থাকো। সেখানে আমাকে পাও তুমি ?

## অন্বেষণ/জীবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কি বলবে বলে ফেলো
সময় নেই
এক্ষুণি বেরুতে হবে,
তোমাদের মত জবুথবু হোয়ে বসে থাকলে তো চলবে না
আমাকে বেরুতে হবে।

কি ব্যাপার। তোমাদের মিটিং আছে নাকি?
তা, আমাকে আবার ডাকা কেন?
তোমাদের মত রাজা মন্ত্রী মহামাত্য
সেজে থাকলে তো আর চলবে না
আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে।

আরে। তুমি তো আবার শিল্পী
আমাকে ধরে রেখে কি হবে?
ছেড়ে দাও,
ওদের ডাকতে
এক্ষুণি আমাকে বেরুতে হবে।

তোমরা সবাই এক-দুই-তিন-চার কোরে গুণে যাও
এই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ি, ফেরা না পর্যন্ত
এই-ই ভাবে গুণে যাও।

# একটি বেদনাময় অধ্যায়

**জেমস জয়েস**

**অনুবাদ : বলরাম দাস**

২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, ডাবলিন শহরে জেমস জয়েস জন্মগ্রহণ করেন। এক বৃহৎ পরিবারের একজন তিনি। বৃহৎ পরিবার বলে লেখকের পিতা এই পরিবারকে "Sixteen or Seventeen Children" নামে অভিহিত করেন। তিনি প্রথমে Clongowes wood College এ এবং পরে ডাবলিনে Belvedere college এ শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যালয়ে তিনি একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। লাতিন ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অসাধারণ ঝোঁক ছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Royal University-র অধীনে Dublin College-এ দর্শন ও মাতৃভাষা নিয়ে পড়াশুনা করেন। থিয়েটারেও তাঁর আগ্রহ ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে 'Fortnightly Review' পত্রিকায় ইবসেনের when we dead awaken-র ওপর লেখেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে লেখক প্যারিসে যান এবং লেখকের মাতা অসুস্থ হওয়ায় তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাবলিনে ফেরেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন এবং বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত Dalkey তে একটি স্কুলে পড়াতেন। লেখক এবং লেখক-পত্নী তারপর প্রথমে জুরিখে ও পরে ট্রিএসটি যান। সেখানে লেখক Berlitz School-এ সাহিত্য পড়াতেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডাবলিনে ফিরে আসেন এবং Dubliners ব্যক্তিগত-ভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জুরিখে চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে কাটান। ঐ সময় Privy Purse থেকে ১০০ ফ্রাঁ সাহায্য হিসাবে তাকে দেওয়া হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি প্যারিসে থাকতেন। তাঁর Ulysses প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে Finnigan's wake প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৪১-এর জানুয়ারী তে মারা যান।

মিঃ জেমস ডাক্‌ফি চ্যাপেলিজডে বাস করতেন ছটি কারণে।

প্রথমতঃ তিনি শহরের বাসিন্দা হয়েও নিজের শহর থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে চাইতেন এবং দ্বিতীয়তঃ ডাবলিনের সমস্ত উপনগরগুলি জঘন্য, আধুনিক আর জনপূর্ণ বলে। একটা পুরোনো অন্ধকারময় বাড়ীতে তিনি থাকতেন। তার ঘরের জানলা দিয়ে একটা অব্যবহৃত মদের ভাটিখানা আর ডাবলিন যে নদীর কিনারায় গড়ে উঠেছে সেই অগভীর নদীর উপরদিকটা দেখা যেত। তার ঘরের গালিচাহীন উঁচু উঁচু দেওয়ালগুলোতে ছবির নামগন্ধ ছিল না। ঘরের প্রত্যেকটি আসবাবপত্র তিনি নিজেই কিনে নিয়েছিলেন। একটা কালচে লোহারঙের খাট, জিনিসপত্র ধোবার জন্য লৌহদণ্ডের ওপর বসানো একটা ধাতুর পাত্র, চারটে বেতের চেয়ার, একটা পোষাক রাখার আল্‌না. একটা কয়লা রাখার জায়গা, জলন্ত আগুন রাখার একটা বাঁবরি, একটা ইস্ত্রি, ডাবল ডেস্ক লাগানো একটা টেবিল ; এই তার আসবাবপত্র। ঘরের একদিকে কুলুঙ্গীতে সাদা কাঠের তাক থেকে তৈরী একটা বই রাখার আলমারী আছে। বিছানায় সাদা চাদর পাতা, খাটের পারাগুলো কালো ও লালচে রঙের কম্বল দিয়ে মোড়া। 'ওয়াশ-স্ট্যাণ্ডের' ঠিক ওপরে ঝুলোনা রয়েছে একটা হাতে ধরা ছোট্ট আয়না। অগ্নিকুণ্ডের ওপরে কারুকাজ করা তাক সাজানোর উপকরণ হিসাবে দিনের বেলা শুধু মাত্র একটা সাদা চাকনি দেওয়া আলো সেখানে দাঁড় করানো থাকে। সাদা কাঠের তাকে বইগুলো আকার অনুযায়ী নীচ থেকে ওপর দিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একেবারে নীচের তাকের এক কোণে ওয়ার্ডসওয়ার্থের একখণ্ড সমগ্র রচনাবলী ও কাপড়ের তৈরী নোটবুকের মলাট দিয়ে সেলাই করা এক কপি 'মেনুথ ক্যাটিবিজ্‌ম্‌' একেবারে উপরের তাকের এক কোণে দাঁড় করানো ছিল। তিনি তার লেখার সামগ্রী সব সময় ডেস্কের উপর রাখেন। এখন সেখানে অনুদ্বিগ্ন 'হপ্টম্যান' রচিত 'মাইকেল ক্র্যামার' নাটকটির পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপির ওপরে বেগুনী কালিতে মঞ্চ-নির্দেশ লেখা রয়েছে। পিতলের পিন দিয়ে আটকানো এক গোছা কাগজ তার পাশে পড়ে রয়েছে। কাগজগুলিতে একটি বাক্যকে বার বার লিখে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং 'বাইল্‌ বীনস' বিজ্ঞাপনের শিরোনামাটি কোন এক ব্যঙ্গপূর্ণ মুহূর্তে প্রথম পাতার উপরে এঁটে দেওয়া হয়েছে। ডেস্কের ঢাকনাটা তুললেই ভেতর থেকে একটা গন্ধ বেরিয়ে আসে। গন্ধটা কিসের কে জানে? হয় সিডার কাঠের পেন্সিলের, নয় আঠার নয়ত বা ভুল করে ফেলে রাখা কোন অতিরিক্ত পাকা আপেলের।

যে সমস্ত জিনিস দৈহিক মানসিক গোলযোগের পূর্বাভাস দেয়, মিঃ ডাফ্‌ফি সেই সমস্ত জিনিসকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। একজন মধ্যযুগের চিকিৎসক তাকে গম্ভীর বলতেন। তার মুখে ছিল ডাবলিন স্ট্রীটের মত বাদামী রঙের আভা এবং সেই মুখ বয়ে বেড়াত তার ফেলে আসা বৎসরগুলির সমগ্র কাহিনী। তার লম্বা, বৃহৎ মাথা শুকনো কালো চুলে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল কিন্তু পিঙ্গল বর্ণের গোঁফটা তার রুক্ষ মুখটা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দিতে পারেনি। তার মুখে কর্কশতা এনে দিয়েছিল তার চোয়ালের উঁচু হাড় দুটি। তার চোখে বিন্দুমাত্র কঠোরতা ছিল না। পিঙ্গলবর্ণ ভ্রু'র নীচ থেকে তার চোখ দুটি পৃথিবীর দিকে চোখ মেললে, এমন একটা মানুষের কথা বলে দিত যিনি অন্য মানুষের মধ্যে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার সহজাত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাকে সর্বদা অভিনন্দন জানাতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রায়ই নিরাশ হতেন। নিজের সন্দেহজনক, কটাক্ষ মেশানো কাজগুলির ব্যাপারে তার দেহ আর মন দুরত্ব বজায় রেখে চলে। তার একটা বিদঘুটে নিজের বিষয়ে বলার অভ্যাস ছিল। যার জন্য মাঝে মাঝে মনে মনে নিজের সম্বন্ধে তিনি ছোট ছোট বাক্য রচনা করতেন। স্বরচিত বাক্যটির উদ্দেশ্য হত তৃতীয় পুরুষ আর বিধেয়র ক্রিয়া হত অতীত কালের। ভিক্ষুককে একদিনের জন্যও তিনি ভিক্ষা দিতেন না, সোজা হয়ে একটা মোটা সোটা হেজ্‌ল্‌ হাতে নিয়ে হাঁটতেন।

তিনি দীর্ঘদিন ব্যাগট স্ট্রীটে একটা প্রাইভেট ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ছিলেন। চ্যাপেলিজড থেকে প্রতিদিন ট্রামে চড়ে তিনি অফিসে আসতেন। দুপুরে ডান বার্কের দোকানে গিয়ে এক বোতল লেজার বিয়ার আর চ্যাপ্টা প্লেটের এক প্লেট এরাকট বিস্কুট দিয়ে লাঞ্চ করতেন। চারটের অফিস ছুটি হত। জর্জ স্ট্রীটের একটি ভোজনালয়ে তিনি ডিনার খেতেন। এ জায়গাটা ডাবলিনের বকবকে যুবক সমাজের হাত থেকে মুক্ত বলে তিনি এখানে এলে স্বস্তি বোধ করতেন। এ দোকানে মূল্য-পত্রে একটা সততার চিহ্ন দেখা যায়। সন্ধ্যাবেলায় হয় তিনি তার বাড়ীওয়ালীর পিয়ানো বাজাতেন নয়ত শহরতলীতে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাতেন। 'মোজারট'-এর বাজনার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তাকে মাঝে মাঝে অপেরা বা কনসার্টে এনে হাজির করত। তার জীবনে সময়ের অপচয় বলতে এটুকুই বোঝায়।

ওনার না ছিল বন্ধুবান্ধব না ছিল গীর্জা বা ধর্মের প্রতি আনুগত্য। তিনি সচরাচর কারুর সাথে না কথা বলে সাধারণ জীবন কাটাতেন। শুধুমাত্র বড়দিনে

আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতেন আর কেউ মারা গেলে গোরস্থানে যেতেন। এই দুটি সামাজিক কর্তব্য শুধুমাত্র মর্যাদা রক্ষার খাতিরে করতেন। নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে যে সকল প্রথা সেগুলো তিনি অস্বীকার করতেন। মাঝে মাঝে তিনি মনে করেন যে কোন এক বিশেষ অবস্থায় তিনি তার ব্যাঙ্ক লুঠ করবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি কোনদিনই হল না। তার জীবন সরল সহজ ভাবে বয়ে যেতে লাগল। তার জীবনটা এক রোমাঞ্চহীন গল্প।

একদিন গম্বুজওলা গোলাকার বিরাট একটি হলঘরে তিনি দুজন মহিলার পাশে বসেছিলেন। হলের স্বল্প লোক ও নিস্তব্ধতাই অনুষ্ঠানের ব্যর্থতার সঙ্কেত দিচ্ছিল। তার পাশের মহিলাটি দু তিনবার হলের চতুর্দিকে তাকালেন তারপর বললেন: 'কি দুঃখের কথা! আজ হলে লোকজন এত অল্প! শূন্য আসনদের গান বাজনা শোনানো যে ভীষণ কষ্টকর!'

কথাটা তিনি কথা বলার আমন্ত্রণ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

ভদ্রমহিলাকে একটু অপ্রতিভ দেখে তিনি একটু অবাকও হলেন।

তারা যখন কথাবলায় মশগুল তখন তিনি চেষ্টা করছিলেন স্মৃতিতে তাকে চিরদিনের জন্য গেঁথে রাখতে। এক সময় তিনি বুঝতে পারলেন যে মহিলাটির পাশে উপবিষ্ট যুবতীটি তারই কন্যা। তার বিচারে যুবতীটি তার চেয়ে দু এক বছরের ছোট। তার ডিমের মত মুখখানি সুন্দর ও বটেই, বুদ্ধিদীপ্তও। তাতে আবার বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত কিছু কিছু চিহ্ন বর্তমান। স্থির চোখদুটির রঙ কালচে নীল। তাদের দৃষ্টিতে প্রথমে উপেক্ষা মেশানো ছিল। কিন্তু পরমুহূর্তে তাদের দৃষ্টি গেল বদলে। মুহূর্তের জন্য প্রকাশ করল ইঙ্গিতের অর্থ তারপর আবার ফলাফলের কথা ভেবে পিছিয়ে পড়ল।

কয়েক সপ্তাহ পরে আর্লসকোর্ট টিয়েসে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে আবার দুজনের দেখা হল। তার কন্যার মন যখন সঙ্গীতের মূর্ছনার সাথে মিলেমিশে একাকার ঠিক তখন তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। দু একবার সে তার স্বামীকে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা জানাল কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছিল না যে এটা তাকে সাবধান করার বিজ্ঞপ্তি। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস সিনিকো। ওনার স্বামীর বাপ-ঠাকুর্দা লেগহর্ন থেকে এখানে বসবাস করতে এসেছিলেন। ওনার স্বামী ডাবলিন ও হল্যাণ্ডের মধ্যে চলাচলকারী এক বাণিজ্যপোতের ক্যাপ্টেন। ওনাদের শিশুর সংখ্যা এক।

দৈবক্রমে তৃতীয়বার যখন দেখা হল তিনি ভদ্রমহিলার সঙ্গে 'এ্যাপয়েন্টমেন্ট'

করার সাহস পেলেন। তিনি এলেন। এই হল অনেক সাক্ষাতের এক সাক্ষাত। প্রতিদিন সাঁঝবেলা ছিল তাদের মিলনের সময়। একসাথে ঘুরে বেড়ানোর জন্ত সবচেয়ে নিভৃত স্থানগুলো তারা বেছে নিতেন। মিঃ ডাফ্‌ফি গুপ্ত যে কোন কাজকে ঘৃণা করেন কিন্তু যখন দেখলেন লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করা ছাড়া অন্ত কোন পথ খোলা নেই তখন তিনি মিসেস সিনিকোকে বলাতে বাধ্য করলেন যেন মিঃ ডাফ্‌ফি মিসেস সিনিকোর বাড়ীতে আসে। ক্যাপ্টেন সিনিকো তার আগমনকে সুচক্ষে দেখেন, উৎসাহ দেন, ভাবেন তার মেয়ের একটা কিনারা হতে চলেছে। সম্ভোগের আসন থেকে তিনি তার স্ত্রীকে পদচ্যুত করেছিলেন এবং তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে অন্ত কেউ তার দিকে আর নজর দেবে না। স্বামী অধিকাংশ সময়েই ঘরের বাইরে থাকেন, মেয়ে চলে যায় গান-বাজনা শেখাতে, সুতরাং মিঃ ডাফ্‌ফি মিসেস সিনিকোর সান্নিধ্য লাভ করার যথেষ্ট সুযোগ পেলেন। এর আগে কোনদিনই তারা এমন করে বিহরণ লাভ করেনি, সামঞ্জস্তহীন কোন জিনিসের সঙ্গেও পূর্ব পরিচয় ছিল না। মিঃ ডাফ্‌ফি মিসেস সিনিকোর সঙ্গে চিন্তা জড়ালেন, ভাবনায় অংশগ্রহণ করলেন। মিঃ ডাফ্‌ফি তাকে বই পড়তে দিতেন, বুদ্ধি দিতেন, নিজের জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত জীবনের কিছুটা অংশও দিয়ে দিলেন।

মিঃ ডাফ্‌ফির মতবাদের প্রতিদানে মাঝে মাঝে মিসেস সিনিকো তার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা বলতেন। অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে মিসেস সিনিকো এক দিন মিঃ ডাফ্‌ফিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বললেন তার চরিত্র প্রকাশ করতে। নিজেকে তিনি যেন পাচাত্রবনের পুরোহিত বানালেন। মিঃ ডাফ্‌ফি বললেন যে কিছুদিন ধরে আইরিশ সোসালিষ্ট পার্টি নামে একটি দলের প্রতিটি সভায় তিনি যোগ দিচ্ছিলেন। সেখানে একফুড়ি সভ্যভব্য শ্রমিকদের মধ্যে নিজেকে তিনি বিশিষ্ট এক মানুষ বলে মনে করতেন। মৃদু প্রদীপের আলোয় এক চিলেকোঠায় সভা হত। তারপর যেদিন দল তিনভাগে বিভক্ত হয়ে, নিজ নিজ নেতার অধীনে আপন আপন মতের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে লাগল, তিনি সেদিন থেকে সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি বলেন, ওখানকার শ্রমিকদের আলোচনায় তেমন তেজ বা উৎসাহ ছিল না। বেতনের প্রশ্নেই তারা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করত। কয়েক শতাব্দী ডাবলিনে কোনরকম সামাজিক বিপ্লব হওয়ার সম্ভাবনা নেই, মিসেস সিনিকোকে তিনি বললেন।

মিসেস সিনিকো তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি তার মতবাদ লিখে প্রকাশ করেন না। কিসের জন্ত? প্রচ্ছন্ন উপহাস মেশানো ভাষায় তিনি জিজ্ঞাসা

করলেন। ষাট সেকেণ্ড ধারাবাহিকভাবে চিন্তা করতে অসমর্থ কথায় কারবারী-দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে? নিজেকে স্থূল মধ্যবিত্ত সমাজের সমালোচনার কাছে সমর্পণ করতে? যারা জীবনের নীতি, কর্তব্যের জন্ত পুলিশের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে আর জীবনের চারুকলার জন্ত জলসার পরিচালকের কাছে?

ডাবলিনের বাইরে মিসেস সিনিকোর কুটীরে তিনি প্রায়ই যেতেন। দুজনে প্রায়ই সন্ধ্যাটুকু উপভোগ করতেন। ক্রমে ক্রমে দুটি চিন্তার ধারা একসাথে মিশল। মিসেস সিনিকো এখন লঘু বিষয় নিয়ে তার সাথে আলোচনা করেন। তিনি অনেকদিনই সন্ধ্যা হওয়ার পরেও আলো জ্বালান না। অন্ধকারকে নেমে আসতে দেন নিজেদের ওপরে। সেই বাজনা যা আজও তাদের কানে কম্পিত, এই অন্ধকার ঘর, এই বিচ্ছিন্নতা তাদের মাঝখানের দূরত্বকে সরিয়ে দিয়ে দুজনকে সংযুক্ত করল। এই সংযোগে মিঃ ডাফ্‌ফি উল্লসিত হলেন, তার চরিত্রের রুক্ষতা ক্ষয়ে গেল, হয়ে উঠল তার জীবন আবেগময়। মাঝে মাঝে মিঃ ডাফ্‌ফি নিজেকে নিজের কথা শোনাতেন। ভাবতেন তিনি মিসেস সিনিকোর চোখে দেবদূতের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। তিনি ক্রমশঃ তার অসীম কৌতূহলী চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়ালেন। তিনি অদ্ভুত অব্যক্তিক ভাষা শুনতে পান সেগুলোকে নিজের বলে সনাক্ত করেন। এই বলে আমরা আমাদের দিতে পারি না, আমরা আমাদের নিজেদের। একদিন রাত্রে এই সব কথা সমাপ্ত হল। সেদিন মিসেস সিনিকো চরম উত্তেজনার প্রতিটি লক্ষণ দেখালেন, আবেগে মিঃ ডাফ্‌ফির হাত ধরে গালে চেপে ধরলেন।

মিসেস সিনিকো মিস্টার ডাফ্‌ফির যে অর্থ করেছেন তাতে তার প্রতি মিস্টার ডাফ্‌ফির আর টান রইল না। মিঃ ডাফ্‌ফি এতে অত্যন্ত অবাক হয়েছিলেন। তিনি মিসেস সিনিকোর সাথে এক সপ্তাহ দেখা করলেন না। তারপর সাক্ষাৎকার চেয়ে তিনি তাঁকে একটা চিঠি লিখলেন। তিনি চান না তাদের শেষ সাক্ষাৎকার ধ্বংসপ্রাপ্ত স্বীকারোক্তির প্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত হোক। তারা উভয়ে মিলিত হল পার্কগেটের কাছে একটা ছোট্ট কেকের দোকানে। তখন শরতের ঠাণ্ডা আবহাওয়া, কিন্তু ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে তারা প্রায় তিন ঘণ্টা পার্কের রাস্তার এপাশে ওপাশে ঘুরতে লাগল। একসময় তারা রাজী হল দৈহিক মিলনে। মিঃ ডাফ্‌ফি বললেন, প্রত্যেক বন্ধনই দুঃখের বন্ধন। পার্কের বাইরে এসে তারা চুপচাপ ট্রামের দিকে এগিয়ে চললেন। এক জায়গায় এসে মিসেস সিনিকো খুব জোরে জোরে কাঁপতে শুরু করলেন। অন্ত কোন বিপদের আশঙ্কায় মিঃ ডাফ্‌ফি

তাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। কয়েকদিন পর তিনি একটা পার্শেল পেলেন, তার মধ্যে ছিল তার বই আর স্বরলিপি।

চারবৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। মিঃ ডাক্‌ফি তার সমান্তরাল জীবনে ফিরে এসেছেন। তার ঘর তার বিশৃঙ্খল মনের সাক্ষ্য বহন করছে। বই রাখার তাকে দুটো নতুন বই সংযোজিত হয়েছে। এ দুটো হল নিয়েটজেস্কীর Thus spake zar athustra এবং The gay Science, ডেস্কের উপরকার কাগজে তিনি কদাচিৎ লেখেন। মিসেস সিনিকোর সাথে শেষ দেখা হওয়ার দু'মাস পরে তিনি লিখেছিলেন : পুরুষে পুরুষে প্রেম অসম্ভব কারণ সেখানে দৈহিক মিলন সম্ভব নয় আর পুরুষের সাথে নারীর বন্ধুত্ব অসম্ভব কারণ সেখানে দৈহিক সম্পর্ক ঘটবেই। পাছে মিসেস সিনিকোর সাথে আবার দেখা হয় তাই তিনি কনসার্ট থেকে দূরে থাকতেন। মিঃ ডাক্‌ফির বাবা মারা গেলেন। ব্যাঙ্কের জুনিয়র পার্টনার রিটায়ার্ড করলেন। এখনও তিনি প্রত্যহ সকালে ট্রামে চড়ে শহরে যান, প্রতিদিন সন্ধ্যা-বেলা জর্জের দোকানে আহার সেরে শহর থেকে হেঁটে বাড়ী আসেন ও সান্ধ্য পত্রিকা পড়েন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সে একটুকরো ছেনে জড়ানো গোমাংস আর কিছুটা বাঁধা-কপি মুখে তুলতে যখন উদ্যত তখন তার হাত থেমে গেল। সান্ধ্যপত্রিকার একটা অনুচ্ছেদে তার চোখদুটি আটকে গেল। কাগজটা তিনি একটা জলপাত্রের পাশে দুমড়ে রেখে দিয়েছিলেন। মিঃ ডাক্‌ফি প্লেটে খাবারগুলি নামিয়ে রাখলেন, শুরু করলেন অনুচ্ছেদটি ভাল করে পড়তে। তারপর এক গ্লাস জল খেলেন, প্লেটটা টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখলেন। কাগজটা দু ভাঁজ করে দু হাতের কনুই দিয়ে চেপে ধরে সামনে ফেলে বার বার পড়তে লাগলেন। তার প্লেটের বাঁধা-কপি ঠাণ্ডা সাদা চর্বির মত হয়ে জমে যেতে লাগল। পরিবেশনকারিণী তার খাবার ঠিকমত রান্না হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে মিঃ ডাক্‌ফি বললেন যে তার খাবার নিঃসন্দেহে সুখাদু হয়ছে, এই কথা বলে তিনি অতিকষ্টে দু এক গ্রাস মুখে তুললেন। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

নভেম্বরের গোধূলির আলোর ভিতর দিয়ে তিনি চলতে শুরু করলেন। তার শক্ত হালকা বাদামী রঙের লাঠি মাটিতে রোজকার মত শব্দ তুলল। তার আঁট-সাঁট ওভার কোটের সাইডপকেট থেকে বাহারী কাপড় উঁকি মারল। পার্কগেট থেকে চ্যাপেলিজড পর্যন্ত যে নির্জন রাস্তাটি চলে গেছে, সেই রাস্তায় এসে তিনি তার গতি শিথিল করলেন। তার লাঠি আগের মত জোরে জোরে মাটিতে আর

পড়ল না। তার নিঃশ্বাস পড়ছিল অনিয়মিতভাবে দীর্ঘশ্বাসের-মত শব্দ তুলে বাড়ী পৌঁছেই তিনি সোজা শোবার ঘরে চলে গেলেন। পকেট থেকে কাগজটা বার করে জানলা দিয়ে আসা আবছা আলোয় মেলে ধরলেন তারপর অনুচ্ছেদটা পড়তে লাগলেন বার বার। তিনি জোরে জোরে পড়ছিলেন না কিন্তু পূজারীর মন্ত্রপাঠ করার মত তার ঠোঁট নড়ছিল। অনুচ্ছেদটা হল এই :

সিডনি প্যারেডে একজন মহিলার মৃত্যু
একটি বেদনাদায়ক ঘটনা

আজ ডাবলিন হাসপাতালে সরকারী মৃত-পরীক্ষক-প্রতিনিধি ( মিঃ লিভারেটের অনুপস্থিতিতে ) মিসেস এমিলি সিনিকোর দেহের ওপর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করেন। ভদ্রমহিলার বয়েস চল্লিশ। তিনি গতকাল সন্ধ্যাবেলা সিডনি প্যারেড স্টেশনে নিহত হন। পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে যখন তিনি লাইন পার হতে চেষ্টা করছিলেন তখন কিংস্টন থেকে আসা রাত দশটার ট্রেনের ইঞ্জিনে তিনি ধাক্কা খান, ফলে মাথায় এবং শরীরের ডানদিকে আঘাত লাগে এবং তার মৃত্যু হয়।

ইঞ্জিনের ড্রাইভার জেমস লিনন বলেন যে তিনি রেলকোম্পানীতে প্রায় পনের বছর কাজ করছেন। গার্ডের বাঁশী শুনে তিনি ট্রেন ছাড়েন এবং দু এক সেকেণ্ড পরেই হৈ-চৈ শুনে গাড়ী থামান। ট্রেন খুবই আস্তে চলছিল।

রেলের কুলি পি ডিউরী বলেন যে, যখন ট্রেন প্রায় চলতে শুরু করেছে তখন তিনি একজন মহিলাকে লাইন পার হবার চেষ্টা করতে দেখেন। তিনি তার দিকে দৌড়ে যান ও চিৎকার করেন। কিন্তু তার কাছে পৌঁছবার আগেই ইঞ্জিনের বাফার তাকে ধাক্কা মারে ফলে তিনি মাটিতে পড়ে যান।

*একজন জুরি* : আপনি মহিলাটিকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখেছিলেন ?

সাক্ষী : হ্যাঁ।

পুলিশ সার্জেন্ট কুলি সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, যখন তিনি ঘটনাস্থলে আসেন তখন তিনি দেখেন মৃতদেহটি প্ল্যাটফরমে পড়ে আছে। এ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত তিনি দেহটি ওয়েটিংরুমে রেখে দেন।

কনস্টেবল ৫৭ সমর্থন করেন।

ডাবলিন হসপিটালের সহকারী হাউস সার্জেন ডঃ হাপলিন বলেন, মৃতার নীচেকার দুটি পাঁজরা ভেঙ্গে গেছে এবং ডানদিকের কাঁধ ভীষণভাবে থেঁতলে গেছে। পড়ে যাওয়ার ফলে মাথার ডানদিকে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। এই

ধরনের আঘাত সাধারণ মানুষের মৃত্যু অন্ততঃ ঘটায় না। তার মতে মৃত্যু ঘটেছে সম্ভবতঃ আকস্মিক যন্ত্রণাজনিত স্নায়বিক বিক্ষোভ এবং হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে।

রেল কোম্পানীর পক্ষে মিঃ এইচ. বি. পিটারসন ফিনলে দুর্ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রেল কর্তৃপক্ষ সর্বদাই লাইন অতিক্রমকারীদের দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য নিবারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, ওভারব্রিজ নির্মাণ করেছেন, প্রতি স্টেশনে নোটিশ দিয়েছেন, লেভেল ক্রসিং-এ গেট লাগিয়েছেন। ভদ্রমহিলার অভ্যাস ছিল লাইন পার হয়ে এক প্ল্যাটফরম থেকে অন্য প্ল্যাটফরমে যাওয়া। দুর্ঘটনার অন্যান্য কারণের জন্য তিনি রেলকোম্পানীকে দোষ দেওয়া সমীচিন মনে করেন না।

মৃতের স্বামী, সিডনী প্যারেড, লিওভিলির ক্যাপ্টেন সিনিকোও সাক্ষী দিয়েছেন। তিনি বলেন মৃতা তার স্ত্রী। দুর্ঘটনার সময় তিনি ডাবলিনে ছিলেন না। আজ সকালে তিনি রটারড্যাম থেকে এসেছেন। বাইশ বছর তাদের বিয়ে হয়েছে এবং দু বছর আগে পর্যন্ত তারা একত্রে সুখে দাম্পত্যজীবন কাটিয়েছেন। এই দু বছর তার স্ত্রী'র অত্যাধিক সুরাপান করার অভ্যাস জন্মেছিল।

মিস মেরী সিনিকো বলেন যে সম্প্রতি তার মা রাত্রে মদ কিনতে যেতে শুরু করেছিলেন। সাক্ষী তার মাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং একটি ক্লাবে যোগদান করার জন্য বুঝিয়েছিলেন। তিনি দুর্ঘটনা ঘটার একঘণ্টা পরেও ঘরে ছিলেন না।

জুরীরা মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী এক মতে এসে লেননকে নির্দোষ বলে মুক্তি দিয়েছেন।

সরকারী মৃত পরীক্ষকের প্রতিনিধি বলেন যে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা এবং ক্যাপ্টেন সিনিকো ও তার কন্যার কাছে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি রেলকর্তৃপক্ষকে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য আরও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। কাউকেই দোষারোপ করা হয়নি।

মিঃ ডাফ্‌ফি কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। জানলার বাইরে সন্ধ্যার শান্ত নৈসর্গিক চিত্রের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সেই শূন্য মদের ভাঁটিখানার পাশে শান্ত নদীটি শুয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে লুকান যোড়ের

বাড়ীগুলো থেকে আলো উঁকি মারছে। তার মৃত্যুকাহিনী মিঃ ডাক্‌কিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। সে কথা ভাবতে গিয়ে তার বিতৃষ্ণা এল, ভয় পেল। খেলো নীরস শব্দগুচ্ছ, শূন্যগর্ভ সহানুভূতি, একটা অতি মৃত্যুর বিবরণ ঢাকতে একজন সাংবাদিকের সাবধানতা অবলম্বন করা কথা তার উদরকে আক্রমণ করল। মিসেস সিনিকো শুধু তার মর্যাদাহানি করেনি, নিজেরও মর্যাদাহানি করেছে। সে দেখল তার পাপের মলিন পথটা শূন্য, দুর্গন্ধময়। 'তার আত্মার আত্মীয়'। তার মনে পড়ে গেল সেই লোকটার কথা, যে কুৎসিতভাবে চলে, যাকে সে টিনের তৈরী মদের পাত্র আর বোতল নিয়ে গুড়ির কাছে ভর্তি করাবার জন্য নিয়ে যেতে দেখেছিল। ওঃ! ভগবান! এর শেষ কোথায়! এটা স্পষ্ট যে সে বাঁচার অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছিল, তার অভিপ্রায়ে তীব্রতা ছিল না, সে অভ্যাসের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। ভেঙে যাওয়া জিনিসের একটি টুকরোর উপর সমাজের বিকাশ! সে এত নীচে নামতে পেরেছিল! এটা কি সম্ভব যে মিঃ ডাক্‌কি নিজেকে প্রতারণা করেছে? সেই রাত্রে তার আবেগ প্রকাশের রূপ তার মনে ফুটে উঠল। তার আবেগকে মিঃ ডাক্‌কি কুৎসিত ভাষায় বর্ণনা করল। এমনটি সে এর আগে কোনদিন করেনি। মিঃ ডাক্‌কি যে পথ বেছে নিয়েছে তাকে মেনে নিতে আর এতটুকু অসুবিধা নেই।

আলো যখন অন্ধকার হল তখন মিঃ ডাক্‌কির স্মৃতি বিচরণ করতে শুরু করল। তার মনে হল মিসেস সিনিকোর হাত তার হাতকে স্পর্শ করছে। সেই শোক যা তার উদরে আক্রমণ করেছিল এখন করল তার স্নায়ুতে। সে তার ওভারকোট আর টুপি পরে দ্রুত বাইরে এল। ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে তার দোরগোড়াতে দেখা হল। বাতাস হাতা দিয়ে গুড়ি মেরে কোটের ভেতর প্রবেশ করল। চ্যাপেলিজডে ব্রিজের কাছে একটা মদের দোকানে তিনি এলেন। একটা হট-পাঞ্চের অর্ডার দিলেন।

মালিক অতি যত্নসহকারে পরিবেশন করল কিন্তু তার সাথে কথা বলার সাহস পেল না। পাঁচ ছ জন লোক কিলডেয়ারের এক ভদ্রলোকের ভূসম্পত্তির দাম নিয়ে দোকানে আলোচনা করছিল। কুড়ি আউন্সের বড় বড় পানপাত্র থেকে তারা পান করছিল আর ধূমপান করছিল। মেঝেতে প্রায় থুথু ফেলছিল আবার মাঝে মাঝে তাদের ভারী বুটে করে করাতে গুঁড়ো টেনে এনে থুথু চাপা দিচ্ছিল। মিঃ ডাক্‌কি টুলে বসে বসে এক দৃষ্টিতে তাদের দেখছিলেন, কিন্তু সে তাকানো তাকানো নয়, কিছু যেন শুনছিলেন কিন্তু সে শোনা শোনা নয়।

কিছুক্ষণ পর তারা চলে গেল। মিঃ ডাফ্‌ফি আরও একটা পাকের অর্ডার দিলেন। অনেকক্ষণ রইলেন তিনি। দোকান নিস্তব্ধ, কলরব নেই। দোকানদার কাউন্টারে হাত পা ছড়িয়ে 'হেরাল্ড' পড়ছিল আর হাই তুলছিল। মাঝে মাঝে বাইরে ট্রামের ঝনঝন শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

যখন মিঃ ডাফ্‌ফি সেখানে বসেছিলেন তখন তিনি নিজেকে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে, দুটো মূর্তিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চোখের সামনে এনে কল্পনায় জাল বুনছিলেন। সে উপলব্ধি করল সে মিসেস সিনিকো মারা গেছে। তার টিঁকে থাকা শেষ হয়েছে। সে স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। সে উদ্বিগ্ন হল। নিজেকে জিজ্ঞাসা করল অন্য কি'ই বা সে করতে পারত। চাতুরীর নাটক রচনা করাও তার পক্ষে অসম্ভব। তার সঙ্গে সর্বসমক্ষে বাস করতেও পারত না। যা ভাল বুঝেছে, সে তাই করেছে। কেমনে সে দোষারোপ করবে? এখন মিসেস সিনিকো চলে গেছে। সে বুঝতে পারল মিসেস সিনিকোর একাকী জীবন রাতের পর রাত বসে বসে কিভাবে কাটবে। একাকীত্বে ভরে যাবে জীবন—যতক্ষণ না সে নিজে মরছে, যতক্ষণ না তার অস্তিত্ব বিলীন হচ্ছে, যারা তাকে মনে রাখে যতক্ষণ না তাদের কাছে সে স্মৃতিতে পরিণত হচ্ছে।

রাত নটার পর দোকান থেকে মিঃ ডাফ্‌ফি উঠল।

ঠাণ্ডা বিষণ্ণ রাত। সে প্রথম গেট দিয়ে পার্কে প্রবেশ করল,

শীর্ণ গাছগুলির নীচ দিয়ে হেঁটে চলল জনশূন্য উদ্যানের পথ ধরে। এই পথ দিয়ে চার বছর আগে তারা হেঁটেছিল। তার মনে হল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মিসেস সিনিকো তার কাছে এল। মনে হল তার কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে। যেন তার হাত তার হাত ছুঁয়ে গেল। সে শোনার উদ্দেশ্যে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। কেন সে নিজেকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল? কেন সে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিল? সে বুঝতে পারল তার মানসিক অনুভূতি খণ্ড খণ্ড হতে চলেছে।

ম্যাগাজিন হিলের চূড়ায় এসে সে থামল। ডাবলিনের দিকে প্রবহমান নদীটির দিকে তাকাল। নীচে ঢালু জায়গাটার দিকে তাকাল এবং একদম নীচে পার্কের দেয়ালের ছায়ায় কতকগুলো মানুষকে শায়িত অবস্থায় দেখল। সেই অন্যায়, দূষিত, চোরা প্রেম তার সমগ্র হৃদয়কে হতাশায় পরিপূর্ণ করে দিল। তার জীবনের সাধুতাকে সে নষ্ট করেছে। সে ভাবল, জীবনের তীব্র আনন্দ থেকে সে বিতাড়িত। একজন মানুষ বোধ হয় তাকে ভালবেসেছিল কিন্তু সে

তাকে তার জীবন ও সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে। সে তাকে অসম্মান করেছে. লজ্জায় মরতে দিয়েছে। সে জানত যে দেয়ালের পাশে জীবগুলো তাকে লক্ষ্য করছে এবং সে বিদায় হোক এটাই চাইছে। কেউ তাকে চায় না। জীবনের তীব্র আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত, বিতাড়িত। ধূসরবর্ণা নদীটির দিকে সে চোখ মেলল। তার বুকে ক্ষণিকের আলো চলাকেরা করছে। নদীর ওপারে একটা মালগাড়ীকে সে পরিশ্রমী ও একগুঁয়ের মত জলন্ত মাথা নিয়ে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে পোকার মত কিংসব্রীজ স্টেশন ছেড়ে চলে যেতে দেখল। ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল ওটা। ইঞ্জিনের আর্তনাদ তখনও তার কানে আসছিল। ইঞ্জিনটা যেন মিসেস সিনিকোর নামটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ করছে।

যে পথে সে এসেছিল সেই পথের দিকে সে পা বাড়াল। ইঞ্জিনের ছন্দ তার কানে আঘাত করল। একটা গাছের নীচে দাঁড়াল সে। ছন্দটা বিলীন হতে দিল। আর সে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল না, অনুভব করতে পারল না তার সেই স্পর্শ। আরও কিছুক্ষণ সে তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য অপেক্ষা করল। সে কিছুই শুনতে পেল না। রাত সত্যিই নিরালা। জীবন নিরালা। তার মনে হল এ পৃথিবীতে সে একলা।*

* A Painful case গল্পের অনুবাদ

# ডাবলিনার্সে জয়েসের প্রস্তুতি

প্রমথ সেনগুপ্ত

"And now I will hazard a second assertion which is more disputable perhaps to the effect that on or about December, 1910—human Character changed." ("আমি যে দ্বিতীয় প্রতিপাদ্যের ঝুঁকি নিচ্ছি—তা আরও বিতর্কিত যে, ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস নাগাদ মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটল।") ১৯১০ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন শহরে গ্রাফ্‌টন গ্যালারিতে ভ্যান গগ, পল গগ্যাঁ, মাতিস, পিকাসো, সেজানে ইত্যাদিদের যুগান্তকারী চিত্র-প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ভার্জিনিয়া উলফ মানব-চরিত্র পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—কথাশিল্পের রূপে ও স্বরূপে উদীয়মান সাহিত্যিকদের মনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল—তার আভাস দেওয়া। ১৯১৪ সালে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ টাইম্‌স্ লিটারারি সাপ্লিমেন্টে হেনরি জেমস ধারাবাহিকভাবে দুই সংখ্যায় 'দি ইয়ংগার জেনারেশন' শিরোনামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। তার দু'বছর বাদে ১৯১৬ সালে জেমস জয়েস (James Joyce) তাঁর এ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ংম্যান (A portrait of the artist as a young man) উপন্যাসখানি প্রকাশ করলেন। এ উপন্যাসের আবির্ভাব ইংরেজী কথা সাহিত্যে এক নতুন যুগের অভিষেক করল। ভার্জিনিয়া উলফ যে 'মানব চরিত্রের পরিবর্তনের' আভাস দেখেছিলেন—তা উপন্যাসের ফর্মের খোল-নলচে পালটে দিল।

ডাবলিনার্স (Dubliners-১৯১৪), এ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান (A Portrait of the artist as a young man—১৯১৬), ইউলিসিস (Ulysses—১৯২২), ফিনিগ্যানস্ ওয়েক (Finnigan's wake—১৯৩৯)—এ চারখানি গ্রন্থে জয়েসের সমগ্র শিল্পী-জীবনের অভিব্যক্তি। এর মধ্যে 'ডাবলিনার্স' ও 'পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট' তাঁর যৌবনকালের রচনা। ডাবলিনার্সের রচনাকাল সুরু হয়েছিল ১৯০০ সাল নাগাদ। আর, 'পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট'ও সুরু হয়েছিল ১৯০৪ সাল থেকে। ডাবলিনার্স গল্প সংগ্রহে প্রথম গল্প উপন্যাসের জরাজীর্ণ প্রাচীন কাঠামোর ওপর আঘাত পড়ল। ডাবলিনের

বস্তি জীবনকে ভিত্তি করে যে গল্পগুলি লেখা হল—তাতে আখ্যান-কৌশলের বদল ঘটল। নোংরা কদর্য প্রতিবেশে জীবনের যে প্রতিরূপ—তাতে 'বর্ণনার ঘনঘটা' নেই। এ গ্রন্থে জীবনের এক একটি সাধারণ তুচ্ছ ক্ষণের মাধ্যমে জীবনের শাশ্বতী-সাধনা। জীবনের প্রতিবিম্বুতে 'ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী।' প্রত্যয়ের অমিত প্রগল্‌ভতা সাহিত্যের ধ্রুবসত্যে ভাস্বর হয়ে উঠল। আমি 'counter parts' ( কাউন্টার পার্টস ) গল্পের ক্যারিংটনকে স্মরণ করছি। নির্দয় পিতা ক্যারিংটন নিরপরাধ সরল শিশু টমকে মারে। পিতার হৃদয়হীন প্রহারের কারণ নেই। এ অত্যাচারের কারণ কি? নিষ্ঠুর পিতার মধ্যে উৎপীড়িত ক্যারিংটন সংগুপ্ত আছে। অত্যাচারিত শ্রমজীবী ক্যারিংটন যে মুহূর্তে শ্রমের বাঁধন থেকে ছাড়া পায়—তার প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। অত্যাচারের জ্বালা ছেলের ওপর দিয়ে শোধ নেয়। পুত্রকে নির্দয়ভাবে প্রহারের মধ্যে পিতার অপমানের ইতিহাস লেখা হতে থাকে। আর একটি গল্প 'দি ডেড' ( The Dead ) মনে করুন। গ্যাব্রিয়েল কনরয়ের আত্মবিশ্বাস প্রচুর। মিসেস মরক্যানের বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠানে বহু লোকের সমাগম ঘটেছে। গ্যাব্রিয়েল আইরিশ জাতীয়বাদ এবং মৃত অতীতকে বাতিল করে বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়েস গ্যাব্রিয়েলের আত্মবিশ্বাসকে বিদ্রূপে পর্যবসিত করলেন। গ্রেটা গ্যাব্রিয়েলের বিদুষী ভার্যা—তার ব্যাপারে স্বামীর উৎসাহের কমতি নেই। গ্যাব্রিয়েল আদালতে তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠানের দিনটির স্মৃতি-রোমন্থনে নিমগ্ন হলেন। যে গ্যাব্রিয়েল অতীত-বিরোধী আত্মবিশ্বাসী। এই স্মৃতি রোমন্থনের পথ বেয়ে স্ত্রীর জন্য গ্যাব্রিয়েলের দৈহিক কামনার ক্ষুধা জাগল।

'ডাবলিনার্স' গল্প সংগ্রহে জয়েসের কলারীতি সরলতার ভিত্তিভূমে লেখকের ব্যক্তিত্বের ক্ষণদীপ্তি। কয়েকটি শব্দের সমষ্টিতে কতকগুলি সাধারণ চরিত্রের চরমমুহূর্তকে অনবদ্য শিল্পরূপ দান করেছেন। "একটি স্মৃতির মাহুষী দুর্বলতা প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করে।" ( শাশ্বতী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত )। কথাশিল্পে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল শব্দ প্রয়োগের সমস্যা—যাকে ভার্জিনিয়া উলফ্ বলেছেন মিডিয়াম। যখন জয়েস ডাবলিনার্স গ্রন্থ লেখেন—তখনও পর্যন্ত জয়েস ভাষা বা মাধ্যমের শব্দকে সঙ্গীত করে তোলেন নি। কিন্তু ভাষাকে এক অভিনব পরিবর্তনে ধন্য করেছেন। সুডৌল-সুন্দর চিত্তচমৎকারী কাহিনী নির্মাণে জয়েসের আস্থা নেই। মানব-জীবনের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হবে—আর সেই দুর্গম অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে তীক্ষ্ণ-প্রখর শব্দ চেতনা ছাড়া আর কোন পাথেয় নেই। ভার্জিনিয়া উলফ্,

'মডার্ণ ফিকশান' নিবন্ধে যাঁদের তথাকথিত বাস্তববাদী বলেছেন—তাঁদের মত পুতুল গড়বার মানসিকতা জয়েসের নেই। চমৎকার খেলনার বাক্সের পরিবর্তে জীবনের সত্যকে সাহিত্যে সাকার করে তুলতে হয়েছে। এজন্য জয়েসের শব্দ প্রয়োগের বিশেষত্ব শুধু ধর্মের প্রশ্ন নহে—অধিকতরভাবে কনটেণ্টের প্রশ্ন।

ডাবলিনার্স গল্প সংকলনে জয়েস 'এপিফেনি' ( Epiphany ) রীতির ক্রম-পরম্পরার মধ্য দিয়ে নগণ্য এবং সাধারণ মানুষের জীবনে সংকটজনক আত্ম-প্রকাশক মুহূর্তগুলিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। জেমস জয়েসকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে গেলে এ 'এপিফেনি' তত্ত্ব আমাদের সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করতে হবে। 'এপিফেনি' ( Epiphany ) কথাটির প্রকৃতিগত অর্থ—প্রাচ্যের জ্ঞানী সম্প্রদায়ের নিকটে যীশুখৃষ্টের আত্ম-মহিমার উন্মোচন ( manifestation ). স্টিফেন হীরো'তে ( stephen Hero ) জয়েস এই তত্ত্বকে প্রাঞ্জল করেছেন। নায়িকা মিলনের সন্ধিক্ষণে বিদায় ঘোষণা করেছেন। ("An instant of all but union.") 'পোর্ট্রেট অফ্ দি আর্টিস্ট'ও এক ধরণের 'এপিফেনি'—তরুণ লেখকের অন্তরে অন্তর্দৃষ্টি এবং তার সত্তার উন্মোচন। তেমন 'ইউলিসিস্' লিওপোল্ড ব্লুম ও স্টীফেন দেদালাসের 'এপিফেনি।' মানব জীবনকে সমগ্রভাবে ধরে তার প্রকৃত অর্থনির্ধারণে এ 'এপিফেনি' যেন আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত সূত্র। ডাবলিনার্স গল্প সংকলনে 'এপিফেনি'-রীতি পরিপূর্ণ ভাস্বরতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এর গল্পগুলিতে এ রীতির চকিত স্পর্শ ক্ষণস্থায়ী—"সে যে পালিয়ে বেড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে"। 'ডাবলিনার্সের' যুগে এ রীতি 'থির বিজুরি' হবার জন্য কাল গুণছে।

স্টিফেনের জবানীতে জয়েস যে নাট্যরীতির কথা বলেছেন—ডাবলিনার্সের গল্পগুলি কম বেশি এ নাট্যধর্মিতার উদাহরণ। এ নাটকীয় শিল্প-রীতিতে লেখক পরের কাছে নিজকে বা নিজের ইমেজ বা মূর্তিকে সরাসরি পরিবেশন করেন। নাটকীয় রীতিতে এই যে ইম্প্রেটিক ইমেজ তা মানবজীবনের কল্পনার সাহায্যে পরিশোধিত প্রোজেক্শন। এই গল্পগুলিতে নাটকীয় রীতিতে জীবনের রূপকে প্রকাশিত দেখি—তবে এ জীবনের পরিশীলিত রূপ। নাট্যধর্মী শিল্পরীতির লক্ষণ মানবজীবনের পরিশীলিত ( purified ) প্রমূর্তির ( image ) পুনরায় উপস্থাপন ( reprojection )। ডাবলিনার্স সংগ্রহের গল্পগুলিতে এ নাট্য রীতির প্রকাশ ঘটেছে। জয়েস যাকে 'শিল্পসুলভ স্থিতি' (aesthetic stasis) বলতে চেয়েছেন —এই গল্পগুলিতে সেই স্থিতিতে তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন। কিন্তু এই

স্থিতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে তাঁর শিল্প বাসনা স্থাণু হয়ে রইল না। অংশের সঙ্গে সমগ্রের যে ঘনিষ্ঠিড় সম্পর্ক—যার নাম তিনি দিয়েছেন Consonance—তার মৃদুচকিত স্পর্শ এ গল্পগুলিতেও পাওয়া যাবে। জেমস জয়েসের 'এপিফেনি' (Epiphany) তত্ত্বের এ হল মূলীভূত নির্য্যাস। এই যে অতর্কিত আত্মিক উন্মোচন ( sudden spiritual manifestation)-এ সোনার কাঠির সাহায্যে মানব মনের অন্তরমহলের লোহার কঠিন দরজার বাধা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ডাবলিনার্স-এর গল্পগুলিতে লেখক মানবজীবনের কয়েকটি সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তিকে অবলম্বন করে—কিছু মুহূর্ত বা ক্ষণকে আশ্রয় করে জীবনের এক পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্যের উপলব্ধি ঘটাতে পারে। জেমস জয়েসের 'এপিফেনি' তত্ত্বে যে ক্ষণের বিদ্যুচ্চমক—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার নাম দিতে পারি ক্ষণ-শাশ্বতী। আলোচনার সুরুতে 'ডাবলিনার্স' সংকলনের 'মৃত' ( The Dead ) গল্পের উদাহরণ দিয়েছি। এখানে একটু বিস্তারিতভাবে গল্প থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। গ্যাব্রিয়েলের অন্তর তাঁর স্ত্রী গ্রেটার সঙ্গকামনায় নিবিড় হয়ে উঠেছে। সে কোর্টসিপের দিনগুলিতে প্রত্যাবর্তন চাইছে :

"সে তার সামনে এত লঘুপদ অথচ ধীর হেঁটে বেড়াচ্ছে—যে সে তার নীরবে পশ্চাতে অনুসরণ করার কামনা করছে। তার কাঁধ ধরে কানে কানে আদর করে কিছু প্রলাপ বকতে চায়। তাকে ( গ্রেটা ) এত নমনীয় বলে মনে হতে থাকে—যে সে তাকে কোন কিছু থেকে রক্ষা করে তার সঙ্গে একাকী কাটাতে চায়। তাদের নিভৃত জীবনের মুহূর্তগুলি স্মৃতির ওপরে নক্ষত্ররাজির মত ফুটে উঠছিল। হেলিওট্রোপ আঁকা লেফাফা প্রাতরাশের পেয়ালার পাশে পড়েছিল —সে এটা হাত দিয়ে আদর করে নাড়াচাড়া করছিল। পাখিরা আইভিলতায় কিচ্‌মিচ করছিল। পর্দার ওপর রোদ-লাগা কাপড়টি মেঝে বরাবর দীপ্তি পাচ্ছিল। এত সুখে সে যেতে পারল না। তারা ভীড়েভর্তি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল। সে গ্রেটার হাতের দস্তানার ভেতরে গরম হাতের তালুতে টিকিট গুঁজে দিচ্ছিল। আরও মধুর আনন্দের ঢেউ তার হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে উষ্ণ বন্যায় তার ধমনী দিয়ে নামতে লাগল। নক্ষত্রের নরম আলোর মত তাদের দাম্পত্য জীবনের মুহূর্তগুলি যাদের কথা কেউ জানত না অথবা জানবে না—তার স্মৃতির ওপর ভেঙে পড়ে উজ্জ্বল করে তুলল। সে সেই মুহূর্তগুলোকে স্মরণ করতে চাইল, তাদের ধূসর জীবনের বছরগুলিকে ভুলে শুধুমাত্র পরম আনন্দের মুহূর্তগুলিকে মনে করতে চাইল। সে অনুভব করল—এই বছরগুলি তার অথবা

গ্রেটার হৃদয় তৃষ্ণাকে নিবারণ করে নি। তাদের শিশুরা, তার লেখা, দাম্পত্য-জীবনের যন্ত্র তাদের হৃদয়ের মধুর অগ্নিকে নির্বাচিত করেনি।"

গ্যাব্রিয়েল ও গ্রেটার বিবাহিত জীবনের উল্লাসময় দিনগুলির জন্য স্মৃতি-রোমন্থন গ্যাব্রিয়েলকে তার স্ত্রীর দৈহিক সঙ্গকামনায় উন্মন করে তুলল। কিন্তু যে তরুণ মাইকেল ফারি গ্রেটার জন্য প্রেমে এবং যক্ষ্মারোগে মারা পড়ল—তার কাহিনী গ্যাব্রিয়েলের স্বপ্নকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

নিদ্রিতা স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে গ্যাব্রিয়েলের নিজেকে নিঃসঙ্গতর মনে হল। মর্ত্যভূমিতে মানবজীবনের অস্তিত্ব যে ক্ষণদীপ্তিতে আকীর্ণ এবং খেয়ালীপনায় পরিপূর্ণ এ সম্পর্কে সহসা সে সচেতন হয়ে পড়ল। তার উপলব্ধিতে এই পৃথিবী গলে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

"আসিতে আলোকশিখার কয়েকটি দীপ্তি এসে পড়াতে সে জানলার দিকে ফিরে তাকাল। আবার বরফ পড়তে সুরু করেছে। সে রুপালি অন্ধকারে চাকা বরফের টুকরোগুলি প্রদীপের আলোকে আড়াআড়িভাবে পড়তে দেখল। পশ্চিমদিকে তার যাত্রার সময় এসে গেছে। খবরের কাগজগুলো ঠিক লিখেছে আয়ার্ল্যাণ্ডের চতুর্দিকে বরফ পড়েছে। মধ্যস্থলে অন্ধকার জলাভূমির প্রতি অংশে বৃক্ষশূন্য পর্বতমালায়, অ্যালেনের জলাভূমি এবং আরও পশ্চিমে ক্যানেলের অন্ধকার গর্জনমুখর ঢেউগুলিতে বরফ আস্তে আস্তে ঝরে পড়ছে। যেখানে মাইকেল ফারিকে কবর দেওয়া হয়েছে, সেই পাহাড়ের ওপর নিঃসঙ্গ কবর প্রাঙ্গণের প্রতি অংশে বরফ পড়ছে। বাঁকা ক্রশগুলির ওপর, চূড়ার পাথরগুলির ওপর, ছোট্ট ফটকের ফলকের ওপর, পুষ্পহীন কণ্টকগুল্মের ওপর বরফ ঝরে পড়ছিল। যখন বরফ আস্তে আস্তে জীবিত ও মৃতের উপর, সারা বিশ্বে শেষ পরিণামের আবির্ভাবের মত ক্ষীণভাবে ঝরে পড়ছিল, তার আত্মা ধীরে ধীরে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।" উদ্ধৃত অংশের যে সহজ সুন্দর কাব্যিকতা তা শুধু প্রসাধন সামগ্রী হিসেবে গল্পটিতে ব্যবহৃত হয়নি। একজন আত্মসচেতন শিল্পী হিসেবে জয়েস টাইম ও স্পেসের (স্থান ও কাল) বন্ধনাতীত জীবনকে বাণীরূপ দান করেছেন শব্দের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দান করে। আধুনিক জীবনের যে আবর্তসঙ্কুল, অন্তর্দ্বন্দ্ব জয়েসের পূর্বে তার ভাষাপ্রয়োগ সম্পর্কে আর কেউ সচেতন হন নি।

# জানালা

নির্মলেন্দু রক্ষিত

নীলা সামনে এসে দাঁড়াল।

কোমরে দুই হাত দিয়ে সোজা চাইল মলির দিকে। ভ্রূ নাচাল দুবার।

মলি ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে সরে গেল। গম্ভীর ভাবে পড়ার টেবিল থেকে একটা মোটা বই, আর পেন তুলে নিল ক্যালেণ্ডারের দিকে চাইল একবার।

নীলা সরে এসে আবার সামনে দাঁড়াল হাসিমুখে। ভ্রূ নাচাল মহা আনন্দে।

বিরক্তিতে রূঢ় হয়ে গেল মলির মুখ।

সোজাসুজি এক মুহূর্ত তাকিয়ে নিয়ে বলল—খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু, বৌদি।

ঠোঁট বেঁকাল নীলা। তারপর হাসতে হাসতে বলল—কি খারাপ হচ্ছে?

—আমি পড়তে বসব এখন।

—আহা, আমি যেন বারণ করেছি।

—তুমি কেন সেই থেকে এরকম করছ?

চাপা গলায় নীলা বলল—আমার কাছে খবর আছে। জোর খবর। এই যে, আনন্দবাজার, যুগান্তর।

—বৌদি, তুমি এখন যাবে? পরশু থেকে আমার টেষ্ট্।

নীলা এবার মলির নাকের ডগা ধরে আদর করল একটু। আল্‌তো করে গলার কাছটাতে ছুঁয়ে দিল। তারপর ফিসফিস করে বলল—আসল পরীক্ষায় কিন্তু উৎরে গেছ, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। অবশ্য—

ছিট্‌কে সরে গেল মলি।

কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—আমি কিন্তু—বৌদি তুমি যাবে?

নীলা খিল খিল করে হাসল একটু। তারপর বেরিয়ে গেল।

ড্রেসিং টেবিলটার সামনে আবার এসে দাঁড়াল মলি। চুলগুলো কপালের ওপর ওছিয়ে নিল। শাড়ির ভাঁজ ঠিক-ঠাক করল। দুবার ঘাড় কাত করল, পেছনের দিক দিয়ে আঁচলটা ঘুরিয়ে আনল। একটু ক্রিম নিয়ে গাল ঘষল কিছুক্ষণ।

তারপর ফিরে এসে খাটে বসে একটা বই খুলে নিল।

সত্যিই তাহলে ঠাকুরিয়ার ওদের পছন্দ হয়েছে?

একটু যেন শিউরে উঠল মলি। সারা শরীরে এক ঝলকের জন্য যেন হিমেল হাওয়া খেলে গেল। খুশীর জোয়ারে নেচে উঠল সমস্ত হৃদয়। ও শূন্য দৃষ্টিতে ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে রইল। ততক্ষণে শরীর কুলকুল করে ঘামিয়ে গেছে।

গলা শুকিয়ে গেছে হঠাৎ। মাথাটা কেমন যেন ভারী লাগছে।

মলি দুবার কাশল। তারপর শুয়ে রইল বিছানায়।

ঠাকুরিয়ার ওঁরা প্রথম এসেছিলেন দিন দশেক আগে। সম্বন্ধটা বেশ ভালই। পাত্র সরকারী কলেজের অধ্যাপক। দেখতে শুনতে নাকি যথেষ্ট ভালই। বাড়ির অবস্থাও স্বচ্ছল। পাত্র ভাই বোনদের সবাইর ছোট। তেমন দায়-দায়িত্ব নেই সংসারে। নিবিষ্ট মনে নিজের পাঠ্য বিষয়ে গবেষণা করছে। পাত্রের মা বেশ হাসি-খুশী মানুষ। ব্যবহারে বেশ আন্তরিকতা আছে। খুব সুন্দর করে কথাবার্তা বলেছেন মলির সঙ্গেও। নিজের হাতে সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছেন। খাবার সময় চিবুক ধরে আশীর্বাদ করেছেন। হেসে বলেছেন—আমার তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

লাজুক হেসে চোখ নামিয়েছিল মলি।

অলকেশবাবু দ্বিধাভরে বলেছিলেন—কে জানে, আমরা সম্বন্ধ করতে পারব কি না আপনাদের সঙ্গে। যদি দয়া করে আপনারা—

মৃদু হেসেছিলেন ভদ্রমহিলা। বলেছিলেন—এভাবে বলছেন কেন? আমরা তো বলেছি, আমাদের দাবী-দাওয়া কিছু নেই। শুধু খোকা একবার দেখবে। তা, মেয়ে তো আবার অপছন্দের নয়।

উনি মলির দিকে পরম মমতায় চেয়েছিলেন একবার।

সরে গিয়েছিল মলি।

সত্যি কথা বলতে কি, সে-রাতে একটুও ঘুম হয় নি। বারবার শরীর কুলকুল করে ঘামিয়ে গিয়েছিল। এক অজানা খুশীর জোয়ার বয়ে গিয়েছিল মনের সমস্ত প্রান্তে। উঠে মলি তিনবার জল খেয়েছে। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে একবার। কয়েকবার নীচের দেওয়াল ঘড়ির প্রহর ঘোষণার ধ্বনি শুনেছে।

তারপর একসময়, যখন পাখিদের কিচির মিচির শুরু হয়েছিল, ঠিক তখনই যেন সারা রাজ্যের ঘুম এসে জড়িয়ে গিয়েছিল দু চোখের পাতায়। এক অপার্থিব

শান্তি এসে যেন ছুঁয়েছিল ওর সমস্ত শরীরকে। ফুলের গন্ধ ভাসছিল বাতাসে। কোঁটা কোঁটা বৃষ্টির শব্দ হয়েছিল বাইরে।

তার পরের দিন বিকেলেই সেই অধ্যাপক এসেছিলেন বন্ধুকে নিয়ে।

তখনো যেন বাতাসে সেই সুরভি। শরীরে সেই বৃষ্টির নরম স্নিগ্ধতা। বুকের মধ্যে অস্থির মৃদঙ্গ।

সেদিন দুপুরে অবশ্য মলি একটু ঘুমোতে চেষ্টা করেছে। একটু ঘুম হলে ওর মুখটা যেন কোলা কোলা লাগে। শরীরটা ভারী মনে হয়। বিকেলে স্নান করার পর এক ধরনের লাবণ্য ছুঁয়ে থাকে ওকে।

সকালেই মা বলেছিল—একটু ঘুমিয়ে নিস বরং। ফ্রেস্ দেখাবে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল ও। বলেছিল—আমি কলেজে যাব। রোজ রোজ তোমাদের—

—আরে বাবা, একদিন কলেজে না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। গিয়ে তো শুনবি প্রফেসর আসে নি।

—হ্যাঁ, বলেছে তোমাকে! কারা না কারা আসবে—

শীলা ঘরে ঢুকেই একটু দেখেছিল ওকে। একটু হেসে বলেছিল—কি?

কি বললে তুমি? ওদিকে তো একটু দেখার জন্য—

মিনতি দেবীও হেসে ফেলেছিলেন।

রেগে গিয়েছিল মলি। বলেছিল—বৌদি, খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু।

—ওরে ব্বাস, এটা রাগ, না অনুরাগ?

মিনতি চিৎকার করেছিল—মা, আমি কিন্তু বলে রাখছি—

ও দুম দুম করে পা ফেলে বাইরে এসেছিল। আর ঠিক তখনই সামনে পড়েছিলেন সত্তর বছরের রাধারাণী দেবী।

মলির ডান হাত ধরে হেসেছেন উনি। একটু দেখেছেন মুখের দিকে।

মাথাটা একটু দুলিয়ে বলেছেন—কিরে, চেঁচামেচি কিসের?

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল মলি। বলেছিল—জানি না।

—শোন্।

—বলুন। আমি চান করতে যাব এখন।

—বেশ করে চান করিস, বাছা। যেন দাদু-ভাইয়ের আমার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। বিকেলে সাজিয়ে দোবখন, ফুলের—

—আপনি সাজুন গিয়ে।

—আ মরণ, আমার কি সেই ছোঁড়া পছন্দ করবে? এমন লক্ষ্মী পিতিমে ফেলে? অমন ডাগর চোখ, সোনার বরণ—বলি, আমারই পছন্দ হয়ে যায় তো, সে কোথাকার রসিক নাগর—

—সরুন, কী অশ্লীল সব কথাবার্তা।

ছিটকে সরে এসেছিল মলি।

পেছনে ঠাকুরমার হাসি সাড়া বাড়িতে যেন ছড়িয়ে গিয়েছিল।

দুপুরে তেমন ঘুম জমে নি। এলোমেলো চিন্তায় কেমন করে যেন বিকেলের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। শুয়ে শুয়েই মলি বুঝতে পারছিল, এবার ওঠা দরকার।

কিন্তু কোথা থেকে একরাশ লজ্জা এসে ততক্ষণে ওকে গ্রাস করেছে।

এক সময় শীলা এসেছে কাছে। ফিস ফিস করে বলেছে—মহারাণী।

ঘুমের ভান করে চুপ করে রয়েছিল শীলা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়েছিল।

আস্তে আস্তে শীলা বলেছে—ঘুম তো হচ্ছে না জানি।

মলি সেই সময় বড় করে শ্বাস টেনেছে।

শীলা বলেছে—সত্যি ঘুম হলে নাকের ডগাটা নড়ত, কানের লতিটা নাচত, চোখের ভ্রূ কাঁপত—

ফিক করে হেসে ফেলেছিল মলি।

শীলাও হেসেছিল। বলেছিল—এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। উঠে পড়। হল ঘে আসার সময়—

মলি উঠে সরে পড়েছিল।

ওঁরা আসতে আসতে একবার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। হাতের তালু ঘামিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। দু-বার ঢোক গিলে ও ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে নরম গলায় বলেছে—বৌদি।

শীলা এগিয়ে এসে ওর চিবুক ছুঁয়েছে। পরম মমতায় ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছে—বোকা মেয়ে।

– মা কোথায়?

– ওঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। শোন, ধুতি-পাঞ্জাবী পরেছে বর, বন্ধুর প্যান্ট—

আমার-আমার না ভীষণ—

—কি অদ্ভুত। তুমি কি করে কলেজ কর, বল তো? ট্রাম-বাসে ওঠ, বাইরে যাও, তাতেও এত শাইনেস? যাবে, দুটো গল্প করবে। ব্যাস!

সেই সময় ডাক পড়েছে। থরথর করে কেঁপে উঠেছে মলি।

শীলা ওর হাত ধরে নিয়ে গেছে। বসিয়ে দিয়েছে একটা চেয়ারে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গিয়েছিল। সরে গিয়েছিল বাড়ির সবাই।

—আপনি ইজিলী কথাবার্তা বলুন। টেক্ ইট্ স্পোর্টিংলী।

চমকে উঠে মলি সামনে তাকিয়েছিল। না পাত্র নয়, বন্ধু কথা বলছে।

ক্রিম রঙের সার্ট। হাতে দামী ঘড়ি। গোলগাল চেহারা।

—গান কোথায় শিখছেন?

—গীতবিতানে।

—একটু শুনতে পারলে—

এক ঝলকে ডান দিকে তাকিয়েছিল মলি। অধ্যাপক মৃদু হেসেছেন। সৌম্য চেহারা। চোখে মুখে শান্ত ঔদার্য, ঘন কাল চুল মাথায়। মোটা ফ্রেমের চশমা। বয়স কম হলেও কিছুটা গাম্ভীর্য্য আছে যেন।

বন্ধু বলেছিলেন—গান হবে নাকি?

অধ্যাপক থামিয়েছিলেন। ভরাট গলায় বলেছিলেন—থাক না প্রশান্ত। এই অবস্থায় গান গাওয়া—মা তো প্রশংসা করেছেন, আবার কি?

—তুমি কিছু জিজ্ঞেস করবে?

ঢোঁক গিলেছিল মলি। বুক দুরু দুরু করে উঠেছিল।

কিন্তু সেই ভরাট কণ্ঠ উত্তর দিয়েছিল—না। জিজ্ঞেস করার কি আছে?

এবার চোখ তুলেছিল মলি। তীক্ষ্ণ দু-চোখ থেকে একটু হাসি যেন বিচ্ছুরিত হয়ে এসেছিল ওর কাছে।

—ঠিক আছে। আপনি—আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে।

বন্ধু মিষ্টি করে বলেছেন।

কোনো রকমে হাত জোড় করে চলে এসেছিল মলি।

তারপর তিনদিন কেটে গেছে। বৌদি আবার কাজলামো শুরু করেছে। বলেছে নাকি সুখবর আছে। মায়ের হাসিতেও বেশ নতুন ধরনের স্নিগ্ধতার ছোঁয়া লেগেছে। মলি সেই মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। সৌম্য চেহারাটা যেন ভেসে উঠল স্মৃতির পর্দায়। ভরাট কণ্ঠটা যেন আবার কানে বাজল।

—দিদি।

বারো বছরের পলি ঢুকল।

চোখ মেলল মলি। একটু হেসে বলল—কাছে আয়।

বিছানায় বসল পলি। বলল—তুই চলে গেলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে।

চোখ বুজল মলি। বলল—নীল উলি শাড়িটা তোকে দিয়ে পুজোতে তুই—।

—আমার চাই না কিছু।

—কি বোকা তুই। আমি তো মাঝে মাঝে আসব। তুই গিয়েও—

পলি উঠে চলে গেল। মলি একটু হাসল। তারপরেই ওর চোখের পাতা ভিজে গেল। পলিটা একেবারে ছেলেমানুষ। অথচ কয়েক বছর পরে ওর জীবনেও এমন দিন আসবে। বাতাসে বাতাসে সেদিনও ফুলের সুরভি ভাসবে নিশ্চয়। বুকের মাদলে দ্রুত ছন্দ বাজবে।

সেদিন সেই সৌম্য দর্শন অধ্যাপককে নিয়ে মলি আবার আসবে এ-বাড়িতে নানা কাজের দায়িত্ব নিয়ে মেতে উঠবে।

—একটু আসতে পারি?

শীলা বৌদির কণ্ঠ।

মলি উঠে বসল। ভ্রূ কুঁচকে বলল—আচ্ছা বৌদি, তুমি আমার পেছনে এত লেগেছ কেন বল তো?

হাসল শীলা। বলল—শোন, একটা খবর দিই। চশমা-ওয়ালার পছন্দ হয়ে গেছে। বাবাকে ফোনে খবর দিয়েছিলেন ওঁরা। বাবা কথা বলতে গিয়েছেন, বোধ হয় এ-সপ্তাহেই আশীর্বাদ—

—আমার শোনার দরকার নেই।

মলি ছিটকে দরজার কাছে দাঁড়াল।

মা যাচ্ছিলেন। বললেন কি রে?

শীলা বলল—দেখুন না মা, আমি চশমা-ওয়ালা বলাতে মলি রেগে গেছে।

—মোটেই না।

মা হাসলেন। যেতে যেতে বললেন—বৌমা..মেয়েটাকে আর জ্বালিও না। শীলা বেরিয়ে গেল এবার। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলল—দাঁড়াও না, এক্ষুণি আসব আবার। মলি উঠে পড়ার টেবিলের কাছে গেল। সেই সময় নজরে পড়ল জানালাটা খোলা।

ও সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

কিছুদিন ধরে সামনের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে। ওদের বড় ছেলেটা সাজা জানালাটা দিয়ে মাঝে মাঝে এদিকে তাকায়। মলি মাঝে মাঝে দুটো আয়ত চোখের ঝলকানী দেখেছে জানালা দিয়ে। কখনো কখনো লজ্জা পেয়ে

সেই দু-চোখ সরে গেছে অন্য দিকে।

রাস্তা-ঘাটেও ওকে কাছাকাছি দেখেছে মলি। ছেলেটা এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ফাইনাল ইয়ার এবার। ছাত্র হিসেবেও নাকি বেশ ভাল।

মলি কোনো রকম দুর্বলতা অবশ্য দেখায় নি। সেই জন্যই রাস্তা-ঘাটে, বাস-স্ট্যাণ্ডে ছেলেটা কাছাকাছি এসেও ভীরু সংকোচে বারবার দূরে সরে গেছে। দীঘল চোখে তাকিয়েও কেমন যেন বিব্রত হয়ে ভিড়ে মিশে গেছে অনেকবার। কিছু বলার চেষ্টা করেও বলতে পারে নি শেষ পর্য্যন্ত।

অধ্যাপকের বন্ধু মিনতি দেবীকে পছন্দের কথা এক রকম জানিয়ে যেতেই সারা বাড়িতে চাঞ্চল্য জেগেছে। আর সেই চঞ্চলতার এক বিহ্বল লয়ে মলি সশব্দে ওই জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে। এই কয়দিনে আর খোলে নি। হয়তো পলি বা বৌদি এক সময় ঘরে আলো-হাওয়া আসার জন্য জানালাটা খুলে দিয়ে গেছে।

মলি সামান্য একটু হাসল। চশমা-চোখে সৌম্য মূর্তিটা মুহূর্তেই যেন মনের পর্দায় ভেসে উঠল। সেই ভরাট কণ্ঠটা যেন কানে বাজল আবার।

—এই দিদি।

চমকে উঠল মলি।

পলি বলল—কি হয়েছে জানিস? বাবাকে ওরা বারণ করেছে। এক জায়গায় কথা চলছিল—তারা কি নিয়ে যেন রাজী হচ্ছিল না, আজ সকালে খবর দিয়েছে আবার। ব্যাস, প্রফেসরের বাবা ছুটে গেছে, মেয়ে নাকি আর্টিষ্ট, দারুণ দেখতে—

—ও, তাই বুঝি।

মাথাটা ঘুরে যাচ্ছিল মলির। হৃদ্-স্পন্দন হঠাৎ থেমে যাচ্ছিল।

—কি বিচ্ছিরি ব্যাপার হল। অবশ্য আমার সুবিধে হয়েছে। একা একা।

—বাবা কোথায় রে?

—ও ঘরে। আমি গানের স্কুলে যাচ্ছি। তুই মন খারাপ করিস না রে। কত ভাল সম্বন্ধ আসবে। ভাবী তো কোথাকার প্রফেসর।

পলি বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত মলি দাঁড়িয়ে রইল। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে নিজেকে একবার দেখল। কিছুক্ষণ চোখ বুজে আবোল-তাবোল ভাবল। মিনিট-খানেক শুয়ে রইল বিছানায়। তারপর বেরিয়ে পাশের ঘরে দরজার কাছে গেল।

ওকে দেখেই মিনতি দেবী সোফা থেকে উঠে খুব ব্যস্ত ভাবে আলমারী খুলে প্রয়োজনীয় কি যেন খুঁজতে লাগলেন। শীলা চায়ের ট্রে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল। ঠাকুরমা চশমা লাগিয়ে হঠাৎ রামায়ণের একটা পৃষ্ঠা খুলে সুর করে পড়তে লাগলেন। অলকেশবাবু খবরের কাগজটা টেনে নিলেন।

মলি সরে এল। এক মুহূর্তের জন্য বারান্দায় থমকে দাঁড়াল।

রামায়ণের সুর আবার থেমে গেল।

মিনতি দেবী বেরিয়ে এসে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন। নরম গলায় বললেন —মলি, কিছু খাবি এখন?

মলি মাথা নাড়ল। চোখ নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ঠিক তখনই শীলা এসে এক কাপ চা এগিয়ে দিল। বলল—ঠাকুরঝি—

মৃদুস্বরে মলি বলল—এখন না।

—বিকেলে চা না খেলে তোমার যদি আবার মাথা ধরে?

মলি উত্তর না দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জানালাটা খুলে দিল।

# বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে মুর্শিদাবাদ

সুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতময় মুর্শিদাবাদ। এই জেলার নানাবিধ সঙ্গীতের মধ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতবাদ্যের বিষয়ই উল্লেখের দাবী রাখে সর্বাগ্রে। উচ্চাঙ্গীয় নৃত্যগীতবাদ্যের পীঠস্থান ও বিশাল কেন্দ্ররূপে তার পরিচিতি বহু শতাব্দীর বিপুল ঐতিহ্যমহিমায় সদাভাস্বর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিবিধ শাখা প্রশাখায় তার মূল্যবান দানও অকিঞ্চিৎকর নয়। মুর্শিদাবাদ জেলার রেঞ্জাপুর গ্রামের ঘনশ্যাম চক্রবর্তী ওরফে নরহরিদাস ছিলেন ক্ল্যাসিকাল হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানে গ্রামের সিদ্ধ কলাকার। বৃন্দাবন, মথুরা ও আগ্রার প্রখ্যাত মুসলিম ওস্তাদগণের নিকট নানাপ্রকার ধ্রুপদ গান শিক্ষার পর খৃষ্টীয় সতের শতকের শেষভাগে বহরমপুরের সৈদাবাদ পল্লীতে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। এবং অধীত সঙ্গীত চর্চায় ব্যাপৃত থাকেন। ধ্রুপদগানে মুর্শিদাবাদের প্রাচীনত্বের দাবী এই কারণে প্রতিষ্ঠিত বলা চলে নির্ভয়েই। সঙ্গীতসার সংগ্রহ, 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ নরহরিদাস কর্তৃক রচিত হয়ে অনেক দুর্লভ সাঙ্গীতিক তথ্যের উদ্ঘাটনও করেছে নিঃসন্দেহে। খৃষ্টীয় আঠার শতকের প্রথমার্ধে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দ্বারা প্রাচীন সুকসুদাবাদে রাজধানী স্থাপনের পর বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাবনাজিম সুজাউদ্দীন খাঁ, আলিবর্দী খাঁ, সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর ও অন্যান্য নবাবদের সভায় ঐশ্বর্য-প্রকাশক, তীব্র রসোদ্দীপক মধ্যগতিযুক্ত খাণ্ডারবাণী, সহজ সরল গতিযুক্ত লালিত্যময় ডাগরবাণী ধ্রুপদ গানের চর্চা চলে নিয়মিত। হদ্দু খাঁ, হসদু খাঁ (গোয়ালিয়রের হদ্দু-হসদু খাঁ নহে) হীরা বুলবুল, বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা, মীর আলিহোসেন, মীর বান্দাহোসেন ভ্রাতৃদ্বয়, মণিয়া খাঁ, গঙ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লছমন মুখোপাধ্যায়, তদীয় পুত্র দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (যন্ত্রী পদবীপ্রাপ্ত) আনন্দীবাঈ, গোরামণি বাঈ প্রভৃতি স্বনামখ্যাত গায়ক গায়িকারা এই সকল নবাবনাজিমের সভায় স্থায়ীভাবে থেকে খাণ্ডারবাণী, ডাগরবাণী রীতির ধ্রুপদ ও সদিল গতিযুক্ত ধামার গানের অকল্পনীয় প্রসার ঘটান। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনাথ চৌধুরী, শ্রীকান্ত ভাস্কর, আনন্দচন্দ্র ঘোষ, ছেদুলাল রায়, কুটিল কান্তিক, বরদা বাগচী প্রমুখ মুর্শিদাবাদ জেলার স্বরশিল্পীদের

অসামান্য কলানৈপুণ্যের ফলে ধ্রুপদ ধামার গানের মর্য্যাদা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, সারা বঙ্গের সঙ্গীত চর্চায় তার প্রভাব না পড়ে পারেনা। চুচুড়ার ধ্রুপদীশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র শীলের মুর্শিদাবাদে দীর্ঘ সময় যাবত অবস্থান এখানকার ধ্রুপদ গীতিকেন্দ্র পুর্নরূপে গড়ে তুলবার বিষয়ে যে প্রভূত সাহায্য দেয়, তাও প্রমাণসিদ্ধ।

সুর বিকাশের অবারিত স্বাধীনতা সম্পন্ন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল মহিমাময় শাস্ত্রীয় বিলম্বিত এবং দ্রুত খেয়াল গানের আলোচনায় মুর্শিদাবাদবাসী বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা, হুসেন খাঁ, মীর আলিহোসেন, মীর বান্দাহোসেন, মেহদীহোসেন খাঁ, গোরামণিবাঈ, ধুমন বাঈ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গীতক্ষেত্রে সদারঙ্গী অদারঙ্গী খেয়াল গানের প্রাধান্য প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটান বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা অসাধারণ প্রতিভাবলে। মুস্কিলাকরত ও শক্তিশালী প্যাঁচদারতানের খেয়াল গানের প্রচারে এখানকার বাহাদুর খাঁর অমূল্য অবদান অবিস্মরণীয়। টপ্‌পা গীতি পদ্ধতির মুর্শিদাবাদে উপস্থিতি ও আধিপত্য বিস্তার খৃষ্টীয় আঠার শতকের অন্ত্যভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উনিশ শত খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এমন একজন মধু কণ্ঠ টপ্‌পা গায়কের বসবাসের কথা জানা যায় যেখানে যার তুলনা পাওয়া ভার। এই জেলার কৈজীবাঈ, মুন্নিবাঈ, ভগবাঈ, মৈনিবিবি, আনন্দীবাঈ, গোরামণিবাঈ, ধুমনবাঈ প্রভৃতি খ্যাতনাম্নী সুরশিল্পীদের মাধ্যমে ঠুংরী গান ও কথকনৃত্যের যে অনুশীলন চলে কয়েক শতাব্দী ধরে তা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুর্শিদাবাদের আদিবাসিন্দা মেহদীবিবির দৌহিত্রী প্রসিদ্ধা নর্তকী-গায়িকা নিকীবাঈ-এর শেষ জীবন লালবাগ নগরীতে অতিবাহিত হয়েছিল, জনশ্রুতি অমূলক মনে হয়না। বঙ্গদেশে 'খাড়ি ঠুংরী' গানের প্রথম প্রচলনেও মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বটে।

সারেঙ্গীনেওয়াজ কেরামত খাঁর মুর্শিদাবাদে বসবাস চলে পুরুষানুক্রমে। বীণকার ওয়াজেদ আলি, দিলরুবা বাজিয়ে সরফুদ্দীন খাঁ, বংশীবাদক আসীর নজর আলি খাঁ, বীণাবাদিকা পুতলীবিবি ও গুল, সেতারী মৈনিবিবি, তবলচী মিঞা মহু খাঁ, বীণাবাদক বাহার খাঁ প্রভৃতি গুণীরাও মুর্শিদাবাদের নিজস্ব ওস্তাদরূপে যন্ত্রবাদ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকেই। সে সময়ে বহরমপুরের মৃদঙ্গী রাধামোহন সেনের 'খুলি' ও 'মুদী' চঙ-এর পাখোয়াজ বাজনা যে জেলায় আনন্দবাদ্যক্ষেত্রের পরিপোষক হয় সে কথাও বলা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে এই জেলায় মুহম্মদ খাঁ, মুন্নন খাঁ, চুন্নন খাঁ, হোসেন বক্স, তাঁর পুত্র

খলিফা আতাহোসেন খাঁ, তাঁর জামাতা আশাখ আলি মির্জা, হুরমুত আলি খাঁ, কৃষ্ণনাথ চৌধুরী, লছমণ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস সেনরায় এর সঙ্গে আরও অনেক সুদক্ষ যন্ত্রীর ধ্রুপদ-খেয়াল-অঙ্গের বীণা-সরোদ-সেতার বাজনা ও দিল্লী—লক্ষ্ণৌ পদ্ধতির তবলামৃদঙ্গবাদ্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মহিমাবর্দ্ধনে উৎসাহ-সাহায্য দেয় বিলক্ষণ। তবলিয়া মিঞা মদু খাঁর পুত্র হোসেন বক্স ছিলেন তৎকালীন বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাখোয়াজবাদক। বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম তবলাবাদকের আসনে বিরাজমান ছিলেন হোসেন বক্সের পুত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন আতাহোসেন খাঁ, জীবনের অন্তিমদিন পর্য্যন্ত। বৃহৎবঙ্গে মুর্শিদাবাদের আতাহোসেন তবলা ঘরানার যে অবদান, তা তাঁরই অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি। মিঞা মদু খাঁর 'ঠেকা ছপকা', হুরমুত আলি খাঁর প্রণীত 'পাঞ্জাবী গত', 'চুটকীর গত', হোসেন বক্সের সৃষ্ট 'চারগায় গত', 'রেলের পরণ,' 'পয়নালীর পরণ,' 'তোপের গতপরণ,' 'পয়নালীর পরণ', 'পড়াল', আতাহোসেন খাঁ কর্ত্তৃক রচিত 'ফারাব,' 'সোল্', 'দমক্ষম পরণ,' 'গজগমন পরণ,' 'তালসমুদ্র' নামক বিখ্যাত গতপরণগুলি অসংখ্য শ্রোতৃচিত্তে বিস্ময়ের দোলা দিয়েছে। কালে খাঁ, বাহাদুর খাঁ, নওরোজ খাঁ, ফিরোজ খাঁ, বায়েস আলি খাঁ, এনায়েত হোসেন খাঁ, তাঁর পুত্র সাফাৎ খাঁ, হুসেন খাঁ, আশিক আলি খাঁ, আলিহোসেন মহম্মদহোসেন খাঁ, কল্লন খাঁ প্রভৃতি যশস্বী কলাবিদরাও উনিশশত খৃষ্টাব্দের অন্ত্যভাগে নিজামত সভায় থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় রাগসঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠা করবার বিষয়ে অশেষ যত্নবান হন।

বহরমপুরের সৈদাবাদ পল্লীর বিশ্বনাথ রাও ( ১৩২৮ বঙ্গাব্দে সৈদাবাদ বিপ্রঘাটার অসুখে উদরী রোগে পরলোকপ্রাপ্ত ', কাশীনাথ রাও, মনবাহাল সিং, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাশিমবাজার রাজসভার অবস্থান আর ধ্রুপদ ধামার গানের বিশদ চর্চার দ্বারা মুর্শিদাবাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধিসাধন মহারাণী স্বর্ণময়ী ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আমলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সৈদাবাদবাসী ধ্রুপদী রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর নামও এ প্রসঙ্গে বর্ণনীয়। ধ্রুপদীশ্রেষ্ঠ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী কাশিমবাজার রাজদরবারে বহুবৎসরকাল যাবত অবস্থান করেন। তাছাড়া দৌলত আলি খাঁ, অঘোর চক্রবর্ত্তী, অযোধ্যামিশ্র, মজঃফর খাঁ, মৌজুদ্দীন খাঁ, ছাপপানছুরী জানকী বাঈ, রাজেশ্বরী বাঈ, ছটাকী গহরাজন বাঈ, ফিদাহোসেন খাঁ, ফয়জতুল্লাহ খাঁ—কুদ্দুস খাঁ, উজীর খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, ইমদাদ খাঁ, দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রসন্ন বণিক্য, অবনী গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্পীদের অসামান্য গানবাজনা ও 'বহরমপুর সঙ্গীতসমাজ

বিদ্যালয়' এর অস্তিত্ব এই জেলাকে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে। এই প্রতিষ্ঠা হয় মুখ্যত সঙ্গীত রসিক মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা মূলে। কাশ্মী পাইকপাড়া রাজসভাসঙ্গীতকার বীণাবাদক নন্দদীঘল ও বনোয়ারীবাদরাজের সেতারী আমীর খাঁর ( জয়পুর ঘরাণার যন্ত্রী, আমীরখানি বাজ-এর স্রষ্টা ) মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার উচ্চাঙ্গীয় যন্ত্রবাদ্য চর্চ্চার পুষ্টিও ঘটে বহুল পরিমাণে। রামরতন মিশ্র, স্বরূপসহায় মিশ্র, রামগোবিন্দ পাঠক প্রমুখ এসরাজী সুরবাহারীও কাশিমবাজার—বহরমপুরে দীর্ঘকাল বসবাস করে বিভিন্ন ঘরাণার যন্ত্রবাদ্য অনুশীলন দ্বারা মুর্শিদাবাদের সঙ্গীতক্ষেত্রকে উর্ব্বর করে তোলেন। আজিমগঞ্জ-নশীপুর—লালগোলার সন্ত্রান্তভবনে রামশরণ পাণ্ডে, বাঁকে বিহারী মিশ্র, অক্রুর কর্মকার, চন্দন চৌবে, বাঁশদেও উপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গানবাজনাও এই জেলার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতপুষ্টির অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই।

মুর্শিদাবাদ জেলায় নানাপদ্ধতির ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরীগানের বিস্তার ঘটাবার বিষয়ে বহুশ্রুত গায়ক গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর অবদান অসামান্য। গিরিজাশঙ্করের বক্রগতি সম্পন্ন বাট-এর কারুকার্য সমন্বিত মহারাষ্ট্রীয় —রামপুরী রীতির ধামার, লক্ষ্ণৌর টপ্পা ঢঙের হোরী পঁ্যাচদার শক্তিশালী তানযুক্ত আস্থায়ী, খাস-হিন্দুস্থানী চাল-এর বড় ও ছোট ঠুংরী, হোরী ঠুংরী গানে মুনসীয়ানা মুর্শিদাবাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চ্চার রসায়নরূপে গণ্য থাকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত। বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীতের অপরূপ বিন্যাস ও নিখুঁত বিশ্লেষণ শক্তির মাধ্যমে গীতবাদ্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন এই জেলাবাসী অন্য গায়ক কিশোরীলাল ভাস্কর, সেখ কাদেরবক্স, অনাথনাথ সিংহ, আনোয়ার আলি মির্জ্জা ওরফে মঞ্জু-সাহেব মজারী, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাধাবিনোদ ঠাকুর, সেঁতারী নবাব আজমআলি, ব্রজনাথ ঠাকুর, ভগবান দাস, গুলজার ওস্তাদ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ বাগচী, লালমোহন ঠাকুর, সূর্য্যকান্ত দ্বিবেদী, সুর-বাহারী জিতেন্দ্র সিং, শ্রীনিবাস নাগ, বেহালাদার হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হারমোনিয়মবাদক ইউসুফ হোসেন, রাধাকান্ত সরকার, যতীন্দ্র হাজরা, মৃদঙ্গী শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য শিরোমণি ( তেরধা তেহাই-এর আবিষ্কর্ত্তা. 'থাপ' ও 'টক্কী' বাদ্যে সমদক্ষ ) হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ভবলিয়া মণিধাড়া, দেবেশচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ( অন্ধ ), বরদাশঙ্কর ঠাকুর, জয়পতি দত্ত, ইয়াকুব আলি প্রভৃতি খ্যাতিমান শিল্পীরা, বর্ত্তমান বিংশ শতকেই।

বহরমপুরের সঙ্গীতশাস্ত্রী হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নামও এ প্রসঙ্গের অপরিহার্য্য সংযোজন।

অধুনাকালে বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত চর্চ্চার দ্বারা মুর্শিদাবাদের সুরজগতকে সমৃদ্ধিশালী করে রাখবার বিষয়ে এখানকার কালিকাপ্রসাদ রায়, গৌরচন্দ্র ভাস্কর, যামিনীনাথ গাঙ্গুলী ডি, মিউজ, জগন্নাথ দাস, আলি মির্জ্জা, ব্রজতশেখর মৈত্র, ব্রজগোপাল সেন, পুলিনচন্দ্র পাল, নিতাগোপাল সাহা প্রভৃতির কার্য্যকলাপ নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

# অগ্রগতি

জ্যোৎস্নাময় বসু

ভোম্বল অনেকদিন পরে কলকাতায় এসেছে। এবার এসে অনেক পরিবর্তন তার নজরে পড়ল। দেয়ালে দেয়ালে 'আমাদের চেয়ারম্যান', 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব', 'শোধনবাদ', 'যুগ যুগ জিও', 'তাত্ত্বিক নেতা', 'সংগঠনের মহান নেতা' ইত্যাদি ইত্যাদি লেখাগুলি আর দেখা যাচ্ছে না। দেয়ালের লিখন মুছে গেলেও শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানারকমের সাইন বোর্ড দেখা যাচ্ছে। 'কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই,' 'মন্ত্র একটাই,' 'অনুশাসন পর্ব', 'নিয়মানুবর্ত্তিতা' ইত্যাদি সাইনবোর্ডগুলিকে পোষ্টারের বিকল্প হিসাবে তার খুব ভালই লাগল।

একটা সাইনবোর্ড দেখে সে একটু থমকে দাঁড়াল। মানে বুঝবার চেষ্টা করল। 'দেশ এখন এগিয়ে চলেছে'—সাইনবোর্ডটি তাকে ভাবিয়ে তুলল। 'মেড ফর ইচ আদার', 'ইউ বি আই সিটী' বা ডানলোপিলোর বিজ্ঞাপনগুলি তার নজরে পড়ল না। রাস্তায় চলতে লাগল অন্যমনস্কভাবে।

'দেশ এখন এগিয়ে চলেছে' কথাটার মানে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। দেশ কিভাবে এগিয়ে চলে? বর্মা, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বাদে ভারতবর্ষ কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছে? উত্তরে? দক্ষিণে? পুবে? না পশ্চিমে?

উত্তরে এগোন সম্ভব নয়। তাহলে হিমালয় পেরোতে হয়। কলকাতা হয়ত কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরেই উঠে পড়বে। এ অসম্ভব। দক্ষিণে বরং যেতে পারে। বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর পড়ে রয়েছে। জায়গার কোন অভাব নেই। কিন্তু হিমালয়ের কি হবে? হিমালয় আবার পুরোপুরি আমাদের নয়। আমাদের সীমানা বরাবর হিমালয় পাহাড়কে খাড়াভাবে কেটে গিয়ে যদি দক্ষিণে এগোন যায় তবে সেখানটার অবস্থা কি হবে? হিমালয়ের দুই অংশের মাঝখানটা কি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু পর্য্যন্ত পৌঁছে যাবে?

ভোম্বল ভেবে দেখল, উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমে কোন দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে তার কোন দিকে খেয়াল ছিল না। একটা প্রাইভেট বাস তাকে ঘেঁসে চলে গেল। পাদানীতে দাঁড়ান কয়েক জনের সাথিও

খেল। এক লাফে সে একেবারে কিনারায় চলে এল। বাস ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে। তার বেশ রাগ হল। রাগতভাবে বাসের দিকে তাকিয়ে আবার তার চোখ আটকে গেল। বাসের গায়ে লেখা রয়েছে—দেশ এগিয়ে চলেছে।

এ লেখার দিকে দৃষ্টি যেতে মুহূর্ত কয়েক আগে যে তার বিপদ হতে চলেছিল সে কথা ভুলে গেল। একথাটার মানে তাকে বুঝতেই হবে। কোথায় দেশ এখন এগিয়ে চলেছে? বেশ ভাবনার কথা। সে স্থির করল দু এক জনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে।

একটা দোকানে জিজ্ঞেস করতে ভদ্রলোক রেগেই উঠলেন। তার এখন এসব বাজে কথা নিয়ে কথা বলবার সময় নেই। কিছু কিনবার থাকলে ঠিক আছে, নয়ত দরজা খোলা আছে। ভোম্বল একটু দমে গেল। চট করে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে ভরসাও পাচ্ছে না।

একজন ভদ্রলোককে দেখে তার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। ইনি নিশ্চয়ই বলবেন। ভোম্বলের আন্দাজ ঠিকই হয়েছে। ভদ্রলোক ভোম্বলকে বুঝিয়ে দিলেন। কত স্মাগলারকে ধরা হয়েছে, কত ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি পড়েছে ইত্যাদি সব বোঝাতে লাগলেন।

ভোম্বলের তাও কিছু বোধগম্য হ'ল না। বুঝতে পারল যে—হ্যাঁ একটা কিছু তোলপাড় হচ্ছে। কিন্তু দেশ কোথায় এগিয়ে চলেছে সেটা কিছুই বুঝতে পারল না। ভদ্রলোককে সোজাসুজি জিজ্ঞেসই করে ফেলল—দেশ কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছে? ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে ভোম্বলকে বুঝিয়েছেন। আর সময় নষ্ট করতে রাজী নন। এক কথায় জবাব দিয়ে বিদায় নিলেন—সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এতক্ষণে ভোম্বল একটা চেনা কথা শুনতে পেল। সমাজতন্ত্র। কয়েকবছর ধরে দেশের বাড়ীতেও একথাটা শুনে এসেছে। সবার মুখেই সমাজতন্ত্রের কথা। তাদের মহাজন নিতাইবাবুও সমাজতন্ত্রের কত ব্যাখ্যা করেন আজকাল। ভোম্বল ভদ্রলোকের উপর বেশ খুশী হয়ে উঠল। এতক্ষণ কি সব শক্ত শক্ত কথা বলছিলেন। দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে বললে এক কথাতেই বুঝতে পারত। সমাজতন্ত্র কথাটা তার চেনা এবং সেদিকে এগিয়ে যাওয়া তো খুব ভালো কথা।

হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গী চলে এসেছে। কত গাড়ী বাব্বা। সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে গাড়ী তো লাগবেই। রাস্তার গাড়ী দেখতে দেখতে তার রাস্তার

দিকেই নজর ছিল। একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগাতে সেদিকে তাকিয়ে যার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে তাকে দেখতে পেল। ভদ্রলোক হাতে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেছেন। ভোম্বল জানে যে এ ধাক্কা লাগবার জন্য সে দায়ী এবং ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চাইবার ইচ্ছা হল। কিন্তু ভদ্রলোক সেটুকু সময় ভোম্বলকে দিলেন না।

এবার ফুটপাথের দিকে নজর গেল। একজন একখুড়ি ছাতু, কাঁচা লঙ্কা, নুন নিয়ে পাল্লায় ছাতু মাপছে আর জনাচারেক লোক তাকে ঘিরে বসে আছে। সবার সামনে একটা করে থালা। এ দৃশ্য সে প্রতিবারই দেখতে পায়। ভোম্বলের মনে হল, গতবার এদের এসময় এখানে এভাবেই দেখেছিল।

সে ভাবল এদের জিজ্ঞেস করে, 'দেশ এখন এগিয়ে চলেছে' কথাটার মানে কি। কিন্তু এরা এখন ক্ষুধার্ত। খাবার ছুটি মিলেছে, এখন খেতেই ব্যস্ত। এদের সময় সত্যিই নেই, খেয়ে আবার যার যার কাজে ছুটতে হবে। কাঁচালঙ্কা দিয়ে ছাতু খাওয়ার মধ্যে তাদের আর বিরক্ত করতে ইচ্ছা হল না। দেশ এখন এগিয়ে চলেছে চলুক, এরা অন্তত একটু শান্তিতে ছাতু খেয়ে নিক।

পার্ক স্ট্রীটে ঢুকে একটু এগোতেই ভোম্বলের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। দেশ কোথায় এগিয়ে চলেছে বুঝতে আর একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। ওইতো স্পষ্ট করে একটা হোটেলের তিনদিকের দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে সাইনবোর্ড ঝুলছে—"HAVE YOUR NEXT AFAFIR HERE"—সাদা বাংলায়—আপনার পরবর্তী ফষ্টিনষ্টি করুন এখানে।

"পরবর্তী" কথাটা এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এবং একথাতেও অগ্রগতির নিদর্শন রয়েছে।

# গ্লাস

মদন দাস

মহাশয়গণ, আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর কোন দুঃখ আপনাদের কখন ছুঁতে পারেনি। আপনাদের প্রত্যেকের মুখে কি উজ্জ্বলতা! আপনারা হাসছেন—অনবরত হাসছেন, হাসছেন আর কথা বলছেন, অনর্গল কথা বলছেন, এ ওকে বলছেন ও একে বলছেন—কি যে বলছেন কে যে শুনছে এসব খেয়ালও করছেন না, শুধু মনের আনন্দেই বকছেন।

ঐ কোণের দিকে আবার ট্রানজিস্টর রেডিও চালু হ'য়ে গেল। বাঃ। গানটা বেশ উত্তেজক। মনে হচ্ছে কোন হিন্দি ফিল্মের ক্যাবারে নাচের গান-টান।

আহা! ঐ একেবারে পেছনের লম্বা সীটে ছ'জন ছেলেমেয়ে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে দিলো। কি ব্যাপার? ও। ওরা খাবার ভাগাভাগি করে খাচ্ছে, খাচ্ছে আর কোথায়! কাড়াকাড়ি করছে আর সেই ছলনার গায়ে গায়ে সুখ-সুখ খেলছে।

বেশ! বেশ! মহাশয়গণ, এরকম আনন্দিত মানুষ দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, আমিও এরকম আনন্দ চাই, এরকম প্রাণ খুলে হাসতে চাই, সেজন্যইতো আজকে আমি আমার তিন বন্ধুর সাথে বেরিয়েছি। চারদিন ধরে আমরা খুব ফুর্তিতে কাটাবো, হাসবো খেলবো খাবো দাবো ছুটবো আর ছুটবো সমুদ্রের দীর্ঘ তীরভূমিতে, ছুটে ছুটে হাঁফিয়ে ধুপ্ করে শুয়ে পড়বো ঝাউবনে, এক ঘন্টা দুঘন্টা যতক্ষণ ইচ্ছা সমুদ্রের জলে ঝাঁপাবো, সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে রুপোলী মাছেরা নাকি ধরা পড়ে জেলেদের জালে। আমরা রোজ অনেক অনেক মাছ কিনবো, মেদিনীপুরের খুব ভালো ভালো চাল নাকি সেখানে থৈ থৈ—আমরা রোজ ভাত রাঁধবো—এইসব অনেক অনেক সুখের মতলব ভেজেছি দিনের পর দিন।

ঐ তো আমার বন্ধুদের দেখুন না—ঐ যে ওদিকের সীটে তিনজন পাশাপাশি—দেখুন কিরকম গল্পে মশগুল! কথা বলছে—না বক্তৃতা করছে রে বাবা। আসলে ব্যাপারটা বুঝেছেন তো? ওদের সামনের সীটে জানালার ধারে

বসেছে যে মেয়েটি ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এরা তিনজন হামলে পড়েছে। মেয়েটির পাশে বোধ হয় ওর মা তারপর বাবা। বাবার হাতে দেখছি আমার খবরের কাগজটা, ধর্মতলায় কাগজ কেনামাত্র কুন্তল ওটা হাতিয়েছিল, দেখুন কারবারটা—মেয়ের জন্য মেয়ের বাবাকেই কুন্তল তেল দিচ্ছে।

মেয়েটা কিন্তু পাত্তাই দিচ্ছে না। গালে হাত রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন পাথরের গা। মেয়েটাকে প্রথম থেকেই দেখে আমার গা জ্বলে গেছে। ধর্মতলায় বাস যখন ছাড়বো-ছাড়বো তখন ওরা এলো. তা মেয়েটার মুখে এতো দেমাক! যেন মাটিতে পা পড়ছিল না। আসলে ও বোঝে যে ওর সুন্দর মুখটার দিকে সকলে তাকাচ্ছেই। তাতে কি হয়েছেরে বাবা! সহজ ভাবে সকলের দিকে তাকালে তোমার চোখ কি ক্ষয়ে যাবে? সব সময় নিজের দিকেই তাকিয়ে আছে। এই মেয়েটার জন্য ওরা তিনজন এমন হ্যাংলামি করছে দেখে আমার মনে হচ্ছে মাত্রি ওদের পেছনে তিন সাথি।

মহাশয়গণ, আমার বন্ধু তিনজন ও আপনারা সকলে যে এমন আনন্দে উৎফুল্ল এতে আমি খুশী হ'তে চেষ্টা করছি। বস্তুতঃ আনন্দ পৃথিবীতে খুবই দুর্লভ বস্তু। কিন্তু মহাশয়গণ, আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। আপনাদের প্রত্যেকের উজ্জ্বল মুখ দেখে আমি ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছি। কেন বলুন তো? এজন্য যে, আমি একটুও আনন্দ পাচ্ছি না—অথচ আমি চাইছি।

আসলে আমার জীবনের প্রত্যেকটা দিন ভীষণ খোঁতাতোঁতা একঘেয়ে এবং নানান প্রকার উদ্বৃত্তিতে ভর্তি। তাও আবার এইসব ছোট ছোট উদ্বৃত্তির জন্য আমাকে নানান মতলব আঁটতে হয়, নানা ফন্দি কিকির খাটাতে হয় তবে দুটো পয়সা জুটিয়ে—

নাঃ! আমি দেখছি মনে মনে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করে দিয়েছি। আপনারা যখন আনন্দে মশগুল হ'য়ে এই দ্রুতগামী বাসে হুসহুসিয়ে ছুটে চলেছেন তখন কিনা আমি নিজে একটা গোঁত্তা খাওয়া লোচ্চা আপনাদের আনন্দ দেখে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছি আর—

এই যে আমার পাশে বসে আছে ছোট ছেলেটা—বাসে উঠে বসা পর্যন্ত আমি বুঝতে পারছি ওর ইচ্ছে জানালার ধারে বসে, কিন্তু আমি যেরকম মুখ খ্যাবড়া করে বসে, আছি ওর সাহসই হচ্ছে না আমাকে মুখ ফুটে বলবার। কিন্তু আমারই তো বলা উচিত। না মহাশয়গণ, আমার অতো বদান্যতা নেই। আমি পৃথিবীতে এসে এযাবৎ দুহাত ভরে, চুলোয় যাক, সামান্য কতটুকু সুখটুখ

পেয়েছি যে আবার অপরের সুখ দেখবো? সামান্য ব্যাপারই দেখুন, ওই যে আমার বন্ধুরা—দেখুন কেমন খুশীতে মশগুল—একবারও আমার কথা ভাবছে যে আমি কেমন একা পড়ে গেছি, অথচ ওরা কি জানে না এভাবে একা আমি ক্রমশঃ আরও ডুবে যাই গভীরতর কষ্টের মধ্যে···

এখন আমার সবচেয়ে বেশী রাগ হচ্ছে অনিমেষের ওপর। ও শালা টিকিট কাটিয়ে নিয়ে গেছে এক সপ্তাহ আগে—জেনে গেছে সীটের কিরকম ব্যবস্থা—কোন্ সীটটা জানলার ধারে। সকালবেলা ধর্মতলায় এসে বাসে উঠে দেখলাম বাসের একদিকে তিনজন করে আর একদিকে দুজন করে বসবার আসন—মাঝে সরু পথ অনিমেষ ব্যাটা জানে—চট করে তিনটে সীটের একটা লাইন ঢুকে জানালার ধার দখল করল আর চোখ দিয়ে আমাকে ইশারা করল উল্টোদিকের এই জানালার ধারের সীটটা দখল করার জন্য। আমি এক নম্বরের আহাম্মক, চটপট বসে পড়লাম। কুন্তল আর পরিমল খানিকক্ষণ চেঁচামেচি করে শেষ অবধি অনিমেষের পাশেই বসতে বাধ্য হলো, কিন্তু কাঁচকলার কাণ্ড দেখো। আমি আহাম্মক কেমন ব্যাবড়া মুখে বসে আছি আর ক্রমশঃ আমার মধ্যে বেড়ে উঠছে যন্ত্রণা···আঃ! আমি কিছু দেবোনা, কাউকে না, কিচ্ছু না, এই ছোট ছেলেটাকে জানালার ধারে বসার সুখটুকুও আমি ছেড়ে দেবোনা। আমার জন্য কে কি ছেড়েছে? আমি আমার এই চৌত্রিশ বছরের জীবনে কি পেয়েছি? আমাকে রোজ লোচ্চামিগিরি করতে হয়, নানান কন্দিকিকির করতে হয় দুটো পাঁচটা টাকার জন্য।

মহাশয়গণ, আসলে আমার কপালে সুখটুখ নেই। অথচ আমার ভেটাটা দেখছি পুরোপুরি আছে। হ্যাঁ মহাশয়গণ, আমি কপালের কথা বলছি। আপনারা বিশ্বাস করুন আমি ভীষণ কপালটপাল মানছি। আগে মানতাম না। যখন আমি বি. এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তখন আমার কি ভীষণ তেজ! তখন আমার এরকম মনে হতো আমার মস্তিষ্ক আমার বাহুবল আমার মনঃশক্তি আমার বুদ্ধিমত্তা এসবই সব। এসব দিয়েই আমি এগিয়ে যাবো জীবনে, শুধু এগিয়ে যাওয়া নয়, সকলকে পথ দেখাবো সুস্থ সুন্দর জীবনের। আমি ভাবতাম আমার দেশের লোকেরা বড়ো ভীরু, বড়ো ভাগ্য বিশ্বাসী, তাদের চেতনা আনতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে তাদের ধারণা ভুল, তাদের নতুন জীবনের কথা শোনাতে হবে, বোঝাতে হবে এ পৃথিবীতে সকলের সমান অধিকারের কথা। হ্যাঁ মহাশয়গণ, আমি একরম ভাবতাম আমি এগিয়ে যাবো সকলকে নিয়ে—পথ

দেখাবো—নতুন পথ—নতুন দিন—নতুন এক সময়ের দিকে আমরা এগিয়ে যাবো —তখন আমার ভীষণ তেজ। কলেজের গেটে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আমি যখন বক্তৃতা দিতাম তখন কলেজের হাজার ছেলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো, আমার কথা শুনতো, আমার সহপাঠীরা তখন আমাকে আর বন্ধু ভাবতে পারতো না, আমাকে শ্রদ্ধা করতো—আমার বক্তব্যকে ধ্রুব মনে করতো আমার অনুগামী হওয়া প্রয়োজন মনে করতো···

কিন্তু কিছুই হলোনা। মহাশয়গণ, সেই একই ভাবে সবকিছু চলছে আর আমি ক্রমশঃ পেছোতে পেছোতে—আঃ! আমি জানতামনা জীবনে এতো পেছানো যায়···আমি এখন খুব কপাল-টপাল বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি ভাগ্য খারাপ তাই এতোগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট জমিয়েও আমার চাকরি হলোনা। চাকরি হলো না তাই জীবনে আর কিছুও হলোনা। হলোনা কারণ ভাগ্য খারাপ, নাহলে চাকরি হতো—বৌ হতো—সাজানো ঘরে সুখগন্ধ—ছুটির দিনে মনমতো বাজার—সুখাদ্য পরিপাটি—সিনেমা—

সত্যি, আমার কপাল খারাপ, আমার শুধু নয় এই দেশটার অধিকাংশ লোকেরই কপাল খারাপ। আসলে এই দেশটারই কপাল খারাপ। সুতরাং সকলেই দেখছি ভাগ্যটাগ্য খুব মানে। এই সত্তর দশকে কলকাতায় কত শনি পূজা বেড়েছে দেখুননা, শনিবার সেই পুজোর থালায় কতো পয়সা জমে! আমিও আজকাল প্রত্যেক শনিবার পুজোর থানে ধূপ কিনে জ্বালিয়ে দিয়ে আসি আর দুটো পয়সা দক্ষিণা দিয়ে প্রার্থনা করি—না মহাশয়গণ, চাকরির প্রার্থনা আর করি না, ওটা দুবছর আগে পর্যন্ত করতাম তখনও কিছু আশা ছিল, ছিল বললে ভুল হয় আশা বলব তা হয়েছিল কারণ এম. এল. এ. দাদা বলেছিলেন তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করবই। কিন্তু ঐ পর্যন্তই! কিছুই হলোনা। তবে দুদিন আগে এম.এল.এ. দাদা খুব খাতির করছিলেন, আবার বলছিলেন, পল্টু, তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করবই, হ্যাঁ শুনেছোতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন হবে বলেছেন, আমি চেষ্টা করছি এম. পি. আসনে দাঁড়াবার, তবে একটু বাধাটাধা পড়ছে, যাইহোক দেখে না এই নীলাটা কিনে ফেললাম, ভাস্করাচার্য বলেছেন এটা পরলেই আমি চড়চড় করে এগিয়ে যাবো। আর আমার এগোনা মানেই তোমার এগোনো, তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করবই। তুমি ভোটের জন্য জান লড়িয়ে দাও।

মহাশয়গণ, আমি কিন্তু আর কাঁচা ছেলে নেই। ছিলাম যখন কলেজে

পড়তাম। আমি এখন বাবু হয়ে গেছি। এক নম্বর লোচ্চা হয়ে গেছি, বললাম, ওসব কথা ছেড়ে দিন, নগদ কতো ছাড়বেন বলুন। তা উনি ক্ষেপে অস্থির। হাতের নীলা ঝকঝকিয়ে বললেন, তুমি এই কথা বলতে পারলে পল্টু? আমার দৌলতে তুমি করে খাচ্ছোনা?

হ্যাঁ মহাশয়গণ, ওনার দৌলতে আমি করে খাচ্ছি। রোজ সকালে উঠে ওনার বৈঠকখানায় চলে যাই তারপর যতো দর্শনপ্রার্থী আসেন তাদেরকে পাকড়াও করি। কার রেশন কার্ড হচ্ছেনা, এম. এল. এ-র সই চাই—চোখমেরে কানে কানে বলি যতগুলি মাথার কার্ড হবে ততগুলি পাঁচ টাকার নোট—আমতা আমতা করে, তখন কড়া গলায় বলি 'ফলস্' কার্ডতো করাচ্ছেন, বুঝি না? যদি দিতে না পারেন কেটে পড়ুন সই হবেনা—হুড়হুড়িয়ে আদায় হ'য়ে যায়। তারপর চরিত্র-সার্টিফিকেট। আহা-আ-হা-হা! অবশ্য এটার ব্যাপারে আমি দুটাকার বেশী আদায় করিনা—ছেলে ছোকরা! চাকরির জন্য লড়ে যাচ্ছে! এদের আমি একটু কন্‌সিডার করি। মার্কশীট, সার্টিফিকেট এসবের কপি 'এটেষ্টেড্' করলে পয়সা লাগবেনা, শুধু 'ক্যারেকটার সার্টিফিকেটে' দুটাকা। এরকম নানান সইসাবুদের ব্যাপারে কিছু আসে। এছাড়া আছে গঙ্গার ধারে আমার এলাকার যতো গোডাউনের মাসিক ব্যবস্থা। তা ব্যাটারা এটুকু দেবেনা? তোদের যে শালা চুরি-চামারি হচ্ছে না, তার বেলা? আমি ইচ্ছে করলে দল পেছনে কিই করে দোবো, লাখ টাকার মাল সাবড়ে দেবে—ঘরে বসে থোক টাকার ভাগ পাঠিয়ে দেবে।

তা এম. এল. এ. দাদা আমার এসব জেনেও জানেন না, দেখেও দেখেন না সেদিন এরই ইঙ্গিত করল। শালা গা জ্বলে গেল। তোমাকে এম. এল. এ. করার জন্য আমাকে কিছু কম করতে হ'য়েছে? আর তুমিতো গুছিয়ে একবারে উপরে পড়ছ চাঁদ, তার বেলা?

ওঃ! আবে কুন্তল আনন্দে যে একেবারে গাল খাচ্ছিস। একটু আস্তে যে একটু আস্তে। মেয়েটাতো তোদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেনা। কিন্তু আমার কাগজটা ভদ্রলোক যে একেবারে চেটে পুটে পড়ে নিচ্ছে। কেন? আমি কারোর জন্য একটু কিছু দোবোনা—

—এ্যাই কুন্তল, আমার খবরের কাগজটা দে। সে চিৎকার করে বলল রুদ্ধ গলায়।

কুন্তল চমকে তাকাল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি কাগজ ভাঁজ করে তার দিকে এগিয়ে ধরে—আপনি পড়বেন? নিন।

ভদ্রমহিলা এবং মেয়েটি ফিরে তাকিয়েছে সে একবারও ওদের চোখে চোখ ফেললো না, মুখভাব আরও গম্ভীর করে বলল—না না ঠিক আছে আপনি পড়ুন, আমি ভেবেছিলাম আমার বন্ধু কাগজটা গুছিয়ে রেখেছে—বলতে বলতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো বাইরের দিকে।

বাসের গতি ক্রমশঃ কমে এসে থেমে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ হলো। কনডাক্টর সামনের সীট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বাস এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে; সামনে চা মিষ্টির দোকান টোকান আছে খাওয়া দাওয়া করতে পারেন, কেউ এদিক ওদিক ঘুরতে যাবেন না তাতে আমাদের দেরী হ'য়ে যেতে পারে। এখন নটা পাঁচ আমরা ঠিক নটা পঁচিশে গাড়ী ছাড়বো। কথা শেষ না হতেই সকলে হৈ হৈ করে নামছিল।

বাস ফাঁকা হ'য়ে গেছে। এমন কি ড্রাইভারও নেই। জানালার বাইরে তাকাল সে—

জায়গাটা বেশ সুমসাম। রাস্তার ওপারে একটা বিশাল পুকুর পাড়ে করেকটি নারকেল গাছ ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে, পুকুরের ওপারে ঝোপঝাড় আর গাছ গাছালির জটলার ফাঁকে দুএকটি বাড়ীর আভাস—রোদ্দুরে ডুবে আছে সব কিছু। সে শালটা গায়ে ভালো করে গুছিয়ে নিলো, সীট থেকে বেরিয়ে 'প্যাসেজে' দাঁড়ালো, পাজামা ঝেড়ে ঠিক ঠাক করল, দরোজা দিয়ে বাইরে তাকাল—

মিষ্টির দোকানে ভীড়ে ভীড়। একদিকে চা—আমার একটা—আমার একটা—এরকম আওয়াজ আর হাত বাড়ানো, অনেকে দোকানের ভেতরে গিয়ে বসেছে, অনেকে বাইরে প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে। দরোজার দিকে এগোলো সে—

সেই মেয়েটি। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। লাল শাল গায়ে জড়িয়েছে, বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করা, মুখ গম্ভীর, পুকুরের ওদিকে কোথায় যেন তাকিয়ে। দুপাশে দুটি তেইশ চব্বিশ বছরের ছেলে, সামনে দাঁড়িয়ে ওদের মা ভদ্রলোক শালপাতার ঠোঙা আর মিষ্টির ভাড় হাতে এগিয়ে এলেন। সে, পাদানিতে পা দিলো। সহসা মেয়েটির চোখ তার দিকে, সে মুখ কোঁচকাল এবং চোখ সরিয়ে নিল তারপর এদিক ওদিক তাকাল, সে তিনজনকে খুঁজছিল।

কুন্তল আর অনিমেষকে দেখল ওপাশের সিগারেটের দোকান থেকে বেরিয়ে

আসছে, হুন্তলের হাতে চার প্যাকেট ফিল্টার উইলস্. ওরা সোজাসুজি এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটির দিকে, হাতখানেক দূরে গিয়ে দাঁড়াল। পরিমল খাবার হাতে দোকান থেকে বেরোচ্ছে। সে পায়ে পায়ে ওদের দিকে এগুলো।

অনিমেষ ওর দিকে চুপা এগিয়ে আসে, চাপা গলায় বলে—কি ব্যাপাররে পল্টু, ছেলে দুটো আর মেয়েটা তোর দিকে বারবার তাকাচ্ছিল? যাঃ বাবা, আমরা এতক্ষণ ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আর তুই কিনা টেনে নিলি? ছেলে দুটোতো তোর সামনের সীটে বসেছে, তুই বুঝি ওদের সাথে ইতিমধ্যে আলাপ করে ফেলেছিস?

সে কপাল কুঁচকে বলল—না, তারপর এগিয়ে গেল পরিমলের দিকে, বলল কি কিনলি দে।

অনিমেষ ফিরে এসেছে, সিগারেটের একটা প্যাকেটে ওর হাতে দিলো, চাপা গলায় বলল মুখটা এমন পাঁচ করে রেখেছিস কেন? তুই যেন কি! বলে সে বিরক্তিসূচক কাঁধ ঝাঁকাল. ফুল হাতা সোয়েটারের হাতাদুটো টেনে টেনে ওপর দিকে একটু তুলল. আঙুল মটকালো। বাস পুনরায় ছুটছে। বাসের মানুষজন এখন অনেক চুপচাপ। সে সিগারেট ধরালো তারপর কাঁধের ঝোলাব্যাগে হাত ঢুকিয়ে কিছু কাগজপত্র বার করল—লাইফ ইনসিওরেন্সের নানা ধরনের লিফলেট—সেগুলি পড়াতে মন দিলো।

পরিমল—কি ব্যাপার বলতো অনিমেষ, পর পর কদিন ধরে দেখছি ইনসিওরেন্সের কাগজপত্র নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করছে, কী জন্য?

অনিমেষ—উঁচু গলায়—ও একটা লাখখানেক টাকার পলিসি করাবে। ঐ যে ইনসিওরেন্সের এজেন্ট—বসন্তদা—ওকে খুব ধরেছে—পল্টু তুমি এতো টাকা আয় করছো কিছু ভবিষ্যতের জন্য জমাও, এই সব ধানাই পানাই গেয়ে গেয়ে ওকে গেঁথে ফেলেছে। তা বসন্তদা ধরেছে ঠিক লোককেই, ওতো আর দু পাঁচ হাজারের পলিসি করে হাত গন্ধ করবে না—লাখখানেক টাকার সহজেই করতে পারবে।

সে চোখ তুলে এক দৃষ্টে অনিমেষের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, অনিমেষ চোখ ফিরিয়ে নিলো তারপর অন্য কথায়—আচ্ছা পরিমল, তোর কি ব্যাপার বল ত? আমার বাড়ীর প্ল্যান আর ডিজাইন তুই কবে করে দিবি? তুই কি চাসনা আমি বাড়ীটা করি?

পরিমল - প্রজ অনিমেষ, আমি এতো ব্যস্ত তুই জানিস না অফিসে এখন

এতো কাজের চাপ পড়েছে ! এক সঙ্গে তিনটে 'মালটি ষ্টোরেড্ বিল্ডিং'-এর কাজ আমার ওপর, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি হিমসিম খাচ্ছি, দেখিসতো এক একদিন ফিরতে কতো দেরী হয়। কোম্পানী আমাকে যে রকম টাকা দিচ্ছে সে রকম খাটিয়েও নিচ্ছে, যাই হোক তোর ব্যাপারটা আমার মাথায় আছে, তাছাড়া তোর বাড়ীর ডিজাইন—সেটা এমনই চমৎকার আর আইডিয়াল করতে হবে—পরিমল সিগারেট ধরায় দীর্ঘটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে—বলে—মাসখানেকের মধ্যে আমি একটু 'ফ্রি' হবো তখন নিশ্চয়ই—।

—দেখা যাক !—অনিমেষ ঠোঁট ওল্টায়—মা এদিকে বিয়ের জন্ত ভীষণ ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছেন, বলছেন বাড়ীতো হবেই কিন্তু এখন কি তুই গাছ তলায় আছিস ? কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় ওই এজমালি বাড়ীর ভাগের অংশে থেকে বিয়ে করি বুঝলিনা ?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, প্রথম 'চার্মিং' দিনগুলো বেশ রাজকীয় যদি না হয়—বলতে বলতে পরিমল উদার হাসে।

বন্ধুগণ ! আজ ছাব্বিশে জানুয়ারী উনিশশো সাতাত্তর সালের ভোরে আমার যখন ঘুম ভেঙেছিল গায়ের চাকা ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমেছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম—এইসব থোঁতাভোঁতা একঘেয়ে দিনগুলির মুখে আমি লাথি মেরে চললাম। বুকের মধ্যে কি একটা উসখুসে ভাব ছটফট করছিল। আমি যতো দ্রুত হাতে কাজ কর্ম সারতে চাইছিলাম ততই সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। তবু আমিই সকলের আগে গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলাম, ওদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাঁক দিয়েছিলাম। কিন্তু—

বন্ধুগণ ! তোমরা সত্যিই সুখী। যেটা আমি পেতে চেয়েছি অথচ পাইনি তোমরা পেয়ে গেছ। কেমন হেসে খেলে মাতোয়ারা হ'য়ে আছো। ঠিক এমনটা তো আমিও চেয়েছি। সেজন্তই তোমাদের সঙ্গে বেরোলাম অথচ এখন আমার মাথার সেই পেরেক-মারা যন্ত্রণা, মুখটা তেতো বিস্বাদ—

সারাক্ষণ আমার মনে হয় আমার মাথায় বাঁদিকের পেছনে একটা পেরেক মারা আছে। কখন কখন এটা এতো প্রবল হয়ে ওঠে মনে হয় একটা ধারাল ছুরি দিয়ে ওখানটা চিরে দিই, জমে থাকা বদ রক্ত-টক্ত হয়তো জমে আছে, বেরিয়ে যাক যন্ত্রণা কমুক।

সারাক্ষণ আমার মুখের মধ্যে একটা বিশ্রী তেতো ভাব থাকে আর বুকের

মধ্যে কি যেন যন্ত্রণা। আঃ! আমার মনে পড়ে না শেষ করে আমি প্রাণ খুলে হেসেছি। এই ভাবেই চলেছে। তবু। মাঝে মাঝে কিরকম যেন মনে হয় নতুন করে বাঁচার, একটা অদম্য ইচ্ছা বুকের ভেতর ধাক্কা দেয়, মনে হয় একটা নতুন কিছু করি—করতে চাই—করতে যাই—তারপর ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ি—

বন্ধুগণ, আজ উনিশশো সাতাত্তর সালের ছব্বিশে জানুয়ারী সকাল বেলা আমি যে উদ্দীপনা নিয়ে উঠেছিলাম মাত্র করেক ঘণ্টার মধ্যেই সেই উদ্দীপনার মৃতদেহ আমাকে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে আছে।

আজ সকালে কিন্তু আমার মাথার বাঁদিকে সেই পেরেক-বেঁধা যন্ত্রণাটা ছিলনা। অনেক অনেক দিন পর আজ মনে হচ্ছিল মাথাটা হাল্কা, মুখটা সুগন্ধপূর্ণ আর বুকের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ আপাচ্ছিল, কোথা থেকে আসছিল অদ্ভুত বাতাস, আমার শীত প্রায় লাগছিলই না।

তারপর আমরা ধর্মতলায় পৌঁছালাম। তখন কাতারে কাতারে মানুষ আর মানুষ—এতো মানুষ? আমি বললাম—অনিমেষ, আজকে কি? এতো লোক?

আমি জানলাম, হ্যাঁ আজ ছাব্বিশে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস, আমি বুঝতে পারলাম কাতারে কাতারে লোক চলেছে প্যারেড্ দেখতে। মানুষ এতো মানুষ দেখতে দেখতে আমার বুকের মধ্যে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল অমর, আমি স্পষ্ট দেখলাম সে মাথা ঝাঁকিয়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে চকচকে চোখে তাকাল, আমি একটা ঝাঁকুনি খেলাম, আর আমার মাথার পিছনে পেরেকটা বিঁধে গেল।

কবছর আগে যেন? পাঁচ? ছয়? সেদিন আমি অমরকে নিয়ে বসেছিলাম। সেদিন ছাব্বিশে জানুয়ারী—তাকে আমি দেখাতে এনেছিলাম ঝকঝকে তকতকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর মাত্র সামান্য অংশের ঝন্‌ঝনা। সে আমার ভাই, সে আগুনের স্রোতে সাঁতার দিতে নেমেছিল। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম—তুই ভুল করছিস—এপথ ঠিক পথ নয়—সে বলেছিল—তবে কোন্ পথ ঠিক দাদা? তোর পথ? তার চোখে আগুন। আমি মাথা নীচু করে নিয়ে বলেছিলাম—আমি এখন আর কোন পথের নিশানায় হাঁটছিনা, আসলে আসলে আমি কোন পথই দেখছিনা; কিন্তু তোর পথ—সেও ভুল পথ।

সে আমার ভাই, সে আগুনের স্রোতে সাঁতার দিতে দিতে হাত তুলে আমাকে ডাকতো—চলে আয়—আমার পথই একমাত্র পথ। চরমপন্থা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

কিন্তু আমি অনেক দেখেছি বুঝেছি ভেবেছি, আমি বুকে হাত দিয়ে বুঝতে

পারতাম, তাই আমার শেষ হ'য়ে যাবে—তাই আমি তাকে—

হাঁ। সেদিন ছাব্বিশে জানুয়ারী, সে বোধহয় পাঁচ না ছয় সাত? কবছর আগে? জনতার ভীড়ে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি আমি বলেছিলাম, অমর দেখ্ কি বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে তোরা খেলনা নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিস। তোরা আহাম্মক—এবং সেই মুহূর্তে অমর ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, আমার চোয়ালে সজোরে ঘুসি—আমার চোখে অন্ধকার—সে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

সে আমার ভাই। সে আগুনের স্রোতে সাঁতার দিতে দিতে আমাকে হাত তুলে ডাকতো, তাকে আমি বলেছিলাম আহাম্মক, সে আমাকে জবাব দিয়েছিল শক্ত মুঠোয়. আমার চোয়াল কেটে রক্ত···তারপর সে হারিয়ে গেল···কোথায়?

আঃ। আমার মাথার পেছনে পেরেকটা ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা ধারাল ছুরি নিয়ে ওখানটা চিরে দিই, যদ রক্তটক্ত বেরিয়ে যাক, তারপর আমি নতুন হয়ে উঠব—চারিদিকে অসুস্থ গাছেরা সবুজ সবুজ হয়ে উঠবে, হেসে উঠবে খুশীর বাতাস, প্রতিটি শিশুর শরীরে লাবণ্য, প্রতিটি মানুষের···

আঃ! আমি জানতাম না জীবনে এতো পেছানো যায়। আমি একটা এক নম্বরের লোচ্চা···

অথচ আমার বাবা খুব সাচ্চা মানুষ, ছেলেবেলার একটা কথা আমি সারা-জীবন ভুলতে পারবো না। তখন আমি প্রাইমারী স্কুলে পড়ি। তখন আমরা কলকাতার এই ভাড়া বাড়ীতে আসিনি। মফঃস্বলে এবং টাউনে তখন বাবা চাকরি করতেন। আমাদের স্কুলে আমার এবং সহপাঠী ছিল কি যেন নাম তার মনে নেই, শুধু ঘটনাটা মনে আছে—আমার ঘুঁড়ি লাটাইর শখ ছিল। বহবার মায়ের কাছে বায়না করে বাবার কাছে বলে আমি পাইনি। আমার বাবা কম মাইনের চাকুরে। এই সামান্য বাজে খরচের সাধ্য তাঁর ছিলনা। তাছাড়া এই-সব নানান খেলাধুলা তাঁর পছন্দ ছিলনা। শুধু লেখাপড়া ছেলের ধ্যানজ্ঞান হোক এটাই তিনি চাইতেন, অবশ্য ধীরে ধীরে তিনি দুছেলেকে সেই ভাবেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ঘুড়ি লাটাই কিনে না দেওয়ার আমি একজনের ঘুড়ি লাটাই নিয়ে নিয়েছিলাম—সে আমার প্রাইমারী স্কুলের সহপাঠী তার তিনটে লাটাই ছিল আর ডজন ডজন ঘুড়ি। আমি জানিনা তাদের ব্যবসা ছিল না জমিদারী ছিল, নাকি তার বাবা অনেক টাকার চাকরি করতেন—কিন্তু তাদের অবস্থা খুবই স্বচ্ছল ছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ছেলেটি আমাদের বাড়ী এসে বলল, পল্টু, তুই আমার

বুড়ি লাটাই চুরি করেছিস ? তখন বাবা সবে অফিস থেকে ফিরেছেন। কিন্তু চুরি কি জিনিষ আমি জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম ওর তিনটে আছে—আমার একটাও নেই অতএব আমি একটা নিলাম—এইতো। কিন্তু ব্যাপারটা বাবা বুঝলেন না, সেদিন সেই লাটাই আমার পিঠে ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

বাবার ওপর আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে আমি বুঝেছি বাবা যে চেয়ারে চাকরি করেন তাতে ঘুষ নিলে বাবা একটা নয় —কয়েকটা বাড়ীর আর অনেক নগদ টাকার মালিক হ'তে পারতেন কিন্তু তিনি কিছুই করেননি, সুতরাং আমরা চিরকাল বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং শেষে কলকাতায় দুখানা ঘরের বাসাতেই জীবন কাটালাম।

যৌবনের প্রথম অধ্যায়ে আমি বাবাকে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। তখন আমার রক্তে তেজ চোখে স্বপ্ন। আমি ভাবি মানুষকে পথ দেখানর জন্য আমি এক অধীশ্বর। আমার দেশের লোকগুলি বড় ভীরু বড় দুর্বল বড় সংস্কারে বিশ্বাসী। আমি তাদের আলো দেখাবো তাদের বোঝাবো, এই পৃথিবীতে আমরা সকলে সমান অধিকার নিয়ে জন্মেছি। এখানে কারো অঢেল থাকবে আর কারো কিছুই থাকবে না এভাবে চলতে পারেনা···

···আমি এক আহাম্মক। আমাকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমার ভাই আরেক কাঠি বেশী আহাম্মক হ'য়ে হারিয়ে গেছে ··আমার বাবাকে এখন আমার আহাম্মক মনে হয়, চিরকাল সাধুতা করে কাটিয়ে···

আর আমার মা, আমার কপাল-বিশ্বাসী মা বিশ্বাস করেন তাঁরই দুর্ভাগ্যে সংসারের এই হাল করেছে। তার দুর্ভাগ্যের জন্যই তার এক ছেলে গেছে হারিয়ে আর এক ছেলে ছন্নছাড়া—চাকরি নেই —আর নেই—

সুতরাং মা আমার রোজ ঈশ্বরের কাছে মাথা খোঁড়েন, সারাদিনের কয়েক ঘন্টা লুকিয়ে চোখের জল ফেলেন, আমার আর হারিয়ে যাওয়া ভায়ের কুষ্ঠি নিয়ে জ্যোতিষীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান···হাঃ। হাঃ। সম্ভবত জননী আমার পরশ পাথর খোঁজেন···

বড় জল তেষ্টা পাচ্ছে। আঃ, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে।

অনিমেষ, জলের গ্লাসটা দেখি সে উঁচু গলায় বলল। কিরকম একটা বিশ্রী কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

মেয়েটি ফিরে তাকিয়েছে এবং সামনের সীটের ছেলেছুটিও।

অনিমেষ টলমলিয়ে উঠে দাঁড়াল, তার পায়ের কাছে কোথায় যেন জলের ফ্লাস্ক ছিল নীচু হ'য়ে তুলে নিলো তারপর অনেকখানি ঝুঁকে এগিয়ে ধরল।

এমনভাবে সে জল খাচ্ছিল যেন দীর্ঘকাল তৃষ্ণার্ত সে মরুভূমিতে ঘুরেছে। গায়ের শাল সরে গিয়েছিল, পাঞ্জাবীর খানিকটা ভিজে গেল. বাঁ হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে সে ফ্লাস্কের ঢাকা বন্ধ করতে গেলে পাশের ছোট ছেলেটি বলল- আমি একটু জল খাবো।

খানিকক্ষণ রুক্ষ চোখে সে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল, ছেলেটি ভীতু ভীতু চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, সে জলের পাত্রটা এগিয়ে ধরল।

ফ্লাস্কের মুখে একটা গ্লাস ছিল, ছেলেটি গ্লাসে জল ঢেলে মুখে তুলেছে এমন সময় পেছনের সীট থেকে মেয়েলী গলা,—ভাই, আমাকে একটু জল দে! সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

জানালার ধারে বসা একটি কিশোরী লাল রঙের চাপ চাপ সোয়েটার গায়ে —তার সঙ্গে চোখে চোখ। পাশে বসে সম্ভবতঃ মেয়েটির মা।

ছেলেটি জল খাওয়া শেষ করে বলল—তোকে দোবো কেন, তুই কি আমাকে জানলার ধারে বসতে দিয়েছিস?

মা—খুকু তুমিতো অনেকক্ষণ জানালার ধারে বসেছ, দাওনা ছোট ভাইকে একটু বসতে।

ছেলেটি জলের ফ্লাস্কটা নিয়ে চকিতে উঠে দাঁড়াল, বলল, যাবো দিদি?

সে আরেকবার মুখ ফেরালো, দেখল মেয়েটি জল খাচ্ছে, সে মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। ছেলেটি পাশ থেকে উঠে গেছে। মেয়েটি তার পাশে এসে বসল। সে একঝলক তাকাল. মেয়েটি জলের ফ্লাস্ক তার দিকে এগিয়ে দিলো।

বাহবা! যাত্রাটা দেখছি বেশ রমনীয় হ'য়ে উঠল। এই টিন্‌এজারটি দেখছি বেশ ফরোয়ার্ড। দৃষ্টি মোটেই বালসুলভ নয়! বেশ খুকু, এই বয়সেই তুমি বেশ চোখের ভাষাটাও শিখে ফেলেছ। তোমার বয়স অনুযায়ী তোমার বুক অধিক পরিপুষ্ট দেখছি, তার ওপর চাপচাপ লাল সোয়েটার আর বেলবটম্‌ —তোমাদের মতো 'ফরোয়ার্ড টিনএজার'দের মায়েরা বেশ উদার। তোমাদের পোষাক আষাক তোমরা নিজেরাই বোধহয় পছন্দ টছন্দ করে এবং তোমাদের ব্যাপারে যথেষ্ট ফিল্' করেন।

বাঃ। তোমার খুই জব্বা দেখছি আমার সঙ্গে বেশ মাখামাখি করতে লেগেছে। বাহবা বাহবা, বেশ বেশ। এইসবইতো জীবন—এই সবইতো—কি বলে—'এনজয়'। দেহ যখন আছে—দেহের ইচ্ছাটিচ্ছাও আছে। আমার তো খুব বেশীই আছে। এই চৌত্রিশ বছর বয়সে দেহের খিদে থাকবেনা?

আমার বাবাতো এই বয়সে দু'ছেলের বাপ হ'য়ে গেছে—তাই কি? এই বয়সে তোমার দু'ছেলেই প্রাইমারী ইস্কুলের গণ্ডী পার হ'য়ে গেছে। বেশ বেশ খুকু, এসো আপাততঃ আমরা একটু পায়ে পায়ে খেলা করি। ঐ দেখোনা আমার বন্ধুরা—কিরকম হামলা হামলি করছে। ওটাকে কি বলব? প্রেম? প্রেম করতে চাইছে?

জানো খুকু, আমারও জীবনে প্রেম এসেছিল তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে আমার সহপাঠিনী। তার নাম মধুমিতা। জানো খুকু, আমার চেহারায় তখন খুব উজ্জ্বলতা ছিল। তাকে পেয়ে আমি আরও উজ্জ্বল হয়েছিলাম। জীবনে আমার আদর্শগুলিকে সফল করার জন্ত আমি সত্যিকারের সঙ্গিনী পেয়েছি। ওহো—তুমি আদর্শ কি জিজ্ঞাসা করছ? আরে সে এক ব্যাপার! আমি ছিলাম ছাত্র নেতা। তখন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু নাম বললেই সকলে আমাকে চিনতো, শ্রদ্ধা করত। আসলে এটা একটা নেশা। আমি আমার পার্টির উচু স্তরের নেতাদের কী গভীর শ্রদ্ধা করতাম, তাদের প্রত্যেক কথাকে মনে করতাম বাণী, আর ভাবতাম আমাকেও ওদের মতো হ'তে হবে, এই অভাগা দেশের এই নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুষদের চেতনা আনতে হবে।

এখন কিন্তু আমি এইসব নেতাদের পরিষ্কার চিনতে পারি। আসলে আমার অবচেতন মনে তখন সেই বয়সে এই নেশাটাই বোধ হয় ছিল—আমিও নেতা হবো, আমার কথায় সকলে উঠবে বসবে আমার কথাই হবে ধ্রুব, আমার সামনে এসে সকলে মাথা নোয়াবে। কিন্তু তখন আমি এটা বুঝতে পারিনি সেই উনিশশো চৌষট্টি সাল—আমার জীবনে অনেক কিছু নেওয়ার সময় ছিল—যখন বড়ো বড়ো সব নেতাদের বড় বড় কথার মার প্যাঁচ আর বাকযুদ্ধে পার্টি দুভাগ হয়ে গেল তখন আমি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলাম। তখন আমি মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে চলেছি চটকল এলাকায়। দিনের পর দিন কেটে যায় বস্তিতে বস্তিতে। কি পঙ্কিল নরকের অন্ধকার সেখানে, বন্দী লক্ষ লক্ষ মানুষ, অথবা মানুষ নামক অন্ত কিছু। সেই সব দিনে যখন আমি আমার দেশের চেহারাটা আরও ঠিক ঠিক চিনে উঠছি ঠিক সেই সব দিনে আমি আর একটা ভাঙনের

মুখে অসহায় দাঁড়ালাম—দেখলাম আমাদের আদর্শে আমাদের রক্ত-শপথ নেওয়া পার্টি দুভাগ হ'য়ে যাচ্ছে। আমার মনের মধ্যে সেদিন সব কিছু ওলট-পালট, আমি বিচার করে বুঝতে চাইছিলাম।

ওরা এখন 'ওরা' হ'লো—ওরাতো আমরা ছিলাম, আমরা সকলে চেয়েছি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে—তাহলে ?

সেদিন আমার শিক্ষা লাভ করা উচিত ছিল কিন্তু আমি করিনি। আমার মতো ছোট ছোট নেতাদের অধিকাংশ তখন তালমান কচুরি পানার মতো কেউ এভাগে কেউ ওভাগে আটকে যাচ্ছিল, আমিও আমার ঘনিষ্ঠ এক নেতার ভাগে রয়ে গেলাম। কিন্তু আমি ভুল করেছি, সেদিন ঠিক ঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আজকে আমি সুখী মানুষ হ'তে পারতাম, সেদিন ঠিক ঠিক শিক্ষা নিতে পারলে মধুমিতা হারিয়ে যেতো না—সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল সব কিছুতে একটা ভুয়ো আবরণ দিয়ে ভেতরে চলছে ক্ষমতা আর ব্যক্তিগত স্বার্থের লড়াই—সে বলেছিল এগুলি আমার কথা নয়—এগুলি আমার বাবার কথা, তাঁর বয়স হ'য়েছে তিনি পরিষ্কার চোখে অনেক কিছু দেখতে জানেন তুমি জানো বাবা পার্টির জন্ত জীবনের সব সুখ ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়েছেন, আজকে তিনি গভীর বেদনায় চুপচাপ বসে গিয়েছেন, তুমিও বুঝে নাও।

আমি ওর বাবাকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম, সেই পথ দিয়েই সে আমার জীবনে এসেছিল, কিন্তু সে চলে গেল। অথবা আমি তাকে সরিয়ে দিলাম ? সে বলেছিল, দেখ আমি মেয়ে, আমি ভালবাসা চাই ঘর-সংসার চাই, অবশ্ত আমি আদর্শবান স্বামীর মধ্য দিয়েই এসব চাই, আর তাইতো আমি তোমাকে ভালবাসি···সে এইসব চেয়েছিল, আমি তাকে দিতে পারিনি, সেদিন আমি তার শ্রদ্ধেয় বাবাকে স্বার্থপর নীচ বলেছিলাম, তাকে বলেছিলাম—

আঃ খুকু, তুমি তোমার স্পর্শ সরিয়ে নাও, আমার লাগছে। তুমি কতো ছোট, তুমি যদি তোমার বয়সের মতো স্বাভাবিক হ'তে, যদি আমার গায়ের ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে, জানালার ধারে যদি বলতে, দেখুন দেখুন ঐ গাছটা কি সুন্দর ! যদি তোমার চোখ দুটিতে মায়াময় সরলতা ছলছল করত—আঃ খুকু, তুমি তোমার স্পর্শ সরিয়ে নাও, আমার লাগছে···

বাসটা থেমে গেল। কনডাক্টর দাঁড়িয়ে উঠে বলল, এখন আমরা যেখানে

দাঁড়িয়েছি এই খড়্গপুর; এখানে আমরা দশমিনিট দাঁড়াবো।

কি আশ্চর্য মধুমিতা, আমি তোমাদের দেশের এলাম। তুমি যখন ছ'চার দিনের ছুটিতে কলকাতায় মামার বাড়ী থেকে মেদিনীপুরে নিজেদের বাড়ীতে আসতে তখন তুমি কথায় কথায় বলতে দেশে যাবো, ওনিয়ে আমি তোমাকে ক্ষ্যাপাতাম—'দেশে যাবে? আচ্ছা মেদিনীপুর দেশের রাজা কে? নাকি ওটা গণতান্ত্রিক? ক্যাপিটালিষ্ট না কমুনিষ্ট? আচ্ছা ওটা পৃথিবীর কোন্ অংশে অবস্থিত? ওই দেশের উত্তরে কি ভারতবর্ষ?' তুমি হাউমাউ করতে···মধুমিতা তুমি কি তোমার ঘর সংসার পেয়ে গিয়েছ? সুখী পরিবার? আদর্শ স্বামী? যে পরিপাটি চাকরি করে, স্ত্রী সন্তানের জন্ত একান্ত মনে শরীর-মন উৎসর্গ করিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে? ভালো। ভালো। আমিই শুধু একটা আহাম্মকের বাচ্চা আহাম্মক নিজের জন্ত কিছুই গুছিয়ে নিতে পারলাম না।

তোমাদের দেশে আমি আহাম্মকের বাচ্চা আহাম্মক শেষবার এসেছিলাম সাতষট্টি সালের গ্রীষ্মকালে বোধ হয়। সে এক মহতী জনসভায় বড় বড় নেতা-দের সাথে আমিও বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেদিন আহাম্মকের বাচ্চা আহাম্মকের কী উদ্দীপনা। তখন আমরা চোদ্দ দলের বাচ্চারা এক হয়েছি, পশ্চিমবঙ্গে আমাদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। আমাদের বড় বড় দাদারা মন্ত্রী হয়েছেন আর আমরা আহাম্মকের বাচ্চারা আবীর মেখে নেচে-কুঁদে ভেবেছি, কী বিশাল বিপ্লব হ'য়ে গেল! এবার আমরা পশ্চিমবঙ্গকে একেবারে—কি? কি যে পালায় করে ফেলবো সে ঠিক ভাষায় বা ভাবেও বোঝাতে পারছিলাম না। সেই রকম একটা সময়ে বিজয় উৎসব এবং জনসংযোগের মহৎ কাজের জন্ত এখানে এক মহতী বিশাল জনসভা হয়েছিল—সেদিন আমার মনে ইচ্ছা হয়েছিল একবার তোমাদের বাড়ী চলে যাই, তোমার বাবাকে উঁচু গলায় বুক ফুলিয়ে বলে আসি—দেখুন আমরা কি করেছি। আসলে সেদিন আমার মনে এরকম একটা অহঙ্কার বেশ লাফালাফি করছিল, এখন সেটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি এভাবে—যে আমি কি হনুরে। এখন আমি বুঝতে পারি তখন আমার ল্যাজ গজিয়েছিল আর তাই অতো লাফালাফি করেছিলাম, তাই আমি তোমার বাবাকে অপমান করতে বাবার কথা ভাবতে পেরেছিলাম। শেষ পর্যন্ত যাওয়া অবশ্ত হ'য়ে ওঠেনি কি জানি বারবার কেন যে তোমার কথা মনে পড়েছিল! তুমি বাড়ীতে আছ কি নেই? যদি থাকো কিভাবে তোমার মুখোমুখি হবো? আর শুধু এই

কারণেই যাওয়া হয়নি। ভাগ্যি যাইনি! কি বলে সেই উঁচু মানুষকে অসম্মান করে আসতাম কে জানে! এখন আজকে এই বাস থেকে তোমাদের গ্রামে নেমে পড়বো নাকি, মধুমিতা? এই ল্যাজ-খসা আহাম্মক হনুমানটার মুখ একবার দেখাবো নাকি তোমাকে—বাবাকে?

আঃ! কে জানে তোমার বাবা বেঁচে আছেন কি না? তুমিতো এখন কোথায় আছ কোন্ সুখী মানুষের সুখী সংসারে—আঃ! আমি শালা একটা আহাম্মকের বাচ্ছা আহাম্মক, লোচ্চা নম্বর ওয়ান হ'য়ে গেলাম, এতদিনে আমি সমঝদার মানুষ হয়েছি। আমার ল্যাজ ছোট হ'তে হ'তে খসে গিয়েছে। আমি দেখেছি ব্যক্তি-স্বার্থ আর ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা দেশ গঠনের বুকনির আড়ালে কতো বিশাল। আমি দেখেছি রক্তে পিচ্ছিল পথ, কি জঘন্য কি নারকীয় কি বীভৎস। আমি হতবাক হ'য়ে দেখছি আমার আদর্শ আমার একাগ্রতা আমার ত্যাগ যা নিয়ে আমি চলেছি সে সব বিসর্জন দিয়ে আমাকে অন্য কাজ করতে হয়েছে। আমার চারপাশে পার্টি ক্যাডার বলে যে সব সঙ্গী—তাদের আমি কখনো দেখিনি তাদের আমি চিনি না, তারা ঘৃণ্য, অথচ নেতাদের নির্দেশে তাদের সঙ্গেই আমাকে কাজ করতে হয়েছে। সে কাজ সংগঠনের নয়, জনচেতনার নয়, সে কাজ ধ্বংসের, প্রাণহননের···এবং সেইভাবে আমি ক্রমশঃ মানুষ হ'য়ে গেলাম। এই পথ। এই দেশ গঠন। এই তো বিপ্লব। ঠিক সেইসব দিনে আমার তোমাকে বড় বেশী করে মনে পড়েছে মধুমিতা। মনে হয়েছে আমার পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। মনে হয়েছে আমি ভুল পথে এসেছি, মনে হ'য়েছে আমি যদি তোমাকে ফিরিয়ে না দিতাম! যদি সুখের ঘর গড়বার জন্য চেষ্টা করতাম·

···এখন আমি তোমার দেশের মাটি মাড়িয়ে যাচ্ছি মধুমিতা। আমি—একটা আহাম্মক, লোচ্চা নাম্বার ওয়ান। তুমি আমার পোড়া মুখটা যদি এখন দেখো ঘৃণায় শিউরে উঠবে। আমাকে ঘৃণা করে আমার বাবা, মা আমাকে ঘৃণা না করলেও কথা প্রায় বলেনই না আর আমার ভাই—সে আমাকে একদা দেবতার মতো ভাবতো, আমার ভাই সে আমাকে অন্ধের মতো একদা অনুসরণ করেছে তারপর আমার পরিবর্তনে তিল তিল করে ঘৃণা জমেছে তার বুকে, শেষাবধি আমাকে আর সে সহ্য করতে পারেনি—

ভাই! তুমি কি ঠিক পথের নিশানা পেয়েছিলে? কি জানি! তোমরাওতো ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গুঁড়িয়ে গেলে। আমি জানি যারের ঈশ্বর হাজার মাথা খোঁড়াতেও

তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, আমিতো তোমাকে সেই বিশাল শক্তি দেখাতে এক ছাব্বিশে জানুয়ারী প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদের এক একটা ছোট্ট বুলেট তোমাদের খেলার ছলে ডুবিয়ে দেবে অন্ধকারে। আমি জানি মায়ের ঈশ্বর হাজার মাথাখোঁড়াতেও তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেনা। অথচ মা বিশ্বাস করে তোমার কুষ্ঠিতে লেখা দীর্ঘ আয়ু। কি জানি আমিও আজকাল এসব কিছু বিশ্বাস করি। আমি প্রত্যেক শনিবার চৌমাথার মোড়ে জমকমাট শনিপূজোর থানে ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে জোড়হাতে প্রার্থনা করি···গত শনিবার প্রার্থনা করেছি, হে ঠাকুর প্রধানমন্ত্রী সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছেন, এবারে বেশ মোটা টাকার একটা দাও মারিয়ে দিও ঠাকুর। আমার ভাবনা কি? আমি এখন শাসক দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি।

এখন তুমি যদি শুধু একটু মুখ তুলে চাও ঠাকুর, আমি একটু গুছিয়ে নিই!

আঃ। ভাই, তুমিকি আমার মনের কথা শুনতে পাচ্ছ? তুমি আমাকে ভীষণ জ্বালাতন করো, প্রায়শই তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ঝাঁকিয়ে জলজলে চোখে তাকাও—ঠিক তখন আমার মাথার পেছনে পেরেক-বেঁধা যন্ত্রণা। মনে হয় একটা ছুরি দিয়ে ওখানটা চিরে দিই, বদ রক্তটক্ত সব বেরিয়ে যাক।

কিন্তু তুমি কেন আমার দিকে ওরকম চোখে তাকাবে? এছাড়া আমার আর কি করার ছিল? প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে আমাকে অনেক রক্ত নেওয়ার ইতিহাস রচনায় মদৎ দিতে হয়েছে—ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে। শুধু ওপরের নির্দেশে। আর ছিল ভয়— নিজে হারিয়ে যাওয়ার ভয়। আর তারপর! সব কিছু যখন থিতিয়ে এলো? তখন আমাকে গ্রাস করে নিলো শাসক ময়াল— সব অপরাধ মুছে দেওয়ার চুক্তি পত্র হাতে দুলিয়ে সে আমাকে মদৎ দিতে ডাকল···। এছাড়া আর কি আমি করতে পারতাম? সেই সব ছিন্নভিন্ন নষ্ট দিনগুলিতেযখন সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে, সেই হানাহানির দিনে যখন ঐক্যের শপথ নেওয়া চোদ্দ দল বিপর্যস্ত এবং সেই সুযোগে শাসক ময়াল নিশ্চিন্তে গ্রাস করছে সবকিছু—তখন আমি অসহায়, তখন আমি বাঁচতে চেয়েছি, আশ্রয় চেয়েছি, দিশাহারা অবস্থা থেকে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে মুক্তি পেতে চেয়েছি।·· ভাই। তুমি তোমার চোখ সরিয়ে নাও, আমার লাগছে। আমাকে সব যন্ত্রণা ভুলে একটু শান্তি পেতে দাও, একটু আনন্দ পেতে দাও···আহ, হাওয়ার কেমন এক নতুন স্পর্শ। এমন বাতাসতো আমি আগে কখনও ছুঁইনি। তবে এইকি সমুদ্রের বাতাস? সমুদ্র কি কাছে এলো?

…ভারী সুন্দর হাওয়া লাগছে। এই আমার সমুদ্র। এই বিশাল, এই দুরন্ত। আহ্ জীবনে আমি কেন এতদিন সমুদ্র দেখিনি? আমি কি এখনই ছুটে যাবো? ছুঁয়ে দেখবো দুরন্ত ঢেউ…?

সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সোনালী বালি মাড়িয়ে সম্মোহিতের মতো, অনিমেষ ডাকে, এই—এখনই ওদিকে গেলে চলবে? আমাদের থাকবার জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে না?

পরিমল—এই অনিমেষ, আমাদের রেষ্ট হাউস কোন দিকে?

অনিমেষ—আমি কি করে জানবো? আমি কি আগে এখানে এসে দেখে গেছি?

পরিমল—বাঃ। তুই তো বলেছিলি রেষ্ট হাউস বুক করে রেখেছিস।

অনিমেষ পকেট থেকে একটা লালচে কাগজ বার করে বলে—করেছিতো, এইতো রিসিট্, কিন্তু বাড়ীটা খুঁজে বার করতে হবেতো!

—কেন তোরা ঝগড়া করছিস? ঐতো, ঐ বাড়িটার গায়ে লেখা 'রিসেপসন' ওখানে সবাই যাচ্ছে দেখছিস না? নিশ্চয় ওখানে গেলে জানা যাবে, দেখি আমাকে রিসিটটা দে—সে হাত বাড়িয়ে অনিমেষের হাত থেকে কাগজটা নেয়।

অনিমেষ—ব্যস্, ব্যস্, গুরু 'একটিভ' হলেই আমি নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে এমন গম্ভীর নাকি উদাস হ'য়ে যাস্ মাইরি,—একদম কথা বলিস না তখন তোকে দেখলে আমি খুব মুষড়ে পড়ি। কেমন ভয়ও লাগে।

সে হাসে। অনাবিল হাসি। এগিয়ে যায়।

রিসেপশন বিল্ডিংএ ঢুকে ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত নানান মানুষ জন ছড়িয়ে—কলরব—সে একে ওকে পাশ কাটিয়ে সামনে কাউন্টার—সে কাউন্টারে পৌঁছে যায়, সেখানে জিজ্ঞাসারত সেই দেমাকী মেয়েটি। মেয়েটি ফিরে দাঁড়ায় এবং তার সামনাসামনি। মুহূর্তে মেয়েটির স্বাভাবিক মুখমণ্ডলে অস্বাভাবিক রেখা ফোটে—ভুরুর ওপর ভাঁজ এবং ঠোঁটের পাশে কোথায় যেন বাঁকা ভাব। মেয়েটি সোজাসুজি তার দিকে তাকায় হঠাৎ বলে—আপনি অমরের দাদা না?

সে হকচকিয়ে যায় এবং তৎক্ষণে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। মেয়েটি এগিয়ে যাচ্ছে, সে ডাকে—শুনুন, কিন্তু মেয়েটি দাঁড়ায় না বা ফিরে তাকায় না, তার হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গীতে কেমন একটা রুদ্ধতা।

সে আরও উঁচু গলায় প্রায় কর্কশ কণ্ঠে ডাকে—শুনুন। কিন্তু মেয়েটি তখন

দরজা পেরিয়ে বাইরে চলে যায়।

সে কাউনটারে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা এটা দেখুনতো—আমাদের এই রেষ্ট হাউস 'বুক' করা আছে এটা কি করতে হবে?

কাউনটারের ভদ্রলোক কাগজটা প্রায় দেখেনওনা, বলেন—সামনে ঐ যে হোটেল সৈকতাবাস—ওর সামনে চলে যান, কেয়ারটেকার আছে—দেখা করুন।

সে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসে,এদিক ওদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে। কিন্তু মেয়েটিকে বা তার বাবা মা ভাই কাউকেই দেখতে পায় না। দূরে বন্ধুরা এলোমেলো, খেলায় ছলে পায়ে পায়ে বালি ছড়াতে ছড়াতে নেমে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। সে দ্রুত ছুটে আসে, বলে - এই তোরা কেউ মেয়েটিকে দেখেছিস?

তিনজন অবাক চোখে থমকে তাকায়—কে—কোন্ মেয়েটা?

—সেই যে বাসে আমাদের সঙ্গে এলো—সেই সুন্দর মতো—

তিনজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে, বলে—কৈ নাতো।

বাড়ীটা সুন্দর। পুবের জানালা খুললে হাওয়া ছুটে আসে বালি ছিটিয়ে—চঞ্চল শিশুর মতো, সোনালী বালির ওপর স্রোতের মতো দাগ পড়ছে। একটু দূরে ঝাউবন, ঝাউপাতার ঝিলিমিলির ফাঁকে সমুদ্র নীল। দূরন্ত ঢেউ ভাঙছে, ফুঁসিয়ে উঠছে সাদা ফেনা।

কেয়ারটেকার ঘর গুছিয়ে জিনিষপত্র বুঝিয়ে চলে গেছে। পাশাপাশি দুটি ঘর—চারটে বিছানায় টান টান ধবধবে সাদা চাদর বালিশ। বাক্স ব্যাগ খোলাখুলি—এটা সেটা বেরোচ্ছিল জামাকাপড় সাবান টুথপেষ্ট তোয়ালে—এটা কোথায় রাখি ওটা কোথায় রাখি—বাথরুমটা কি সুন্দর আর পরিষ্কার—আহ্ খাওয়ার ঘরটা দারুণ। ওপাশে রান্নাঘর থেকে ডেকচির পেছনে চামচে দিয়ে বাজাতে বাজাতে কুন্তল গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসে—'ঘুমঘুমকে নাচোরে গাও বাজাও'—তারপর একপাক নেচে নিয়ে বলে,—আহ্। রান্নাঘরে সব আছে—আর ডিনার সেট—শালা প্লেটটেটগুলো যা দামী না। আজকে আজকে রাত্তিরে জবরদস্ত মুরগী রাঁধবো আর ভাত—আর সরু সরু আলুভাজা আর—আর—

পরিমল—শালা রাত্তিরের মেনু বানাচ্ছে। এখন পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে। এখন কি খাওয়া হবে?

কুন্তল—সে তো ঠিক হ'য়ে গেছে। আমি কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসা

করেছি। চানটান করে নাও তারপর বেরিয়ে পড়ো—ওই রিসেপশনের ওদিকে খাওয়ার হোটেল আছে অনেক। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে, বেলা হ'য়ে গেছে, বেশী দেরী করলে কিছু পাওয়া যাবে না। কি গুরু তুমি আবার গুম্ মেরে যাচ্ছো। বেশতো চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছিলে—সে দাঁড়িয়েছিল পুবের জানালায় —বাইরে চোখ—কুন্তল তার খুব কাছে এগিয়ে আসে, বলে,—এরকম ভাবে তুই একদিন পাগল হ'য়ে যাবি।

সে কুন্তলকে এক ঝটকা মারে, জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বিছানায়, বলে, —হেই – চলো সব, সমুদ্রে স্নান হবে।

এখন সমুদ্রের ধারে কেউ নেই, কেউ স্নানও করছে না। স্নিগ্ধ রোদ্দুর, ঈষৎ শীত শীত হাওয়া। জল ছুটে আসছিল আর ছুটে যাচ্ছিল। তারা ভীতু ভীতু পায়ে একটু এগোচ্ছিল একটু পেছোচ্ছিল।

জল আর বালি মাখলো তারা। শিশুর মতো খেলা। এভাবে এ-ওকে ও-তাকে—ফেরার জন্য তাগাদা—তারপর ঘরে এসে আবার পরিষ্কার স্নান করে তারা দল বেঁধে খেতে বেরুলো।

—মাছ একটা, ডাল ভাত তরকারি যতোবার ইচ্ছে নেবেন আড়াই টাকা।

—ঠিক আছে আলাদা আরও দুটো করে মাছ দাও, আর কি আছে? ডিম? ঠিক আছে, একটা করে ডিমও দিও।

—ভাত যতো খুশি খাবো? শেষে রাগ করবেনা তো হে?

—না, না, দাদা, খাননা কতো খাবেন, আপনারা কোলকাতার বাবুরা আমাদের চেয়ে বেশী খেতে পারবেন না।

—কেমন চালের ভাত?

—দেখতে হবে না, হেঁ, হেঁ, এ আপনাদের রেশনের মোটা কাঁকরমণি নয়, ভাত খাওয়াবো যুঁই ফুলের মতো···

শান্ত দুপুর। চারজন দস্তি শান্ত ঘুমোচ্ছিল। জানলার ওপারে একইভাবে বালির ওপর দাগ কাটছে একটানা বাতাস। ঝাউবনের ঝিলমিল একই ভাবে কাঁপাকাঁপি করছে। তার ওপারে সমুদ্র, সারাক্ষণ ঢেউ বাজিয়ে চলে, চরাচরে সবকিছু ছাপিয়ে জেগে রয়েছে তার গর্জন···।

ক্রমশঃ বিকেল। পরিমল আগে উঠেছে, ডাকাডাকি করতে করতে যখন কেউ উঠছিল না তখন সে সকলকে ধাক্কা দিতে শুরু করল কিন্তু তথাপি কাউকে

ওঠাতে না পেরে সে 'ধুৎ' বলে বাথরুমে চলে যায়।

তখন অনিমেষ উঠে বসে। কেয়ার টেকার এসে দরোজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

—তুমি কোথায় থাকো?—অনিমেষ জিজ্ঞাসা করে।

—কাছেই থাকি বাবু, আপনাদের কোন দরকার আছে কিনা জানিতে এলুম। এবেলাও কি হোটেলে খাবেন?

—দূর! হোটেলে খেয়ে কি পোষায়? আচ্ছা এখানে মুরগী পাওয়া যাবে?

—যেতে পারে। বিকালে বাজার বসে, ওখানে কেউ কেউ নিয়ে এসে বসে থাকে।

—তার মানে পাওয়া নাও যেতে পারে।

—নাও যেতে পারে। কেয়ার টেকার বলে।

—আচ্ছা তুমি এক কাজ করো—অনিমেষ উঠে পড়ে—তুমি আমাদের মশলা পাতি তেল টেল এসব এনে দাও, এখন আমরা বেড়াতে বেরোবো, ঘণ্টা-খানেক বাদে ফিরবার সময় বাজার করে আনবো—দেখি কি পাওয়া যায়। তোমার নামটা কি যেন—কেয়ার টেকার ঘাড় নাড়ে। নাম বলে—পরেশ।

তারা হাঁটছিল। একপাশে সমুদ্র আরেক পাশে ঝাউবন। সূর্য ডুবছে। এখন নীল জলরাশি লালে লাল। সূর্যকে সামনে রেখে তারা হাঁটছিল।

—যতদূর চোখ যাচ্ছে ঝাউবনের শেষ নেই—কুন্তল বলে—ওই ও-ই অনেক দূরে একটু যেন বাঁক খেয়েছে—আমরা ঐ পর্যন্ত যাবো।

—ওতো অনেক দূর। আমরা কতো এসেছি দেখেছিস? পেছন ফিরে দেখ্।

চারজনে ফিরে দাঁড়ায়। কাছাকাছি কোন লোকজন নেই। বহুদূরে—যেখান থেকে তারা হাঁটতে শুরু করেছিল সেখানে ছোট্ট ছোট্ট কিছু মানুষজন।

—আরে বাস্! কতদূর চলে এসেছি। এখান থেকে ফিরতেই তো ঘণ্টা কাবার হ'য়ে যাবে।

সহসা কুন্তল ছুটতে আরম্ভ করে। দেখাদেখি সকলে ছুটতে আরম্ভ করে। ছুটতে ছুটতে কখনো এ ওকে ও একে পেরিয়ে যায়। হাসে। ধাক্কা দিতে চায়। বালির ওপর পায়ের ছাপ ছাপিয়ে যায়। ঝাউবন ঝম্ ঝম্ শব্দ করে। সমুদ্র খিলখিলিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে আসে ছুটে যায়। সূর্য হাত তুলে বলে

[ পরবর্তী অংশ ৩৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

# কবিয়াল কবিগান

## নীলেশচন্দ্র সিংহ

হরি আচার্য মহাশয়ের কাছে দাদন গ্রহণ করায় সরলা একটু মনক্ষুণ্ন হয়ে বললো—আপনি ত বিদেশে পাড়ি ধরলেন ; আর আমরা এই ঝালকাঠির মাল গুদামের বস্তা পচা আলুর মতো পড়ে রইলাম।

নকুলেশ্বর—একথা বলছেন কেন? আপনারা হচ্ছেন আলালের ঘরের দুলালীর মতো। বড় গায়িকা হয়েছেন ; সকল দলপতিই আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। আর আমি হলাম কবি সমাজে নগণ্য ; কিছু জানিনা। আমার এখন সাগর সেচে রত্ন আহরণ করে মানুষ হতে হবে। স্বদেশ-বিদেশ বিচার করলে চলবে কেন? আপনি আশীর্বাদ করুন আমার যেন অভীষ্ট পূর্ণ হয়। এই বলে নকুলেশ্বর টাকা নিয়ে বাড়ী গিয়ে মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে টাকা দিলেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন, এ কিসের টাকা, কে দিল?

নকুলেশ্বর—গত বছর যে আচার্যপ্রভুর দলে ছিলাম এ বছরও তাঁর দলেই যেতে হবে। তিনি আমাকে এক শত টাকা মাস-মাহিনা স্থির করে এই টাকা অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছেন।

মা খুব খুশী হয়ে বললেন—তোর কপাল ভাল, তাই তিনি তোর উপরে অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর মন জুগিয়ে চলতে পারলে তুই অল্পদিনের মধ্যেই মানুষের মতো মানুষ হতে পারবি।

নকুলেশ্বর—মা, তুমি সেই আশীর্বাদই করো, যেন আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

লোকে বলে, শুভকার্যে বহু বিঘ্ন। নকুলেশ্বরের ভাগ্যেও তাই ঘটল। পূজার সময় দলে যাবার প্রস্তুতি হিসেবে কিছু জামা কাপড় কেনার জন্য নকুলেশ্বর বরিশাল গিয়েছেন। টাউনের কাছেই তাঁর মেজদির বাড়ী। সেখানে দু' এক দিন থাকবেন বলে স্থির করেছেন। এদিকে ঝালকাঠির আদর্শ কবি সেই শরৎ সরকার মহাশয়ের দলের পরিচালিকা 'রাঙ্গা' যামিনী দলপতির সঙ্গে বিবাদ করে তার দল থেকে বের হয়ে নিজে দল করার মনস্থ করেছেন।

যদিও দল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা তার আছে, তথাপি একজন উপযুক্ত ম্যানেজার রাখা প্রয়োজন মনে করে তিনি হরিচরণ নটকে ম্যানেজার রাখলেন।

হরিচরণ নট খুব ভাল ঢুলী। ঝালকাঠির ঢুলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব সে গানের আসরে ঢোলও বাজাবে, এবং দলের সব কিছু দেখা শোনাও করবে। রাজা যামিনী হরিচরণ নটকে বললো—আমি যেমন শরৎ বাবুর দল ছেড়ে বের হয়ে এসেছি, তখন এমন ভাবে দল গঠন করবেন যেন ঝালকাঠীর সব দলের চেয়ে ভাল হয়।

হরিচরণ—সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি টাকা চালাতে পারলে আমি সব দলের সেরা দল গড়ে দেব।

রথযাত্রার দিন দলের পত্তন আরম্ভ হল। গায়িকা চারজন চাই—সরলা, ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালী, সত্যভামা আর দলের কর্ত্রী রাজা যামিনী—এই চার জন স্থির হল। তখন রাজা যামিনী বললো, পূজার সব রকম আয়োজন তো হয়ে গেল, এখন একজন উপযুক্ত পুরোহিত না হলে তো সব আয়োজন পণ্ড হবে।

হরিচরণ—আপনি কি বলছেন? সব পণ্ড হবে কেন?

রাজা যামিনী—হবেনা? অন্যান্য দলপতিরা নিজেরাই সরকার; অন্য সরকারের অপেক্ষা রাখেনা। ক'জন গায়ক গায়িকা হলেই তাঁদের দল হয়ে গেল। কিন্তু আমি ত নিজে সরকার নই, সামান্য গায়িকা মাত্র। কবির দলের সরকারই হল মূল মাঝি; পরিচালক, এমন কি সর্বেসর্বা। যেমন—

'এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে,
লক্ষ লক্ষ তারা দেখ কি করতে পারে?' যেমন দল, তেমন একজন উপযুক্ত সরকার না হলে সব উদ্‌যোগই যে পণ্ড হয়ে যাবে। এখন সরকার কোথায় পাওয়া যায়! ঝালকাঠির যে কয়জন সরকার সকলেই দলপতি। নিজের দল আছে। এখন দলছাড়া উপযুক্ত সরকার কোথায় পাওয়া যায়।

সরলা—সরকার তো একজন ছিল; কিন্তু এখন আর তাকে পাওয়া সম্ভব নয়।

হরিচরণ—কে? কার কথা বলছ সরলা?

সরলা—আমি বলছিলাম কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের প্রধান ছাত্র নকুলেশ্বরের কথা। কুঞ্জবাবুর আদেশে সে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কবিগুরু হরি আচার্য মহাশয়ের দলে গিয়ে খুব উন্নতি লাভ করেছে।

হরিচরণ—তবে তাকে পাওয়া যাবে না কেন?

সরলা—পাবেন কি করে? হরি আচার্য মহাশয় যে কিছুদিন আগে তার এক শত টাকা মাহিনা স্থির করে বায়না দিয়ে গেছেন। এ বছর সে আর অন্য দলে

যাবে না।

হরিচরণ—আমরা যদি তার বেতন দাদন বাড়িয়ে দিই।

সরলা—আমার মনে হয় সে আচার্য কর্তার সঙ্গে কথায় বেলাপ করবেনা। বিশেষতঃ তার বড় হবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কি সে টাকার প্রলোভনে ভুলবে? আমার তো মনে হয়না।

যামিনী—একবার তার বাড়ীতে গিয়ে চেষ্টা করে দেখি। আগেই হাল ছেড়ে বসে থাকলে যে আমার সাধের তরণী মাঝ গাঙে ডুবে যাবে। চল সরলা আমরা তার বাড়ীতে যাই।

সরলা, রাঙ্গা যামিনী ও হরিচরণ নট্ট তিনজনে নকুলেশ্বরের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। নকুলেশ্বর তখনো বরিশাল হতে ফেরেন নি। সরলার সঙ্গে নকুলেশ্বরের মায়ের পরিচয় ছিল। সে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলো।

নকুলেশ্বরের মা—সুখে থাক মা। তোমার সঙ্গে ও দুই জনকে তো চিন্‌তে পারলাম না।

সরলা—( তাদের পরিচয় দিয়ে ) এরা বালকাঠি থেকে এসেছেন। ( বধিয়সী রাঙ্গা যামিনীকে দেখিয়ে ) এই মহিলা অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে একটি কবিগানের দল করেছেন। কিন্তু সরকার অভাবে সব নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। সে জন্য আপনার ছেলেকে খোদ সরকার হিসেবে দলে নেবার মনস্থ করে এসেছেন।

নকুলের মা—সে আর কি করে হবে বাছা। সে তো আচার্য কর্তার দলে থাকবার জন্য দাদন নিয়ে এসেছে। এ বৎসর যে তার সেই দলেই যেতে হবে।

সরলা—আপনাকে সে দেবীর মতো ভক্তি করে। আপনি বললে নিশ্চয়ই সে এই দলে যেতে রাজী হবে।

মা—ছিঃ ছিঃ সরলা। আমি মা হয়ে এমন একজন মহাপুরুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করার পরামর্শ কেমন করে দেব। আমার দ্বারা তা হবেনা। তোমরা অন্য একজন ভাল সরকার খোঁজ করে নাও। আমি ওর উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটাতে পারবনা।

মাকে টলাতে না পেরে রাঙ্গা যামিনী ও হরিচরণ এসে নকুলেশ্বরের পিতাকে প্রণাম করলে তিনি তাদের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন। সব শুনে বললেন—শুনেছি সে নাকি ঢাকার হরি আচার্য মহাশয়ের দলে এ বছর থাকার কথা দিয়ে টাকা নিয়েছে।

হরিচরণ—সে দলে তো খোদ হতে পারবেনা। ডাক-সরকার হিসাবে কাজ করতে হবে। এ দলে নিজেই খোদ সরকার হয়ে দল পরিচালনা করবেন। তাতে তার কত সুনাম সুখ্যাতি হবে ; আর টাকাও বেশী পাবে।

নকুলেশ্বরের বাবা—হরি আচার্য মহাশয় তো একশত টাকা মাহিনা স্থির করে অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছেন। এখন সে দলে না গেলে তাঁর যে ক্ষতি হবে!

হরিচরণ—তাঁর আর এমন কি ক্ষতি হবে। সে দলে তিন চারজন করে ডাক সরকার থাকে। তার মধ্যে উনি একা না গেলে তাঁর দল তো আর অচল থাকবেনা। কিন্তু এ বেচারী এই দল গড়তে দু'তিন হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছে। এখন যদি সরকার অভাবে দল চালাতে না পারে তবে ওর একেবারে সর্বনাশ।

হঠাৎ রাজা যামিনী নকুলেশ্বরের বাবার পায়ে হাত দিয়ে বললেন—আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, নইলে আমার আর উপায় নেই।

বাবা—তোমরা কত বেতন দিতে পারবে?

যামিনী—আপনি যা বলবেন তাই দেব।

বাবা—দেড় শত টাকা মাহিনা দিতে পারবে?

যামিনী—তাই দেব।

যামিনীর সঙ্গে টাকা ছিল। হরিচরণ নট্ট যামিনীকে বললো—দিন দুই মাসের দাদন তিন শত টাকা। আর দেরী করবেন না। যামিনী সঙ্গে সঙ্গে তিন শত টাকা নকুলেশ্বরের পিতার হাতে দিয়ে বললো—এই নিন আপনার ছেলের দুই মাসের বেতন।

বাবা—এত ব্যস্ত কেন, খাওয়াদাওয়া করো। নকুলেশ্বরও হয়তো এখনই এসে পড়বে, তার সামনেই টাকা নেব।

যামিনী—না না! আপনি টাকা না নেয়া পর্যন্ত আমরা আহার করবো না। দয়া করে টাকাটা নিন।

ওদের আবদারে বাধ্য হয়ে সরল মতি বৃদ্ধ যামিনীর কাছ থেকে টাকা হাতে নিলেন। সরলা যামিনীর কানে কানে বললো—আর দেরী করবেন না। তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে চলুন ; নকুলেশ্বর এসে পড়লে হয়তো সব ওলটপালট হয়ে যাবে। খাওয়া দাওয়া সেরে যাবার কালে যামিনী নকুলেশ্বরের বাবাকে প্রণাম করে বললো—দেখবেন, আমি যেন পথে না বসি।

সন্ধ্যার পূর্বে নকুলেশ্বর নিজের জন্য দলের সঙ্গে থাকাকালীন ব্যবহার্য কিছু

জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী এলেন। বাড়ী আসামাত্র তাঁর পিতা তাঁকে ডেকে বললেন—বাবা নকুল, আমি তো একটা কাজ করে বসেছি।

নকুল—কি কাজ বাবা!

তখন নকুলেশ্বরের পিতা আদ্যপূর্বিক সব ঘটনা তাঁকে জানালেন। শুনে নকুলেশ্বর বললেন—সে কি কথা! আপনি জানেন না যে আমি আচার্য কর্তার দলে যাওয়ার কথা দিয়ে টাকা নিয়েছি।

বাবা—হ্যাঁ তা জানি, কিন্তু এটা যে তার চেয়েও জরুরী। তাঁর একটু সাহায্যের জন্য তোকে ডাক সরকার হিসাবে নিতে চায়। আর এ বেচারী তোকে দলপতি করে দলের সম্পূর্ণ পরিচালন ভার তোর হাতে ছেড়ে দেবে। টাকাও বেশী, যশ প্রতিষ্ঠাও বাড়বে, সে কথাটা ভেবে দেখেছিস্?

নকুল—বাবা! আপনি ভুল বুঝেছেন। এখন খোদ সরকার হয়ে যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে যাওয়া আর বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়া সমান নয় কি! আমি এখনো কবির 'ক' ও লিখতে পারিনি; সে জন্য পুনরায় হরি আচার্য প্রভুর পদাশ্রয় নিতে চেয়েছিলাম। আপনি আমার সে আত্মোন্নতির পথ বন্ধ করে দিলেন! আপনার কাছে আমার পরমার্থের চেয়ে অর্থটাই বেশী হল? এখন আমি আচার্য কর্তাকে বলে জবাব দেব?

বাবা—টেলিগ্রাফ মনি অর্ডারে তাঁর টাকা ফেরৎ দিয়ে ভাল করে একখানা চিঠিতে সত্য ঘটনা লিখে তাঁকে জানিয়ে দে। তিনি মহৎ ব্যক্তি। নিশ্চয়ই তিনি বুঝবেন যে বিপন্নকে উদ্ধার করাও মানুষের পরম ধর্ম।

পরের দিন আচার্য মহাশয়ের টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে নকুলেশ্বর বড় দুঃখিত হলেন।

দেখতে দেখতে আষাঢ় শ্রাবণ কেটে গেল। ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে ম্যানেজার হরিচরণ নট্ট এসে নকুলেশ্বরকে খালকাঠি নিয়ে গেলেন। রাঙ্গা যামিনী বললো—এতদিন ত আমরা প্রত্যেক দলই হরি আচার্য মহাশয়ের রচিত গান গেয়ে আসছি। শুনলাম তুমি নাকি আচার্য কর্তার দলে থেকে নূতন নূতন গান তৈরী করেছ। আমার দলে তোমার সে সব গান গাওয়াতে হবে। আমার গানের খাতায় তোমার রচিত গানগুলি লিখে দাও। আমার ছোট ওস্তাদ সূর্যকান্ত ঘোষ সব গান মুখস্থ করে রাখবে; আসরে বলে দিয়ে তোমার ডাক সরকার হিসাবে কাজ করবে।

নকুলেশ্বর তাঁর রচিত, ফুল-সুবল, কালো মেঘ, সারদা, সমাজ মালসী, জল-

কুঞ্জের কবি প্রভৃতি অনেক গান যামিনীর দলের খাতায় লিখে দিলেন। দলের শ্রেষ্ঠ গায়িকা সেই সরলা নকুলেশ্বরকে পেয়ে খুব খুশী হয়ে ঠাট্টা করে বললো—কি মশাই! আমাদের ছেড়ে পালাবার জন্য তো বিদেশে পাড়ি ধরেছিলেন। কৈ পারলেন না তো! আর পারবেনই বা কি করে—

'না জানি মথুরাপুরের আছে কি ক্ষমতা,
এখানে যে আসে তার ভোলে পূর্ব কথা।'

আমাদের ঝালকাঠির এমন এক মোহিনী শক্তি আছে যে একবার ঝাল-কাঠির বাতাস গায় লাগলে আর অন্য বাতাস ভাল লাগে না।

নকুলেশ্বর—এ যাদু শক্তির মূল তো আপনারাই। আপনারাই তো হাকিনী, কাঁকিনী, ডাকিনী, সাকিনী, মোহিনী সব রূপে পথিককে পথভ্রষ্ট করেন। তবে দেখবেন এই সরল তীর্থযাত্রীটিকে পথভ্রষ্ট করে বিপথগামী করবেন না যেন।

সরলা—না, না! সে জন্য আপনি ভয় করবেন না। কুঞ্জবাবুর দল হতেই তো আপনাকে দেখে আসছি। আপনি হলেন এক জন অরসিক কর্তব্যনিষ্ঠ গোঁড়া যাত্রী। আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে গেলে মোহিনীরাই পথভ্রষ্ট হবে। আমরা ষড়যন্ত্র করে যা করেছি তাতে আপনার মঙ্গলই হবে দেখবেন। দশ বছর ডাক সরকারী করে যা না হতো, এক বছর খোদ সরকার হয়ে দল পরিচালনা করলে তার চেয়ে শতগুণ উন্নম উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে, অভিজ্ঞতা বাড়বে।

নকুলেশ্বর—আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়।

দু' চারদিন ঝালকাঠি থেকে নকুলেশ্বর বাড়ী যেতে মনস্থ করলেন। রাজা যামিনী বললো—বাড়ী যাবে ত যাও। আশ্বিন মাসের দুই তারিখ দল নিয়ে ঢাকা রওনা হতে হবে। তুমি সে ভাবে প্রস্তুত হয়ে আসবে। সব দলেরই বার্ষিক পূজার বায়না আছে। আমার নতুন দল, পূজার বায়না নেই। কাজেই একটু আগে ঢাকায় ঘাটে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

নকুলেশ্বর—আপনি শরৎবাবুর দলে থেকে ত অনেক পূজাবাড়ীতে পরিচিত হয়েছেন। সেই সব স্থানে চিঠি দিলে হয়তো বায়না হতে পারে।

যামিনী—শরৎবাবু অনেকদিন যাবত পূজার বার্ষিক গান করেন কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জমিদার বাড়ী। আমি সেখানে একখানা চিঠি লিখে দেখি কি হয়। তুমি কিন্তু দোসরা আশ্বিন অবশ্য আসবে।

রাজা যামিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জমিদারবাবুর কাছে পত্র লিখলেন—আমি অনেক দিন যাবত শরৎ সরকার মহাশয়ের দলে পরিচালিকা হিসাবে কাজ

করছি। এ বৎসর আমি নিজে দল গঠন করে খুব ভাল গায়ক-গায়িকা রেখেছি। এবং অল্প বয়সী একজন সরকারও নিযুক্ত করেছি। শরৎবাবুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনার বাড়ী দুর্গাপূজায় গান করবার আশায় এই পত্র দিলাম। আশা করি আমার বাসনা পূর্ণ করবেন।

পত্র পেয়ে জমিদারবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে যামিনীকে লিখলেন—তোমার নতুন দল বায়না করলাম। শরৎবাবুর সঙ্গে জয়ী হতে পারলে তোমাকেও বার্ষিক করে দেব।

নির্দিষ্ট তারিখে কালকাঠি এসে নকুলেশ্বর শুনলেন দুর্গাপূজায় বায়না হয়েছে। স্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিপক্ষে শরৎ সরকার।

রাঙ্গা যামিনীর নতুন দলের নিজস্ব নৌকা নেই। তাই ঢাকাইয়া এক বাসী নৌকা (যাকে গহনার নৌকা বলে) মাঝিমাল্লাসহ ভাড়া করে যথাসময়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে গানের বাড়ীর উদ্দেশ্যে নৌকা খুলে দুর্গাষষ্ঠীর দিন দ্বিপ্রহরে দুই দল গিয়ে পূজাবাড়ী উপস্থিত হলেন।

## ব্রাহ্মণবাড়িয়া জমিদার বাড়ির গান

ষষ্ঠী সপ্তমীতে একখানা করে ষষ্ঠী ও সপ্তমীর গান ছাড়া আর কোন গান গাইতে হয়না। অষ্টমী নবমী দু'দিন দু'পালা পুরা গান। অষ্টমীর দিন রাত দশটায় শরৎ সরকারের দল আসরে গিয়ে ডাক মালসী গেয়ে বের হয়ে এলো। রাঙ্গা যামিনী দল নিয়ে আসরে যাবার সময় নকুলেশ্বরকে বলে গেল—তুমি বিশ্রাম কর। ডাক মালসীর আসরে তোমার দরকার হবে না। সূর্য ঘোষ মশাই গান বলে দেবেন। বিপক্ষ দলে সখী-সংবাদ গান করলে তুমি সেই গানের জবাব দিতে যাবে।

দল আসরে গিয়ে ডাক মালসী ও ভবানী গাইছে। নকুলেশ্বর এই অবসরে শরৎবাবুর বাসা ঘরে গিয়ে তাকে প্রণাম করে বললেন—আপনি ত এখন সখী সংবাদ গান গাওয়াবেন। দয়া করে সে গানের পদগুলি একটু বললে আমার জবাব করতে একটু সুবিধা হতো।

শরৎ সরকার একটু উপেক্ষার হাসি হেসে বললেন—কম্পিটিশনে গান করতে খোদ সরকার হয়ে এসেছ। আসরে গান শুনে যদি জবাব করতে না পার, তবে এ গুরু দায়িত্ব নিয়ে বামন হয়ে চাঁদ ধরতে এসেছ কেন?

শরৎ সরকারের মতো একজন বয়স্ক ও বিজ্ঞ সরকারের মুখে এরকম শ্লেষোক্তি

শুনবেন নকুলেশ্বর ধারণা করেন নি। চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো তিনি ফিরে চললেন। শরৎ সরকার ডেকে বললেন—আরে যাচ্ছ কেন? যখন এসেছ গানটা শুনেই যাও।

নকুলেশ্বর—প্রয়োজন হবে না; আসরে শুনেই জবাব করবো। তিনি সোজা আসরে গিয়েই বসলেন।

বস্তুতঃ কালকাঠির কোন কবিয়ালই নিজে গান তৈরী করতেন না। তাদের নিজস্ব সম্বল কিছু ডাক, ডবানী ও টপ্পা পাঁচালী। আর অন্য গানের বেলা হরি আচার্য। তাঁর রচিত গানই সব দলে গাইত। শরৎ সরকারও আজ আসরে সেই আচার্য কর্তার রচিত একখানা 'মান' গান পরিবেশন করলেন। আচার্য কর্তার দলে থাকাকালে তাঁর গানের খাতায় নকুলেশ্বর ঐ গান দেখেছিলেন। গানটির মূল বক্তব্য— চন্দ্রাবলীর অপবাদে রাধারাণী যখন দুর্জয়মানে মগ্ন, শ্যাম নীলপদ্ম গিয়ে শ্রীরাধার পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করে 'মকমরী মানং' বলে কান্না করছেন— বৃন্দাদূতী সে দৃশ্য দেখে রাধারানীকে বলছেন—

[১] যে কৃষ্ণ হয় দেবারাধ্য, সে ধরে কেন তোর পাদপদ্ম, নয়ন জলে বুক ভাসায়?

[২] চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদা থাকে আমোদিনী, তোর কেন এত বিষাদ?

[৩] সূর্যোদয়ে কমলিনী কি জন্য এত মলিনী কেন নাই তোর হাসি মুখ?

[৪] কি সাধে ঘটিল বিষাদ, কাছে পেয়ে মহাপ্রসাদ, কেহ কি উপবাসী রয়? ইত্যাদি নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে রাধারাণীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন বৃন্দা দূতী।

সাধারণ উপমা অলঙ্কার ও অনুপ্রাস যমকের সুসঙ্গত প্রয়োগে গানটি আচার্য কর্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'মান' গান। নিচে সম্পূর্ণ গানটি উদ্ধৃত হলো—

চিতন— দুর্জয় মানে মজে, শ্যাম প্রতি বাম, শ্যাম প্রেয়সী।

পায়ণ—আয়ত হেরবেনা কালোরূপ, কালোরূপ কাল স্বরূপ,
দেখতে সেই ভাল রূপ, বিরূপ হল রাই রূপসী॥

১ম কুকার—শ্যাম শশী, হায় হায়, চূড়া বাঁশী দিয়ে রাই পদে, পড়ে বিষম বিপদে; কেঁদে বলে ত্রাহি ত্রাহি, কেবলম্ তব কৃপাহি,
অমানিকে মানং দেহি, স্থানং দেহি দেহি ও পদে॥

মিল—রাধার কুঞ্জেতে প্রবেশিতে দেখে সব অপ্রীতি,
বৃন্দাদূতী কয় রাধার প্রতি, বিস্ময় বাক্যে তখন।

মুখ—বলগো বিধুমুখী, কেন অধোমুখী, মুখে নাইগো সুখদুঃখের বচন॥

ভাইনা—হায় কি অভাবে ভাবান্তর, সবাকার অন্তর, নিরন্তর নিরানন্দ ,
কেন ভাস্কর উঠেনা, পুষ্কর ফোটেনা, অলি লোটেনা মকরন্দ,
ছিলি যার প্রেমে বাধ্য, সে হল কি অবাধ্য,
কেন পাদপদ্মে প'ল অন্ধ, পদ্মপলাশলোচন ।
খেঁচ—পশ্চাতে প'ল বাধা কুঞ্জে আসি যখন ॥
২য় ফুকার—মরি হায় হায় গো, কি সাধে বিবাদে মজলি রাই,
দুঃখ কার কাছে, জানাই ।
চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদা থাকে আমোদিনী,
সূর্যোদয়ে কমলিনী, কেহত মলিনী দেখে নাই ॥
মিল—কেন সাজলি রাই শুভঙ্করী, মূর্তি ভয়ঙ্করী,
ত্বরায় করে দে এ কিঙ্করীর, এ সন্দেহ মোচন ।
অন্তরা—গঙ্গা আজ বিমুখী কেন সাগর সঙ্গমে ।
কেন শুকের মুখ দেখেনা শারী, সুখ নাই বরষে ॥
ময়ূর ত্যজল ময়ূরিনী, ভ্রমর ত্যজল ভ্রমরিনী,
মেঘ ত্যজল আজ চাতকিনী, কি ব্যতিক্রমে ॥
পরচিতান—হায় হায় সব বিপরীত, কেন দেখি এ নিবুঞ্জেতে ।
পারণ—জানি চিরদিন আশ্রিতা, লতা আর বনিতা,
অন্য স্বর্ণলতা, তমাল ত্যজল কি জন্যেতে ॥
৩য় ফুকার—মরি হায় হায় গো, সান্নিপাত নাই কিসের মহাশ্বাস,
এমন কে করে বিশ্বাস ।
পবিত্র আসনে বিষাদ, সাধে সাধে কেন বিবাদ,
ত্যজ্য করে মহাপ্রসাদ, কেন একাদশীর উপবাস ॥

নকুলেশ্বর জবাব দিতে উঠে বৃন্দাদূতীর ঐ সব আশ্বাস বাক্যের প্রতিবাদ করে রাধারাণীর জবানীতে বললেন—

শুনে বৃন্দাধনীর হিতবানী, বলে মানিনী তখন ।
তোরে বলব কিলো সজনী,
যে দুঃখে যায় রজনী,
আমি জানি, জানে আমার মন ॥
কালার বাঁশী শুনে পূর্বরাগে,

জীবন যৌবন দিলেম আগে.
শ্যামকে ভেবে গুণাধিক ;
শ্যামের জ্ঞান নাই মোটে ন্যূনাধিক
পেয়ে চন্দ্রার কামের ব্যসন,
অটল চাঁদের টলে আসন,
একটু মান-দণ্ডে না করলে শাসন—
লম্পট পুরুষ রয়না ঠিক ॥

মিল—মান করেছি মানে রব শোন গো সজনী—
বিফলে গেল রজনী, সে দুঃখ কি সহা যায়

মুখ—মুখ হতে বের করে দে, .
সাধে সাধে কেন গোল বাধায় ॥

ভাইনা—শ্রীপাদপদ্মে শ্যামনীলপদ্ম পড়ল কি কারণ ;
মানের দণ্ডে ভণ্ড শ্যামের ভণ্ডামি এমন।
আগে কেটে বুকের গোড়া,
পরে দেয় শ্যাম জলের ধারা,
লাথি মেরে পারে ধরা—
সেই ধরায় কি প্রাণ জুড়ায়।

খোঁচ—আশা ভঙ্গ অপরাধে দোষী শ্যাম রায় ॥

বললে, চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদা থাকে আমোদিনী,
জাগতিক এ ঘটনা, কিন্তু অসময় তা ঘটেনা।
রাত্রে যদি চন্দ্র ওঠে, আমোদে কুমুদী ফোটে,
যদি ভোরে চন্দ্র যায়, কোটে, কুমুদিনী ফোটে না ॥

বললে, সূর্যোদয়ে কমলিনী, কিন্তু এত মলিনী,
কিসে রাই তোর এত দুখ ?
সই তোর কথা শুনে ফাটে বুক।
চন্দ্রাবলী রাহুর গ্রাসে, দিবাকরের কর বিনাশে,
তাইতে অন্ধকারে মন বিরসে, কমলিনীর মলিন মুখ ॥
বললে, সাধে সাধে কেন বিষাদ, কাছে থাকতে মহাপ্রসাদ,
কেন উপবাসী রই ?

তুই কি জানিস না গো বৃন্দে সই।
মহাপ্রসাদ ছিল আগে, কাল নিশিতে কামমোহাগে,
লাগে অশুচি পিশাচীর ভোগে ,মহাপ্রসাদ রইল কই ?

এইভাবেশনকুলেশ্বর মানগানের জবাব দিয়ে সে সঙ্গে একটি রংফুকার দিলেন—

আগে লোকের মুখে তত্ত্ব শুনি,
শরৎ আর রাঙ্গা যামিনী,
দল করেছেন বহুদিন ;
এখন আত্মদ্বন্দ্বে হল ভিন্।
দারুণ বিচ্ছেদ রবিকরে,—
নিষ্প্রভ চাঁদ পুড়ে মরে,
হল যামিনীর অভাবে পড়ে—শরৎচন্দ্র জ্যোতিহীন ॥

এরপর নকুলেশ্বর স্বরচিত সেই 'ফুল-সুবল' গান খানা আসরে গাওয়ালেন, যার রচনা শুনে হরি আচার্য মহাশয় বলেছিলেন—সরকার ঠকানো গান লিখেছিস্! গান শেষে নকুলেশ্বর দল নিয়ে বের হয়ে এলেন। শরৎ সরকার সে গানের জবাবের বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন না। জবাবের শেষে তিনি নকুলেশ্বরের রং ফুকারের সূত্র ধরে পাল্টা একটা রং ফুকার করলেন—

দেখি ঐ দলের রাঙ্গা যামিনী,
নূতন দল করেছেন তিনি,
পুরান লাগেনা ভাল ,
তাইতে নতুন সরকার জোটালো।
দলে দুইটা ছুকরী আছে,
ঘাগরা পরে সভায় নাচে,
থাকে ছোকড়া সরকার পাছে পাছে—
সভাটা করলো আলো ॥

নকুলেশ্বর পুনরায় এসে উপরিউক্ত ফুকারের জবাব করলেন—শরৎবাবুর দলে এলোকেশী নামে গায়িকার সঙ্গে ঠেস দিয়ে উপরিউক্ত ফুকারের নিম্নরূপ জবাব দিলেন—

বললে, যামিনী বেশ দল করেছে,
ছোকড়া সরকার ছুকড়ীর পাছে
সভা আলো করেছে।

এলোকেশীর এলোচুলে,
শরৎবাবু গেছেন ভুলে,
তাইত ছোঁড়া সাজতে বুড়া কালে—
কচি সাল্‌সা ধরেছে ॥

এর পর শরৎবাবু এসে টপ্পা পাঁচালী আরম্ভ করলেন—

আমি কনক লঙ্কার অধিপতি রাজা দশানন।
যত যক্ষ রক্ষ কিন্নরে, দেব দানব গন্ধর্ব নরে,
আমার উদ্দেশে প্রণাম করে বিশ্ববাসীগণ ॥
যত তেত্রিশ কোটি দেবগণে
আমারি অধীন হয়ে কাজ করে ;
ঘোড়ার চাকর যম তুমি,
চিরদিন রও ঘোড়ার ঘরে।
অস্ত শ্রীরামের শরাসনে, পড়েছি ধরাসনে,
প্রাণপাখী যেতে চায় উড়ে।
তুমি ঘোড়ার ভৃত্য কি নিমিত্ত,
এ সময় দাঁড়ালে মোর শিয়রে ?

এই টপ্পা উপস্থাপন করে শরৎবাবু মনে করেছিলেন যে নকুলেশ্বর জবাবে বলবেন যে "আমি মৃত্যুপতি যম, মৃত্যুকালে সব জীবের আত্মা নিয়ে যমপুরে পাপপুণ্যের বিচার করি।" নকুলেশ্বরের এই জবাবের উত্তরে শরৎবাবু এসে আবার জেরা করবেন—জীব দেহে মরে কি ? আত্মা তো বায়ুমাত্র, তুমি তার বন্ধন কর কি ? স্বর্গ নরক কাকে বলে ? তুমি মৃত্যুপতি হলে মৃত্যুকন্যা কি করে ? শিবকে সংহার কর্তা বলে কেন ? ইত্যাদি কূট প্রশ্ন তুলে নকুলেশ্বরকে জব্দ করবেন। কিন্তু নকুলেশ্বর এমনভাবে নিম্নোক্ত জবাব দিলেন যে তার আর ওসব প্রশ্ন করার অবসর রইলনা।—

তুমি মহাতেজা রাবণ রাজা, কুম্ভকর্ণের ভাই।
তুমি ব্রহ্মাদেবের পেয়ে বর, হয়েছ দেবতার ঈশ্বর,
ক্ষুদ্র জ্ঞানে নরবানর, গ্রাহ্য কর নাই ॥
ও সেই নররূপী নারায়ণে জীবনে ভক্তি করা শিখ নাই :
যমকে দেখে দায় ঠেকে নিলে আজ রামচরণে ঠাঁই ॥
এখন তুমি যাচ্ছ চলে, তাই তোমায় মরণ কালে,

আজ আমি শিরদে দাঁড়াই।
আমি কৃত্য হয়ে যা করেছি—
কর্তাকে শেষের হিসাব দিয়ে যাই ॥

নকুলেশ্বরের এই জবাবখানা শুনে শরৎবাবুর মনোকল্পিত ধারণা কর্পূরের মতো উড়ে গেল। নিজের জীবনের ভুল ভ্রান্তি ও আত্মকৃত অপরাধের কথা বলতে বলতেই সময় কেটে গেল। তাঁর আসরে বাহবা নিতে পারলেন না।

নকুলেশ্বর দ্বিতীয় আসরে শ্রীরামচন্দ্রের গুণাগুণ—পাষাণী অহল্যা উদ্ধার, মাধবের কাষ্ঠ তরণী সোনা করণ, তরণী সেনের মুক্তি, গুহক চণ্ডালকে কৃপা ইত্যাদি বিষয়গুলি ধুয়া ধরে হরি আচার্য মহাশয়ের কাছে শেখা পদাবলী সুরে পাঁচালী বলে আসরে দু'তিনটা হরিধ্বনি ফেলে চলে এলেন। অষ্টমীর গান শেষ হলো।

**নবমীর গান ॥**

নবমীর রাত্রে রাঙ্গা যামিনীর দল আগে আসরে গেলেন। উভয় দলের ডাক মালসী গান হয়ে গেল। রাঙ্গা যামিনীর দল নকুলেশ্বরের রচিত 'জল কুম্ভের' কবিখানা গাওয়ালে শরৎ সরকার সে কবি'র জবাব দিয়ে হরিচরণ নাথের রচিত 'যবন হরিদাসের' কবি খানা গাওয়ালেন। গানখানার মর্মার্থ হল—কল্পনায় হরি বুল্লা কাজী যেন যবন হরিদাসকে বলছেন—

[ক] তুই হরিনাম করিস্ কেন ?

[খ] সেলাম ছেড়ে দণ্ডবৎ করিস কেন ?

[গ] নামাজ রোজা ছেড়ে দিয়ে দিন রাত নাম কীর্তন করিস কেন !

[ঘ] মুরগী ছাগী কোরবাণী দিলে বেহেস্ত পাবি—তা না করে ভেক নিয়ে বৈরাগী হলি কেন ?

[ঙ] মাথা মুড়ায়ে করঙ্গ ধারণটা কোন্ ধর্ম ?

[চ] নানীকে দিদি বলিস কেন ?

[ছ] তোদের ঐসব আউল বাউল দরবেশ নাড়া, সব বেটা গাঁজা খোর।

[জ] তুই মরলে বৈষ্ণবেরা তোকে খাড়া করে মাটি দিবে, তার চেয়ে মুসলমানের কবর কত ভাল।

[ঝ] লুঙ্গী ছেড়ে কপ্নী পরেছিস্ কেন ?—ইত্যাদি রহস্যপূর্ণ কবিখানা গেয়ে গেলেন। সম্পূর্ণ গানখানা নিম্নরূপ—

চিত্তন—ন'দে হবিবুল্লা কাজীর ঘরে,
হরিদাসকে পালন করে,
এ সকল কর্ম্মেরই বিপাক।
পারণ—দেখে হরিদাসকে কপ্‌নী পরা, বৈরাগীর পাড়া,
কাজীর নয়নে ধারা—
বলে প্রাণ জুড়া,—বাবা বলে ডাক॥
১ম ফুকার—কেন কোরান ছাড়, সদা পড় পুরাণ ভাগবৎ?
এখন ছেলাম ছেড়ে কর জোড়ে, করছ দণ্ডবৎ।
ছেড়েছ আমার বাড়ী, হলে কমণ্ডধারী,
করে মস্তক মুণ্ডন রাখলে দাড়ী,
কোন্ ধর্ম্মের এই মত?
মিল—নিয়ে বাইশ বাজারে বেতের বাড়ি দিলাম তোরে,
তবু জুম্মা মস্‌জিদ দিয়ে ছেড়ে,
কি সুখে কীর্ত্তন করিস বার মাস?
মুখ—ছাড়িয়ে আল্লা নবী,
আগে জানিনা বৈরাগী হবি, ওরে হরিদাস।।
ডাইনা—বাছা তুই যখন মরিবি প্রাণে,
দিতে জানাজা সব মুসলমানে,
ডাক দিয়ে মোল্লা আনবে বাড়ী।
তখন মোল্লা আর বৈরাগীর দলে, লাগবে মারামারি।।
কেহ বলবে দিব গোর,
কেহ বলবে আগুনে পোড়,—
দেখছি দোটানাতে পড়িয়ে তোর—
শেষকালে একুল ওকুল হবে নাশ।
খোঁচ—কোন্‌টা সত্য নিত্য ধন করলি না তালাস।।
২য় ফুকার—এখন নানীকে ত ডাক দিদি, পানিকে কও জল।
ছাড়লে রোজা নামাজ, মাথায় নাই তাজ, বলছ হরিবল॥
পরিচয় দেওনা কাজী,
নাম হরিদাস বাবাজী,
পেলে কোন্‌খানে এই বেনামাজী, ভেক বৈরাগীর দল?

অন্তরা কোন্ ধর্মের মর্ম জেনে, পরেছ এই কৌপ্‌নী ডোর—?
বাদের আউল বাউল দরবেশ মানি,
দেখি তার বার আনি গাঁজা খোর।
গৌর প্রেম সিন্ধু হিন্দু মতে, বিন্দু ক'রে দান—
তরায় পাষণ্ডী পামর। মরি হায়রে,—
তোদের খাড়া করে গাড়ার চেয়ে,
কিসে মন্দ মুসলমানের গোর॥
পরচিতান—ও তোর কাজ কি হয়ে ভেক বৈরাগী,
জুম্মা বারে মুরগী ছাগী,
কোরবানী করবি চিরকাল।
পারণ—হলি কি ধন পেয়ে, কি গুণ জেনে গৌরাঙ্গের ভক্ত,
শুনে লাগে বিরক্ত,
লবি পাঁচ ওয়ক্ত, খোদাতালার নাম॥
৩য় ফুকার—এই যে দেহ খাঁচার জীবন পাখী, যতনে রাখি;

বহে নিঃশ্বাস পবন, হিন্দু যবন একমতন দেখি।
শিবশক্তি কৃষ্ণ রাধা,
একবস্তু নাই কো বাধা,
এই যে রাম রহিম আর আল্লা খোদা, বিভেদ আছে কি?

নকুলেশ্বর এই গানখানার রহস্যভাবে জবাব না দিয়ে একটু আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন জবাব করলেন, যথা—

তখন হবিবুল্লা কাজীর বাক্যে দুঃখে বলে হরিদাস।
হরিনামে মত্ত হলে চিত্ত, মিলে নিত্য ধাম,
তাইতে হরিনাম, করি বার মাস॥
১। বললে সেলাম ছেড়ে কিসের তরে,

দণ্ডবৎ কর বায়ংবার?
নিলেম বৈষ্ণবের আচার।
দণ্ডবৎ সাধুর চিহ্ন, প্রণাম সেলাম অভিন্ন,
যেমন এক জলের নাম ভিন্ন ভিন্ন—

জল পানি অপ আর ওয়াটার ॥

২। আমি ত্যাগ করিবে ন্যামাজ রোজা
হরিনাম লই দিবা নিশি।
তাতে কিসে হই দোষী ?
যে বস্তু যার উপাস্ত, তারে সে পায় অবশ্য,
যেমন যাদৃশী ভাবনা বস্তুসিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥
আমি কাম কামনা ভোগবাসনা পরিহরি,
আমার ভেকের গুরু গৌর হরি,—
হবেন সেই ভবপারের কর্ণধার।
হিংসায় না আল্লা পাবে,
বরং চিরতরে বন্ধ হবে, বেহেস্তের দুয়ার ॥

৩। বললে, কাজ কি হয়ে ভেক বৈরাগী,
কোরবানী দিতে বল মুরগী ছাগী,
আমরা তো ধারিনা তার ধার।
জানি অহিংসা পরম ধর্ম বৈষ্ণবের আচার ॥
শুনি ইব্রাহিম অকপটে, স্বহস্তে পুত্র কাটে,
ওসব মুরগী ছাগী কেটে কেটে—
করোনা দোজখের পথ পরিষ্কার ॥
বৈষ্ণব নিন্দা অপরাধ, প্রায়শ্চিত্ত নেই তার ॥

৪। বললে চাঁচর কেশ মুড়ায়ে মাথা, করেতে নিলে কমণ্ডল
এসব কোন ধর্মের অঙ্গ ?
চাঁচর কেশ মুড়ো মাথা, অঙ্গেতে ছেঁড়া কাঁথা,
লাগে বৈষ্ণব ধর্মে এই হীনতা—
শিখালেন দয়াল গৌরাঙ্গ ॥

৫। আমি নানীকে আজ দিদি বলি,
ডাকে কিছু যায় আসে না,
ও তো দু'দিনের চেনা।
যত সম্পর্কের খেলা, বিভিন্ন ছাঁচে ঢালা,
যেমন তার বাহু অনন্ত বালা
সকলের মূলে এক সোনা ॥

[ ৩১০ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ ]

যাই—এই যাই—তারপর টুপ্ করে জলে ডুবে যায়।

তারপর আবার তারা মুখোমুখি। বাজারে চাল কিনতে কিনতে হঠাৎ অনিমেষ বলল—এই, সেই মেয়েটা—খুব নীচু গলায় প্রায় তার কানের কাছে মুখ এনে—সে তাকিয়েছে।

বাজারটা একটা সিমেন্ট বাঁধানো খোলা চত্বরে। সারি সারি বসেছে বিক্রেতারা। তারা যেখানে চাল কিনছে তার পরের সারিতে শেষে মেয়েটি কি যেন কিনছে, পাশে দাঁড়িয়ে তার এক ভাই। ভাইটি নীচু হ'য়ে মেয়েটিকে কি যেন বলল, মেয়েটি এদিকে তাকালো, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পুনরায় কেনাকাটায় মন দিলো।

সে দুজন বিক্রেতার মাঝে সরু জায়গা দিয়ে ওপাশের সারিতে চলে যায়, দ্রুত এগিয়ে যায়। ভাইটি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, দৃষ্টিতে ঈষৎ ভীতি, সে দিদিকে ঠেলা দেয়।

মেয়েটি ধান দিয়ে খুচরো ফেরৎ নিচ্ছিল, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ভাইকে বলে—চল্। এবং তখন তাকে দেখতে পায়।

—আপনি অমরকে চেনেন? সে জিজ্ঞাসা করে।

—কেন? মেয়েটির কণ্ঠস্বরে কেমন এক রূঢ়তা।

সে একটু নাড়া খায়, বলে, আমি তাকে খুঁজছি। মেয়েটি কোন উত্তর দেয় না, চলতে শুরু করে।

—শুনুন,—সে ডাকে, ওদের পিছনে পিছনে এগিয়ে যায় বলে,—বলুন, যদি তার সম্বন্ধে কিছু জানেন বলুন, আমি তাকে খুঁজছি।

মেয়েটি ফিরে তাকায়ও না, শুধু বলে,—আমি তার সন্ধান জানিনা।

তিন বন্ধু তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, অনিমেষ বলে—কি ব্যাপার রে?

—কিছু না, সে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ে, মুখ নীচু করে ফিরে চলে।

রেস্ট হাউসে এসে সে চুপচাপ অন্ধকার ঘরে চলে যায়, একটা চেয়ার নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

ওপাশে রান্নাঘরে ওরা কলরব করছে—পরেশ, তুমি তো খুব কাজের লোক—উনুনে আঁচ দিয়ে রেখেছ—ঠিক আছে, আগে ভাতটা বসিয়ে দাও আমরা ততক্ষণে এদিকে—কুক্কুল মুরগীটা কেটে ফেল্—আয়েকটু চা হ'লে হোতো না—

দোকানে কি যে চা খেলাম—চায়ের জিনিসপত্র কে কিনেছে—আর চা খেয়ে কি হবে ব্ল্যাক নাইটের বোতোলটা খুলতে হবেতো—ভাত হ'তে হ'তে এদিকে সব গুছিয়ে কেল্, মাংসটা চাপিয়ে দিলেই ব্যাস—আর কিছু রাঁধবার দরকার নেই, আধ ঘন্টায় সব হ'য়ে যাবে—পল্টু শালা যে কি—দিন দিন কথাবার্তা ভুলে যাচ্ছে—আর কিছুদিন পরে বোধ হয় হাতটাত নেড়ে ইশারা করে কাজ চালিয়ে নেবে—নারেও সব সময় মনে মনে বক্ বক্ করে—ব্যাটাকে আজ ছইস্কি দিয়ে বোকাই করে দোবো—মাল পেটে পড়লে ওর মুখ খুলে যায়—মেয়েটার সঙ্গে কি ব্যাপার বলতো—কিছু করতে চাইছে নাকি—দূর দূর ওসব ও চায় না। —তবে কি চায় বলতো—ওবে কি চায় ও নিজেই জানে না—তাতো আমরা শালা কেউই জানি না—তুই জানিস তুই কি চাস—আচ্ছা আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন ও একজনের সঙ্গে প্রেম করতো সেটা কি হ'লো বলতো—মেয়েরা ওসব পার্টি ফার্টি বোঝে না, সে চেয়েছিল ও চাকরি বাকরি করুক সংসার টংসার করুক——মেয়েরা ওসব পার্টি ফার্টি বোঝে না—আমরাও বুঝি নাকি শালা—এখন কিছু জোটেনা তাই টুপাইস্ খাদ্দায় এখানে জুটে গেছি—ও কিন্তু লাল পার্টির জন্য ভীষণ খেটেছে—অথচ কেন যে ছেড়ে দিলো—পরেশ—ভাত চাপানো হ'য়ে গেছে—আচ্ছা এই নাও, তুমি চায়টে সোডার বোতল নিয়ে এসো—পাওয়া যাবতো—এই কুন্তল, মাংস ছোট ছোট টুকরো করিস না…

মা সরস্বতীর কৃপায় ছইস্কিটা ভালই হ'য়েছে। অনেকদিন পর মাইরি জমিয়ে মাল খাওয়া হচ্ছে—ওকি গুরু, তুমি কখন থেকে গ্লাসটা খালি করতে পারছো না?—বলতে বলতে কুন্তল অর্ধেক গ্লাসটা ভর্তি করে দেয়।

অনিমেষ খিক্ খিক্ করে হাসে, বলে, চাঁদা তোলার সময় পল্টু যা করেছে না! মাইরি ওর একটু মায়াদয়া নেই, বেশী বকবেও না খালি খ্যারখেয়ে কিরকম একটা গলা করে বলে, যা লিখেছি দিয়ে দিন. ওর কমে চাঁদা নিয়ে পুজো হয় না —খিক্ খিক্—খিক্।

পরিমল—আতরদের বাড়ী—মাইরি আতরের মায়ের অসুখ—কি অবস্থা—আতরের বাবাতো রাইটার্স বিল্ডিংএ থার্ড ডিভিশন—মাইনে যা পায় মাসের অর্ধেক ফুরিয়ে যায় তার ওপরে ওরকম একটা রুগী, তারপর মাসের শেষ কিন্তু পল্টু কি করে অমন ধমকালো—কি নিষ্ঠুর হ'য়ে গেছিস তুই—একটুও মায়াদয়া নেই—পরিমল প্রায় কাঁদো কাঁদো।—অতো মায়া দয়া করলে এমন মেজাজে

হইস্কি হতো ? না মুরগী চাট্ ভিস্ ? অতো আতর আতর করছিস কেন ? আতর বুঝি তোর পেয়ারের ইয়ে হয় ? সে তোকে মাল খেতে হবে না – বলতে বলতে সে হাত বাড়ায়।

—যাক্ যাক্, যেতে দাও—কুন্তল হাত নেড়ে বলে—আরে এবারে বড় দাঁও আসছে—ভোট—ছুঁচো মারা কাজ চাঁদা তুলতে হবেনা, থোক কড়কড়ে গোছা আসবে—না কি গুরু ? কিরকম আসবে এবার ?

—খুব একটা বুঝতে পারছিনা রে—সে বলে—ভোট এখন হঠাৎ কেন হচ্ছে বুঝতে পারছিনা। অনেক দিন বিরোধী পার্টিরা নড়তে চড়তে পারে নি, সব বন্ধ - মিটিং বন্ধ, আগন্তে বেচাল কিছু লেখা বন্ধ—দেওয়ালে পোষ্টার পর্যন্ত বন্ধ — জেলে অনেক নেতা বন্ধ হ'য়ে আছে—এখন ওরা একটুও তৈরী নেই, হঠাৎ ভোট করে নিলে ওরা কোন সুযোগই পাবে না।

—তাছাড়া আমাদের হাত সাফাইতো আছেই—অনিমেষ বলে।

সে কট্ কটে চোখে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, কর্কশ গলায় বলে—হ্যাঁ আমাদের হাত সাফাই—আমি জানি হাত সাফাই না করলে এখনও এই দেশে কোটি কোটি জনসাধারণ ছড়িয়ে রয়েছে যারা ঠিকঠাক ভোট দিয়ে আসবে, তাদের মিটিং করে পোষ্টার মেরে কানে কাঠি দিয়ে বোঝাতে হবে না – আমি জানি আমার দেশে ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ যুবক যাদের টাকা দিয়ে ডাকতে হবে না ভোটে খাটবার জন্য, যাদের বুকের ভেতর ছড়িয়ে আছে আগুন, যারা আদর্শের জন্য নিঃশব্দে বহন করছে জীবন যন্ত্রণা, কলে কারখানায় হাটে বাজারে মাঠে ময়দানে লক্ষ লক্ষ সেইসব বন্ধুরা যাদের আমি দেখেছি, যাদের সঙ্গে আমি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেটেছি – তাদের আমি চিনি – সে হঠাৎ চুপ করে যায়, ঘরের মধ্যে তার ভারী কণ্ঠস্বরের রেশ যেন গম্‌গম্ করে।

অনিমেষ হঠাৎ খিক্ খিক্ করে হেসে ওঠে, বলে,—গুরু মাইরি মাঝে মাঝে ভুলে যায় যে লাল পার্টি সে কবে ছেড়ে দিয়েছে—সেই একটা গেরস্ত বউ—অভাবে খানকি-খাত্তার নাম লেখালো—তা সে তার ঘরের কথা আর ভুলতে পারে না, কথায় কথায় খালি আমার ভাতার আর আমার ভাতার—তা গুরুর আমার সেই অবস্থা।

—এই শালা, চোপ্। সে লাফিয়ে ওঠে, কুন্তল তাকে জাপটে ধরে বলে, বাঃ শালা, নেশাটা মাটি হয়ে যাচ্ছে। তুমি মাইরি ঠাণ্ডা হও গুরু, ওর কথায় কান দিও না—কুন্তল ওকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়, গেলাসটা হাতে ধরিয়ে দেয়,

বলে, নাও এটুকু শেষ করে ফেল।

সে গেলাসটা টেবিলে রেখে দেয়, বলে,—এক ঘুসিতে ওর মাথা আমি গুঁড়িয়ে দেবো।

অনিমেষ মাথা নাড়ে—তা দাও কিন্তু তুমি অতো সাধু সাধু জনসাধারণের কথা বোলোনা ওসব আমার চেনা আছে, ওরা শালা লাল পার্টির সময় গলায় রুমাল বেঁধে চাকরির ধান্ধা করেছে, আবার গণেশ উল্টে গেলে রুমাল পকেটে পুরে যুগ যুগ জিও করে মিনিবাসের পারমিটের ধান্ধা করে। ও শালার জনসাধারণের কথা ভুলে যাও, ভোটের দিনে কি রকম করে কি করলে ভীতুর বাচ্ছারা ভোট দিতেই যাবেনা সেই চিন্তা কর।

চুপ কর্ চুপ কর্—সে হিস্‌হিসিয়ে বলে, চেয়ারের পেছনে মাথা এলিয়ে দেয়, বিড়বিড় করে বলে—আমার মতো দু চারজন নষ্ট কুত্তা হ'য়ে গেছে, তাদের দিয়ে সকলকে তুলনা করিস না। আমি জানি, হ্যাঁ আমি জানি,—বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়—আমি দেখেছি আমার দেশের মানুষদের, তাদের মধ্যে কি আগুন আছে আমি জানি, শুধু দরকার সংঘবদ্ধ করার মতো নেতৃত্ব, কিন্তু সেটুকুই নেই, আমি একজনও মানুষ দেখিনা যে শক্তিধর। উত্তেজনায় তার চোখ মুখ লালচে, সে সোয়েটার খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

পরিমল বলে—আমি কিন্তু এক সময় ভাবতাম তুই একদিন খুব বড় হবি—নেতৃত্ব দিবি—সেই যখন আমরা কলেজে পড়তাম—তুই কলেজের গেটে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতিস।

—না, না আমি খুব সামান্য মানুষ, আমার কোন শক্তিটক্তি নেই। এখন আমি এটা বুঝতে পারি। অনেক আগে আমার বোঝা উচিত ছিল। তাহলে জীবনটাকে অন্য ছাঁচে ঢেলে নেওয়া যেতো। এমন করে নষ্ট হ'য়ে—সে আমাকে বলেছিল—অন্যমনস্কভাবে বলে সে—সে বলেছিল পার্টি করো, কিন্তু পার্টির জন্য জীবনপণ কোরোনা। সে আমার জন্য ভাবতো, হয়তো সে বুঝেছিল আমার জীবনপণ করার মতো শক্তি নেই...কিন্তু আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি—আবহাওয়া একেবারে চ্যাবচেবে হ'য়ে গেল কুন্তল চিৎকার করে—যতো সব আহাম্মকের দল ফুর্তি করতে এসে এসব কি? এঁ্যা? এসব কি? কথা ছিল সব ভাবনা চিন্তা বাদ, অথচ এখন কি হচ্ছে? এঁ্যা? এসব কি হচ্ছে? চলো সব বাইরে সমুদ্রের ধারে, চলো—

—কটা বেজেছে? মোটে পৌনে আটটা? ঠিক আছে চলো ভাই, এই

চলো বাইরে—অনিমেষ চিৎকার করে।

হিমেল বাতাস। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছিল কিন্তু সমুদ্রকে দেখা যাচ্ছিল না। রাস্তায় চড়া আলো। দুপাশে দোকান বসেছে। নানান রকম মালাটালা, ঝিনুকের খেলনা, ভীড় না হলেও বেশ কিছু মানুষজন ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

তারা পায়ে পায়ে পেরিয়ে এলো দোকান পাট। ঈষৎ এলোমেলো লাগছিল হাঁটার ভঙ্গী, পথ শেষে কংক্রীটের একটু ঢালু চাতাল, তারপর বালি, তারা দাঁড়াল। সামনে অন্ধকার, অন্ধকারে সমুদ্র গর্জন করছিল। অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসছে চারটে আবছা মূর্তি তাদের টুকরো কথোপকথনের শব্দ আরেকটু এগিয়ে আসে, তারা স্পষ্ট হয়—সেই মেয়েটি, দুই ভাই, বাবা, মা। মুখোমুখি হ'লে সকলের সাথে চোখাচোখি। তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করেন, সামনে এসে দাঁড়ান, বাকি তিনজন পেরিয়ে চলে যায়। ভদ্রলোক দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলেন,—আপনি অমরের দাদা, না?

সে হতভম্বের মতো ঘাড় নাড়ে। ভদ্রলোক বলেন—আপনাদের মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য। সে যেন অন্ধ এভাবে ভদ্রলোকের হাত আঁকড়ে ধরে, বলে, অমরকে আপনি জানেন? সে বেঁচে আছে?

—কেন? আপনাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই?

—সে ঘাড় নাড়ে। ভদ্রলোক মুখ নীচু করে নেন, বলেন,—অবশ্য আপনাকে সে ভালো চোখে দেখেনা, এমন কি—এমন কি—এরকম কথাও বলে—ভদ্রলোক দুবার ঢোক গেলেন—ইতস্ততঃত করেন তারপর বলেন—এরকম কথাও বলে, দাদা আমাকে ধরিয়ে দিতে পারে—টাকার জন্য ও সব পারে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ তারপর ভদ্রলোক মুখ তোলেন, বলেন,—ও আমার মেয়ে, ওরা রেজিষ্ট্রী বিয়ে করেছে বছর দুই আগে। আপনার ভাই সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই, ভালো ছেলে, ভালো মন, কিন্তু আমার মেয়ের কথা ভাবলে আমি খুব ভাবনায় পড়ে যাই। এরকম ছন্নছাড়া ভাবে কতদিন চলবে? দুমাসে তিনমাসে এক একদিন অমর আসে, রাত্রে লুকিয়ে, আবার রাত্রেই চলে যায়, খানিক ক্ষণের থাকা, একটু আধটু কথাবার্তা, একটু খাওয়া দাওয়া করে—কোনদিন তাও না, এ যে আমার কি অশান্তি।

—সে কি জানে সে কি চায়?—কর্কশ গলায় বলে সে—তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, নাকি শুধু আবেগ নিয়ে দৌড়চ্ছে?—সে মুখটা ভদ্রলোকের খুব কাছে

এগিয়ে নিয়ে যায়, বলে—বলবেন তার দাদা লোচ্চা নম্বর ওয়ান, কিন্তু ভাইকে সে নিজের কলজের চেয়েও ভালবাসে— তার গলা ভারী হ'য়ে যায়—বলে,— আর তার মা—তার মা কেঁদে কেঁদে পরশ-পাথর খুঁজে বেড়ায়, যে পাথর তার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দেবে।

সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে, ভদ্রলোক আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে যান।

হঠাৎ পিছনে ঝনন্ ঝন্ ঝনন্ ঝন্ ঝাঁজ বাজছে, চারজনেই পিছন ফেরে, তিনচাকা সাইকেলের মালটানা গাড়ির ওপর সরস্বতী প্রতিমা, দুজন কিশোর ছেলে প্রতিমা ধরে আছে, একজন হ্যাজাক নিয়ে আর একজন ঝাঁজ বাজাচ্ছে। তারা পাশ দিলো। রিক্সা এগিয়ে চলল।

ক্রমশঃ অন্ধকারে ওরা এগিয়ে যায়, হ্যাজাকের আলোর সীমানার মধ্যে চারজন কিশোর এবং প্রতিমা – হঠাৎ তারাও হাঁটতে শুরু করে, চারজন—কেউই কোন কথা বলেনা।

জল অনেক দূর সরে গেছে, রিক্সা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, তারাও হাঁটছে তো হাঁটছেই এবং এক সময় জলের ধারে রিক্সা থামলো, তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়ালো।

চারজন কিশোর—হ্যাজাকটা জলের ছুটোছুটি এলাকা থেকে একটু দূরে। তারা প্রতিমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একে একে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে, তারপর নামিয়ে চারজন চার কোণে ধরে জলে নেমে যায়, জলে ছুঁড়ে দেয়। একটা ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসে, মুহূর্তে ঢেউয়ের ভেতর থেকে ভেসে ওঠে প্রতিমার হাত—আশীর্বাদের মুদ্রা মুহূর্তে ভেসে উঠে ঢাকা পড়ে যায়। শুকনো ফুল বেলপাতা এসব তারা জলে ফেলে দেয়, আর ঘট ভ'রে জল নেয়। চার কিশোর হ্যাজাকের আলোর সীমানা নিয়ে এগিয়ে যায়, ঝাঁজের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে আসে। তাদের চারজনের পাশে গভীর অন্ধকার, আর অন্ধকারে সমুদ্র গর্জন করে।

অনিমেষ প্রথম কথা বলে—কালকে আমরা ঠাকুর বিসর্জন করে ঘট ভরে জল আনিনি তো? সবই গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হ'য়েছে।

—হ'য়েছে বেশ হ'য়েছে। আমাদের আবার পুজো তার আবার ইয়ে—কুন্তল বলে—ঘট এনে প্যাণ্ডেলে রেখেতো কুকুরে মুত্‌বে। তাছাড়া প্যাণ্ডেল-ওয়ালাকে কালকে রাত্রেই প্যাণ্ডেল খুলে নিতে বলা হ'য়েছে না? না হলে আজকে এরকম কেটে পড়া যেতো? আবার ঘটে জল ভরে এনে—আ—রে

আমাদের যখন ঐ বয়স ছিলো তখন আমরাও ওরকম ভক্তি টক্তি করেছি, নে নে, এখন মা সরস্বতীর কৃপায় কেমন ফুর্তি করছি—এখন আর মাকে অতো না ডাকাই ভালো, অন্য দিকে মন আছে, আমরা কি করছি খেয়াল নেই, অতো ডাকাডাকি করলে যদি দেখে চাঁদার পয়সায় ছইস্কি তাহলে বলা যায় না হাত এরকম বেঁকে যাবে, আর চাঁদার বিল লিখতে হবে না—

অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না, শুধু পোষাকের আভাস টাভাস। অনিমেষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বলে, তখনই বেশ ছিলাম, অথচ তখন মনে হতো কবে বড়ো হ'য়ে যাবো। স্বাধীন হবো, নিজের ইচ্ছে মতো—পল্টু, তোর মনে পড়ে? তুই বলতিস, বড়ো হ'য়ে নিই তারপর বাবার একদম কড়াকড়ি দেখে নেবো—

সবাই চুপচাপ হ'য়ে গেছে। যেন কৈশোরের চার বন্ধু, যৌবনে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে, অন্ধকারে সমুদ্র গর্জন করে।

অনেক দূরে আলোক বিন্দুগুলির নিশানা ধরে তারা ফিরে চলে।

—আমরা কি চেয়েছিলাম বলতো?

—কি জানি?

—আমরা কি চাই বলতো?

—কি জানি?

তারপর চুপচাপ। দূরে আলোকবিন্দুরা জনপদের নিশানা জানিয়ে ঝিক্‌-মিক্‌ করে, তারা চারজন টালমাটাল পায়ে অন্ধকার ঠেলে সেদিকে হাঁটতে থাকে।

# গ্রন্থ-সমীক্ষা ॥ হৃৎপিণ্ডে দারুণ দামামা

পত্র-পত্রিকার পাতায় সুনীল বসুকে আটপৌরে ভেবে নিয়েছিলাম। তাঁর কবিতা বহুর পনের ধরেই তো পড়ছি। নীরেনবাবুর গভীরতা কিংবা শক্তি-সুনীল বিষয়ক তীব্রতা তাঁর রচনায় আছে কী নেই—তেমন কখনো ভাবি নি। যারা ছুটন্ত ঘোড়ার মতো শাঁই-শাঁই বেগে চলে গেল অথবা যিনি বেশ রাজকীয় গাম্ভীর্যে পাশ কাটিয়ে গেলেন—তাদের নিয়েই ভাবনা খুব ব্যস্ত ছিল। সুনীল বসুর জন্ত আলাদা কোনো ভাবনার সময় ছিল না আমার। বোধ হয় ছিল না অনেকেরই। হঠাৎ তিনি হৃৎপিণ্ডে দারুণ দামামা বাজিয়ে চমকে দিলেন। অন্তত: আমাকে তো বটেই। সব কবিতার গায়ে কবিতার লেবেল এঁটে দিতে আমার দ্বিধা হয়। আমি অত আগ বাড়িয়ে কাউকে রাজা-মহারাজা বলতে পারি নে। কিন্তু সুনীল বসুর কবিতার আসনটি যে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে গেছে, সে-বিষয়ে আর একরত্তিও সংশয় বোধ করছি না। সমসাময়িক কবিদের তুলনায় তাঁর কবিতার স্বরূপটি যে একান্তভাবেই তাঁর, একথা যে-কোনো পাঠকই কবুল করবেন।

তাঁর কবিতায় মানুষের পার্থিব এবং অপার্থিব অস্তিত্ব সহাবস্থান করেছে। একই কবি যেন দু'টি ইমেজ-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করেছেন অতি সহজেই। পার্থিব চিত্রকল্পব্যাপারে তাঁর শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ শাণিত হয়ে উঠেছে প্রতিটি ছত্রেই। এই সংকলনের মঙ্করা, রাজামশাই হেসেছেন, কথাগুলো স্রেফ কথাগুলো, কি দাঁড়াব, স্কুলে থাকার ব্যাপার—ইত্যাদি কবিতাগুলি নিদারুণভাবে দাগ কেটে যায়। নিজেকে নিয়ে কবির মঙ্করা যেন সকলের হৃদয়েই দারুণ দামামা বাজিয়ে দেয়। একালের মানুষ যেভাবে বেঁচে থাকে—তারই মনস্তাত্ত্বিক নানা মুদ্রা অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন কবি। কোনো কারচুপি বা সংশয় তাঁকে ঘোটানায় ফেলে নি, তিনি সরাসরি শরবিদ্ধ করেছেন সমস্যাগুলিকে। একই সঙ্গে উল্লেখ করা যায়—অসভ্য দুজন, গোলকধাঁধা, তাজ্জব, জুতোটা জামাটা এবং আমি, ভক্ত বটুকেশ্বর—ইত্যাদি কবিতাও। কবিতায় এভাবে সাধারণতঃ স্পষ্ট ভঙ্গি নেওয়া হয় না, কিন্তু সুনীলবাবু নিয়েছেন।

জীবনবোধের গভীর মূল্যায়ন প্রত্যেক কবিরই অবশ্যকৃত্য, এই কবিও বেশ

কিছু কবিতায় সেই পরিচয় দাখিল করেছেন। যেমন —মায়াবী ঘরোজা, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের ঝাঁকুসে খিদে, দেখা হবে, কে রাখে, চরম প্রাপ্তি—ইত্যাদি কবিতা। এখানে কবি 'রক্তে জিভে চোখে স্পর্শে অনুভূতির আগুনে সেঁকেছ কে' মানবিক সুধার ব্যাপারগুলি বিবৃত করেছেন। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন পার্থিব মানুষের অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব আর অজস্র প্রশ্নাতুর সমস্যা।

পাঠক হিসাবে আমি বেশি মুগ্ধ হয়েছি কবির আত্ম-নিরীক্ষার এবং বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষার কবিতাগুলিতে। যেখানে একজন আস্তিক মানুষ পরিশুদ্ধ অস্তিত্বের জন্য নিজেকেই প্রশ্ন করে—'তোমার সবটুকুই কি প্রেম আর ক্ষমার ভূমিকা?', অথবা তাঁর প্রশ্নাতীত বিশ্বাসে তিনি বলেন —'তোমার দেওয়া সমস্ত জীবনের খেলনাগুলো / তোমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব,' কিংবা যে মুহূর্তে তাঁর আত্মদর্শন ঘটে এবং তিনি বলে ওঠেন—'আমি শুধু দূর থেকে অভাবনীয় ঐশ্বর্য দেখে যাব/ কিন্তু জীবনে কোনো দিন কিছু মুঠোয় পাব না / স্থির জেনে গেছি, ভগবান।' তখন কবির সততা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং আমরাও মানুষের এই আস্তিক্যের মূল্য বুঝতে চেষ্টা করি। জাগতিক বৃত্তি এবং প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে আমাদের যে চিন্তা এবং চেতনা সঞ্চারিত থাকে—এখানে তারই নিঃসংশয়িত নিবেদন শুদ্ধ মূর্ছনায় বেজে ওঠে। সুনীলবাবুর যাত্রা, ধুলো হয়ে আছি, পায়ের পাতায় ধুলোর ঘুম পাড়িও, ঘুরঘুর করছি, নিজেকে ভেঙে ভাখো—ইত্যাদি কবিতা অবিস্মরণীয়। ভোলা যায় না সেই অনিন্দ্যসুন্দর পংক্তিটি —'এই লীলা অভ্যাস করো / নিজের এক-জনকে ভেঙে দু'জন হয়ে ভাখো'। অথবা, পাশাপাশি অন্য কবিতায় দেখুন— 'নিজের থেকে নিজেকে খুলে ফেলে এখন আর মেলাতে পারছি না।' এই কবিতাগুলি কবিকে একটি বিশিষ্ট অভিধায় চিহ্নিত করবে। ভারতীয় জীবনধারার যথার্থ মূল্যায়ন এখানে উপস্থিত করা হয়েছে।

সুনীলবাবুর কবিতায় 'মুড' যতটা প্রবল, 'প্যাটার্ণ' ততটা নয়। তিনি যখন মগ্ন-ভাবনার সংযুক্ত অথবা বিহ্বল, তখন তাঁর 'ফর্ম'-এর প্রতি যেন আনুগত্য কমে যায়। তাঁর কবিতার চলন তেমন রাশভারি হয় নি কোথাও, পরিকল্পিত একঘেয়েমির চঞ্চলতা বরং প্রায় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। সাজানো-গোছানো শিল্পীপনার বদলে তাই তাঁর কবিতায় উদাসীন গৃহকর্তার স্বভাব সঞ্চারিত। কিছু কিছু কবিতা অবশ্য ছন্দোময়তায় চূড়ান্ত লক্ষণ বজায় রেখেছে, যেমন —মশারির মধ্যে একটি জোনাকি, ভিগবাজি, করজোড়ে নিবেদন, ডাইনী, জেব্রা, দেখা হবে, ধুলোপড়া—ইত্যাদি। অন্যদিকে, কিছু কিছু কবিতা আশ্চর্য কথ্যভঙ্গিতে বিবৃত

এবং মুক্তছন্দের বিলম্বিত অবকাশে বেসামাল, যেমন—আমি এই, কি দাঁড়ায়, জুতোটা জামাটা এবং আমি, কথাগুলো.এক কথাগুলো—ইত্যাদি কবিতা। শব্দচয়নে এবং বিন্যাসে সুনীলবাবু নিতান্তই সাদামাটা। অনেকটা নীরেনবাবুর মতই সহজ। তাঁর কবিতা নিরলঙ্কার এবং নিরহঙ্কারও বটে। কোথাও কোথাও অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে, তবে তা খুবই নগণ্য। যেখানে তিনি জীবনানন্দের মতো কবিতার প্রাচীন ইতিহাস এবং ভূগোল ব্যবহার করেছেন, সেখানে শব্দের ব্যঞ্জনাও গভীর এবং বহুত।

এই সংকলন যে কবিতাটির নামে চিহ্নিত, সেই কবিতার ছন্দ, শব্দ এবং ব্যঞ্জনা মিলিয়ে যে চিত্রকল্প খুঁজে পাওয়া যায়, তা সত্যিই ভিন্ন স্বাদের। অনেকটা আধুনিক বাদ্যযন্ত্রগুলির বিষম সমাবেশে ধ্বনিত শব্দপুঞ্জের মতো। কবিতাটির অন্তর্লীন শ্লেষ অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সেই সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত ভাবনায় চিত্রিত হয়েছে শিল্পী সুবোধ দাসগুপ্তর 'প্রচ্ছদপট'। প্রচ্ছদে হুংপিণ্ডে দারুণ দামামা-র প্রকৃষ্ট প্রতিচ্ছবি বোঝা যায়, কিন্তু নৈসর্গিক পটভূমির অভাব চোখে পড়ে। 'সূচী'-তে একটি প্রমাদ রয়েছে, 'মঙ্করা' কবিতাটির কোনো উল্লেখ নেই। তার পরিবর্তে 'তাজ্জব' কবিতাটির উল্লেখ দু'বার মুদ্রণ প্রমাদসহ ছাপা হয়েছে।*

—পিনাকীরঞ্জন গুহ

* হুংপিণ্ডে দারুণ দামামা ॥ সুনীল বসু ॥ আনন্দ পাবলিশার্স

সদ্য পরলোকগত শক্তিমান তরুণ কবি

যোগব্রত চক্রবর্তীর

আত্মা নান্দনিক অনুভূতিতে স্নাত হোক্।

KRISHANU
Quarterly

Vol. IX No. III
Rs 1·50

Regd. No.
RN 16533/68

with compliments of

British Paints

মলিন দত্ত কর্তৃক ব্যবসাও বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩০/১এ কলেজ রো, কলি-৯ থেকে প্রকাশিত।

*With the Compliments of :*

**TATA STEEL**

*With the Compliments from :*

**I. T. C. (Limited)**

With the Compliments of :

# KARMON & Co.

Mechanical & Structurals Engineers Specialized in Reduction Gear Unit.

Registered Contractor of All India State Rlys, Sugar Mill, Jute Mill, Tea Garden & Engineering Firms of All Over India.

*Office & Workshop* :
**19, Satkori Chatterjee Lane,**
**Howrah.**

# পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা

## বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

( পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ )

রচনা : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মুখবন্ধ'—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। পৃঃ ১৪৭ ; আর্ট-প্লেট —৬৫ ; ম্যাপ —১ ; মূল্য—৪·৫০ টাকা

## নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি

( প্রথম সংস্করণ )

গ্রন্থনা : মোহিত রায়। সম্পাদনা—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ। পৃঃ ১১৯ ; আর্ট-প্লেট —৩০ ; ম্যাপ —১ ; মূল্য—৪·০০ টাকা

## বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি

( প্রথম সংস্করণ )

রচনা : দেবকুমার চক্রবর্তী। পৃঃ ১০২ ; আর্ট-প্লেট —২৭ ; ম্যাপ—১ ; মূল্য—২·৫০ টাকা।

## হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি

( প্রথম সংস্করণ )

গ্রন্থনা : তারাপদ সাঁতরা। সম্পাদনা—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৫২ ; আর্টপ্লেট —৩৪ ; ম্যাপ —১ ; মূল্য—৪·৫০ টাকা।

● প্রতিক্ষেত্রেই পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও উৎকৃষ্ট কাগজ ●

**পাইকারী বিক্রয়কেন্দ্র**—অধীক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ, ৩৮, গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা—২৭।

**খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র**—পশ্চিমবঙ্গ সরকারী প্রকাশন-বিপণী, ১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা—১।

( পুস্তকবিক্রেতাদের পাইকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ২০% কমিশন )

ডবলিউ বি আই পি আর ··৯৭৭১। ৭৭

সদ্য প্রকাশিত

জ্যোৎস্নাময় বসু-র

# যখন বৃষ্টি

হৃদয় বিনিময়—সংশয়—প্রেম-প্রীতি—বিরহ এবং বিষণ্ণতার আপাত-মধুর কাহিনী। মেজাজে রোমান্টিক লেখকের এই উপন্যাসটি বেশ তর-তাজা অথচ গভীর। রচনা-ভঙ্গি এবং ভাষার মাধুর্য যে কোনো পাঠকের মনে ধরবে। ঝলমলে মলাটে এবং ঝরঝরে ছাপায় শোভন-সুন্দর।

আট টাকা

লেখকের নতুন স্বাদের প্রথম উপন্যাস

# সিকিদিরি

সাত টাকা।

হাতিয়া—ধুরুয়াতে টাকা উড়ছে।
কায়দা জানলে সে টাকা ধরাও যায়…।
প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে
প্রকৃতি যে হেরে যাচ্ছে তার প্রমাণ…
সুবর্ণরেখার জল এবং
বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে

বহু প্রশংসিত এবং অভিনীত নাটক

# রং বদলায়

চার টাকা

---

লিপিকা ৩০/১-এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

# কৃশানু

সাহিত্য ত্রৈমাসিক
নবম বর্ষ। চতুর্থ সংখ্যা
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪

## লেখক সূচী

কবিতা

ফিরোজ চৌধুরী/মন্মথনাথ সামন্ত/সত্য গুহ/মুকুল চট্টোপাধ্যায়/অনিরুদ্ধ গুপ্ত/অলোক দাস/সন্তোষ মণ্ডল/নিবেদিতা চক্রবর্তী/নীতিশ চৌধুরী/কাশীনাথ দাশ চাকলাদার/রঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/রমা ঘোষ/নীতিশ বসু/সুধাময় মুখোপাধ্যায়/প্রদীপ রায়চৌধুরী/ধ্রুব বসু / অজিত বাইরী / অশোক পোদ্দার / দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়/স্বপন কুণ্ডু/৩৬৭—৩৭৯

অনুবাদ গল্প

পরম আনন্দ/ক্যাথারিন ম্যান্সফীল্ড ( অনু : চঞ্চল ঘোষ ) ৩৮০

প্রবন্ধ

কবি ও কবিগান/দীনেশচন্দ্র সিংহ, ৩৯৮

নিয়মিত

পুস্তকের কথা : ইন্দ্রনীল বসু ও শ্যামল সেন, ৪১১—৪১৪

গল্প

প্রতিমা বিসর্জন/মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪০৮
কায়ার অপমৃত্যু/কিরণচন্দ্রমৈত্র, ৪১৩

প্রচ্ছদ

শ্রীপ্রভাস

সম্পাদক

দীনেশচন্দ্র সিংহ

বাঙ্গালী কৃষ্টির অন্যতম অঙ্গ কবিগানের স্বর্ণ যুগের বর্ণোজ্জ্বল আলেখ্য। পূর্ব-বঙ্গের কবিগানের শেষ সার্থক প্রতিনিধি-কবিয়াল শ্রীনকুলেশ্বর সরকারের ( নকুল দত্ত ) ৭০ বছরব্যাপী কবিজীবনের উন্মেষ ও বিকাশের চমকপ্রদ বিবরণ—

# কবিয়াল ঃ কবিগান ( যন্ত্রস্থ )

## দীনেশচন্দ্র সিংহ

(ক) কবি-সম্রাট হরিচরণ আচার্য, ত্রিপুরার হরকুমার শীল, দুর্গাচরণ ধুপী, শচীন্দ্র শীল, ঢাকার দেবেন্দ্র সরকার, অম্বিকা পাটুনী, অমূল্য সরকার, পূর্ণ সরকার, তারিণী সরকার, মদন শীল, নোয়াখালীর কাশীনাথ নট্ট, রমেশ আচার্য্য ; বরিশালের কুঞ্জ দত্ত, শরৎ বৈরাগী, উমেশ শীল, প্রসন্ন নন্দী, নিবারণ সরকার, কুসুম কুমারী, হরিচরণ নাথ, ফরিদপুরের হরিবর, মনোহর, নারায়ণ বালা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নিশিকান্ত সরকার, খুলনার রাজেন্দ্র সরকার, যশোহরের বিজয় সরকার ময়মনসিংহের হরিহর আচার্য প্রভৃতির সঙ্গে কবির লড়াই ও ব্যক্তিগত স্মৃতিপট ; টপ্পা, জবাব. সখী সংবাদ, ও রংফুকারের বিচিত্র সমাবেশ ;

(খ) শেখ সরলা, মানদা, রাজা যামিনী, কালা যামিনী, মনমোহিনী, গোবিন্দ সাহা, রাধারমণ, সুবল, বিহারী প্রভৃতি খ্যাতনামা গায়কগায়িকাদের কথা ;

(গ) রজনী নট্ট, হরিচরণ নট্ট, বসন্ত নট্ট, যজ্ঞেশ্বর, বনমালী, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ঢুলীদের কৃতিত্বের নিদর্শন ;

(ঘ) রাজরোষে কবিগান (ঙ) ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিরুপম চিত্র ;

(চ) আগরতলা রাজবাড়ী, উদয়পুর কাছারী, নোয়াখালী দালাল বাজার, ঢাকা সোনার গাঁ পানাম, রিকাবিবাজার, নরসিংদী বাজার. খুলনার করাপাড়া. নগাঁও পীলজং, ফরিদপুরের গোলাবাড়ী, শ্রীহট্ট করিমগঞ্জ, ত্রিপুরার গৌরীপুর বাজার বরিশালের বালকাঠি প্রভৃতি পূজাপ্রাঙ্গন, কবির আসর ও অনুষ্ঠাতাদের কথা.

ছ) উদ্বাস্তু কবিগানের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন ;

(জ) পূর্ববঙ্গের সরস মাটি ও রসিক মানুষের সাবলীল পরিচয় ;

(ঝ) একাধারে তথ্য-তত্ত্ব, গল্প প্রবন্ধ ইতিহাস-কাব্য, সঙ্গীত-স্মৃতি চারণ ;

(ঞ) লোকসঙ্গীত গবেষক লাইব্রেরী ও পাঠাগারের পক্ষে অপরিহার্য,

**দুই খণ্ডে পাঁচশত পৃষ্ঠার সুবৃহৎগ্রন্থ। প্রতি খণ্ড ১৫·০০ টাকা ;, দুই খণ্ড একত্রে ২৫ ০০**

---

**লিপিকা** ৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

বাঙ্গালীর একমাত্র গর্বের বস্তু তার ভাষা-সাহিত্য। পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া সুদূর আন্দামান ও দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসিত তথা নির্বাসিতদের বাদ দিলেও সারা ভারতে বাংলা ভাষাভাষীরা সতীদেহের মতো ছিন্নবিচ্ছিন্ন নিক্ষিপ্ত। অথচ ভারত ও বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যাগত শক্তি এই উপ-মহাদেশে যে কোন ভাষাগোষ্ঠীর চেয়ে গরিষ্ঠতর। ভাষার বন্ধন বাঙ্গালী জাতিকে একত্র রাখতে পারলে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক চেহারাই অন্য রকম হতো। ভাষা সাহিত্য শিল্প ভাস্কর্য যে কোন জাতির পরিচয়পত্র। সে পরিচয় পত্র যারা দেশবিদেশে বয়ে নিয়ে যান জাতিধর্ম নির্বিশেষে তারাই নমস্য।

কারো কারো মৃত্যুতে শূন্যস্থান পূর্ণ হবার নয় বলে মন্তব্য করা আজকালকার রাজনৈতিক নেতাদের একটা ফ্যাসান। কয়দিন পরেই দেখা যায় শূন্যস্থান যথা-রীতি পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু ভাষা-শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে একথাটা সর্বাংশে সত্য। দ্বিতীয় বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্র, নন্দলাল কিন্তু জন্মাননি। তেমনি অপূর্ণ থেকে যাবে বিশ্বভাষার ভীষ্ম পিতামহ, ভারতীয় ভাষাসমূহের নাড়ীনক্ষত্র বিশারদ, এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষার উৎসসন্ধানী তথা অমলয় ও কোটী প্রস্তুতকারক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে সৃষ্ট শূন্যস্থান। এ ক্ষতি সত্যিই অপূরণীয়; এ শূন্যতার পূর্ণত্ব কখনো হবার নয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে যে সব মহীরুহ বঙ্গভূমির বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন একে একে তাঁদের সবারই প্রায় পতন ঘটেছে। এখন লতা-পাতার ঝোপঝাড়ে চারদিক আচ্ছন্ন। সেগুলি বাঘ সিংহের বসবাসের অনুপযোগী। তাদের আকাশভেদী গর্জনের বদলে বজ্জাত মশককুলের বিরক্তিকর কলরবে সর্বক্ষণ মুখরিত।

অমৃতলোকবাসী ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের অবিনশ্বর আত্মার-প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি।

আজকাল তরুণ গল্প লেখকরা নিটোল গল্পরচনায় প্রায়শ সমর্থ নন—প্রভাস ভদ্র এই সাধারণ অভিযোগের জলন্ত জবাব। ইতিপূর্বে 'গল্প দশক' 'সময়ের কণ্ঠস্বর' 'গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থে একাধিক গল্প সংকলিত হওয়ার পর তার কয়েকটি অসাধারণ গল্পের সংকলন 'স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রতি প্রকাশিত।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেন, লেখাটা প্রভাসের কাছে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের মত জরুরী ব্যাপার। তার চেয়েও জরুরী ব্যাপার, কিছু বলা। তিনি কিছু বলতে চান।···গল্পগুলো না পড়লে বাংলা গল্পের এই হতাশা-ব্যঞ্জক উচ্ছৃংখল রাজ্যেও যে অনেক সত্যিকার নিষ্ঠা কাজ করছে, টেরই পেতাম না।

# স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী | প্রভাস ভদ্র

সাপ্তাহিক 'দেশ' মতে, প্রভাস ভদ্র লেখক হিসেবে তরুণ হলেও শিল্পের একটি চরম কথা জেনে গিয়েছেন···বোঝা গেল তিনি গল্পের বক্তব্যেও বিশ্বাসী। এই সংকলনের প্রতিটি গল্পেই সে বিশ্বাসের প্রমাণ রেখেছেন।

সাপ্তাহিক 'অমৃত' মতে, তরুণ জীবনের বেকারী ও অন্যান্য জ্বালা যন্ত্রণা গল্পগুলির মূল বিষয়···তা ভালভাবেই ফোটাতে পেরেছেন লেখক। লেখারও রীতিমত মুন্সিয়ানা আছে। সেই সঙ্গে আছে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য। 'দৈনিক বসুমতী' মতে, লেখক যথেষ্ট পরিচিত না হলেও এই গল্পগুলির মধ্যে তাঁর মুনশীয়ানা ও প্রতিভার পরিচয় তাঁকে নিঃসন্দেহে খ্যাত করবে।

এবং প্রভাস ভদ্র বলেন, বক্তব্য বলতে যা কিছু আমার গল্পতেই। লিখেছি এবং লিখছি নিজের তাগিদেই।

---

লিপিকা ৩০/১-এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

## এখন আমি/ফিরোজ চৌধুরী

এখন আমি কিছুই দেখতে পারছি না
এখন আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না
এখন আমি অসম্ভব আত্মমগ্ন
এখন তোমরা আমাকে বিরক্ত কোরো না

হাওয়ায় শীতের মৃদু তাপ ছড়িয়ে পড়ছে
ধূপদী আকাশ কী অসহ্য নীল
বোধহয় এই একমাত্র সঠিক সময়
চারদিকে চোখ মেলবার
অথচ আমি কিছুই দেখতে পারছি না
কিছুই শুনতে পাচ্ছি না

এখন আমি অসম্ভব আত্মমগ্ন
এখন তোমরা আমাকে বিরক্ত কোরো না

## কবিরা এসো/মন্মথনাথ সামন্ত

আমি চাই উদ্দাম স্বাধীনতা
ঝোড়ো সমুদ্রের মুখে, শিমুল তুলোর মত
সাহসীমন্ত্র বুকে নির্জনতার দ্বীপে ভেসে যেতে,
সেখানেই তুলোর ভেতর থেকে খসে পড়বে আত্মগোপন কারী বীজ,
তারপর একদিন কোন সুন্দরী বকের
শুভ্রপালক খসে খসে পড়বে, নিগূঢ় কান্নায়,
নির্জন দ্বীপের উপর নদী বয়ে যাবে, জন্ম নেবে ভ্রূণ,
এভাবেই সৃষ্টি হবে বাড়তি উত্থান।
তখন পারোতো কবিরা এসো, এবং উজাড় করে বুক
শুনিয়ে যেও সুখ কিংবা দুঃখ থেকে
মানুষকে ভালবাসার গান।

রোজ রোজ যেমন আমি, তেমনি এলাম
সেই ঘর, যেখানে যা তেমনি
প্রমাণসই আয়নার সামনে অভিজাত প্রসাধনী
টবে চিরহরিৎ দ্রষ্টব্য ক্যাকটাস
ফুলদানী থেকে উড়ে উড়ে ঘরময় জমে আছে
রজনীগন্ধার গন্ধ
টেবিল-শোভা কাঠ-কুটুম
এ্যাটলাসের মতো কাঁধে নিয়ে অনন্ত নক্ষত্র বীথির পাতাবাহার যেমন
রোজ রোজ এই সব দেখি
তেমনি দেখলাম

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, চারদিকে স্তব্ধ নির্জনতা
দরজা তেমনি ভেজানো
বাইরে স্থির গৃহগতপ্রাণ গাড়ী নিয়ে গৃহস্তের ব্যস্ততা
কাঠের চেয়ারে অতি অভ্যস্ত আমার বসে থাকাও তেমনি অপরিবর্তিত
কেবল শয্যায় যেখানে তোমার এ সময়ে শুয়ে থাকার কথা
সেখানে, এই এখন
খোলা জানালা গলে এসে
ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসা বিশ্রামের শোয়া শুয়ে আছে
বেলাশেষের এক ছোপ আলো

আমাদের যা ছিলো বাস্তব ক্রিয়াকলাপ
আমাদের যা ছিলো উজ্জ্বল ব্যবহারিক বিস্ময়
সেই সব অনুভব
তোমার পুরুষ্ট ঠোঁটে সংবদ্ধ আমার পিপাসার্ত অস্তিত্বের আবেগ
তোমার স্তন যোনি তোমার সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ— তোমার জীবনে
আমার জীবন

এক ঐশ্বরিক সম্মেলনে
পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের হারিয়ে যাওয়া
না—
সব মিথ্যা
পৃথিবীতে একটা নিষ্ঠুর প্রথাই কেবল সত্য

আলো মরে গেছে
অন্ধকারে তোমার সমগ্র শরীরের রক্তমাংসের চেয়ে সত্য হয়ে থাকছে
আমার একান্ত ব্যক্তিগত জীবন শিল্পের মায়া ॥

## অনিবার্য কেউ/মুকুল চট্টোপাধ্যায়

নির্ঘাত অতিরিক্ত কেউ এসেছে উৎসবে, মঞ্চে
নির্ঘাত অতিরিক্ত শকুন নেমেছে ভাগাড়ে—
তাই, আঁশটে গন্ধের এত অংশীদার
তাই, ব্যতিক্রমের যন্ত্রণায় এত লোভ।

নিশ্চিত অতিরিক্ত কেউ এসেছে বিহারে-ব্যবহারে
নিশ্চিত এ শহরে কেউ ভাগ্যের সন্ধানে এসেছে
নিশ্চিত অতিরিক্ত মাছি উড়ে এসেছে ক্ষত স্থানে
তাই, এক যন্ত্রণা থেকে আর এক যন্ত্রণায় চলে যাওয়া
তাই, খণ্ড ঈশ্বর খোঁজে পাথর প্রতিমা
তাই, মূর্তি খোঁজে, যজ্ঞ, পুরোহিত……,

নির্ঘাত নক্ষত্রের দায়ীত্বে আকাশ আহত
নির্ঘাত কেউ বনবাসে যায় নি
নিশ্চিত ঈশ্বর কোন অতিরিক্ত কল্পনা—,

## রিণি, প্রতিশ্রুতি শুধু তোমাকে ঘিরে/অনিরুদ্ধ গুপ্ত

রিণি, এ আমার শেষ প্রতিশ্রুতি
অথবা এই হ'লো আমার আরম্ভ
ফেলে আসা লাভ ক্ষতি
দ্যাখো আমি কেমন জাগর-নিদ্রা জানি
প্রতিক্ষণ গলে যৌবন দাহে
অন্ধকার ঘরে বাতি জ্বালি

তবু মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে
মুহূর্তের উন্মীল স্মৃতি দুঃখ-শোকে
জ্বলে উঠে বর্বরতার অভীপ্সায়
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় অনিশ্চয়তায়

তবু ফিরে যাই তোমার কাছে
যেন অশ্রুত নামে যাই ফিরে
অপ্রতিরোধ্য অত্যন্ত সংবৃত নগ্নদেহে
রিণি, প্রতিশ্রুতি শুধু তোমাকে ঘিরে।

## সুকান্তের কাছে/অলোক দাস

এখনো মানুষের জন্য প্রস্তুত হয় নি মৃতসঞ্জীবনী
বিশল্যকরণী আমি চিনিনা এখনো
তবু মৃত্যুর নাড়ী ধরে বলে দিতে পারি
এ মরণ সুখী নয় কেন।
শিউলীর বন্যা এলে শরৎবাতাসে
চাঁদের জ্যোৎস্না হাসে, তারা কথা কয়
রৌদ্রের লাল আভা জানলায় পড়ে ;
কবি ছাড়া বিপ্লব বাঁচেনা কখনো
সুরার নরম নেশা চেনাতে পারে না কেউ
কবির দু' চোখে শুধু স্বপ্নের রুমাল ওড়ে
কেশে কেশে রক্তের নদী বয়ে যায়।

এ যুগ পেরুলে পরে সামনের যুগে
সমুদ্র মন্থন করে আমি আনব অমৃত
দীর্ঘজীবি কবির মিছিলে
একে একে মারব সব কীট।

**এইতো জীবন যাপন/সন্তোষ মণ্ডল**

হাতের সুখে গড়া
পায়ের সুখে ভাঙা যে খেলাঘর
সেখান থেকে অনেক···অনেক দূরে
এখন ছোট্ট একটা ঘর একটি বসন্ত
যে বয়েসে বসন্তেরা ভুল করে মিলোতে চায় নিসর্গ
এবং শরীরের উষ্ণতায় রক্তক্রীড়া করে রুপালী উড়াল মাছ
এইতো জীবনযাপন
রক্তমহলের ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত পিপাসার পাঁচ রঙে
রাঙা হয় জন্মের অলৌকিক মুখ
মৃত্যুরও মৃত্যু হলে জন্ম নেয় জীবন
আবার ফিরে আসে কিছু কিছু হৃদয়বৃত্ত
আবার ঝড় ওঠে, ভাঙচুর হয় জীবনযাপনের আসবাব
ছুটে আসে মহাজাগতিক রথ
যার ঘড়ি ধরে উঠে যাওয়া যায় মধু মৈনাকের দিকে
যে নির্জনতায় খুঁজে পাওয়া যায় হিরণ্ময় দিন রাত্রি
জীবনযাপনের।

**এখনই সময়/নিবেদিতা চক্রবর্তী**

আর কতকাল প্রাচীন বল্কলে
থাকবে লুকিয়ে
এখন এসো, এইতো সময়
বহুকাল আগে জল নিয়ে রমণীরা ফিরেছে নীড়ে
নদীর বুকে স্নান করে ফিরে গ্যাছে ক্লান্ত সময়।
এখনই এসো,
প্রাচীন বল্কল খুলে পরো নতুন উত্তরীয়।

## সেই সব প্রিয়তম শাশ্বত দিন/নীতীশ চৌধুরী

নদীতে বৃষ্টির মত মাঝে মাঝে রক্তে এসে জমা হয় প্রিয়তম দিন,
মানুষ যত্ন করে ধরে রাখে তাকে,
বুকে করে হেঁটে যায় আরও কিছু দিন কিংবা রাত।
কখনও মধ্যরাতে
হৃদয়ে মেঝে ঠুকে তারা বলে ওঠে—আমি
এখনও এখানে আছি যেমন ছিলেম।

মানুষের মৃত্যু হলে সেই সব প্রিয়তম দিন
সমাধির পাশে
চিরকাল ঘেউলে হয়ে থাকে।

## এবং সে/কালীনাথ দাশ চাকলাদার

কোনও একদিন সকালে দরজা খুললে
সোনালী রোদ গান শুনিয়ে-চ'লে যায়।
খুঁজে বেড়াই তার মিষ্টিগলা
ব্যাকুল আঁখি আরও কি?।

আরও একদিন দেখি
সোনার মাঠ ভ'রে গ্যাছে সোনালী রোদে।
জানালা দরজা খুলে দিয়ে
দেখা হোতেই দুই বাহুর সন্ধিক্ষণে পাঠ।
তারপর
অধরে অধর এবং স্পর্শ চুম্বন।
ক্ষণিকের ছোঁয়াতেই
এমিভাবে বেঁচে আছি আমি এবং সে।

## কবিকে পাবে না/রঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন পুরুষ, তাকে ঘিরে চাপা উত্তেজনা, সে কেন নীরব এত ?
কম্পিত পত্রকার, তাহলে উপায়
একে নিয়েই তো কবিতা লেখার কথা ছিলো, তাহলে উপায়
উৎসাহীজনেরা ছবি তুললো পটাপট—সমস্ত শরীরে জলরঙ মেখে
দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পুরুষ।
শহরে বালিয়াড়ির তটে আছড়ে পড়লো তাজা বন্দুক ও ফুলদানীর অনুষঙ্গ।
দার্শনিকের দু'একটা কাঁচা চুল পেকে উঠলো রাতারাতি
নির্জনতা ও মানবিক অবক্ষয় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে ঠাণ্ডা কফি খেলেন,
রেকর্ডারে গান বাজলো, 'এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে…'
ক্রীতদের ভেতর থেকে চিৎকার ক'রে উঠলো পুষ্টিকর ভিটামিনের
কঙ্কাল, 'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।'

সন্ধ্যেবেলায় রঙীনমানুষের ভিড়ে জমে উঠলো
ইকেবানা ও বাটিক প্রদর্শনী।
হোটেলরেস্তোঁরায় বেজে উঠলো পপ কনসার্ট
জ্যাজ সেসনে পা মেলালো মেয়ের দল, টেবিলের ওপর
ঠক্ ক'রে বীয়ারের গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়ালো একজন যুবক,
বললো, 'অপ্রেমের শীতে আর কাঁপতে পারি না' হাঁটুমুড়ে
প্রেম ভিক্ষা করলো।

ম্যাজিকের আসরে এক দৈত্য হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে
ক্রমশ দীর্ঘায়িত হতে হতে একসময় গিলে ফেললো ম্যাজিকঅলাকেই।
এরকমই আরো কত কী হ'লো কিংবা হচ্ছে যেমনটি হ'য়ে যায়—
বাগান থেকে কাঠচাঁপার গন্ধ ভেসে আসে,
মৃদু ও কর্কশ দু'রকম শব্দে সামাজিক পদাবলী পাঠ হয়,
নারী-স্বাধীনতার নামে কোথায় কোন্ মেয়ে আগুনরঙা শাড়ী দিয়ে
বেঁধে রেখেছে চারটে দমকল।

আসলে কেউ জানে না, অনুশাসন পর্ব চলছে —
সব আহ্লাদ গায়ে মেখে এইখানে দাঁড়াবেন জীবনদেবতা
বন্দনাগান হবে, এইখানে রাতভোর অর্চনা হবে, অতএব

বৃথা প্রশ্ন, সে কেন নীরব এত, বৃথাই কম্পিত পঙ্কজার, নির্জনতাহীন
এসবের অন্য নাম সামাজিক নক্র উৎসব, কবিকে পাবে না এইখানে।

## আমি নীল জলপরী নই/রমা ঘোষ

অধরে তোমার রক্তের মাদক গন্ধ
কেঁপে উঠি।
বালিয়াড়ি ছেয়ে সামুদ্রিক ঘুন ঘাস
জাহাজডুবির ঘোর সম্ভাবনা ডাকে নিদারুণ।
আমি নীল জলপরী নই, মৎস্যবালিকা নই
পৃথিবীর রূপময়ী
অতল বিজনে নেমে যাই।
উপকূল বৃক্ষরাজি গ্রাম ও নগর ভেঙে পড়ে
আত্মসমর্পণে তছনছ বিন্দুকে গোপন সুখ।

## অপ্রকাশিত কবিতার…/নীতিশ বসু

অপ্রকাশিত কবিতার অহরহ চিৎকারে ঘুম আসে না
দেয়াল ফেটে চৌচির হয়
গোপনে কাঁদে কখনো শিশুর মত
তবু তুমি হাসো কবি
ওই দাঁড়িয়ে থাকা ভিখিরীর মত।

কবিতা এখন আসেনা আর সকালে বিকেলে কী
গভীর রাতে
অথচ তুমি এখনো বেঁচে আছ কবি
অপ্রকাশিত কবিতার সঙ্গী হয়ে।

## ঝেল্লা/দেবপ্রসাদ মিত্র

তোমার কাছেই ফিরে আসি আবার
যে তুমি জানো হরণমন্ত্র নিবিড় অন্ধকারের
রাখো আমন্ত্রণের অক্ষয় অমল সাঁকোয়

অনেক অদর্শন পার হয়ে ফিরে আসি
তোমার সাগর ঘেরা দ্বীপে
যেখানে অলৌকিক আঙুল মুছে দেয়
জটিল সময়ের দাগ। যেখানে তুমি
সিন্ধুকে রাখো আমার বিভঙ্গময় দিন।

## বসন্তকে বলে দিও/সুধাময় মুখোপাধ্যায়

অস্তিত্বের পরমাণু নিঃশেষিত দিনান্ত বেলায়
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি অনন্ত দুঃখের বোঝা নিয়ে,
অনেক দিনের পথ একাকী করেছি অতিক্রম,
হয়তো কোথাও আছে শান্ত কোনও স্নিগ্ধ মহাদেশ।
আমাকে একান্ত করে স্বপ্ন দেবে দুটি হাত ভরে,
বলেছিল উড়ে আসা প্রেম নামে চঞ্চল পাখিটা,
সোনালী ডানায় সেই পাখিটাকে বন্দী করে রাখি
এমন সামর্থ্য নেই বং ওঠা এ্যানিমিক দুর্বল হৃদয়
বার বার প্রত্যাহত আমার সে উত্তুঙ্গ বিশ্বাস,
বার বার রক্ত ঝরে আমার ঠোঁটের সীমানায়
অভ্যাসের দাসত্বেতে দিন গেল দুর্মর খেয়ালে,
তবু যেতে চাই আজ অন্য কোনও সুস্থির আকাশে।
প্রিয়তমে সুরঞ্জনা। এর বেশী কিইবা
লেখার আছে বলো।
বসন্তকে বলে দিও, তার জন্যে কোনও ঘর নেই।

## পিকনিক/প্রদীপ রায়চৌধুরী

ছায়া জড়ানো মৌরুসী আকাশের নীচে
সারাদিন আঁচলছড়ানো এক সোহাগী পিকনিক
প্রাণবন্ত ছিল শুধু গৌণ শব্দের ভীড়ে
নারকেল গাছের আড়ালে শুয়ে ছিল

বিবর্ণ ওঁটির ক্ষেত শিশিরের জালে
তেমন কোন কথা ছিল না
প্রাচীন বটগাছের পিছনে সূর্য ডুব দিলে
সোনালী আলোয় ভেসে যাবে থৈ থৈ দিগন্তের আকাশ
তেমন কোন কথা ছিল না
সূর্য ছলকে যাওয়া তোমার শতাব্দী মুখ
আর্তপাখির মতো অমন নিবিড় করে
তুমি যে তাকাবে
সকালের রোদ্দুরেও তেমন কোন কথা ছিল না
ঈষৎ কেরানো সেই গাঙ্গশালিক চোখ বিবশ গ্রীবার বাঁক
আঁচল-খসা কাঁধের অমলিন স্নিগ্ধতায়
ফুটে ওঠে ব্রহ্মাণ্ডের বহুপ্রতীক্ষিত আশ্চর্য ছবির আদল
শব্দের ভিতরে স্থির হয় শব্দের ব্রহ্মনাদ
গাঢ় অন্ধকারে ফিরে এলে নিজের দাওয়ায়
সকলে শুধোয়—পিকনিক কেমন হোলরে অমল
দীর্ঘবেলা পার হয়ে অন্ধ কুয়াশায় জেগে ওঠে
সেতুবন্ধে জীবন প্রতিমা
দশ আঙুল মুঠো খুলে শান্ত স্বরে বলি—তেমন কিছু নয়
তবু সারারাত বুকের মধ্যে মোহিনী জাহাজ দোলে—
ওকি তবে তেমন কিছু নয়

চিরমাস্না/ধ্রুব বসু

আপাদ মূল চায় অলৌকিক জল
স্বগত মননে ব্যাপ্ত আশ্চর্য বেদনা,
এ আশ্চর্য বেদনা আমি কার হাতে দেব অর্কিয়ুস ;
নারীর ভিতর পাপ : মানুষের ভিতর ঘৃণ
রোদের ভিতর ছায়া বাড়তে বাড়তে
গ্রাস করে বিশল্যকরণী,
এ আশ্চর্য বেদনা আমি কার হাতে দেব অর্কিয়ুস ?

বিলোম লৌকিকে
শীতল বাতাস এসে
সমস্ত রূপালী-পালক খসিয়ে নেয়,
মৃত্যু তার ভারী পা ফেলে হাঁটে
দ্বিধাজীর্ণ চৈতন্য ও সত্তায়,
শিরায় যার সংক্রান্তি
রক্তে যার ফেনাগ্রসঞ্চার
শূন্যে করক্ষেপ করে সে তবু
ছেনে আনে মোহিনী শূন্যতা,
এ আশ্চর্য শূন্যতা আমি কার হাতে দেব অকিঞ্চন ?

## যেদিকেই যাই/অজিত বাইরী

যেদিকেই যাই, ওই যে নদী, ব্রিজ, ওপারে নাটমন্দির
পাকুড়ের সবুজ চূড়া, আকাশ মাটির মায়াময় সংসার ;
মুগ্ধ বালকের মতো যখনই ফিরিয়েছি চোখ, দশদিগন্ত
কঠিন ভর্ৎসনায় তুলেছে তর্জনী—তুমি এর যোগ্য নও।

পাহাড়ের পাদদেশে, কোমর জড়িয়ে উঠেছে নিবিড় অরণ্য
পাখপাখালির অদ্ভুত সঙ্গীত তরঙ্গে মুখরিত বাতাস ;
সর্পিল রাস্তার পিছল সোপান বলেছে ইঙ্গিতে —এগিয়ো না পায়।
সমুদ্র কিনারে বসেছি নির্জনে, পাড় ভেঙে ছুটে এসেছে ঢেউ
জোয়ারের জল ছুঁয়েছে ওষ্ঠ, লবণাক্ত এ জলে মিটবেনা তৃষ্ণা—
এই বলে, সৈকতে ফেলে হাঙরের হাড়, ফিরে গেছে সমুদ্র।

যেদিকেই যাই, কোনখানে পাই না আন্তরিক উষ্ণ আতিথ্য ;
এমন-কি ঘরে ফিরলেও, অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত ভেবে
সমূহ আসবাবপত্র—খাট টেবিল চেয়ার আলমারি
স্বহস্তে সাজানো যাবতীয় গৃহস্থালি
হো-হো শব্দে হেসে উঠে, বিদ্রূপ-বাণে করে আমূল—বিদ্ধ।

## বীজ-গণিত/অশোক পোদ্দার

একটা নাম দেয়া দরকার
তাই মানুষের নাম রাখা হয়েছে- মানুষ।
মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার
তাই তার জন্য নির্মিত হয়েছে ঘর বাড়ী প্রাসাদ।
প্রজননের জন্য একটি নারী প্রয়োজন
তাই তার নাম—ভালোবাসা।
ভালোবাসার জন্য আবশ্যক
একটি রাত—একটি তৃষ্ণার্ত বিছানা।
এই একই পদ্ধতিতে নির্বিকল্পকরণ—পৃথিবীর জঠর হতে
প্রতিটি বীজ কেটে বেড়িয়ে আসছে, মানুষ।

## ফুল/দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

হে ফুল, কোথায় তুমি ?
সকলের বেলা এলে মৌমাছি লুঠে নেয় সব—
রং মাজি ঢং হাসি
হায় কালবেলা !
এনামেল মুখের মিছিলে
ঢেকে যায় ঘর-বাড়ী দরজা জানলা
কঠিন তুষারপাতে মোছে সবকিছু
থাকে আলো-হাওয়াদের ভুল— ফুল।

## মৃত্যুর প্রার্থনা/স্বপন কুণ্ডু

যে চোখে দেখেছি অসংখ্য শবের মিছিল
দুঃখ ক্ষুধা কান্নার করুণা ভেজা হৃদয় প্রণতি
এই চোখ তুমি উপরে ফেলো মা।
যে বুকে আমার হাজার যন্ত্রণা—কীটের দংশন
আমার সে 'পৈতৃক ক্ষত' তুমি উন্মূলন করে দিও।

তুমি কথা দাও মা—
আমি এ কুড়ির যুবক
তোমার পঞ্চাশের শীর্ণ বাহুতে মাথা রেখে
মরে যাবো
এই গোধূলি-হেমন্তে।
নিজের কদর্য মুখ দেখতে আমার ঘেন্না করে, মা।
ও মুখে কি আগ্রাসী অন্ধকার
রক্ত চোষা বাদুড়ের মতো ঝোলে
কি ক্রূর লোভে
কি বেহায়া বজ্জাতি—
আমার কুড়ি বছরের ধমনীতে নৃশংসে মৃত্যু ঢুকে গেছে।
তবুও মৃত্যুর আগে
অন্তত একবার আমি প্রদীপ্ত হবো
একবার উজ্জ্বল চোখ মেলে চাইবো
পঙ্গু ঠোঁট খুলে
আমি একবার বলে যাবো শুধু :
মৃত্যু এক নীলাভ অন্ধকার
মৃত্যুর মতো পবিত্র শান্তি কিছু নেই।

তুমি কথা দাও মা—
আমি এ কুড়ির যুবক
তোমার পঞ্চাশের শীর্ণ বাহুতে মাথা রেখে
মরে যাবো
এই গোধূলি-হেমন্তে।

# পরম আনন্দ

ক্যাথারীন ম্যান্সফীল্ড

অনুবাদ : চঞ্চল ঘোষ

[ ক্যাথারীন ম্যানসফীল্ড ১৮৮৮ সালে নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েলিংটন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চতর পড়াশোনার জন্য ইংল্যাণ্ডে আসেন। 'দি নিউ এজ' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। তাঁর প্রথম বই 'ইন এ জারমান পেনসান' ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়, পরে 'রীদম' নামে তাঁর একটি উপন্যাসের প্রকাশক মিডলটন মারেকে বিয়ে করেন। পরবর্তী লেখাগুলির মধ্যে কর্ম এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে নানা রকম পরীক্ষা নিরিক্ষা করেন। এর ফলে তিনি এক দুর্লভ টাইলের প্রবর্তন করেন। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে পরবর্তী দিনগুলো ভগ্ন স্বাস্থ্যের উদ্ধারের আশায় বহু জায়গায় ঘুরে বেড়ান, ১৯২৩ সালে তিনি মারা যান, ব্লিশ নামক গল্পটি তাঁর দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ]

যদিও বার্থা ইয়র্জের বয়স তিরিশ তবুও এখনো কখনো সখনো এমন মুহূর্ত আসে যখন তার হাঁটার চেয়ে দৌড়োতেই বেশী ইচ্ছে করে শান বাঁধানো রাস্তায়, কখনো এদিকে কখনো ওদিকে পা ফেলে-ফেলে নাচের ভঙ্গিতে চলতে, হঠাৎ একটা ঘুরপাক খেয়ে নিতে উপরে কিছু একটা ছুঁড়ে দিয়ে পরক্ষণেই সেটা লুফে নিতে, কিংবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অকারণ ফুর্তিতে হেসে উঠতে—অকারণে, একেবারেই অকারণে।

কি করতে পারো তুমি, যদি বয়স তোমার তিরিশ হয় আর তোমার বাড়ির রাস্তার মোড় ঘুরতেই হঠাৎ অপূর্ব এক আনন্দ তোমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফ্যালে—পরম এক আনন্দ।—যেন তুমি পড়ন্ত বিকেলের সেই উজ্জ্বল সূর্যের একটা টুকরো হঠাৎ গিলে ফেলেছো আর তোমার বুকের মধ্যে জ্বলতে জ্বলতে

তা প্রত্যেকটি বস্তুর উপর স্বর্গীয় মতো অজস্র স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছে—ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকটি হাতের আঙুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত।

ইশ, এমন কি কোনো উপায় নেই যাতে মস্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল না হয়েও তাকে প্রকাশ করতে পারো? কি নিরেট বোকামী এই সভ্যতা ব্যাপারটা! এই শরীরটা কেন দেয়া হল যদি তাকে দুষ্প্রাপ্য একটা বেহালার মতো সর্বদা বাক্সবন্দী করেই রাখতে হয়।

'না ঐ বেহালা সম্পর্কে আমি ঠিক এ কথা বলতে চাইনি,' দৌড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে আর ব্যাগের মধ্যে চাবিটা হাতড়াতে হাতড়াতে—সেটা অবশ্য যথারীতি সে ভুলে ফেলে এসেছে—আর চিঠির বাক্সটা খট খট করতে করতে সে ভাবলো,

'ঠিক এ কথাটা বলতে চাইনি আমি—ধন্যবাদ, মেরী'—হলঘরটায় ঢুকলো সে 'এই ফিরেছে?'

'হ্যাঁ মা।'

'আর ফলগুলো এসে গেছে!'

'হ্যাঁ, সবকিছুই এসে গেছে,'

'তাহলে ফলগুলো খাবার ঘরে নিয়ে এসো, কেমন? উপরে যাবার আগে বরং আমি ওগুলো গুছিয়ে রাখি।'

খাবার ঘরটা আধো অন্ধকার আর বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বার্থা কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেললো, এই আঁটো বন্ধন সে যেন আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছিলো না। এবার তার বাহুতে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পেলো সে', কিন্তু তার বুকের মধ্যে তখনো সেই দীপ্তশিখার আগুন জ্বলছিলো—ছোটো ছোটো অজস্র স্ফুলিঙ্গ স্বর্গীয় মতো অবিরল ঝরে পড়ছিলো সেখান থেকে, প্রায় অসহনীয় মনে হচ্ছিল তার, এই দীপ্তি আরও ঊর্ধ্বমুখী হবে—এই ভয়ে সে যেন নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত পারছিলো না, এবং তা সত্ত্বেও জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো সে অত্যন্ত গভীর ভাবে। শীতল আয়নাটার দিকে তাকাতেই সে ভয় পাচ্ছিল কিন্তু তবু তাকালো, আর আয়নায় যে দীপ্তিময়ী নারীর ছবি ফুটে উঠল, তার সহাস্য কম্পিত ঠোঁটে, বড়ো বড়ো কালো দু-চোখে যেন আলো ঝরছে, তার সমস্ত সত্তা উন্মুখ হয়ে কি যেন শুনছে, যেন কোন স্বর্গীয় সংঘটনের প্রতীক্ষা করছে সে, সে জানে যে তা ঘটবেই। নিশ্চিতভাবে ঘটবে।

মেরি ট্রেতে করে ফলগুলো নিয়ে এলো, একটা কাঁচের বাটি আর ভারী

সুন্দর একটা নীল থালাও সে সঙ্গে নিয়ে এলো। থালাটার থেকে অদ্ভুত একটা জেল্লা ফুটে বেরোচ্ছে —যেন সেটাকে দুধে ডুবিয়ে আনা হয়েছে।

"আলোটা কি জ্বেলে দেব, মা ?"

"না, অনেক ধন্যবাদ। এমনিতেই আমি বেশ ভালো দেখতে পাচ্ছি।' ট্রেবেরীর বেগুনি ছোপ লাগা আপেল আর কমলালেবু ছিল ট্রেতে আর ছিলো রেশমের মতো মসৃণ হলুদ নাশপাতি। আর রুপোলী আভা জড়ানো কিছু সাদা আর বেশ বড়ো এক গুচ্ছ লালচে বেগুনি রং-এর আঙুর।

শেষেরটা তার খাবার ঘরের নতুন কার্পেটের রং-এর সংগে খাপ খায় বলে কিনেছিলো সে। কথাটা ভীষণ বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে—কিন্তু সত্যি সত্যি সে ওগুলো ঐ কারণেই কিনেছিলো। দোকানে গিয়ে তার মনে হলো 'আমাকে ঐ লালচে বেগুনি রংএর গুলো কিনতেই হবে, তাহলে কার্পেটটা বেশ টেবিল অবধি টেনে আনা যাবে' আর কথাটা তখন কিছুই অদ্ভুত মনে হয়নি তার কাছে।

যখন তার গোছানো শেষ হলো আর এই উজ্জ্বল গোলাকার বস্তুগুলো দিয়ে দুটো পিরামিড রচিত হলো, তখন, ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ালো—দূরে দাঁড়িয়ে তাই সে দেখতে লাগলো, আর সাজানোটা সত্যই অদ্ভুত ভালো হয়েছিলো। কালো টেবিলটা যেন মিশে গিয়েছিলো সেই নিলাভ আলোয় আর কাঁচের পাত্র আর নীল থালাটা যেন হাওয়ায় ভাসছিলো। বলাই বাহুল্য, বর্তমান মানসিক অবস্থায় সমস্ত দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর মনে হচ্ছিলো তার ··সে হাসতে শুরু করলো।

'না, না, আমি হিষ্টিরিয়া গ্রস্থ হয়ে পড়ছি', তাড়াতাড়ি তার ব্যাগটা আর কোটটা টেনে নিয়ে সে এক দৌড়ে উপরে উঠলো, তার পর বাচ্চার ঘরে ঢুকলো।

ধাই-তখন ছোট্টটির স্নানের পর তাকে একটা নীচু টেবিলে বসিয়ে রাত্রের খাবার খাওয়াচ্ছিলো। বাচ্চাটির পরনে একটা শাদা ফ্লানেলের ফ্রক আর নীল পশমের জামা আর তার কালো, ফুরফুরে চুলগুলো আঁচড়িয়ে একটা মজার ঝুঁটি বাঁধা। সে চোখ তুলেই মাকে দেখতে পেলো আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করলো লাফালাফি।

'এ রকম করে না সোনা, লক্ষ্মী মেয়ের মতো সবটুকু খেয়ে নাও তো।' ধাই বলে উঠলো, তার চাপা ঠোঁটদুটোর পরিচিত ভঙ্গি দেখে বার্থা বুঝতে পারলো

যে, এর মানে হচ্ছে—আরো একবার নিতান্ত একটা অসময়ে সে বাচ্চার ঘরে এসে পড়েছে। 'ধাই, ও বেশ লক্ষ্মী হয়ে ছিলো তো?'

'সমস্ত বিকেলটাই খুব লক্ষ্মী সোনা হয়ে ছিলো, ফিসফিস করে ধাই জানালো, 'আমরা একটা পার্কে গিয়েছিলাম আর আমি একটা চেয়ারে বসে-ছিলাম ওকে প্র্যাম্ থেকে তুলে নিয়েছিলাম, এতবড়ো একটা কুকুর এলো আর আমার হাঁটুতে মাথা রাখলো ও তার কানদুটো মুঠো করে ধরে টানতে লাগলো, ইশ তখন যদি ওকে একবার আপনি দেখতেন!'

বার্থার একবার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হলো যে, একটা অজানা-অচেনা কুকুরের কান মুঠো করে ধরাটা কি একটু বিপদজনক নয়। কিন্তু সাহস হোলো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তাদের লক্ষ্য করতে লাগলো, তার হাত দুটো দু পাশে ঝোলানো, পুতুল হাতে নিয়ে বসে থাকা বড়লোকের বাচ্চা মেয়ের সামনে একটা গরীব বাচ্চা মেয়ে ঠিক যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাচ্চাটি আবার চোখ তুলে তাকালো, তাকিয়ে রইলো, তারপর এত মিষ্টি করে হাসলো যে বার্থা আর থাকতে পারলো না, চেঁচিয়ে উঠলো 'না ধাই বাকিটা আমিই ওকে খাইয়ে দিচ্ছি। তুমি বরং ওর স্নানের জিনিশগুলো সরিয়ে নাও।'

'দেখুন মা, খাওয়ার সময় ওকে হাত বদল না করাই ভালো,' যথারীতি ফিসফিস করে ধাই জানালো, 'তাতে ও চঞ্চল হয়ে পড়ে। এ রকম করলে ও বিগড়ে যাবে।'

সমস্ত ব্যাপারটাই ভীষণ বাজে। বাচ্চা হওয়া কেন, যদি তাকে দুষ্প্রাপ্য বেহালার মতো সযত্নে আড়াল করে না রেখে সদাসর্বদা অন্য একজন মহিলার হাতে ছেড়ে দিতে হয়?

'বলছি আমাকে দাও'। চেঁচিয়ে উঠল সে।

অত্যন্ত আহত হয়ে ধাই বাচ্চাকে তার হাতে তুলে দিলে।

'যাই হোক, খাওয়ার পর ওকে বেশী প্রশ্রয় দেবেন না। আপনার তো আবার এরকম একটু অভ্যাস আছে, মা। আর তারপর ওকে নিয়ে আমাকে যা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়।'

ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ। স্নানের তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে ধাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। 'সোনামণি, এখন তুমি শুধু আমার' তার বুকের মধ্যে এলিয়ে থাকা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো বার্থা।

পরমানন্দে খাচ্ছিলো সে, মুখ তুলে চামচের জন্য ঠোঁট ফাঁক করছিলো

আর তারপর প্রবলবেগে হাত নাড়ছিলো কখনো-আবার চামচটাকে কিছুতেই ছাড়ছিলো না, কিংবা কাঁটা চামচেতে খাবার তোলা মাত্র হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলো।

খোলটা শেষ হবার পর বার্থা আগুনের দিকে একটু ঘুরে বসলো। 'লক্ষী মেয়ে, আমার সোনা মেয়ে,' সেই উষ্ণ ছোট্ট শরীরে চুমু খেতে খেতে বলতে লাগলো সে, 'আমি কত ভালোবাসি তোমাকে, ভীষণ ভালবাসি।'

আর, সত্যিই ছোট্ট বি-র প্রতি ভালোবাসায় তার হৃদয় ভরে উঠেছিলো—যখন সে সামনে ঝুঁকে পড়ছিল তখন তার ঘাড় আর আগুনের আভায় উজ্জ্বল ঝকঝকে পায়ের আঙুলগুলো দেখতে দেখতে ভালোবাসায় অধীর হয়ে উঠছিলো সে, আর এই অনুভূতির সঙ্গে-সঙ্গে তার সেই পরম সুখবোধ আবার ফিরে এলো। আর আবার সে ভেবে পেলো না এই তীব্র সুখ সে কী ক'রে প্রকাশ করবে—কি করে সে এখন একে নিয়ে।

'আপনার টেলিফোন এসেছে' বিজয় গর্বে ঘরে ঢুকলো ধাই আর তার বাচ্চাটাকে তার কাছ থেকে টেনে নিলো।

একদৌড়ে নীচে নামলো সে। নিশ্চয় হ্যারি।

'এই যে বার্থা নাকি। এই শোনো আমার একটু দেরি হয়ে যাবে। আমি একটা ট্যাক্সী নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসছি, কিন্তু খাওয়ার সময়টা মিনিট দশেক পেছিয়ে দাও, কেমন? ঠিক আছে তো।'

'হ্যাঁ, ঠিক—আছে। আর শোনো, হ্যারি।'

'বলো?'

কিন্তু কি বলার আছে তার। কিছু নেই। সে শুধু আরো এক মুহূর্ত এই সান্নিধ্যকে ধ'রে রাখতে চেয়েছিলো। অর্থহীনভাবে সেতো আর চেঁচিয়ে উঠতে পারে না। 'কী অপূর্ব হয়েছে আজকের দিনটা, তাই না?'

'কী বলো?' তীক্ষ্ণ গলায় আওয়াজ শোনা গেল।

'কিছু না ঠিক আছে, বার্থা বললে, তারপর রিসিভারটাকে নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবলে সভ্যতা ব্যাপারটাকে বোকামী বললেও কম বলা হয়।

রাত্রে ছয়জনকে খেতে বলা হয়েছিলো। নরম্যান নাইট দম্পতি—অত্যন্ত প্রগাঢ় তাদের দাম্পত্যজীবন—ভদ্রলোক একটা থিয়েটার খোলবার তোড়জোড় করছেন আর ভদ্রমহিলা ঘর সাজানোর কাজে মারাত্মক উৎসাহী; এ. ডি. ওয়ারেন ব'লে একটি যুবক, অত্যন্ত সম্প্রতি যার একটি ছোট্ট কবিতার বই

প্রকাশিত হয়েছে এবং সকলেই যাকে এখন রাত্রে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ; আর বার্থার একটি 'নব-আবিষ্কৃত' বান্ধবী, যার নাম পার্ল ফুল্‌টন্‌। মেয়েটি কি করে বার্থার জানা নেই। ক্লাবে একদিন ওদের দুজনের দেখা হয়েছিলো এবং অবিলম্বে বার্থা তার প্রেমে পড়ে যায় ; কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলে, বিশেষ করে তার মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা থাকে, সদাসর্বদাই বার্থা তার প্রেমে পড়তে প্রস্তুত।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার যদিও অসংখ্যবার তাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে আর সহস্র কথা বলেছে তারা তবুও বার্থা কিছুতেই মেয়েটিকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি ; একটা সীমা পর্যন্ত মিস্‌ ফুল্‌টন সত্যিই অসাধারণ রকমের সরল, চমৎকার খোলামেলা, কিন্তু একটা সীমা পর্যন্তই—সেটা ছাড়িয়ে সে কিছুতেই যায় না। কিন্তু তা ছাড়িয়ে কি সত্যি কিছু আছে! হ্যারি বলে, 'না, তার মতে মেয়েটি নিতান্তই হাবাগোবা, আর যে কোন সোনালী চুল-ওলা মেয়ের মতোই শীতল, এবং, হয়তো মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ রক্তাল্পতা দোষ আছে, কিন্তু বার্থা তার সম্বন্ধে একমত হ'তে পারে না, অন্তত এখনো পারেনি।

'না, হ্যারি, একপাশে মাথা হেলিয়ে মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটিয়ে যে ভঙ্গিতে ও বসে থাকে, তাতেই বোঝা যায় কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে এর পিছনে আর, আমাকে বের করতেই হবে সে ব্যাপারটা কী ?'

'সম্ভবত তার একমাত্র কারণ, মেয়েটির পেটের গোলমাল নেই।'

সর্বদাই এই ধরণের উত্তর দিয়ে বার্থার পেছনে লাগতে হ্যারি খুবই তৎপর 'ওগো মেয়ে, যকৃৎটাই আসলে জমে গেছে, কিংবা 'বোম্বাই যাচ্ছে, পেট ক্ষেপেছে। কিংবা কিডনীতেই গণ্ডগোল,···এইধরণের আরো কতো কী মন্তব্য করে সে, আর কি এক অজানা কারণে বার্থার এ-সব শুনতে বেশ ভালোই লাগে, স্বামীর এই স্বভাবের সে একজন রীতিমতোই গুণগ্রাহী বলা যায়।

বসার ঘরে গিয়ে সে আগুনটা জ্বালিয়ে দিলে ; তারপর যে কুশনগুলো সেরী সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলো, সেইগুলো একটা একটা করে তুলে নিয়ে আবার চেয়ার আর সোফার উপরেই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। এতেই সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে বদলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো শেষ কুশনটা ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে সে নিজেই হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলো যে, প্রবল, অত্যন্ত প্রবল একটা আবেগে সেটাকে জড়িয়ে ধ'রে সে যেন বুকের মধ্যে পিষে ফেলছে : কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বলছিলো, তা মোটেই নিভল

না তাতে, বরং তার উল্টোটাই হ'লো।

বসার ঘরের জানালাগুলো খুললেই বাগানের ঠিক উপরে একটা ঝোলানো বারান্দা। বাগানটার একেবারে শেষপ্রান্তে, পাঁচিলের ঠিক গায়েই, একটা দীর্ঘ কৃষ্ণকায় নাশপাতি গাছে অজস্র, অসংখ্য ফুলের সমারোহ; কম্বুভাবে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা, যেন হাল্কা-সবুজ আকাশের পটভূমিতে শান্ত স্থির হতে পেরেছে সে, অতদূর থেকেও কথা স্পষ্ট অনুভব না ক'রে পারলো না সে, একটিও না-কোটা কুঁড়ি নেই গাছটায়, একটি বিবর্ণ পাপড়িও না। ঠিক নিচেই, বাগানের জমির উপরে লাল আর হলুদ টিউলিপ ফুলে ছাওয়া গাছগুলো যেন গোধূলির প্রায়ান্ধকারে তাদের শরীর এলিয়ে দিয়েছে। একটা ধূসর রঙের বেড়াল জমির উপর তার শরীরটাকে প্রায় মিশিয়ে নিয়ে এগোচ্ছিলো, আর আরেকটি কালো রঙ-এর—তারই ছায়া সেটা—ঠিক তার পিছনে-পিছনেই যাচ্ছিলো। এত একাগ্রতা আর তৎপর তাদের ভঙ্গি যে, সে দিকে চোখ পড়তেই এক অদ্ভুত শিহরণে বার্থার শরীর কেঁপে উঠলো।

'বেড়ালগুলোর চুপিসারে চলা দেখলে গা শিরশির করে,' একটু হেসে হেসে বললে বার্থা, তারপর জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক পায়চারী করতে লাগলো।

জোৎ কুইল ফুলের তীব্র গন্ধে ঘরটা একেবারে ভ'রে গেছে। খুবই কি তীব্র? মোটেই না। কিন্তু তবুও তা সম্পূর্ণ অবাক করলো তাকে, একটা সোফার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে দুহাতে নিজের চোখ ঢাকলো।

'কী সুখী আমি, কি অসম্ভব সুখী!' গুন গুন করলো সে। আর তার চোখের পাতায় যেন সেই আশ্চর্য সুন্দর পাশাপাশি গাছটা ফুটে উঠলো, প্রস্ফুটিত ফুলে-ছাওয়া সেই গাছটা যেন তার নিজের জীবনের প্রতীক।

সত্যি, সত্যিই, সে সব পেয়েছে বয়স তার কম। হ্যারি আর সে পরস্পরকে আগের মতো, চিরদিনের মতোই, ভালোবেসে চমৎকার কেটেছে তাদের যুগল জীবন, সত্যিই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ তাদের সম্পর্ক। ভারি সুন্দর একটি বাচ্চাও আছে তার। টাকাকড়ি নিয়ে কখনো কোনো দুশ্চিন্তা করতে হয়নি তাদের। ঠিক মনের মতো ও-রকম একটা বাড়ী আর বাগান পেয়েছে তারা। আর কত বন্ধুবান্ধব পেয়েছে—সবাই একেবারে আধুনিক, রীতিমতো রোমাঞ্চকর তাদের সঙ্গ ও সান্নিধ্য—লেখক, শিল্পী, কবি কিংবা সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসুক—ঠিক যে ধরনের বন্ধু তারা চেয়েছিলো, সেই রকমই পেয়েছে। আর

এ ছাড়াও কত বই, কত গান বাজনায় ভরা তাদের জীবন, আর সে কি আশ্চর্য্য ভালো একজন পোষাক তৈরী করার লোক পেয়েছে, তা ছাড়া এই গ্রীষ্মে তারা সাগর পাড়ি দিচ্ছে, তার উপর তাদের নতুন ক্রাঁধুনিটি কী অপূর্ব ওমলেটভাজে…

'কি সব আজে বাজে ভাবছি আমি', সে উঠে বসলো ; কিন্তু কি রকম যেন বিহ্বল বোধ করছিলো সে, যেন তার বেশ নেশা হয়েছে। এই বসন্তকালই নিশ্চয় এর পিছনে কাজ করছে।

ঠিক, সবটাই এই বসন্তকালের জন্ত। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো সে যে পোষাক পরার জন্ত নিজের শরীরটাকে টেনে নিয়ে সে যেন আর উপরে উঠতেও পারছিলো না।

একটা সাদা পোষাক, সবুজ, পাথরের একটা মালা, এক জোড়া সবুজ জুতো আর মোজা। সমস্তটাই ইচ্ছাকৃত। বসবার ঘরের জানলায় এসে দাঁড়াবার কয়েক ঘণ্টা আগেই এই সে মনে মনে ভেবে রেখেছিলো। তার পোষাকের ফুলের পাপড়িতে মশ্‌মশে আওয়াজ তুলে সে হলঘরে ঢুকলো। তারপর মিসেস নাইটকে চুমু খেলো ; তিনি তখন একটা মজার কমলা রঙের কোট গা থেকে খুলছিলেন ; কোটটার প্রান্তে চারদিক দিয়ে সারিবদ্ধ কালো বাঁদরের মিছিল সামনের দিকেও সোজাসুজি উপরে উঠে গেছে তাদের শোভাযাত্রা।

কেন ? কেন ? কেন এই মধ্যবিত্তেরা এত ভারিক্কি ধরনের হয়—রসবোধের এত অভাব কেন তাদের মধ্যে। জানো আমি যে শেষ পর্য্যন্ত এখানে এসে পৌঁচেছি তা নিতান্ত বরাত জোরে—নরম্যান হচ্ছে আমার সেই প্রতিরক্ষাকারী বরাত। কেন না আমার এই বাঁদরমশাই সমস্ত ট্রেনে এমনই একটা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করলো যে শেষ পর্য্যন্ত সে একজন ভদ্রলোকের উপরই গিয়ে ভর ক'রে বসলো। দু'চোখ দিয়ে সে যেন গিলে খাচ্ছিলো একেবারে। হাসলো না, কৌতুক পর্য্যন্ত বোধ করলো না যে আমার ভালো লাগবে। কিন্তু না, শুধু ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইলো—এই বিরক্তিকর একঘেয়েমীতে আমায় একেবারে হয়রান ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু সবচেয়ে সেরা ব্যাপার হলো', কব্জিপের খোলায় বাঁধানো একটা এক চোখো চশমা চোখে লাগাতে লাগাতে নরম্যান বলে উঠলেন, 'তুমি কিছু মনে করবে না তো, ভেটকি, যদি ব্যাপারটা বলি ? করবে ? ( নিজেদের বাড়ীতে এবং বন্ধুমহলে তারা পরস্পরকে ভেটকি আর হাঁদা বলে সম্বোধন ক'রে থাকে। ) 'সবচেয়ে সেরা ব্যাপার হ'লো যে, শেষ পর্য্যন্ত ও পুরোপুরি বিরক্ত হয়ে ওর

পাশে বসা মহিলাটির দিকে ফিরে প্রশ্ন ক'রে বসলো, "আপনি বুঝি এর আগে কখনো বাঁদর দেখেন নি ?"

'হ্যা হ্যা !' মিসেস নরম্যান নাইটও সমবেত হাসিতে যোগ দিলেন। 'এটা একেবারে দারুণ মজার ব্যাপার হয়েছে, তাই না !'

কিন্তু এর চেয়ে মজার ব্যাপার হ'লো এই যে, কোটটা খুলে ফেলার পর তাকে একটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান বাঁদরের মতোই দেখাচ্ছিলো—এতটাই বুদ্ধিমান যে, কলার খোলা ছাড়িয়ে তা থেকে হলুদ সিল্কের একটা পোষাক বানানোও তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আর তার এ্যাবারের কানের দুল—ঠিক যেন একটা বাদাম ঝুলছে।

'সেই অধঃপতন নিতান্তই দুঃখের।' ছোট্ট বি-র প্যারাম্বুলেটরের সামনে থেমে দাঁড়িয়ে হাদা বলে উঠলেন 'প্র্যামের যবে হয় আগমন' উদ্ধৃতির বাকী অংশটা তিনি হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন।

ঘন্টা বেজে উঠলো। রোগা ফ্যাকাসে এডি ওয়ারেন ( যথারীতি ) বিষম যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় উপস্থিত।

'ঠিক বাড়ীতেই এসেছি, তাই না ?' ব্যাকুল ভাবে সে প্রশ্ন করলো। 'হ্যাঁ আমার তো তাই মনে হয়; অন্তত সেইরকম তো আশা করি ! হাস্যোজ্জ্বল বার্থা জানালো।

'একটা ট্যাক্সিওয়ালা নিয়ে এমন এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হ'লো আমার, কি বলবো। অতিশয় বদ লোকটা। গাড়ী থামাতেই পারছিলাম না আমি। আমি যতই টোকা দিই, লোকটা ততই আরো জোরে চালায়। আর চাঁদের আলোয় সেই অদ্ভুত মুখটা তার চ্যাপটা মাথা নিয়ে ছোটো হুইলটার উপর ঝুঁকে পড়েছে...' সে শিউরে উঠে পকেট থেকে একটা শাদা সিল্কের স্কার্ফ বের করে আনলো।

'সত্যি, কি ভয়ংকর ব্যাপার !' বার্থা বলে উঠলো।

'সত্যিই তাই, রীতিমতো ভয়ঙ্কর' তাকে অনুসরণ ক'রে বসার ঘরে যেতে যেতে এডি বললো, 'আমার মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল ধ'রে কালহীন একটা ট্যাক্সি ক'রে আমি চলেছি।'

নাইট-দম্পতিকে আগে থেকেই চিনতো সে। সত্যি বলতে কি, নরম্যান নাইটের মাথার থিয়েটারের মতলবটা আসার পর সে তার জন্য একটা নাটক লিখতেও আরম্ভ করেছিলো।

'এই যে ওয়ারেন, আপনার নাটক কতদূর ?' নরম্যান নাইট তার এক-চোখের চশমা নামিয়ে রেখে চোখটাকে মুহূর্তের জন্য একটু উপরে ভেসে ওঠার সুযোগ দিলেন, পরক্ষণেই অবশ্য তা আবার ডুবে গেলো।

আর শ্রীমতি নরম্যান নাইট ব'লে উঠলেন,' ওমা, মিস্টার ওয়ারেন, আপনার মোজাগুলো কি সুন্দর !'

'আপনার ভালো লেগেছে ? অত্যন্ত খুশি হলাম,' পায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, চাঁদ ওঠার পর থেকে ওগুলোকে আরও অনেক বেশী শাদা দেখাচ্ছে। তারপর তার কৃশ বিবর্ণ মুখ বার্থার দিকে ফিরিয়ে ব'লে উঠলো, 'চাঁদ উঠেছে, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই।' বার্থার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো ; 'খুব লক্ষ্য করেছি—খুউব !'

ওয়ারেন লোকটি সত্যিই খুব আকর্ষণীয়—। কিন্তু ভেটকিও তো তাই, আগুনের সামনে তার সেই কলার খোলা জড়িয়ে গুটিশুঁটি হয়ে বসেছিলেন তিনি। আর হাঁদাও কিছু কম যান না, সিগারেট খেতে-খেতে আর ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে বিড়বিড় ক'রছিলেন 'ঘরের গায়ের রংটা কেন আলকাতরা ?'

'এই যে, এসে গেছে।'

বাইরের দরজাটা দড়াম ক'রে খুললো এবং বন্ধ হ'লো। হ্যারি চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই যে, সবাই এসে গেছে তো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।' সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে তার ওঠার আওয়াজ শোনা গেল। বার্থার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, সে জানে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে কাজ করতে ও কি ভীষণ ভালবাসে। আর পাঁচ মিনিট বেশী লাগলে কি-ই বা এমন এসে যায় ? কিন্তু ও এমন ভাব করে যেন মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। অথচ এর পরেই বসার ঘরে আসার সময় ঝাড়াঝাড়ি রকম শান্ত, সংযত হ'য়ে আসা বিষয়ে সে আবার বেশী মাত্রায় মনোযোগী।

জীবন সম্পর্কে হ্যারির উদ্দীপনা এই রকম প্রবল ; ওর মধ্যে এই জিনিষটা অসম্ভব ভালো লাগে বার্থার। সব রকম বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আসক্তি ওর কী প্রচণ্ড। যা-কিছু তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তার মধ্যেই নিজের সাহস আর শক্তি পরীক্ষার সুযোগ খুঁজে বেড়ায় সে,—তার স্বভাবের এই দিকটাও বার্থা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে। এমন কি, কখনো-কখনো ক্বচিৎ কদাচিৎই অবশ্য, যারা তাকে ভালো ক'রে জানে না, তাদের কাছে নিজেকে হয়তো হাস্যাস্পদও করে তোলে সে, কেননা কখনো কখনো এ রকম হয়, যখন

আসলে যুদ্ধে করার কিছু না থাকলেও সে যুদ্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে আর গল্প করতে করতে বার্থা ভুলেই গিয়েছিলো যে, পার্ল ফুলটন এখনো আসে নি। হ্যারি ঘরে ঢোকা মাত্র ( ঠিক যেমন ভেবেছিলো, তেমনি ভাবেই ঘরে ঢুকলো ) সে কথাটা তার মনে পড়ে গেলো।

'কি ব্যাপার বলো তো, মিস ফুলটন কি ভুলে গেলেন নাকি ?

'আমার তাই মনে হয়,' হ্যারি বললো 'ফোন করা যায় না ওকে ?' 'এই তো, একটা ট্যাক্সি এলো।' একটু নতুন ধরণের আর রহস্যময় বন্ধু জোগাড় করার পর বার্থা সাধারণত মালিকানার স্বর-মেশানো যে মৃদুহাস্য করে থাকে, সেই রকম মৃদু হেসে জানালে, 'সারাদিন ট্যাক্সীতেই থাকে ও।'

'খুব খারাপ করে, মোটা হ'য়ে যাবে,' শান্ত ভঙ্গিতে খাবার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে হ্যারি মন্তব্য ক'রলো, 'সোনালি চুল-ওলা মেয়েদের পক্ষে সেটা সাংঘাতিক বিপদের কথা।'

'হ্যারি ও রকম বোলো না,' তার দিকে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে বার্থা শাসালো। আবার সেই ছোট্ট মুহূর্তটা এলো যখন অপেক্ষা করতে করতেই হাসি-গল্প করতে হ'লো তাদের। একটু বেশীরকম সহজ ভঙ্গিতে কথা-বার্তা বলছিলো সবাই, একটু অতিরিক্ত অসচেতন ভাবে। আর, তারপর মিস্ ফুলটন ঘরে ঢুকলো। পুরোপুরি রূপোলী রঙের পোষাক পরেছে সে। হাল্কা সোনালী চুলগুলো একটা রূপোলী ফিতে দিয়ে বাঁধা, মাথাটা একপাশে অল্প একটু হেলিয়ে হাসতে—হাসতে সে ঘরে ঢুকলো।

'আমি কি দেরী ক'রে ফেলেছি !'

'না, না, একটুও না,' বার্থা বলে উঠলো, 'ভিতরে এসো।' তার হাত ধ'রে খাবার ঘরে নিয়ে এলো সে।

কি ছিলো সেই ঠাণ্ডা বাইর স্পর্শে, বা আবার দাউ-দাউ ক'রে সেই তীব্র আনন্দের আগুন জ্বালিয়ে দিলো তার প্রাণে ? একে নিয়ে কি করবে বার্থা ভেবে পায় না।

মিস্ ফুলটন তার দিকে তাকালো না; এমনিতেই অবশ্য লোকের দিকে সোজাসুজি সে কদাচিৎ তাকায়। ভারি চোখের পাতায় তার চোখ যেন আধ বোজা, আর ঠোঁটে সেই অদ্ভুত অস্ফুট মৃদু হাসি ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছিলো—যেন দর্শনের চেয়ে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতেই সে অভ্যস্ত কিন্তু বার্থার হঠাৎ মনে হ'লো যেন এক দীর্ঘতম, অন্তরঙ্গতম দৃষ্টি বিনিময় হ'লো

তাদের মধ্যে। যেন তার মধ্যে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে একই প্রশ্নের বিনিময় হ'লো 'তুমি ও?' মনে হ'লো যেন সে জানে যে, সে নিজে যা ভাবছে, ঘুসব প্লেটের উপর লাল বোলটা নাড়াতে নাড়াতে পার্ল ফুলটনও ঠিক তাই ভাবছে। আর অন্যেরা? ভেটকি আর হাঁদা, এডি আর হ্যারি—তাদের সকলের চামচ উঠছিলো আর নামছিলো, ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছছিলো তারা, রুটি গুঁড়ো করছিলো। আর অযথা কাঁটা আর গেলাশগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বক্‌বক্ করছিলো।

'আলফা সৈকতে দেখা হয়েছিলো ওর সংগে—কী রকম অদ্ভুতগোছের ছোট্ট চেহারা। শুধু যে চুলটাই ছোটো ক'রে ফেলেছে তা নয়। তার হাত, পা, ঘাড়, এমন কি বেচারির ছোট্ট নাকটা থেকেও বেশ ভয়ংকর রকমের খানিকটা অংশ সে খুব্‌লে নিয়েছে ব'লে মনে হয়।'

'মাইকেল ওটের সঙ্গে ওর বেশ একটু দহরম মহরম না?'

'সে আবার কে, ঐ "বাঁধানো দাঁতে প্রেম" বইটা যে লিখেছে?'

'ও আমার জন্যেও একটা নাটক লিখতে চায়। একাঙ্ক। একটি পুরুষ চরিত্র। আত্মহত্যা করবে স্থির করলো সে। কেন করা উচিত এবং কেন করা উচিত নয়, সে সম্পর্কে যাবতীয় যুক্তি প্রয়োগ করলো। এবং শেষ পর্য্যন্ত যখন সে একেবারে মনস্থির করে ফেলেছে যে হয় করবে, আর না হয় করবে না—যবনিকা: ভাষাও খুব একটা খারাপ না।'

'কি নাম দিয়েছে তার—'প্লেটের গণ্ডগোল'?'

'আমার মনে হচ্ছে, ছোটো একটা ফরাসী পত্রিকায়, ইংল্যাণ্ডে কেউ জানেনা তার কথা, ঠিক এই রকম ভাবেরই একটা লেখা পড়েছিলাম।'

না, ওরা কেউ তার ভাবনার অংশগ্রহণ করছে না। কী ভালো, কি অসহ্য ভালো ওরা সবাই, আর ওদের সঙ্গে একত্রে, এক টেবিলে ব'সে থাকতে কি ভীষণ ভালো লাগছে তার। ওদের সুখাদ্য আর পানীয় পরিবেশন করার মধ্যেই বা কী তৃপ্তি! সত্যি কথা বলতে কি, তার অসম্ভব ইচ্ছে করছিলো যে তাদের ডেকে বলে, কী আনন্দদায়ক তাদের সঙ্গ, আর কি সুন্দর একটা দল রয়েছে তাদের। পরস্পরকে কী রকম পাল্টা জবাবে ঘায়েল করছে তারা, আর বলে যে তাদের দেখে চেখভের একটা নাটকের কথা মনে পড়ে যায় তার।

হ্যারি বেশ পরিতৃপ্তি সহকারে খাচ্ছিলো। এটা তার অঙ্গই বলা যায়—কিসের? ঠিক তার স্বভাবের বলা চলে না, এটা তার একটা ভঙ্গি তো নিশ্চয় নয়—এটা

তার একটা, এমন কিছু একটা, যে জন্য খাওয়ার কথা বলতে সে ভালবাসে, 'নিজের নির্লজ্জ উন্মাদনায় চিংড়ি মাছের সাদা শরীরের' আর 'মিশরীয় নর্তকীদের চোখের পাতার মতোই যা ঠাণ্ডা আর সবুজ সেই পেস্তার বরফির' গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠে।

যখন সে তার দিকে চোখ তুলে তাকালো আর ব'লে উঠলো, 'বার্থা, অসম্ভব ভালো হয়েছে এই খাবারটা,' তার মনে হ'লো সে যেন আনন্দের চোটে বাচ্চাদের মতো কেঁদে ফেলবে।

আর কেন আজ রাতে সমস্ত পৃথিবীর প্রতি সীমাহীন প্রীতিতে তার মন ভ'রে উঠেছে? সবকিছু যেন ভালো—ঠিক যা হওয়া উচিত, তাই। যা-কিছু ঘটছে সবই যেন তার এই পরম আনন্দের পাত্রকে কানায়-কানায় ভ'রে তুলছে।

কিন্তু সব সত্ত্বেও, তার মনের একান্ত প্রদেশে সেই নাশপাতি গাছটা যেন তেমনি ক'রেই দাঁড়িয়েছিল। এখন নিশ্চয়ই মিষ্টি এডিটার সেই চাঁদের আলোয় রুপোলী হয়ে উঠেছে সে। মিস্ ফুলটনের মতোই রুপোলী—যে এখন লীলায়িত আঙুলে একটা ট্যাঙ্গারিন লেবু নাড়াচাড়া করছে, এত বর্ণহীন তার আঙুল যে মনে হচ্ছিলো যেন একটা আলোর আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেখান থেকে।

বার্থা সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না যেটা তার কাছে প্রায় অলৌকিক মনে হচ্ছিলো, তা এই যে, কী ক'রে মিস্ ফুলটনের মনের ভাব সে মুহূর্তের মধ্যে এত সুস্পষ্ট ভাবে আন্দাজ করতে পারলো। সে যে ঠিকই আন্দাজ করেছে, এ-সম্পর্কে তার মতে তার মনে কোনো সংশয় ছিলো না; কিন্তু আসলে সে তো কিছুই জানতো না, একেবারে কিছু না।

'আমার বিশ্বাস, অত্যন্ত, অত্যন্ত কদাচিৎ কখনো-কখনো মেয়েদের মধ্যেই ঐ-রকম ব্যাপার ঘটতে পারে। পুরুষদের মধ্যে কখনোই ঘটেনা, বার্থা মনে মনে ভাবলো, 'কিন্তু এর পর যখন বসার ঘরে আমি কফি তৈরী করবো, তখন ও হয়তো একটা "আভাস দেবে"।'

ঠিক কী মনে করে কথাটা তার মনে হ'লো, বার্থা জানতো না; আর এর পরে ঠিক কি ঘটতে পারে, সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা ছিল না। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো অনর্গল কথা বলছে আর হাসছে সে। হাসতে তার এত ইচ্ছে করছিলো যে, কথা না ব'লে কোন উপায় ছিলো না।

'হাসতে না পারলে আমি ম'রে যাবো।'

কিন্তু হঠাৎ ভেটকির ভারি মজার একটা অভ্যাস লক্ষ্য করলো সে জামাক

বুকের কাছটাতে কি যেন গুটিয়ে রেখেছেন তিনি। যেন সেখানেও বাদাম রাখার একটা ছোট্ট গুপ্ত ভাণ্ডার আছে তার ; যেহেতু বেশী হাসা উচিত নয় সেই জন্যে বার্থা নিজের হাতে নখ বসিয়ে হাসি থামাতে চেষ্টা করলো।

অবশেষে আহারাদি সমাপ্ত হ'লো। 'চলুন আমার নতুন কফির যন্ত্রটা দেখাই আপনাদের,' ব'লে উঠলো বার্থা।

'পনেরো দিনে মাত্র একবার কফির যন্ত্রটা বদলাই।' জানালো। এবার ভেটকী বার্থার হাত ধরলেন, মাথা হেলিয়ে মিস্ ফুলটন তাদের অনুসরণ করলো।

বসার ঘরের আগুনটা তখন নিভু নিভু হ'য়ে একটা লাল দপদপে—ভেটকীর বক্তব্য অনুসারে 'ফিনিক্স-শিশুর বাসায়' পরিণত হয়েছিলো।

'আলোটা এখন একটু নিভোনই থাক, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে,' ব'লে তিনি আবার আগুনের ধারে গুটি শুটি হয়ে বসলেন। সর্বদাই তিনি শীতে জড়োসড়ো ; 'এখন অবশ্য লাল ফ্লানেলের জামাটা ও পরা নেই ওঁর,' বার্থা ভাবলে।

আর তক্ষুণি মিস্ ফুলটন সেই 'আভাসটা দিলেন।'

এমন একটা নিখুঁত সূক্ষ্মতা ছিলো তার মধ্যে যে, আজ্ঞানুবর্তী হওয়া ছাড়া বার্থার যেন আর কিছু করার ছিলো না। ঘরটা পার হ'য়ে পর্দাগুলো টেনে সরিয়ে দিলো সে, তারপর সেই দীর্ঘ জানালাগুলো খুলে দিলো।

'এই যে!' নিশ্বাস নিতে নিতে সে বলে উঠলো।

তারপর সেই দুজন নারী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঐ তন্বী কুসুমাকীর্ণ গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলো। যদিও গাছটি নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো তবু মনে হচ্ছিলো যেন মোমবাতির শিখার মতো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে অঙ্গুলী নির্দেশ করছে সে, প্রদীপ্ত শিহরিত হচ্ছে তার শরীর, তাদের দৃষ্টির সামনেই যেন ক্রমশ দীর্ঘ, দীর্ঘতর হয়ে উঠছে—যেন গোল রুপোলী চাঁদের কানাকে সে এক্ষুণি ছুঁয়ে যাবে।

কতক্ষণ তারা দাঁড়িয়েছিল সেখানে! এক অপার্থিব আলোর কুহেলী আচ্ছন্ন করেছিলো তাদের, পরস্পরের ভাবনাকে তারা যেন স্পষ্ট স্পর্শ করতে পারছিলো। যেন তারা অন্য এক জগতের জীব। সেই জগতে দাঁড়িয়ে তারা কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না ; কী করবে তারা এই পরম আনন্দের ঐশ্বর্য নিয়ে, যা তাদের বুকের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, তাদের চুল, তাদের হাত থেকে অজস্র রুপোলী ফুলের মতো ঝ'রে পড়ছে চারদিকে?

চিরকাল ধ'রে দাঁড়িয়েছিলো? না কি এক মুহূর্তের জন্য? আর মিস্

ফুলটন কি সত্যিই অস্ফুটে ব'লে উঠেছিলো, 'হ্যাঁ ঠিক তা-ই' না কি সেটা বার্থারই নিজের কল্পনা ?

এরপর আলোটা হঠাৎ দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো আর ভেটকী কফি তৈরী করতে লাগলো। হ্যারি ব'লে উঠলো, 'শুনুন মিসেস নাইট, আমার বাচ্চার কথা আপনি আমাকে জিগ্যেস করবেন না। তার সংগে আমার কখনো দেখাই হয় না। যদ্দিন না ওর একটা প্রেমিক জুটছে, তদ্দিন পর্য্যন্ত ওর সম্পর্কে সামান্যতম ঔৎসুক্য বোধ করবো না আমি,' হাঁদা তাঁর কাঁচঘর থেকে চোখটাকে মুহূর্ত্তের জন্য মুক্তি দিলেন, তারপরেই আবার সেটা কাঁচের আড়ালে ঢাকা পড়লো, আর এডি ওয়ারেন কফিটা শেষ ক'রে এমন যন্ত্রণা-কাতর মুখে সেটাকে নামিয়ে রাখলো যেন একটা মাকড়সা চোখে পড়েছে তার আর সেটা শুদ্ধু ই সে চুমুক দিয়েছে।

'তরুণ ছোকরাদের নিয়ে একটা নাটক করার যে ইচ্ছে আমার। আর লণ্ডন শহরটা তো অমন দুর্দান্ত সব অলিখিত নাটকে গিশ গিশ করছে ব'লেই আমার বিশ্বাস। আমি শুধু তাদের বলতে চাই, "এই নাও থিয়েটার, বাস্ এবার চালাও পান্সি"।'

'ওগো, জানো, আমি ঠিক করেছি, একটা ঘর আমি জ্যাকব নাথানদের জন্য সাজিয়ে রাখব। আঃ ভাজা মাছের একটা পরিকল্পনা আমাকে যা প্রলুব্ধ করছে, কী বলবো। চেয়ারের পিছন দিকগুলোর চেহারা ঠিক মাছ-ভাজা প্যানের মতো মনে হবে। আর পর্দাগুলো ভ'রে ভারি সুন্দর সব আলু-ভাজার নক্সা করা থাকবে।'

'আমাদের সব তরুণ লেখকদের দোষটা কি জানো? বড্ড ভাবালু তারা এখনো। সমুদ্রের উপর দিয়ে ভাসতে হলে সমুদ্রপীড়া আর বেসিন ছাড়া তো আর চলে না। তাহ'লে এই বেসিনের মতোই সহিষ্ণুতা আর সাহস তাদের থাকবে না কেন!'

'একটি মেয়ে সম্পর্কে ভয়ংকর একটি কবিতা, যে মেয়েটি একটা ছো-ট্টো বনে এক নামহীন ভিখিরী দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিলো···।

সবচেয়ে নীচু, সবচেয়ে গভীর, একটা চেয়ারে মিস্ ফুলটন তার শরীরটা ডুবিয়ে দিয়ে বসেছিলো আর হ্যারি বিলি করছিলো সিগারেট।

যে ভঙ্গিতে সে ফুলটনের কাছে গিয়ে তার রূপোলী সিগারেটের বাক্সটা নাড়াতে নাড়াতে হঠাৎ বলে উঠলো, 'মিশরীয়? তুর্কী? না ভার্জিনিয়া? সবগুলো মিশে গেছে এখানে,' তা দেখেই বার্থা বুঝতে পারলো যে, ওর সঙ্গ

হ্যারির কাছে শুধু ক্লান্তিকরই নয়, সত্যি-সত্যি সে বেশ অপছন্দ করে ওকে। আর মিস্ হুলটন যে-ভঙ্গিতে উত্তর দিলো, 'না, অনেক ধন্যবাদ, আমি এখন সিগারেট খাবো না,' তা দেখে সে বুঝলো যে, সে-ও এটা অনুভব ক'রে আহত হয়েছে।

'এই হ্যারি, ওকে একটুও অপছন্দ কোরো না। ওকে তুমি ঠিক বুঝতে পারো নি। চমৎকার মেয়ে ও। ভারি চমৎকার। আর তা ছাড়া আমি যাকে এত ভালোবাসি তুমি তার সম্পর্কে এ-রকম নিস্পৃহ হও কি ক'রে। রাতে আমরা যখন বিছানায় শুতে যাবো, তখন তোমাকে বলবো কি ঘটেছে, দু'জনে আজ আমরা অভিজ্ঞতা ভাগ ক'রে নিয়েছি…'

এই শেষ কথাগুলো ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য্য, প্রায় সভয়, একটা ভাবনা বিদ্যুতের মতো বার্থার মনে সঞ্চারিত হ'য়ে গেলো। আর এই মধুর, গোপন ভাবনা যেন তার কানে ফিসফিস ক'রে বলতে লাগলো, 'এক্ষুণি সবাই চ'লে যাবে। বাড়ীটা নিস্তব্ধ হ'য়ে পড়বে—একেবারে নিস্তব্ধ। আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হবে। তারপর সে আর তুমি সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে একা—আর সেই উষ্ণ বিছানা…।

চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে সে পিয়ানোর কাছে ছুটে গেলো। 'ইশ,—পিয়ানোটা বাজাচ্ছে না কেউ।' চেঁচিয়ে উঠলো সে,—'কি ভালো হ'তো কেউ বাজালে।'

তার জীবনে এই প্রথম বার্থা তার স্বামীকে এই ভাবে কামনা করলো। আর সে তাকে ভালো তো বাসেই, চিরদিনই বাসতো। অন্য আর সব অর্থেই ভালবাসতো তাকে। কিন্তু ঠিক এমনি ভাবে কখনোই নয়। আর সঙ্গে-সঙ্গে সে এটাও অবশ্য বুঝতো যে, হ্যারি একেবারেই অন্যরকম। কতদিন এই নিয়ে আলোচনা করেছে তারা। প্রথম প্রথম নিজের এই শীতলতা নিয়ে সে ভীষণ দুশ্চিন্তা করতো। কিন্তু পরে ক্রমশ, এ নিয়ে যেন আর-কিছু এসে যেতো না তার। তারা দু'জনেই পরস্পরের কাছে এত স্পষ্ট আর খোলামেলা, এত অন্তরঙ্গ সঙ্গী তারা পরস্পরের—এই তো যথেষ্ট। আধুনিক হবার এটাই সবচেয়ে ভালো দিক।

কিন্তু এখন—আকুল, আকুল হ'য়ে উঠেছে তার সমস্ত সত্তা। এই শব্দটাই যেন তার আকুল শরীরে একটা দীর্ঘস্থায়ী বেদনা সঞ্চারিত করেছে। সেই পরম আনন্দের অনুভূতি তাহ'লে এরই পূর্বাভাস? কিন্তু তাহ'লে, তাহলে—

'লক্ষ্মীসোনা, জানোই তো আমাদের লজ্জার কথা,' মিসেস নরম্যান নাইট ব'লে উঠলেন, 'সময় আর ট্রেনের হাত ধরা আমরা। ছাপ্পটেডে থাকতে হয়, বুঝতেই

পারছো। এত ভালো কাটলো, কি বলবো!'

'চলুন, হল পর্যন্ত এগিয়ে দিই আপনাদের,' বার্থা বললে, 'আপনারা থাকলে ভীষণ ভালো লাগতো; কিন্তু শেষ ট্রেনটা ছাড়া আপনাদের কখনোই উচিত হবে হবে না। সাংঘাতিক বাজে ব্যাপার, তাই না।'

'যাবার আগে একটা হুইস্কি চলবে নাকি নাইট!' হ্যারি হাঁক দিলে।

'না, অনেক ধন্যবাদ, ছোকরা।' এই কথা বলার জন্য করমর্দন করার সময় বার্থা তার হাতে কৃতজ্ঞভাবে চাপ না দিয়ে পারলে না।

'শুভরাত্রি, বিদায়,' উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে সে মনে মনে বুঝতে পারলো, তার এখনকার এই রূপ আসলে ওদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিচ্ছে।

যখন সে বসার ঘরে ফিরে এলো, অস্বেরাও তখন উঠে পড়েছে।

'আপনি তাহ'লে আমার ট্যাক্সিতে কিছুটা পথ আসতে পারেন'।

'একবার যে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তারপর একা আরেকবার ট্যাক্সি চড়ার সম্মুখীন না হ'তে হ'লে সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকবো।'

'রাস্তার ঠিক শেষেই সারি সারি ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে থাকে, ওখান থেকেই একটা নিয়ে নেবেন। কয়েক গজের বেশী হাঁটতে হবে না আপনাদের।'

'যাক নিশ্চিন্ত হলাম। আমি গিয়ে কোটটা পরে আসি।'

মিস্ হুলটন হলের দিকে এগোলে, বার্থা তাকে অনুসরণ করলো, এই সময় হঠাৎ হ্যারি তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেলো। 'আমি আপনাকে সাহায্য করছি।'

বার্থা বুঝতে পারলো যে নিজের রূঢ় আচরণের জন্যে হ্যারি অনুশোচনা করছে—বার্থা তাকে যেতে দিলে। কোনো কোনো ব্যাপারে কী ছেলেমানুষ যে ও—বোঝার মাথার চলা সরল।

আগুনের ধারে তখন সে আর এডি ছাড়া আর কেউ ছিলো না। 'আপনি বোধ হয় রিল্‌কের নতুন কবিতা পড়েন নি?' সাধারণ নরম গলায় এডি ব'লে উঠলো, 'ভারি চমৎকার কবিতা। একেবারে সাম্প্রতিক কবিতা সংকলনটায় আছে, আপনার কাছে আছে কি বইটা। এত দেখাতে ইচ্ছে করছে আপনাকে। একটা অবিশ্বাস্য সুন্দর লাইন দিয়ে কবিতাটি শুরু হয়েছে, টোম্যাটোর খোল ছাড়া কত্থ কেন অন্য কিছু নয়?'

'হ্যাঁ, আছে,' বললে বার্থা। আর বসার ঘরের দরজাটার উল্টোদিকে একটা

টেবিলের দিকে নিঃশব্দ পায়ে এগোলে সে। এডিও নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলে। ছোট্ট বইটা তুলে নিলে বার্থা, তারপর এডির হাতে দিলে; কেউই কোনো শব্দ করলে না।

যখন এডি সেটাতে চোখ বুলোচ্ছিল, বার্থা ঘাড় ফিরিয়ে হলের দিকে তাকালো। আর দেখলো হ্যারির হাতে মিস্ ফুলটনের কোট আর মিস্ ফুলটন তার দিকে পিছন ফিরে মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোটট ছুঁড়ে ফেললো হ্যারি, দু'হাত রাখলো তার কাঁধে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে তাকে নিজের দিকে ফেরালো। তার ঠোঁট যেন ব'লে উঠলো; 'ভালোবাসি তোমায়,' আর মিস্ ফুলটন তার চাঁদের আলোয়-গড়া আঙুল ছোঁয়ালো হ্যারির গালে, তার মুখে ফুটে উঠলো সেই নিদ্রাতুর স্মিত হাসি। কেঁপে উঠলো হ্যারির নাসারন্ধ্র; এক কুৎসিৎ বিকৃত হাসিতে তার ঠোঁট দুটো যেন পিছন দিকে দুমড়ে গেলো; ফিসফিস ক'রে সে বললে, 'আগামীকাল,' আর মিস্ ফুলটন যেন তার চোখের পাতা দিয়ে জানালো, 'হ্যাঁ।

'এই যে, পেয়েছি,' ব'লে উঠলো এডি, 'টোম্যাটোর ঝোল ছাড়া কভু কেন অন্য কিছু নয়?' কী গভীর সত্য আছে এর মধ্যে বুঝতে পারছেন আপনি। এই টোম্যাটোর ঝোল ব্যাপারটাই কি ভয়ংকর রকম চিরন্তন, ভাবুন।'

'যদি চান,' হল থেকে হ্যারির উঁচু গলা, জোরালো গলা শোনা গেল। 'আমি ফোন করে একটা টাক্সীকে।এখানে আসতে বলতে পারি।' 'আরে না, তার কিছু দরকার নেই,' মিস্ ফুলটন ব'লে উঠলো, তারপর বার্থার কাছে এগিয়ে এলো সে, তার পাতলা আঙুলগুলো বার্থাকে মুঠো ক'রে ধরতে দিলে।

'বিদায়। অনেক ধন্যবাদ।'

'বিদায়,' বললে বার্থা। মিস্ ফুলটন আরো এক মুহূর্ত তার হাতটা ধরে রইলো।

'কি সুন্দর তোমার নাশপাতি গাছটা!' অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলো সে। তারপর সে চলে গেলো, এডি তার অনুসরণ করলো, সেই ধূসর বেড়ালটাকে কালো বেড়ালটা যেমন অনুসরণ করেছিলো।

আমি সব ঠিকঠাক ক'রে গুছিয়ে রাখছি,' অত্যধিক শান্ত সংযত ভঙ্গিতে হ্যারি বলে উঠলো।

'কি সুন্দর তোমার নাশপাতি গাছটা - নাশপাতি গাছটা - নাশপাতি গাছটা।'

এক দৌড়ে সেই দীর্ঘ জানালাগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো বার্থা।

'উঃ কি হবে এবার?' চেঁচিয়ে উঠলো সে। কিন্তু নাশপাতি গাছটা ঠিক আগের মতোই সুন্দর, আগের মতোই পুষ্পাভীর্ণ আর নিঃশব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

# কবি ও কবিগান

## দীনেশচন্দ্র সিংহ

ব্রাহ্মণ বাড়িয়া জমিদার বাড়ীতে দুর্গাপূজার নবমীর দিন রাত্রি কবিগান। বিপক্ষে ঝালকাঠীর কবিয়াল শরৎ সরকার। যথারীতি ডাক মালসী, সখি-সংবাদ ও কবি শেষ হলে নকুলেশ্বর প্রথম আসর নিয়ে শরৎবাবুকে বিপক্ষে রেখে টপ্পা করলেন—

আমি কল্পনায় অদ্বৈতাচার্য, শান্তিপুরে বাস।
তুমি গঙ্গাদাস বিদ্যানিধি, পাণ্ডিত্যে পেলে উপাধি,
জাতিতত্ত্ব কৌমুদী, করেছ প্রকাশ॥
ক'রে গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ, নদীয়ায় এল গৌর গুণাধার,
কি অভাবে যেন তার নয়নে বহে অশ্রুধার॥
নিমাই সাজিয়ে নামের পাগল,
সঙ্গে নিয়ে ভক্ত দল, হরিবল বলে অনিবার।
তোমরা কয়েক জনে করে দ্বন্দ্ব,
আজ কেন সমাজ বন্ধ করলে তার?

এই টপ্পার সঙ্গে ছড়া পাঁচালীতে আলোচ্য বিষয়বস্তুর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে নকুলেশ্বর আসর শেষ করলেন। শরৎবাবু সদলে এসে উক্ত উপ্পার জবাব দিলেন—

কেন নিমাই'র করি সমাজ বন্ধ জানতে চাও কারণ।
ক'রে গয়াধামে পিণ্ড দান, শিখেছে হরিনামের গান,
হিন্দু ধর্মের জাতিমান দিল বিসর্জন॥
বেদে বর্ণাশ্রমের ধর্ম যাহা—মোটে তা করে না সে পছন্দ,
ডোম হাড়ি যবন নিয়ে, কীর্তনে করে আনন্দ।

বেটা হয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে
যায় না ব্রাহ্মণের দলে
শেখ তুরুক সঙ্গে সম্বন্ধ
ও সেই শেখের সাথে, খায় একপাতে,—
তাইতে তার করেছি সমাজ বন্ধ।

ছড়া পাঁচালীতে শরৎ সরকার মশাই হিন্দু ধর্মে জাতিভেদ, শুচিস্পর্শ সমর্থন করে, বেদের বর্ণাশ্রম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করে গেলেন। নকুলেশ্বর দ্বিতীয় আসরে এসে প্রতি-জবাব করলেন—

নাকি নিমাইয়ের নাই জাতির বিচার—তাইতে কর রাগ।
ঠাকুর! ব্রাহ্মণ শূদ্র শেখ জাতি,
খৃষ্টিয়ান কিংবা মগ জাতি,
মূলে সবাই এক জাতি, গুণে কর্মে-ভাগ।
নিমাই শেখের সাথে খায় এক পাতে—
তাইতে তার গলায় দাও সমাজের ফাঁস।
কুব্‌রা জোলায় কেন খেয়ে—
কি জন্য হয় না জাতি নাশ।
যদি হরি নামে হয় রুচি—
অশুচিও হয় শুচি—
তার সাক্ষী মুচী রুহিদাস।
যাহার প্রসাদ খেতে ক'রে আর্তি—
সাজিলেন কুত্তার মূর্তি কীর্তিবাস॥

এভাবে টপ্পার জবাব দিয়ে নকুলেশ্বর পুনরায় পাঁচালীতে যুধিষ্ঠিরের ঘরে রুইদাস মুচী বৈষ্ণবের ভোজন, শ্রীক্ষেত্রে যবনী করমাবাঈ'র জগবন্ধু সেবা, শবরীর উচ্ছিষ্ট ফল শ্রীরামের ভোজন, গুহক চণ্ডাল, সুগ্রীবাদি'র সঙ্গে রামের মিত্রতা, দাসীপুত্র বিদুরের ঘরে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন, ইত্যাদি—বিষয়গুলি সুরে ছন্দে আসরে পরিবেশন করলেন। শুনে শ্রোতৃবৃন্দ খুব সন্তুষ্ট হলেন; পান শেষ হয়ে গেল।

বিদায়ের সময় জমিদারবাবু দলের কর্ত্রী রাঙ্গা যামিনীকে ডেকে বিদায়ের টাকা দিয়ে বললেন—'তোমার দল বেশ ভাল হয়েছে। তোমাকেও আমার

বাড়ীতে দুর্গাপূজার বার্ষিক করে দিলাম।' সকল দোহারপত্রকে বখ্‌শিস দিলেন; যামিনীকে একখানা শাড়ী এবং নকুলেশ্বরকে ধুতি-চাদর দিয়ে জমিদারবাবু বললেন—'তোমার জবাবে পাঁচালীতে শুধু আমি কেন সভার সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছেন। আশা করি তুমি হরি আচার্য মহাশয়ের সুনাম রক্ষা করে তাঁর স্থান অধিকার করতে পারবে।'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বসেই লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন "সরকারের" সঙ্গে দশ বারো পালা বায়না পেলেন। গানের পর গান চলছে। বিভিন্ন "সরকারের" সঙ্গে গান করে নকুলেশ্বরের বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা লাভ হতে লাগলো।

কবির কাব্য-প্রতিভা একবার বিকাশোন্মুখ হলে উত্তরোত্তর কবির মনে নূতন নূতন ভাবের উন্মেষ হতে থাকে। নকুলেশ্বর দেখলেন, সরলার কথাই ফলবতী হতে চলেছে। সরলা বলেছিল—দশ বৎসর ডাক সরকারী করে যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভ হতো, এক বৎসর খোদ সরকার হয়ে দল পরিচালনা করলে তার চেয়ে শতগুণ উত্তম উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

নকুলেশ্বরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। খোদ সরকার হিসাবে কাজ করতে করতে তাঁর আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, নূতন নূতন ভাবের উদ্দীপনা অন্তরে অনুরিত হচ্ছে। কালীপূজা উপলক্ষে হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে নকুলেশ্বরের গান হলো কুমিল্লা জিলার গৌরীপুর বাজারে। তার পরে অম্বিকা পাটনী, দেবেন্দ্র দাস, মদন শীল, পূর্ণ সরকার, তারিণী সরকার, দুর্গাচরণ সরকার ইত্যাদি সরকারগণের সঙ্গে পরপর গান চলতে লাগল। সে বৎসরের শেষ গান অনুষ্ঠিত হলো শ্রীহট্ট জিলার করিমগঞ্জে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে। বিপক্ষে ছিলেন ত্রিপুরার প্রধান সরকার হরকুমার শীল। গান শেষ করে নৌকায় এলে রাজা যামিনী বললো—'বাসন্তী পূজার পরে আর এদিকে গানের বায়না থাকে না। কাজেই এবার ঝালকাঠি ফেরা যাক।'

দল নিয়ে ঝালকাঠি এসে রাজা যামিনী দলবন্ধ করে দোহার পত্রের হিসাব মিটিয়ে দিলে সবাই নিজ নিজ ঘরে চলে গেল। যামিনী নকুলেশ্বরকে বললো—'বাবা, তুমি আমার নতুন দল যে ভাবে চালিয়ে এনেছ, আশীর্বাদ করি তুমি কবি-সম্রাট হও। আগামী সনেও কিন্তু আমার দলে তোমাকে থাকতে হবে।'

নকুলেশ্বর বললেন—'গুরুদেবের যা ইচ্ছা তাই হবে।

**নকুলেশ্বরের নিজের দল গঠন**—রাজা যামিনীর দলের ম্যানেজার হরিচরণ নট্ট নকুলেশ্বরকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললো—'আমি বলি কি এখন

আর পরের দলে না গিয়ে আপনার নিজের দল করাই সঙ্গত।'

নকুলেশ্বর—ম্যানেজারবাবু! অমৃতে কি কারো অরুচি হয়? নিজে দল করতে আমার ইচ্ছা করে; কিন্তু আমার সে শক্তি সামর্থ কোথায়? আপনি তো জানেন নিজস্ব দল তৈরী করতে হলে অন্ততঃ তিন চার হাজার টাকার দরকার। মেয়েদের নাচের পোষাক, রান্নার বাসনপত্র. প্রত্যেক দোহারের তিন চার মাসের মাহিনা অগ্রিম দিয়ে দলিল রেজিষ্ট্রি করা। নৌকা ভাড়া ইত্যাদি নানা খাতে বহু টাকার দরকার। আমার কি আছে! শুধু হাতে কি বাঘ তাড়ানো যায়?

হরিচরণ—আপনি টাকার জন্য ভাবছেন কেন? ঝালকাঠির কাপুড়িয়া পট্টিতে অভয় সাহা নামে একজন মহাজন আছে। সে সব কবির দলেই টাকা কর্জ দেয়; তবে সুদটা একটু বেশী। মাসিক শতকরা ছয় টাকা। তবে টাকাটা তো বেশী দিন খাটবেনা। দুর্গাপূজা থেকে কালীপূজা পর্যন্ত। এর মধ্যে যা আয় হবে তাতে দেনা শোধ হয়ে যাবে। যদি মত হয় তবে চলুন। সেই মহাজনের কাছে নিয়ে আমি টাকার ব্যবস্থা করে দেব।

হরিচরণ নটের কথা শুনে নকুলেশ্বরের প্রাণে আশার সঞ্চার হলো। তিনি বললেন—যদি দল গড়া হয়, তবে পরিচালন ভার কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে।

হরিচরণ—সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না। সব ভার আমি বহন করবো।

পরদিন নকুলেশ্বরকে নিয়ে হরিচরণ নট অভয় সাহার গদীতে গিয়ে নকুলেশ্বরের নূতন দল করার প্রস্তাব জানিয়ে টাকা কর্জের কথা পাড়লো। অভয় সাহা নকুলেশ্বরের যত প্রতিষ্ঠার কথা লোক মুখে শুনে থাকবে। এখন সাক্ষাতে বিস্তারিত জেনে শুনে টাকা দিতে কোন ওজর-আপত্তি করলো না। অভয় সাহা বললো—দল যদি করতে হয় ভাল ভাবে করবেন। টাকার চিন্তা করবেন না। যত টাকা লাগে আমি দেবো।

নকুলেশ্বরের অনেক দিনের আশার স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে দেখে তার আনন্দের সীমা রইল না। অভয় সাহার সঙ্গে পাকাপাকি কথা স্থির করে নকুলেশ্বর হরিচরণ নটকে বললেন—বাইন মহাশয়! আপনার উপরেই কিন্তু দলের সম্পূর্ণ ভার; আমি উপলক্ষ মাত্র।

ঝালকাঠির পাশের গ্রাম বাসণ্ডায় হরিচরণের বাড়ী। সে বললো—আমি তো সর্বদাই ঝালকাঠি যাতায়াত করি, দেখে শুনে দোহারপত্র ঠিক করবো। আমাদের দল সব দলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে; আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী চলে যান। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন নূতন দলের পত্তন হবে। গায়ক-গায়িকা

বাজনদারদের দাদন দিতে হবে। ছয় সাত দিন আগেই আপনি ঝালকাঠি চলে আসবেন।

নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী গিয়ে নকুলেশ্বর মাতা ঠাকুরাণীর কাছে নিজে দল করার সঙ্কল্প জানালেন। মা বললেন—তুমি ছেলেমানুষ; নূতন দল করে কি তুমি দলের ঝামেলা সইতে পারবে? আর এত টাকা পয়সাই বা কোথায় পাবে?

নকুলেশ্বর হরিচরণ নট্ট এবং অভয় সাহার সঙ্গে আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ মাকে জানালেন এবং বললেন—অভয় সাহা যখন অভয় দিয়েছে তখন আর টাকার জন্য চিন্তা! মা, তুমি আশীর্বাদ কর এই দল যেন আমার জীবন মরণের সম্বল হয়।

মা—তোমার বাসনা পূর্ণ হোক, তবে মনে রাখবে তুমি দশ জন নিয়ে একজন হতে চলেছ; দশজন দোহার পত্রের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবে। নিজে তুমি যতই বড় হও, দলের দোহারপত্র ছাড়া তুমি কিছু করতে পার না। অন্নই হলো সেনাপতির শক্তি সামর্থ সহায় ও সম্বল। দলের প্রত্যেকটি লোকই তোমার এক একখানা অস্ত্র।

১৩২০ সাল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কেটে গেল। আষাঢ়ের প্রথম ভাগে নকুলেশ্বর পতামাতার পদধূলি ও আশীর্বাদ পাথেয় করে শুভদিনে ঝালকাঠি এলেন দলের পত্তন করতে। এদিকে হরিচরণ নট্ট, শেখ সরলা, কালা সুখদা ও মানদা নামে তিনটি সুন্দরী তরুণী গায়িকাকে দলে নেওয়া ঠিক করে রেখেছে। নকুলেশ্বর এসে শেখ সরলার বাড়ী উঠলেন। হরিচরণ এসে দল গড়া সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থা করেছে তা নকুলেশ্বরকে জানাল।

রথযাত্রার দিন যাত্রা কবি জারী রয়ানী কীর্তন ইত্যাদি ঝালকাঠিতে যত রকম গানের দল আছে সব দলেরই নূতন খাতা মহরৎ অর্থাৎ হাল-কাগজ। বন্দরময় আজ ধুমধাম। গান বাজনা আনন্দ উৎসবে চারদিক মুখরিত। এসব আনন্দ উৎসবের মধ্যে অন্যান্য দলের সঙ্গে নকুলেশ্বর নূতন দলের শুভ সূচনা করলেন।

নকুলেশ্বর দল গঠন করে গুরুদেব কুঞ্জবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা! আমার তো চুক্তিপত্র ছাপাতে হবে; দলের কি নাম দেব?

কুঞ্জবাবু বললেন—তুই যখন নিজে দল করেছিস আমি এখন দল ভেঙ্গে দেব। নিজস্ব দল পরিচালনার এত ঝামেলা আর বইতে পারিনা। আমি সরকার হিসাবে রাজা যামিনীর দলে যোগ দেব, মাসে তিন চার শত টাকা মাহিনা ও আদর যত্ন পাবো। সেই আমার পক্ষে এখন ভাল। তুই এক কাজ কর—

আমার দলের এই নামটা বজায় রাখবার জন্ত তোর দলের নাম দে ঐ 'বীনাপাণি কবি পার্টি।' যতদিন তোর দল থাকবে, ততদিন আমি ঐ নামের মধ্যে বেঁচে থাকবো।

নকুলেশ্বর তদনুসারে দলের নাম 'বীনাপাণি কবি পার্টি' দিয়ে গুরু-বাক্য রক্ষা করলেন। শ্রাবণ, ভাদ্র দুই মাস বাড়ীতে বসে নকুলেশ্বর গত বছর যে সব আসরে গান করে এসেছেন, সেই সব অনুষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের পত্র দিয়ে তার নূতন দল গঠনের কথা জানালেন এবং বায়নার জন্ত প্রার্থনা করলেন। সকল জায়গা থেকেই তিনি পত্রোত্তরে সানন্দ সম্মতি পেলেন। পত্রযোগে বায়না স্থির হয়ে গেল। বাড়ী এসেই বিশ পঁচিশ পালা বায়না পেলেন। দুর্গাপূজায় গানের বায়না হলো ঢাকা মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিসনে নগর কদবা দুয়ী বাড়ী। হরিচরণ নট দলের দোহারপত্র সবাইকে ঢাকা যাত্রার তারিখ জানিয়ে দিলেন।

দুর্গাপূজার সাত আটদিন আগে ঝালকাঠির অন্যান্ত দলের সঙ্গে রওনা দিতে হবে। একটা ঢাকাইয়া বড় ঘাসী নৌকা ( গহনার মতো নৌকা। মাঝি মাল্লা সহ ভাড়া করা হলো। নির্দিষ্ট দিনে ঝালকাঠি কাশী বাড়ী মহল্লা দিয়ে সব দল একত্রে ঢাকা অভিমুখে রওনা হলো।

দুর্গা ষষ্ঠীর চারদিন থাকতে সব কবির দল ঢাকা পৌঁছে বুড়ী গঙ্গা নদীর পাড়ে সোয়ারী ঘাটে গিয়ে নৌকা নোঙ্গর করলেন। এটাই হলো কবির দলের প্রাচীন ঘাট। শুধু ঝালকাঠির কবির দলই নয়, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর নাটোর ইত্যাদি বহুস্থানের অন্তত শতাবধি দল ঐ ঘাটে জমায়েত হয়ে বায়না ধরে।

এ বছর নকুলেশ্বর ও ঘাটে প্রথম গিয়েছেন। ঘাটের নিয়ম কিছু জানেন না। সেখানে গিয়ে শুনলেন ঘাট মাঝিকে দিতে হবে বায়নার টাকার শতকরা সোয়া ছয় টাকা। আরো শুনলেন যে প্রত্যেক দলকে ঘাট মাঝির গদীঘরের সামনে এক খানা করে গান শোনাতে হবে। নকুলেশ্বরের বায়না বাড়ীতে বসেই হয়ে গেছে ঢাকা গিয়েছেন শুধু ঢাকেশ্বরীর বাড়ী পূজা দেওয়ার জন্ত। তিনি ঘাটের এসব নিয়মকানুনের বিরোধিতা করতে মনস্থ করলেন। গুরু কুঞ্জ যন্ত্রের নৌকায় গিয়ে বললেন—বাবা। শুনলাম ঘাটমাঝিকে নাকি বায়নার টাকার শতকরা সোয়া ছয় টাকা দিতে হয় ঘাট খাজনা হিসাবে; তার উপর তার গদীর সামনে নাকি সব দলকে একখানা করে গান শোনাতে হবে?

কুঞ্জবাবু—হ্যাঁ, প্রাচীন কবিয়ালদের আমল থেকেই এ ঘাটে এই নিয়মই চলে আসছে।

নকুলেশ্বর—খাজনা দিয়ে ঘাটে থেকে আবার তার গদীর সামনে গান শোনাতে হবে কেন? ওটা তো ঢাকেশ্বরী কালীও নয়, কোন দেবালয়ও নয়। ওখানে গান শোনাব কেন? আমি ও প্রস্তাবে রাজী নই। ঘাট মাঝির সঙ্গে খাজনার সম্বন্ধ, সে ঘাট খাজনা নেবে। তার হুকুম মাথা নত করে মানা আমি সমর্থন করতে পারি না।

কুঞ্জবাবু—তুমি ছেলেমানুষ; এ ঔদ্ধত্য তোমার সাজে না। ওর কথা না শুনলে ও যদি এ ঘাটে থাকতে না দেয়, তবে যে সর্বনাশ হবে। সারা দেশের বায়নাদার জানে ঢাকা সোয়ারী ঘাটেই কবির আড়ং মিলে। ওখানে গেলেই দল বায়না করা যায়। তাই সকলে ছুটে আসে এই ঘাটে। এ ঘাট ছেড়ে দিলে কি আর উপায় আছে?

নকুলেশ্বর—আমরা সব দল যে ঘাটে থাকব, সেখানেই কবির আড়ং মিলবে। অন্য ঘাট ঠিক করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং কয়েক হাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে দলের দোহারদের দিয়ে শহরময় বিলি করে দিলেই তো প্রচার হয়ে যাবে। এ কাজ সামান্য কয়টা টাকায় করা যায়। তা না করে আমরা মান খুইয়ে ঘাটমাঝির অধীনতা স্বীকার করে মাথা বিক্রি করব কেন? আপনি সব দলের কাছে এ কথা বুঝিয়ে বলুন। আমি একটু ঘুরে আসি।

এই বলে নকুলেশ্বর ঢাকা সদর ঘাটে চলে গেলেন। সে ঘাটের ঘাটমাঝির সঙ্গে দেখা করে বললেন—আপনি যদি আপনার ঘাটে গানের নৌকার থাকার ব্যবস্থা করে দেন, তবে আমরা শতাবধি কবিগানের নৌকা নিয়ে এসে আপনার ঘাটে আড়ং মিলাতে পারি।

সদর ঘাটের মাঝিটি ছিল খুব সৎচরিত্র আনন্দপ্রিয়। সে বললো—সে তো খুব আনন্দের কথা। চার পাঁচদিন বিরাট মেলার মতো বসবে আমার ঘাটে। নৌকায় নৌকায় গান বাজনায় ঘাট আনন্দ মুখর থাকবে—এ সৌভাগ্য কে না চায়? কিন্তু সোয়ারী ঘাটের ঘাটমাঝি আপনাদের ছাড়বে কেন? এত দিনের প্রাচীন ঘাট!

নকুলেশ্বর—এখন আর প্রাচীন কুসংস্কার ভাল লাগে না। দেশে দেশে দেখুন না কেমন নূতনের হাওয়া বইছে। তাই আমরাও পুরান ঘাট ছেড়ে নূতন ঘাটের সন্ধানে আপনার কাছে এসেছি।

ঘাটমাঝি—আমি সানন্দে প্রস্তুত। আপনারা এই মুহূর্তে চলে আসুন; আমি ব্যবস্থা করে দেবো।

নকুলেশ্বর—তা আপনাকে দক্ষিণা কত দিতে হবে ?

ঘাটমাঝি—কিছু না, কিছু না ; আমার কোন দাবী নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন ; আমি আনন্দের ভিখারী, আনন্দই আমার কাম্য।

নকুলেশ্বর ঘাটমাঝির সঙ্গে কথা বলে হ্যাণ্ড বিল ছাপানোর জন্য ছাপাখানায় অর্ডার দিয়ে এলেন—

স্থান পরিবর্তন

ঘাট বদল

ভদ্র মহোদয় এবং কবি রসপিপাসু সুধী বন্ধুগণ !

আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে বহুদিন পর্যন্ত ঢাকা সোয়ারী ঘাটে কবির দলের আড়ং বসিত। বর্তমানে সে ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভদ্রলোকের-চলাফেরা কবিগানের নৌকায় ওঠানামার খুব অসুবিধা। তার উপর ঘাটমাঝির অভদ্র আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া সোয়ারী ঘাটের সেই নোংরা আড়ং ভেঙ্গে দিয়ে সব কবির দল একাত্মতি হইয়া ঢাকা সদর ঘাটে নূতন আড়ং পত্তন করিলাম। এই ঘাটে আসিয়া আপনাদের মনোমত যে কোন কবির দলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

—নিবেদক

বাংলা দেশের কবিমণ্ডলী

হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে এনে নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করে সদর ঘাটের মাঝির সদয় ব্যবহার ও স্বতঃস্ফূর্ত আদর সম্ভাষণের কথা জানিয়ে বললেন—আর অপেক্ষা বিলম্ব নয়। মাঝি আমাদের জন্য ঘাট পরিষ্কার করে রেখেছে, জয় গুরু মা ঢাকেশ্বরী বলে আসুন একত্রে সবাই নোঙ্গর তুলে রওনা হই।

কুঞ্জবাবু আগেই সকলের কাছে নকুলেশ্বরের বক্তব্য বলে রেখেছিলেন। এখন খবর দেওয়া মাত্র একযোগে সব নৌকার নোঙ্গর তুলে জয় মা ঢাকেশ্বরী বলে সোয়ারী ঘাট ছেড়ে সদর ঘাটের উদ্দেশ্যে নৌকা খুলে দিল। সদর ঘাটে যাওয়ামাত্র মাঝি সব নৌকা সুবিধা মতো রাখার ব্যবস্থা করে দিল—

এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে

এই তো নদীর খেলা—

এদিকে বিভিন্ন দলের দোহারপত্র দ্বারা হ্যাণ্ডবিলগুলি ঢাকা নারায়ণগঞ্জে বিলি করা হলো। নকুলেশ্বর সোয়ারী ঘাটের মাঝির কাছে একখানা পত্র লিখলেন—

মহাশয়! আপনার বহু দিনের প্রাচীন ঘাট ভেঙে এসেছি বলে দুঃখ করবেন না। মনে রাখবেন কারো অসহায়তার সুযোগ নিয়ে জুলুমবাজী করা মনুষ্যত্ব বিরোধী। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মতিগতিরও পরিবর্তন হয়। মুখ বুজে জুলুম সহ্য করার মনোবৃত্তি চিরদিন থাকে না। পরিবর্তনশীল জগৎ। এখন আপনার শূন্য ঘাটে বসে বসে আমার এই কবিতাটি পড়ুন, শান্তি পাবেন—

ভাঙা গড়া নিয়ে বিধাতার খেলা
মানুষের বোঝা ভার।
আজ যেথা বাজে মিলনের শঙ্খ
কাইল সেথা হাহাকার॥ ইত্যাদি

সদর ঘাটে তিন চার দিনের মধ্যে সকল দলের বায়না হয়ে গেল। ষষ্ঠীর দিন সকালে সব দল ঢাকেশ্বরী মায়ের বাড়ী পূজা দিয়ে আসার পর নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর কাছে বললেন—বাবা, এখন তো সব দল গানের বাড়ী চলে যাবে। কিন্তু ঘাটমাঝি আমাদের সঙ্গে যে ভদ্রতা করেছে তার প্রতিদানে আমাদেরও কিছু করা দরকার। চলুন সব দলপতির নিকট থেকে দল প্রতি পাঁচ টাকা তুলে ঘাটমাঝিকে দিয়ে যাই।

নকুলেশ্বরের এ প্রস্তাবে কুঞ্জবাবু রাজী হলেন। দুজনে দলপতিদের নিকট গিয়ে বললেন—সোয়ারী ঘাটে আপনাদের টাকা প্রতি এক আনা হারে খাজনা দিতে হতো, কম পক্ষে পাঁচ শত টাকার বায়না পেলেও তাকে একত্রিশ টাকা চার আনা দিতে হতো। এ ঘাটমাঝি কোন দাবী না করে আমাদের সঙ্গে উদার ভদ্রতা দেখিয়েছে। তার প্রতিদানে আমাদেরও তো কিছু কর্তব্য আছে। আসুন আমরা প্রত্যেক দল মাত্র পাঁচটি করে টাকা দিয়ে আমাদের কর্তব্য করি।

এ প্রস্তাবে সকল দলপতি খুশী মনে রাজী হলেন। এবং মোট চার শত পঞ্চাশ টাকা আদায় হলো। ঘাটমাঝিকে নকুলেশ্বর নৌকায় ডেকে এনে তার হাতে টাকা দিয়ে বিদায় চাইলেন। ঘাটমাঝি বললো—আমি তো টাকার লোভে এ আড়ং মিলাই নাই; শুধু আনন্দ লাভই আমার উদ্দেশ্য। আবার টাকা কেন?

নকুলেশ্বর—আপনার ভদ্র ব্যবহারে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছি। আপনার দাবী না থাকলেও আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে।

ঘাটমাঝি ছল ছল চোখে বললেন—এই তিন চার দিন যে কি আনন্দে কেটেছে বলতে পারি না। আজ আনন্দের হাট ভেঙ্গে যাবে এই আমার দুঃখ। যা হোক কথা দিয়ে যান প্রত্যেক বৎসর আপনারা সব দল আমার ঘাটে এসে এইভাবে আনন্দ দান করবেন।

সানন্দে সকলে সম্মতি দান করে দুর্গা দুর্গা বলে যার যার গানের বাড়ীর অভিমুখে নৌকা খুলে দিলেন। সে বছর থেকে সদর ঘাটেই কবির দলের পাকাপাকি ঘাট নির্দিষ্ট হলো ; সোয়ারী ঘাটের হাট চিরতরে ভেঙ্গে গেল।

( ক্রমশঃ )

# প্রতিমা-বিসর্জন

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু কিছু ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে, যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অবিশ্বাস্য, গল্প-কথা, বানানো, অথচ যা আপনার আমার অস্তিত্বের মতোই সত্য ও বাস্তব। আমাদের আশেপাশেই এ-ধরনের ঘটনা ঘটে, যদিও অনেক সময়েই আমরা সেদিকে নজর দিইনে তেমন, বা গুরুত্ব আরোপ করি না। প্রতিমা নামের সাদামাটা মেয়েটি তেমনি এক ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু।

জায়গাটার আসল নাম গোপন রাখছি ; ধরা যাক্ গ্রামের নাম হরেকৃষ্ণপুর, জেলার নাম নবদ্বীপ ওরফে নদীয়া। সেই গ্রামেরই প্রতিমা-বিসর্জনের কথা বলতে যাচ্ছি। ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, অবশ্য আংশিকভাবে, বলেই আজও দাগ কেটে রয়েছে মনের মধ্যে।

না, খুব যে দর্শনডালি আহা-মরি ছিল প্রতিমা, তা নয়। রং ময়লা, ছিপ্‌ছিপে চেহারা, মাথায় মাঝারি—তবে সবসুদ্ধ মিলিয়ে আল্‌গা চটক ছিল একটা। নিম্ন মধ্যবিত্ত—তাই বা কেন, নিম্নবিত্তই বলা উচিত—ঘরের মেয়ে, পড়াশুনো প্রায় হয়নি, পছন্দসই পাত্র পাওয়ায় বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ষোলো বছর বয়সে। প্রকৃতপক্ষে বিয়েটা ঘটেছিল মা শান্তিলতারই চেষ্টায়, বাপ প্রাণকেষ্ট ছিল নিমিত্তী মাত্র—এবং সেই মা মেয়েকে সুখী জেনে নিজেও সুখে পাড়ি দিয়েছিল পরপারে, দু'বছর বাদে।

শান্তিলতার ভাগ্য ভাল, সে আগেভাগে চলে গিয়েছিল। নইলে মরেও সে কদাচ শান্তি পেতনা।

প্রতিমার শ্বশুরঘর ছিল ছিমছাম। বিপত্নীক ভাশুর, বিধবা বৃদ্ধা শাশুড়ি, আর আপন সোয়ামী যার নাম বিপিন। বিয়ের পর দুটো বছর বেশ সুখেই কেটেছিল প্রতিমার—মোটামুটি দুধে-ভাতে থাকার মতো সংস্থান, বিপিনের স্নেহচ্ছায়া, শাশুড়ির নিরীহ অস্তিত্ব। ভাশুর নবীন সম্পর্কে শুধু কেমন যেন একটা অস্বস্তি ছিল অবচেতন মনে, যার স্বরূপটা বুঝতে পারত না প্রতিমা।

প্রতিমার দ্বিতীয় নিদারুণ আঘাতটা এল শান্তিলতা মারা যাবার বছরখানেক বাদে। লোকাল ট্রেণের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ভ্রমণ করতে গিয়ে নিয়তির ডাক-

শুনল বিপিন। আচমকা ধাক্কা লাগল একটা লোহার থামের সঙ্গে, আর তাইতেই মাথার খুলিতে মারাত্মক জখম হয়ে মারা গেল সে।

খালি হয়ে গেল প্রতিমার জগৎ।

পাঁচজনের সহযোগিতায় বিপিনের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সমাধা হবার পর বুকের দগদগে ঘা-টাকে তখনো লালন করছে প্রতিমা। তারই মধ্যে সে টের পেল, নবীন যেন তার প্রতি একটু বেশি রকম মমতাশীল হয়ে উঠছে। অবচেতন অস্বস্তিটা সচেতন ও প্রখর হয়ে উঠল শোকাকুলতার মধ্যেও। কী আর করে, পুত্রহীনা শাশুড়িকে বলতে পারেনা লজ্জার কথা, বলতে গেলে আবার উল্টো বুঝলি রাম হয়ে দাঁড়ায়—নিজেই যথাসম্ভব সামলে সামলে চলে।

সাদা চোখে এবং সুস্থ মস্তিষ্কে প্রবৃত্তিটাকে জাহির করতে হয়ত বা চক্ষুলজ্জায় বাধছিল, তাই নবীন মদ খেয়ে এসে মুখোমুখি হল একদিন। শোক চিরস্থায়ী হতে পারে না, তাছাড়া নবীন থাকতে প্রতিমার অভাবই বা কী, চিন্তাই বা কী,—এবম্প্রকার ধানাই পানাই করার পর আসল বক্তব্যটা সে পেশ করলে। বলা বাহুল্য, নোংরা সেই প্রস্তাবে প্রতিমার মতো মেয়েরা কোনকালেই রাজি হতে পারে না। কিছুতেই যখন বাগ মানেনা মেয়েটা, তখন নবীনের ভিতরকার জন্তুটা দংষ্ট্রা বের করল শেষতক্—"এ্যাই শোন্ শালী। বিপ্‌লে অনেক ট্যাকা রেখে গেছে আমি জানি, আর সেটা তোর জিম্মাতেই আছে। বের কর্ সেই ট্যাকা শিগ্‌গির—"

বিপিন বেশ কিছু টাকা সত্যিই প্রতিমার জিম্মায় গোপনে রেখেছিল। কিন্তু নবীনের হুমকিতে সেটা বের করে দিতে চাইল না প্রতিমা। ফলে, দংষ্ট্রাযুক্ত জন্তুটা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ভ্রাতৃবধূকে এবং তার স্ত্রীধনটুকুকে পশুশক্তির বলে দখল করতে যখন সে উদ্যত হয়েছে, তখন প্রতিমার চিৎকারে অন্য ঘর থেকে শাশুড়ি এবং ঘরের বাইরে থেকে স্থানীয় চৌকিদার ছুটে এসে হস্তক্ষেপ করায় সে-যাত্রা কোনমতে ফাঁড়া কেটে গেল অভাগিনী মেয়েটার।

পরের দিন সকালেই সোয়ামীর সেই গোপন ভাণ্ডারটুকুকে পেটকাপড়ে লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে এল হরেকৃষ্ণপুরে।

এল তপ্ত কটাহ থেকে জলন্ত চুল্লীতে। অর্থই ডেকে আনল অনর্থকে।

শান্তিলতা গত হবার পর সব বদ্‌লে গিয়েছিল। প্রতিমা ঠিক জানতে পারেনি তা। বাবার সম্বন্ধে সে ছিল প্রায় অন্ধকারেই।

মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রথমে জামাই-এর টাকা-ক'টা হস্তগত করবার চেষ্টা

করল নেশাখোর উচ্ছৃঙ্খল প্রাণকেষ্ট। মেয়ে রাজি হল না। সোয়ামীর অনেক কষ্টের সঞ্চয় সে বাপকেও হস্তান্তর করতে চাইলে না। এই বেয়াড়াপনা তাতিয়ে দিল প্রাণকেষ্টর মেজাজকে। দিনে দিনে দুনিয়াটার কী যে হচ্ছে—আপন বউ-এর পেটের মেয়ে, কদিন আগেও যার নাক টিপলে দুধ বেরোত, সোয়ামীটাকে খেয়ে বাপের ঘরে ফিরে এসেছে যে মেয়ে—তার আবার এত কী ঢং-আদিখ্যেতা, এত কিসের বক্কির মতো মতো ধন আগলানো! আর তোর নিজের বাপ—সে কি পর, তার হাতে টাকা দিতে এত তোর কী আপত্তি রে আবাগী বেটী! তুই বেধবা বেওয়া মনিষ্যি, একবেলা হবিষ্যি আহার বেঁধে দিয়েছে শাস্তরে, করবি কী তুই এত ট্যাকা নিয়ে। উচ্ছন্নের পথে যাবি নাকি! বাপটা তোকে আঁতুড় থেকে মানুষ ক'রে তুলল (কেমন মানুষ করা, তা এক শান্তিলতাই জানত!), সে-লোকটা আজ অর্ধাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তা কি হতচ্ছাড়ী তুই বেখেও দেখিস্ নে? যা ভবে ফিরে যা তোর সোয়ামীর ভিটেয়, এখেনে তোর জায়গা হবে না—।

বয়ে গেছে প্রতিমার ফিরে যেতে। সেখানে সে আর ফিরবে না। থাকবে এখানেই, এই বাপের বাড়িতে। যতদিন বেঁচে আছে, বিপিনের গচ্ছিত ধনও হাতছাড়া করবে না। এই মতে সে অনমনীয়। সে-মানুষটা অনেক বিশ্বাস ক'রে তার জিম্মায় রেখে গেছে টাকাগুলো। সে-টাকা উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবার জন্যে নয়।

গন্‌গনে হয়ে উঠল প্রাণকেষ্ট। জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেললে। মেয়ে তার শত্তুর। হাতে মারতে না পারলে লোকে ভাতে মারতে চেষ্টা করে। গভীর রাতের আঁধারে বাড়িতে ডাকাত পড়ল। ঘরদোর লণ্ডভণ্ড ক'রে তারা চলে গেল, যাবার সময় তুলে নিয়ে -গেল হাত-পা-মুখ বাঁধা প্রাণকেষ্টর মেয়েটাকে। আশ্চর্যের বিষয় আর কোনও জিনিস খোয়া গেল না ঘর থেকে।

পরের দিন সকালে পদ্মদীঘিতে ভেসে উঠল প্রতিমার দেহখানা। সেই দৃশ্য আমি দেখেছিলাম। বুকে দাগ কেটে গেছে সেই দৃশ্য। পুলিশ এসে ঘটনার খবরদারি নিল। বেরিয়ে পড়ল প্রাণকেষ্টর কীর্তি।

পরের কথা আমার জানবার দরকার মনে করিনি। প্রাণকেষ্টর যাই হোক না বিচারে, প্রতিমা বলে মেয়েটা তো আর ফিরে আসলে না—পদ্মদীঘিতে যার বিসর্জন হয়ে গেছে।

# পুস্তকের কথা

এক

বাংলা গল্প—কবিতা—নাটক, এমন কী বাংলা গান নিয়ে এপর্যন্ত যতটা নিরীক্ষা হয়েছে উপন্যাস নিয়ে ততটা হয় নি। না হয়ে বরং ভালই হয়েছে, হলে উপন্যাসের উপকার কতটা হোত তা বলতে পারব না, তবে পাঠকের উপকার আদপেই হোত না একথা হলফ্ ক'রে বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ইদানীংকালের শীর্ষেন্দু সিরাজ অতীন পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের যেটুকু বা বদলেছে তা বাইরের ব্যাপার। উপন্যাসের content যদি মজবুত না থাকে তবে form-এর বাহার দিয়ে তাকে সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না। পশ্চিম মুলুকে ও-রকম একটা চেষ্টা হয়েছিল তবে তা টেকেনি। যদিও বাংলা উপন্যাসের বয়স পশ্চিমী উপন্যাসের তুলনায় বেশ কম—তবুও তার সম্যক অবস্থা বেশ ভালো। স্বাস্থ্যে এবং সৌন্দর্যে তার তুলনা সে নিজেই।

জ্যোৎস্নাময় বসুর 'যখন বৃষ্টি' বইটি পড়তে পড়তে এসব কথা আমার মনে পড়ছিল। মনে পড়বার কতগুলি সঙ্গত কারণ আছে। বইটিতে কুশলতার কিছু অভাব চোখে পড়ে। লেখক উত্তমপুরুষে কাহিনী বিবৃত করেছেন, কিন্তু আত্মরতি ভিন্ন আত্মপ্রকৃতির অন্যান্য সম্ভাব্য দিকগুলির কথা কিছুমাত্র বলেন নি। সাধারণত উপন্যাসে একটি মূল কাহিনী থাকে এবং সেই সঙ্গে জুটে যায় আরও কিছু উপকাহিনী—সবটুকু মিলিয়ে যে সিম্ফনী শুনতে পাওয়া যায়—সেটাই উপন্যাস। তার একটা সিদ্ধান্তও থাকা দরকার, তবে সেটা যে 'বিশুদ্ধ' হতে হবে এমন কোনো বাধকতা নেই। হওয়া স্বাভাবিকও নয়। কারণ ও-ব্যাপারটা সব ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক।

কাহিনীর কথাই বলি, ঘটনার ঘনঘটা এখানে নেই। একজন সুস্থ—সবল, শিক্ষিত মানুষ কিভাবে ভালোবাসার জন্য ক্রমশ অসুস্থ হয়ে উঠছে—এখানে তারই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অসুস্থতার মাত্রা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে এখানে। সূচনায় দেখি অনবদ্য প্রেম। যেখানে মনে পড়ে জয়দেব রচিত "স্মরগরল খণ্ডনম্/মম শিরসি মণ্ডনম্ / দেহি পদপল্লবমুদারম্।' কিন্তু তা সারাক্ষণ বজায় থাকলে নায়ক-চরিত্র একটা Dimension পেত। মেঘদূতের বিরহী যক্ষ

দয়িতার স্মৃতিমন্থন করেই বেঁচে থাকল। কিন্তু এই উপন্যাসের নায়ক যেহেতু রক্ত-মাংস ইত্যাদির দাস, সেইহেতু তারও নিদারুণভাবে মাংসাশী হতে ইচ্ছা হোল। এজগতে বুঝি নারীর অর্থ, শরীর। এবং সেই শরীরি ক্লেদের মধ্যেই উপন্যাসের অধিকাংশ পাতা খরচ হয়ে গেল। মনের জন্য তেমন কিছু আর রইল না। শাশ্বতীর জন্য নায়ক নিকষিত হয়ে থাকলেই যে উপন্যাস হোত—এমন নয়। তার অন্য গতিও ছিল। কিন্তু তা হোল না। একাধিক শরীরিনীর মোহিনী মায়ায় সে আটকে গেল বিবাহিত জীবনও তার অসুখে আচ্ছন্ন হোল। 'শেষের কবিতা'-র অমিত রে কিংবা তার নিতান্ত ভগ্নাংশ—যার জীবনে নিত্যনূতন ব্যবহারের জন্য ঘড়ার তোলা জল এবং সদাপ্রবহমানা সরোবরও বহাল ছিল অর্থাৎ লাবণ্য এবং কেতকীর গল্প হলেও হয়ে উঠতে পারত আর একটু নতুনভাবে।

এই বইটিতে গল্প বলার একটি অনবদ্য Style লক্ষ্য করা যায়। লেখকের এই মনোযোগ কাহিনীর Treatment-এর ক্ষেত্রেও সমভাবে সক্রিয় হলে ভালো হোত। পরিবেশ-সৃষ্টি এবং সংলাপ-রচনায় লেখক উল্লেখযোগ্য কুশলতা দেখিয়েছেন। লেখকের বর্ণনাভঙ্গিতে নিষ্ঠা আছে। ভাষাও বেশ সহজগতিময় বলা যায়। তাঁকে এর পর থেকে কাহিনীবিন্যাস এবং চরিত্রচিত্রণের প্রতি আরও বিশ্বস্ত হতে হবে। সমসাময়িক পরিপার্শ্বে প্রেম-ভাবনাও যে অনেকখানি পাল্টে গেছে—একথা তাঁকে না ভাবলে চলবে না। তাছাড়া, উপন্যাসের মূল ঘটনা ছাড়াও অপরিহার্য সমস্যাগুলির ছোঁয়াচ রাখতে হবে কাহিনীতে। যে-সব কারণে গল্পের বিশ্বস্ততা অনেক গুণ বেড়ে যায়। শাশ্বতীর অপভ্রংশ এখানে 'শ্বাতী' হোল কেন কিছুই বোঝা গেল না। দুটিতো সম্পূর্ণই আলাদা শব্দ। বইটির প্রচ্ছদে পুষ্পময় বর্ণাঢ্যতার কারণও ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা গেল না। সমালোচক হিসেবে নয়, একজন পাঠক হিসেবেই আমার তা মনে হয়। লেখকের স্থির লক্ষ্য এবং অধ্যবসায় আরো উজ্জ্বল হোক—তা-ই কামনা করি।*

—ইন্দ্রনীল বসু

---

* যখন বৃষ্টি। জ্যোৎস্নাময় বসু। লিপিকা

## দুই

নির্মল গুপ্ত অনুদিত দুখানা বই আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে।

প্রথমটি ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত রুবাইসমূহের অনুবাদ। ভূমিকা থেকে জানা যায় যে রুবাইগুলি দুই দশকের আগে অনুদিত হয়। অবশ্য ওমর খৈয়ামে রুবাইয়াতের প্রসঙ্গে সর্ব প্রথমে মনে পড়ে প্রয়াত কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদের কথা। এ ছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম, কবি নরেন দেব এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও অনুবাদ করেছেন। তা ছাড়া আরও কিছু কিছু অনুবাদ আছে তা সত্ত্বেও নির্মলবাবুর অনুবাদ আমাদের ভালো লেগেছে তাঁর পরিচ্ছন্ন ও সরস রচনাভঙ্গীর জন্য। যার আবেশ অন্যান্য পাঠকদের হৃদয়েও সঞ্চারিত হবে বলে ভরসা করি। মনোজকুমার সেনগুপ্ত অলঙ্কৃত প্রচ্ছদটি ভালো। তবে রুবাইয়াতের অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থে যে অলংকরণ-পারিপাট্য থাকে তা এ বইয়ে অনুপস্থিত। সুতরাং ও আলাদা স্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি স্বভাবতই।

শ্রীগুপ্তের দ্বিতীয় বইটি হল, কিছু মুণ্ডা কবিতার অনুবাদ। এ ধরনের অনুবাদ গ্রন্থ সাধারণত আমাদের হাতে আসে না। সে হিসেবে বইটি আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। মুণ্ডারা আমাদের প্রতিবেশী আদিবাসী জাতি। কিন্তু নিতান্ত পাশের মানুষ হয়েও আমাদের সঙ্গে এদের আত্মিক ব্যবধান অনেকখানি। শ্রীগুপ্ত সরাসরি মুণ্ডা ভাষা থেকে যে কবিতাগুচ্ছ ভাষান্তরিত করেছেন তার জন্য বাঙ্গালী কাব্য রসিকদের সাধুবাদ অবশ্যই পাবেন। তাঁর অনুদিত কবিতাগুলি থেকে মুণ্ডাদের অনাড়ম্বর জীবন এবং চিন্তাধারার সারল্যের চিত্র আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ কিম্বা জমিদারের লেঠেল-পাইকের উপস্থিতিও রয়েছে কবিতাগুচ্ছের বিষয়বস্তুর মধ্যে। এ ছাড়া চিন্তার সারল্যের মাঝে মাঝেও উঁকি দিয়েছে গভীরতর ব্যঞ্জনা—

নাই বা হল আম-সরাতে জলের ছিটে দেওয়া
সিঁদুর মাখা সিঁথির কোণে কোণে,
আমার কনে দেখব আমি যেথায় হৃদি নেওয়া
ইচ্ছা আমার পূরুত হবে মনে।

## তিন

নকুড় চন্দ্র মিত্র রচিত 'সারাঙ্গাবাদ গ্রামের নাট্যচর্চা ও কয়েকটি নাট্য প্রবন্ধ' এই নামের একটা পুস্তিকাও আমাদের আলোচনার জন্ত এসেছে। পুস্তিকাটির কোন বিক্রয় মূল্য মুদ্রিত হয়নি। স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় যে পুস্তিকাটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্ত মুদ্রিত হয়েছে। ভালো এন্টিক কাগজের ওপর লাইনো টাইপের দারুণ ঝকঝকে ছাপা। মোট ছয়টা প্রবন্ধ আছে। প্রথমটা সারাঙ্গা-বাদ নামক কোন এক গ্রামের নানান নাট্য প্রচেষ্টার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত। সাধারণ পাঠকদের খুব কৌতূহল সৃষ্টি করবে বলে মনে হয় না। বাকী প্রবন্ধ-গুলি নবনাট্য, গণনাট্য, একাঙ্কিকা ইত্যাদি বিষয়। এই প্রবন্ধগুলি যদি বাংলা নাটকের বিবর্তন সম্পর্কে আগ্রহী তরুণদের কিঞ্চিৎ উপকারে আসে তবে আমরা খুশী হব।

—শ্যামল সেন

---

রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম। অনুবাদ—নির্মল গুপ্ত। বাক্ সাহিত্য প্রাঃ লিঃ

মুক্তারি কবিতাগুচ্ছ। অনুবাদ—নির্মল গুপ্ত। বাক্ সাহিত্য প্রাঃ লিঃ

# কান্নার অপমৃত্যু

**কিরণচন্দ্র মৈত্র**

"তুমি, তুমি এখানে!"

তন্ময় হয়ে ফুটপাতে সাজান পত্র পত্রিকাগুলো দেখছিলাম। কানের খুব কাছে কোকিলকণ্ঠ শুনে হকচকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আরো হকচকিয়ে গেলাম। যার সাথে আর কখনও দেখা হবে ভাবিনি তাকে হঠাৎ এত কাছে দেখতে পেয়ে দেহ মনে একটা শিহরণ বয়ে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম—"তুমি এখানে?" অর্থাৎ এভাবে দেখা হওয়া দুজনের কাছেই স্বাভাবিক নয়। দৃষ্টি বিনিময়ে বিস্ময়ের ঘোর কিছুটা কাটল।

"চিনতে পারলে তা হলে!"

"চিনতে পারলাম বলেইত আশ্চর্য হচ্ছি; তুমি না সুদূর……

"ও রেলের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় 'অমুক' হাসপাতালে জয়েন করেছে।" খোঁজ খবরের প্রথম পর্ব সংক্ষেপে শেষ হল। কথা বলতে বলতে আমি ইতি-মধ্যে ওর পাশে চলতে সুরু করেছি। খুব কাছেই ওর বাসা।

যেতে যেতে আরো কিছু খবরাখবর জানা গেল। 'সুমি' মানে সুমিতা এখন চার ছেলের মা। ছেলেদের পড়াশোনার কথা ভেবেই ওর স্বামী রেলের 'অমন' চাকরি ছেড়ে সুদূর মাদ্রাজ থেকে অশান্তির শহর কলকাতায় চলে এসেছে।

—"চার ভাই চম্পার একটি পাকল-বোন অথবা নিদেন পক্ষে পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চমটি না হলে যে 'সারকিট কমপ্লিট' হয়না।"

সুমি পুরুষ জাত তুলে খিস্তি করল। "ডাক্তারেরও একটা মেয়ের……; রক্ষে কর বাবা; বেলতলায় আর নয়।" সুমিতা এত রোগা হয়ে গেছে যে ওকে আর 'স্লিম'র পর্যায়ে ফেলা যায় না।

দুই ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাট। সুমিতার সংসার বেশ ছিমছাম দেখব আশা করেছিলাম। হতাশ হলাম। বাইরের ঘরখানা বড্ড অগোছাল। চার মাস্কেটি-য়ার্সের কুরুক্ষেত্র। সুমিতার ছোট্ট সাজান সংসারের স্বপ্ন তাহলে একদম বানচাল। সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত স্বামী একজন ডাক্তার। চাকরি ছাড়াও ওষুধের দোকানে পার্ট টাইম।

—"কি ছেলেদের নিয়ে পার্কে গেছে; তুমি কাগজখানা নাড়াচাড়া কর, আমি

চা-বানিয়ে আনি, তারপর গল্প করা যাবে ; কতদিন বাদে দেখা।"

সুমি যে কাগজখানা আমার হাতে ধরিয়ে অন্দরে চলে গেল তার একখানা কপি আমার হাত ব্যাগেও রয়েছে এবং অফিসে ওটাকে তুলোধুনা করেছি। কাগজখানা চোখের সামনে মেলা থাকলেও আমি খুব চেনা পথ ধরে অতি সহজেই অতীতে ফিরে গেলাম।

পাশাপাশি দুই বাড়ি।—ওদের আর আমাদের। ওদের মস্ত দোতলা বাড়ির তুলনায় আমাদের বাড়িটা খুব ছোট হলেও মফঃস্বল শহরে সে সময়েও বড় ছোটর সহ-অবস্থান সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। দুই বাড়ির ছেলে মেয়েরা দিব্যি একসাথে বড় হচ্ছিলাম। কালোটাকা-কমপ্লেকস বেড়াজাল তখনও গড়ে ওঠেনি।

ছোট বেলা থেকেই সুন্দরী বলে ওর নাম-ডাক ছিল। আত্মসচেতন মেয়েটার দেমাকও ছিল খুব। তাই আমি ওর পেছনে লাগতাম। আমার জেঠতুতো বোন মীনার বন্ধু। ওদের পুতুল খেলা, আচার খাওয়া ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছি। ওদের তেতুলমাখা-ডাঁশাপেয়ারা-কুল চুরি করে খেয়েছি। সুমিতা মীনার কাছে অনুযোগ করত—তোর ছোড়দাটা ভারি অসভ্য। একদিন আড়ালে একলা পেয়ে আমাকে 'রাঙামুলো' সম্ভাষণ করেই ফিক্ করে হেসে ফেলেছিল। একবার "ভূতের-জঙ্গল" থেকে কামরাঙা এনে ওদের দিয়েছিলাম। সুমিতা খুব খুশি হয়ে মীনাকে বলেছিল, ওই রোগা পটকা শরীরে 'ভূতের জঙ্গলে' যাওয়ার সাহস ভাল না। কথাটা শুনে আমার ভেতর মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। মনে মনে সঙ্কল্পও করেছিলাম, ফেলুদার আখড়ায় নিয়মিত ব্যায়াম করবো।

আমার বয়েস যখন পনের, ওর তের কি চোদ্দ। বাল্যের উচ্ছ্বাসে গাম্ভীর্যের প্রলেপ পড়তে সুরু করেছে। সুমি ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধর-ধর। আমিও হাফ্-প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা ধরেছি ; চুল কাটার সময় নাপিত-ভায়াকে দিয়ে গাল দুটোও কল দিয়ে চাঁছিয়ে নিচ্ছি। সুমির প্রতি আমার গাম্ভীর্য বেড়ে গেলেও ওকে দেখবার এবং ওর সাহচর্য পাবার বাসনা আমার পেয়ে বসল। ঘুমিয়ে ওকে স্বপ্ন দেখতাম ; ঘুমহীন রাতে কল্পনার ডানা মেলে……। আমি কেমন পাল্টে যেতে লাগলাম। আড্ডা ছাড়লাম ; পড়াশোনায় মন দিতে সুরু করলাম—ফেল করলে ওর কাছে মুখ দেখাতে পারবনা যে !!

মীনাদের খাতা বই আদান-প্রদান ছাড়াও ওদের বাড়িতে নিয়মিত যাওয়ার একটা সুযোগ জুটে গেল। থ্যাঙ্কস্ টু মাসীমা, মানে সুমির মা। ওঁর পান-জর্দা সুপুরি বাতাসা ইত্যাদি কাইফরমাস খাটার জন্যে আমার মত একজনের

প্রয়োজন ছিল। আমাদের মেলামেশা ক্রমশ সহজ হয়ে উঠল। বেশ একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠল, লুডো খেলতাম দুজনে ; সুমি বেশীর ভাগ হারত ও আমি চুরি করেছি অজুহাতে খেলা ভণ্ডুল করে দিত। লেখা-পড়া, খেলা-ধূলা এমন কি সিনেমা নিয়েও আলোচনা হত। অপর কেউ এসে পড়লে কেন যেন আমরা দুজনেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম! পরবর্তী পর্বে শরৎ-সাহিত্য আদান-প্রদান ও আলোচনা। 'দেবদাস' আলোচনারত আমি ওর চুল টেনে ধরলাম। মুহূর্ত কয়েক মেনে নিয়ে, 'অসভ্য কোথাকার' বলে চুলের গোছা ছিনিয়ে নিল। সুরু হল ছোটখাট উপহার দেয়া-নেয়া।

পরের অধ্যায়ে সামান্য বোঝাপড়ার দরকার। মুখে কিছু বলা সম্ভব হলনা। বন্ধু কমলের পরামর্শে পত্রাঘাত করা সাব্যস্ত হল। চিঠি নয়ত কয়েক রাত জেগে রীতিমত সাহিত্য। জানা-না-জানা কত কোটেশন! কয়েকদিন ঘুর ঘুর করে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে একদিন ওর বইতে গুঁজে দিয়ে এলাম। আসার সময় জানিয়ে এলাম—'ওই বইয়ের মধ্যে একখানা……। ওদের বাড়ির বাইরে এসে দেখি আমি রীতিমত কাঁপছি। সারারাত ঘুমাতে পারলাম না। ভার অন্তাক্ষের দরজায় মাথা কুটলাম। ক'দিন পাড়া থেকেই নিপাত্তা হয়ে গেলাম।

পথের ধারেই সুমিতাদের বাড়ি। একদিন চোরের মত পাড়ায় ঘিরছিলাম, দেখি ও জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল আমারই প্রতীক্ষায়। সন্ধ্যার পর একখানা বই হাতে দুরু দুরু বুকে গেলাম ওদের বাড়ি। ওকে বেশ সহজ মনে হল। কিন্তু চিঠি সম্পর্কে ও নির্বাক! আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, জিজ্ঞাসা করলাম—

"উত্তর দেবে না?"

"জানিনা; আমার বড্ড ভয় করছে; জানতো বাবা-মা এসব পছন্দ করেন না।" সুমিতার জবাবে আমার মধ্যে একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া হল। ওর মুখে 'ভয় করছে' ও 'এসব' শব্দ তিনটের মধ্যেই যেন আমার দীর্ঘ চিঠির জবাব পেয়ে গেলাম। নিজেকে বেশ ঐশ্বর্যশালী বলে মনে হল। কমল আরো তাতিয়ে দিল।

"এর চাইতে আবার স্পষ্ট করে মেয়েরা কখনও বলে নাকি যে শালা? চালিয়ে যা। তবে শালা যদি পেট পুরে মিষ্টি না খাওয়াস ঢোল পিটিয়ে দেব।" সে বছর ভাইফোঁটায় সুমি আমার কপালে ফোঁটা না দিয়েই জলখাবারের ডিসটা এগিয়ে ধরল—"অমন লোভীর মত খাবারের প্রতি তাকিয়ে থাকলে ফোঁটা দেয়া যায় নাকি।" মাসীমা এসে পড়বার আগেই আমি কয়েকটা খুরিতে আঙুল ডুবিয়ে নিজের কপালে একটা ফোঁটা লাগিয়ে নিলাম।

সে বছর সুমি 'নাইন' থেকে 'টেন' এ উঠতে পারল না। আমার 'টেষ্ট' এ 'এ্যালাও' হবার আনন্দ শ্রাদ্ধ বাড়ির শোক উৎসবে পরিণত হল। শেষ পর্যন্ত ওর বড়দার পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক হল সুমি পরের বছরই পরীক্ষা দেবে; ওদের দেশের স্কুল থেকে। বোলপুরের কাছে ওদের দেশ। সুমি দিনরাত পড়াশোনা নিয়ে মেতে উঠল। আমার 'ফাইনাল' পরীক্ষার পড়া ওর 'সেমিফাইনাল' পরীক্ষার কাছে হার মানল। যাতায়াত কমাতে হল। পড়াশোনা ছাড়া আর কোন আলোচনা জমত না। ওর প্রতি আমার প্রবল সহানুভূতির কাছে আমার আর কোন দাবি বা অভিমান পাত্তা পেতনা।

ওদের টেষ্ট পরীক্ষার মাসখানেক আগে সুমি দেশে চলে গেল। আমার নতুন কলেজ জীবনের গর্বিত বুক আলগা-মুখ বেলুনের মত চুপসে গেল। লজ্জার মাথা খেয়ে আমি স্টেশনে গেলাম; অবশ্য সুমি আমাকে যেতে বলেছিল। শালওয়ার কামিজে ওকে ভারি সুন্দর লাগছিল। ট্রেন ছাড়বার একটুক্ষণ আগে আমরা একলা হবার সামান্য সুযোগ পেলাম। ট্রেন ছাড়বার আগে ওর বাবাকে প্রণাম করে নেমে এসে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। সুমি আস্তে আস্তে বলল,— 'চিঠি দিও জবাব না পেলেও, আমার পরীক্ষা।' মৃদু শাসন করতেও ভুললনা— "সাবধানে খেলাধূলা করবে; পড়ার ক্ষতি করে রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করবে না; কিছু হলে আমাকে জানাবে।"

ট্রেনের লাল আলোটা বাঁকের মুখে মিলিয়ে যাওয়া মাত্র আমার ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। শীতটা যেন আমায় জাপটে ধরল। প্রতিমা বিসর্জনের পর সবাই যেমন ভাঙ্গা মন নিয়ে ঘরে ফেরে, আমিও বাড়ির পথে পা বাড়ালাম। এ পথ যেন আর শেষ না হয়। জনারণ্য শহর, অথচ আমার কাছে কি ভীষণ ফাঁকা হয়ে গেল। এই প্রথম অনুভব করলাম যজ্ঞে যাওয়া মহানন্দা নদীর বুক-ফাটা কান্না। নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মত সে কান্না আজও আমার বুকে শুনতে পাই। সেই আমাদের শেষ দেখা। সুমিকে জানাতে হবে রেলগাড়ির পেছনের লাল আলোর প্রতি জীবনে আর কখনও তাকাতে পারিনি।

আমি ওর পথ চেয়ে প্রতিটি দিন মুহূর্ত গুণে চললেও সময় বয়ে চলেছিল আমার প্রতিকূলে। সুমি আর ফিরল না। একদিন জানতে পারলাম ওদের বাড়ির সবাই দেশে যাচ্ছে। সুমিতার বিয়ে। প্রসাদ খেতে দিয়ে মাসীমা জানালেন, বেয়ান এইমাসের মধ্যেই বিয়ে দিতে চান। ছেলে ডাক্তারি পড়ে; কবে আবার ছুটি পাবে তার ঠিকঠিকানা নেই। জান বাবা, আমার সুমুকে

ওদের ভারি পছন্দ হয়েছে। আমার ভেতরে একটা কান্না ডুকরে উঠল। বুঝলাম সবটাই ওর বাপ-মায়ের চালাকি—প্ল্যান করে ওকে এখান থেকে সরিয়েছে।

সেদিনের পর এক যুগ বাদে এই দেখা হওয়াটা কত অপ্রত্যাশিত! কত বদলে গেছি সবাই। কি দুস্তর ব্যবধান! তবু দেখা হওয়া মাত্র দুজন দুজনকে চিনতে পারলাম। না কোন প্রত্যাশা নয় তবু যেন আনন্দে মনটা দুলে উঠল —হারান পয়সা অচল হয়ে গেলেও, ফিরে পেলে যেমন হয়। অবশ্য এ উচ্ছ্বাসের তেমন কোন প্রকাশ নেই। কিছুই নয়, মাঝে মধ্যে ওর কাছে আসা যাবে; সময় সুযোগ হলে সবাই মিলে আড্ডা দেয়া যাবে। সুমির সংসার আমার একঘেয়ে মেস জীবনে একটা বৈচিত্র্য, হয়ত বা মরুদ্যানই!

"তুমি ত চা খুব গরম খাও।" বিস্কুট সহযোগে চায়ের পেয়ালা হাতে সুমি সশরীরে হাজির হয়ে আমার স্মৃতি রোমন্থনের জালটা ভেঙ্গে চুরমার করে দিল।

"তোমার কাছে অনেকগুলো খাওয়া পাওনা আছে; কাজেই আমি কিন্তু ঘন ঘন আসব সুমিতা।"

সুমিতা কিছু জবাব দেবার আগেই ফুটবল হাতে ওর ছেলেরা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। (চার্লস ল্যাম্ব'র শেষের কয়েকটা পংক্তি হঠাৎ মনে পড়ে গেল!!)।

"তোমাদের আর একজন মামু।"

অনেক কষ্টে একটা বিষম লাগা ঠেকালাম। ছেলেরা অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমায় খুঁটিয়ে দেখে বুঝল যে, আমি যে "তুত" মামুই হইনা কেন, 'প্রণামতুত' নই। সুমিতা ওর ছেলেদের পেছন পেছন ভিতর ঘরে চলে গেল। চায়ের ডিসে রাখা বিস্কুট ক'খানা ইতিমধ্যেই নেতিয়ে পড়েছে।

"তোমরা হাত-পা ধুয়ে এঘরে পড়তে বস।" তারপর ওর স্বগতোক্তি নীচু গলায় হলেও পরিষ্কার শুনতে পেলাম—"মাষ্টার আসার আগে আপদটা বিদেয় হলে হয়।"

আমাদের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকাশন

**মদন দাশ, প্রভাসকান্তি ভদ্র, রত্নেশ্বর বর্মণ ।। গল্প**

তিন তরুণ গল্পকারের বারোটি বলিষ্ঠ ও সমাজ সচেতন গল্পের সংকলন।

মূল্য ৫·০০

**মদন দাশ, শান্ত রায় ।। এক সূত্রে**

নতুন আর পুরনো বাট জন কবির কবিতার একটি বিশিষ্ট সংকলন।

**পিনাকীরঞ্জন গুহ। সিন্ধু সারস**

বহু প্রশংসিত অনুপম উপন্যাস। দ্বিতীয় মুদ্রণ : ৭·০০

**মনোজ মিত্র ।। চাক ভাঙা মধু**

প্রখ্যাত নাট্যকারের মঞ্চসফল ও জনসমাদৃত নাটক। দ্বিতীয় সংস্করণ : মূল্য ৫·০০

**রসিকরঞ্জন** রচিত শ্লেষ-ব্যাঙ্গাত্মক রম্যরচনা-সঙ্কলন

**অথ রসিকরঞ্জন-কথা** আট টাকা

**মাক্সিম গোর্কির মা**—নাট্যরূপ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ( যন্ত্রস্থ )

**লিপিকা ৩০/১-এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯**

**কৃশানু**

একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এককালীন চাঁদা ছয় টাকা। সডাক আট টাকা।

বিশেষ সংখ্যায় বর্ধিত মূল্য গ্রাহকদের দিতে হয় না।

নমুনা সংখ্যার জন্য দুই টাকার ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টরা ২৫%কমিশন পাবেন।

কৃশানু শারদীয় সংখ্যা অন্যান্য বারের মতো কবিতা, গল্প ও উপন্যাসে সমৃদ্ধ হয়ে মহালয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে।

**কৃশানু ৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯**